আবদুল গফুর

আমার কালের কথা

আমার কালের কথা

আবদুল গফুর

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা

www.pathagar.com

আমার কালের কথা

আবদুল গফুর

প্রকাশক
মুহাম্মদ নূর উল্লাহ্, পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

ঢাকা অফিস ঃ
১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। ফোন ঃ ৯৫৬৯২০১

চট্টগ্রাম অফিস ঃ
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম। ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩

গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশ কাল ঃ
ফেব্রুয়ারী ২০০০, মাঘ ১৪০৬

মুদ্রাকর ঃ
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি (প্রিন্টিং প্রেস) লিঃ

প্রচ্ছদ ঃ
আরিফুর রহমান

কম্পিউটার কম্পোজ
বন্ধু কম্পিউটার্স
২৮/সি, টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা। ফোন ঃ ৯৫৫০১০৭

মূল্য ঃ ১৭০/-

প্রাপ্তিস্থান ঃ
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
১২৫ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।
১৫০-১৫১ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা।
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।

AMAR KALAR KATHA; Written by : Abdul Gafur, Published by : Muhammad Nur Ullah, Director (Publication) Bangladesh Co-operative Book Society Ltd., 125 Motijheel C/A, Dhaka-1000. Price : Tk. 170.00, US$ 6.00
ISBN—984-493-051-3

www.pathagar.com

আব্বা মরহুম হাজী হাবিলউদ্দিন মুন্সী

ও

মা মরহুমা শুকুরুন্নেছা খাতুন

স্মরণে

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে।

বর্তমান বিশ্বে প্রায় সকল দেশে পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে এবং বিভিন্ন কারণে সামাজিক পরিস্থিতির ক্রমাগত পরিবর্তন হচ্ছে। পরিবর্তিত হচ্ছে মন-মানসিকতা এবং জীবনের মূল্যবোধ সম্বন্ধে ধারণা। এই পরিবর্তনের গোড়ায় নাড়া দিয়ে সহজাত প্রবৃত্তি ও চেতনাকে ফিরিয়ে এনে জাতির গঠন প্রক্রিয়ায় সহায়তা করেন লেখকরা তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে, শিল্পীরা তাঁদের শৈল্পিক অবদানের মাধ্যমে।

ঐতিহাসিকরা অতীতের কথা তুলে ধরে জাতি গঠনে সাহায্য করেন; তদ্রুপ কবি-সাহিত্যিকরা করেন তাঁদের কবিতা, নাটক-নভেল এবং রচনাবলী দিয়ে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রসূত বিভিন্ন যুগের সমাজচিত্র অঙ্কিত করেন কিছু ব্যক্তি স্মৃতিকথার মাধ্যমে। জাতি গঠনে এ সব স্মৃতিকথার মূল্য অপরিসীম।

বিখ্যাত ভাষা-সৈনিক অধ্যাপক আবদুল গফুর-এর স্মৃতিকথা 'আমার কালের কথা' ধারাবাহিকভাবে দৈনিক ইনকিলাব-এ প্রকাশিত হচ্ছিল এবং তা আমার দৃষ্টি আককর্ষণ করে। গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার ইচ্ছা পোষণ করে ব্যক্তিগতভাবে আমি যোগাযোগ করি। আমি তাঁর স্নেহধন্য, তাই অনুমতি দিয়ে তিনি আমাকে ব্যক্তিগতভাবে এবং বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটির পরিচালকবৃন্দকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

আমার শ্রদ্ধেয় 'গফুর ভাই'-এর এই পুস্তকটি তাঁর স্মৃতি রোমন্থনের 'প্রথম খন্ড'। এটাতে পরিবেশিত হয়েছে তাঁর শৈশব থেকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা (১৯৪৭) সময় পর্যন্ত কালের কথা। এই সময়টা ছিল সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক এবং আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের যুগ। এই হাওয়া বদলের পালায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'গফুর ভাই' তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সরল ভাষায় যা বর্ণনা করেছেন তা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী।

এই লেখা পুস্তকাকারে প্রকাশ করতে পেরে বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি অত্যন্ত গৌরবান্বিত। পাঠকবৃন্দের একজনের হৃদয়কেও যদি এই বই নাড়া দেয়, আমাদের এই প্রয়াস সার্থক হবে বলে আমি আশা করি।

মুনওয়ার আহমদ
সভাপতি
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.pathagar.com

ভূমিকা

পুরনো কথা শুনবার প্রয়োজন আছে। কেননা তার সাহায্যে আমরা আমাদের অতীতকে চিহ্নিত করতে পারি এবং বর্তমানের জন্য মূল্যবোধ নির্মাণ করতে পারি। আমাদের রাজনৈতিক এবং সামাজিক জীবনে বৃটিশ শাসন থেকে পাকিস্তানী শাসনের উত্তরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল। বৃটিশ শাসন চলে যাওয়ার পর ভারতীয় ভূখন্ডে একটি নতুন অখন্ড ব্যবস্থাপনা তৈরী হয়নি। ভারত বিভক্ত হয়েছিল এবং আমরা বিভক্ত ভারতের পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীরা একটি নতুন প্রত্যাশার মধ্যে জেগেছিলাম। যাকে আমরা বাংলাদেশ বলে জানি বৃটিশরা চলে যাবার পর নতুন জন্মলগ্নে তার নাম হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান। আমাদের প্রত্যাশা তখন ছিল প্রচুর। একটি অপরিসীম বিশ্বাসে আমরা মনে করেছিলাম আমাদের নতুন জীবনেএকটি সমৃদ্ধি আসবে এবং দেশের সাধারণ মানুষ স্বস্তিতে বসবাস করতে পারবে।

আজকে যাঁদের বয়স ষাটোর্দ্ধ, তাদের সবাই এক সময় নতুন প্রত্যাশার মধ্যে জেগেছিলো, কিন্তু নানা কারণে তাদের প্রত্যাশাগুলো ভেঙে গিয়েছিলো এবং তারা যা আশা করেছিলো তারা তা পায়নি। এই না পাওয়ার ইতিহাসটি আমাদের জানবার প্রয়োজন আছে। আরও প্রয়োজন আছে এ কথা জানবার যে আমাদের প্রত্যাশা পূর্ণ যে হলো না সেজন্য কে বা কারা দায়ী। আমাদের অহমিকাবোধ ছিল, কিন্তু অহমিকাকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থাপনা আমাদের জানা ছিল না। তাই আমাদের নতুন ইচ্ছার জন্ম হয়েছে কিন্তু ইচ্ছাটি কখনও সফল হতে পারেনি। এই ইচ্ছার দু'টি পর্যায় আছে। একটি হচ্ছে পাক-ভারত ভূমন্ডলে বৃটিশদের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নির্মাণ। দ্বিতীয় হচ্ছে নতুন প্রেক্ষাপট যথার্থরূপে গড়ে ওঠার আগেই নিজেদের মধ্যে বিরোধিতার সূত্রপাত এবং একটি দুঃখজনক অবিশ্বাসের জন্ম। তবে প্রথম পর্বের ইতিহাসটি পুরোপুরি না জানলে পরবর্তী পর্যায়ের নতুন অবস্থাটি অনুভব করা যাবে না।

আবদুল গফুরের 'আমার কালের কথা' নামক স্মৃতিমূলক গ্রন্থে প্রথম পর্বের ইতিহাসটি ধরা পড়েছে। লেখক তার নিজের শৈশবকালীন পরিবেশ এবং জীবনধারা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন এবং ক্রমশ পাকিস্তান আন্দোলনের পটভূমি বিশ্লেষণ করেছেন। গ্রাম ছেড়ে একজন কিশোরের চিরকালের জন্য রাজধানীতে আগমন বিরাট পরিবর্তন সূচনা করে।

শহরের জীবন, সংকট এবং কোলাহল গ্রাম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আবদুল গফুর গ্রাম থেকে শহরে এসে এই ভিন্নতাকে লক্ষ্য করতে লাগলেন। তিনি দেখলেন যে, নগর জীবনে স্থায়ী কোন প্রত্যয় নেই এবং অনবরত সেখানে দ্বন্দ্ব, কোলাহল এবং বিশ্বাস-অবিশ্বাসের টানাপোড়েন। লেখক এ বিষয়টি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তার আলোচনার মধ্যে গ্রামীণ জীবনের স্বভাব, কথকতা এবং প্রাকৃতিক ঔদার্য যেমন এসেছে, তেমনি আবার নগরের নির্মাণাধীন নতুন বলয়ের মধ্যে অন্য একটি জীবনকে মূর্ত হতে দেখেছেন। তার ছাত্রাবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশে নানা ধরনের রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনার তিনি জন্ম হতে দেখেছেন। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের মধ্যে ভারসাম্যের অভাব লক্ষ্য করেছেন এবং সর্বত্র একটি অস্থির প্রপঞ্চ তাকে বিচলিত করেছে।

আবদুল গফুর খুব সহজ ও সরল বিশ্বাসে তার বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। তার লেখার মধ্যে একটি সুন্দর গতিধারা পাওয়া যায়। আরও একটি বড় কথা, তাঁর গ্রন্থের মধ্যে তাঁকে আমরা সমালোচক হিসেবে পাই না, পরিণামদর্শী দর্শক হিসেবে পাই। 'ইনকিলাব' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে যখন এ লেখাটি প্রকাশিত হচ্ছিল তখন আমি নিয়মিতভাবে পড়তাম এবং মুগ্ধ হতাম। আমাদের জাতীয় জীবনের জন্য যে প্রেক্ষাপট তিনি নির্মাণ করেছেন তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

সৈয়দ আলী আহসান

www.pathagar.com

লেখকের কথা

'আমার কালের কথা' কিভাবে লিখতে শুরু করি, তা লেখার শুরুতেই বিবৃত হয়েছে। আত্মজীবনী লেখার মতো কোনো খ্যাতনামা ব্যক্তি যে আমি নই, এ সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ সজাগ। তবুও কেন এ লেখায় হাত দিলাম, সে প্রশ্নের জবাবে বলতে হয়, আমি নিজে একটি ক্ষুদ্র ব্যক্তি হলেও আমি যে কালে বেড়ে উঠেছি, তখন আমার চারপাশে যেসব ঘটনা ঘটতে দেখেছি সেগুলোর গুরুত্ব ছিল অসাধারণ। আমাদের জাতীয় ইতিহাসে তার প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী।

'আমার কালের কথা' কিছুটা স্মৃতিচারণধর্মী রচনা হলেও সম্পূর্ণ স্মৃতিকথা নয়। আমার শৈশব, কৈশোর এবং প্রথম যৌবনের সেই দিনগুলোতে সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনে যেসব পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছিল, তা স্বাভাবিকভাবেই আমার ব্যক্তি জীবনেও ফেলছিল বিরাট প্রভাব। সেই চলমান ইতিহাস সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণই এখানে আমি কলমবদ্ধ করেছি সাদামাটা ভাষায়। আমার এ লেখা সম্পূর্ণ স্মৃতিচারণ নয়, আবার ইতিহাস গ্রন্থও নয়। কিন্তু এতে যে ইতিহাসের প্রচুর উপাদান রয়েছে– এ সত্য অনস্বীকার্য।

'আমার কালের কথা' যখন দৈনিক 'ইনকিলাব'-এ ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছিল, তখনই এ রচনা গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে তাগিদ পাচ্ছিলাম। এতোদিনে এ গ্রন্থের প্রথম খন্ড প্রকাশিত হলো, এ জন্য আল্লাহ্ রাহমানুর রাহীমের দরবারে জানাই লাখো শোকরিয়া। এই বই প্রকাশের জন্য আমি বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটিকে এবং সোসাইটির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

এ গ্রন্থ প্রকাশ তো দূরের কথা, এ লেখা আমার পক্ষে সম্ভবই হতো না, যদি এ লেখা শুরুর পূর্বে ও পরে দৈনিক ইনকিলাব-এর সম্পাদক জনাব এ.এম.এম. বাহাউদ্দীন, নির্বাহী সম্পাদক কবি রুহুল আমীন খান, সহকারী সম্পাদক জনাব ইউসুফ শরীফ, মুনশী আবদুল মাননান এবং ফিচার বিভাগের শেখ দরবার আলম, কবি আবদুল হাই শিকদার, আহমদ সেলিম রেজা, হাসনাইন ইমতিয়াজ, কবি ফাহিম ফিরোজ প্রমুখ এ ব্যাপারে একটানা উৎসাহ না যোগাতেন। মামুলী ধন্যবাদ জানিয়ে তাদের আন্তরিকতাকে আমি খাটো করতে চাই না।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মনীষী, জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান সাহেব আমার এ বইয়ের ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে আমার শিক্ষক। তাঁকে ধন্যবাদ জানানোর স্পর্ধা আমার নেই।

সাবধানতা সত্ত্বেও তাড়াহুড়ার দরুন বইয়ে কিছু ছাপার ভুল থেকে গেল। বইয়ে কোনো তথ্যগত ভুল দেখা গেলে সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা যদি তা ধরিয়ে দেন, আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো। ভবিষ্যতে সেগুলো সংশোধনের চেষ্টা করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

আবদুল গফুর

২৩ ফেব্রুয়ারী ২০০০

www.pathagar.com

সূচীপত্র

শিক্ষা জীবনের শুরু/৯
লেখা শিখতে কলাপাতা/১০
খৃষ্টধর্ম শিক্ষাদান/১১
রাজা পঞ্চম জর্জের রজত জয়ন্তী/১২
ধর্মসভা ও ওয়াজ মাহ্ফিল/১৫
সামাজিক পর্ব/১৬
মিষ্টির পোকা/ ১৮
ইলিশ মারতে পদ্মায়/ ২৪
তালিমনগর মাদ্রাসা/ ৩৩
শাহ সাহেব ও মাওলানা রইসউদ্দিন/৩৪
জগলুল পাশা, ফজলুল হক/৩৮
একজন কবি ও একটি পত্রিকা/৪০
মওলানা আকরম খাঁ/৪০
আব্বাস উদ্দীনের গান/৪১
কলের গান/৪১
মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব/৪২
মোবারকবাদ/৪২
ক্ষুদে মোল্লার ভূমিকায়/৪৪
লাহোর প্রস্তাব পাসের পটভূমি/৪৭
পদ্মা পারাপারের দুর্ভোগ/৫২
স্টীমার পথে সিরাজগঞ্জ/৫৮
জীবনে প্রথম সিনেমা দেখা/৫৯
ফরিদপুরে/৬২
ভালো রেজাল্টের ঝকমারী/৬৭
শহর জীবনের প্রথম ছোঁয়া/৭০
স্টুডেন্টস হোম/৭৬
শেরেবাংলার লীগ ত্যাগ/৭৯
ফজলুল কাদের গ্রেফতার/৮১
হিন্দু নেতাদের ইংরেজপ্রীতি/৯০
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত/৯১
প্রথম বঙ্গভঙ্গ/৯২
বেঙ্গল প্যাক্টের অকাল মৃত্যু/৯২
দুর্ভিক্ষের অভিজ্ঞতা/৯৫
কোহিনূর লাইব্রেরী/৯৮
মুসলিম লীগের ট্রেনিং ক্যাম্প/১০৩
বিপ্লবী কবি বেনজীর আহমদ/১০৫
ফজলুল হকের বিরুদ্ধে কালো পতাকা/১০৮
হাই মাদ্রাসায় আমার শিক্ষকমন্ডলী/১১০
প্রাথমিক শিক্ষক হতে পারলাম না/১১৯
প্রথম কলিকাতা দর্শন/১২২
প্রথম ঢাকা দর্শন/১২৬
প্যারাডাইস হোস্টেলে/১২৮
১৫০ মোগলটুলী/১৩২
রায়টকালীন ঢাকা/১৩৩
পাঁচচল্লিশের ঢাকা শহর/১৩৫
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বোর্ডের করুণ অবস্থা/১৩৭
মুকুল ফৌজ আন্দোলন/১৩৮
জিন্নাহর সঙ্গে সুভাষ বসুর সাক্ষাৎকার/১৫০
একজন অসাধারণ মেধাবী ছাত্র/১৫২
শহীদ নজীর/১৫৬
সিলেটের শহীদ আলকাস/১৫৭
আসামে পাকিস্তান আন্দোলন/১৫৭
রঙ্গাল খেদা/১৫৮
লাইন প্রথার কবলে বাঙ্গালী কৃষক/১৫৯
একজন বিপ্লবী মওলানা/১৫৯
ঐতিহাসিক নির্বাচন/১৬৩
গফরগাঁও কনফারেন্স/১৬৪
বাগ্মী আবুল হাশিম/১৬৯
গোয়ালন্দ ঘাটের কুলি সমাচার/১৭৩
প্রফেসর মনসুর উদ্দিন/১৭৪
বিজ্ঞান গবেষক আকবর আলী/১৭৬
একখানি সাড়া জাগানো কাব্যগ্রন্থ/১৭৮
'তরুণ মুসলিমের ভূমিকা'/১৭৯
দ্বিতীয় কলিকাতা সফর/১৭৯
কার্টুনিষ্ট 'দোপেয়াজা'/২০২
পাকিস্তান সংগ্রামের সাংস্কৃতিক পটভূমি/২০৫
বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলন/২০৮
পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি প্রতিষ্ঠা/২১২
মুসলিম সাহিত্য সমাজ, ঢাকা/২১৪
পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ/২২১
পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সম্মেলন/২২৩
পাকিস্তান আন্দোলনে শিল্পী-সাহিত্যিকদের ভূমিকা/২২৬
বাংলাদেশে পাকিস্তান সংগ্রামের বৈশিষ্ট্য/২৩৩
নির্বাচনে ঐতিহাসিক সাফল্য/২৩৮
সংখ্যালঘু নয়, স্বতন্ত্র জাতি/২৪২
মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা/২৪৩
দিল্লী সম্মেলন/২৪৪
নেহরুর ভূমিকা/২৪৭
প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস/২৪৭
কলিকাতায় দাঙ্গা/২৪৮
বিহার ও অন্যান্য প্রদেশে দাঙ্গা/২৫০
ইন্টেরিম গভর্নমেন্ট/২৫২
নেহেরু-মাউন্টব্যাটেন আঁতাত/২৫৩
তেসরা জুন পরিকল্পনা/২৫৪
সার্বভৌম বাংলা আন্দোলন/২৫৭
'শেষ পর্যন্ত আপনিও?'/২৬৩
গণভোট উপলক্ষে সিলেটে/২৭৩
সাম্রাজ্যবাদের শেষ খড়গ : র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ/২৮১
সোহরওয়ার্দীর হত্যা প্রচেষ্টা/২৮৫
বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি/২৮৯
স্বাধীনতার প্রতীক্ষায়/২৯১
অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান/২৯৩
বৃটিশ শাসনের কুফল/২৯৯
সাতচল্লিশের পটভূমি/৩০৯

www.pathagar.com

মেঘে মেঘে বেলা তো কম হয়নি। সেই ছোটকালের ছোট্ট আমিটি দেখতে দেখতে এখন (১০.১০.৯৭) আটষট্টি পেরিয়ে উনসত্তরে পা রাখতে চলেছি। এককালের সদাচঞ্চল শিশু এখন বার্ধক্যের গুরুভারে স্থবির হবার উপক্রম। পরিবর্তন শুধু আমার জীবনেই আসেনি, এসেছে চারপাশের চলমান জগতেও। জন্মেছিলাম বৃটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষে। চোখের সামনে বৃটিশ শাসনের অবসানে কায়েম হল পাকিস্তান। সে পাকিস্তানও চোখের সামনেই একদিন ভেঙ্গে জন্ম নিল বাংলাদেশ। সে বাংলাদেশেরও বয়স এখন ছাব্বিশ। জীবনে চলার পথে যে সব বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছি, অনেক সময়ই বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মীদের সাথে কথা-বার্তায় তার ছিটেফোঁটা উঠে এসেছে। আর তখনই তাগিদ এসেছে স্মৃতিকথা লেখার।

কিন্তু স্মৃতিকথা লিখতে চাইলেই তো আর লেখা হয়ে ওঠে না। এককালে ডাইরী লেখার অভ্যাস করেছিলাম কিছুদিন। নানা ঝড়-ঝাপটায় সে অভ্যাসও ধরে রাখতে পারিনি। এমন কি, সে ডাইরীও যে কোথায় হারিয়ে গেছে তারও কোন হদীস নেই। এতদিন পর নেহায়েৎ স্মৃতিনির্ভর লেখায় কিছু ভুলভ্রান্তি আসতে পারে। তবে এরূপ কোন ভুল কেউ দয়া করে শুধরে দিলে তার প্রতি কৃতজ্ঞই থাকবো।

জন্মেছিলাম সাবেক ফরিদপুর বর্তমান রাজবাড়ী জেলার খানগঞ্জ ইউনিয়নের দাদপুর গ্রামে। পাড়া গাঁ হলেও এই গাঁয়ের এক মাইল উত্তর দিক দিয়েই চলে গেছে বৃটিশ আমলে নির্মিত বিখ্যাত গোয়ালন্দ-কলিকাতা রেলপথ। আমাদের বাড়ীর দূরত্ব নিকটতম রেলস্টেশন বেলগাছি থেকে এক মাইলের সামান্য বেশী। ফলে বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে সেকালেও মোটামুটি একটা সংযোগ ছিল আমাদের।

শিক্ষা জীবনের শুরু

আমার শিক্ষা জীবনের শুরু গ্রামের মকতবে। মকতবটির এককালে পরিচিতি ছিল দাদপুর মাদ্রাসা হিসাবে। এটি পরে যখন প্রাইমারী স্কুলে রূপান্তরিত হয় তখনও এর নাম দাদপুর মাদ্রাসাই লোকমুখে চালু থাকে। সারা ইউনিয়নে তখন একটি মাত্র মাইনর স্কুল ছিল বেলগাছিতে। পরে এটি হাইস্কুলে উন্নীত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা মুসলমান জমিদার খান বাহাদুর আলিমুজ্জামান চৌধুরী হলেও হেডমাস্টারসহ অধিকাংশ শিক্ষক-ছাত্র ছিল হিন্দু। সারা ইউনিয়নের মোট জনসংখ্যার বেশীর ভাগ মুসলমান হলেও শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-

www.pathagar.com

বাকরি প্রায় সর্বত্রই হিন্দুদের ছিল একচেটিয়া প্রাধান্য।

মুসলমানদের এ দুরবস্থা শুধু যে আমাদের ইউনিয়নে সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়। এলাকার সর্বত্রই ছিল প্রায় একই অবস্থা। বরং বলা যায়, এলাকার মধ্যে শুধু আমাদের স্কুলেই অবস্থার কিছুটা ব্যতিক্রম ছিল। এখানে শিক্ষক সবাই এবং ছাত্রদেরও অধিকাংশ ছিল মুসলমান। আমার ধারনা, এই ব্যক্তিক্রমী অবস্থার মূলে ছিল ফুরফুরা শরীফের পীর সাহেবদের, বিশেষত মওলানা আবু বকর সিদ্দিকী (রঃ)-এর প্রভাব। তিনি এবং তাঁর খলিফাগণ নিয়মিত আমাদের গ্রামে জলসা করতেন। এসব জলসার প্রভাব অনগ্রসর মুসলমান সমাজের ধর্মীয় জীবনে তো বটেই, অন্যান্য ক্ষেত্রেও পড়ত প্রবলভাবে। মুসলমানদের দুরবস্থা কাটিয়ে উঠতে শিক্ষার গুরুত্বের কথা ফুরফুরার পীর সাহেব যত জোরে-শারে প্রচার করতেন, তেমন খুব কমই দেখা যেত। আমার আব্বা মুন্সী মোহাম্মদ হাবিল উদ্দীন ছিলেন ফুরফুরার মুরীদ। বলা বাহুল্য, তিনিই ছিলেন দাদপুর মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা।

মুসলমানদের অর্থনৈতিক অবস্থা করুণ, অথচ তাদের মাদ্রাসা করতে হবে, স্কুল করতে হবে। সুতরাং সিদ্ধান্ত হল প্রত্যেক বাড়ীতে মাদ্রাসার জন্য আলাদা মাটির পাত্র থাকবে, যেখানে গৃহিণীরা প্রতি ওয়াক্ত রান্নার সময় এক মুষ্টি চাউল রাখবেন। এভাবে সঞ্চিত চাউল সপ্তাহ শেষে ছাত্ররা সংগ্রহ করে নিয়ে আসবে। গাঁয়ের বিয়ে-শাদী উপলক্ষে তোলা চাঁদা এবং বার্ষিক জলসার সময়ে ওয়ায়েজিনদের উঠানো টাকা ছাড়া এই মুষ্টি চাউলই ছিল তখন মুসলিম সমাজে শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন জনহিতকর কাজের জন্য আয়ের প্রধান উৎস।

লেখা শিখতে কলাপাতা

আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন শিক্ষাক্ষেত্রে আজকের মত কাগজের বহুল প্রচলন ছিল না। স্কুলে আমাদের প্রথম দিকে লিখতে হত কলাপাতা বা তালপাতায়। চাল পুড়িয়ে কালি তৈরী করে মাটির দোয়াতে ভরে দিতেন মা। বাঁশের কঞ্চি কেটে কলম তৈরী করে দিতেন আব্বা। এভাবেই হয়েছিল আমার লেখার হাতেখড়ি। তারপর একদিন এলো কাগজ হাতে নেয়ার পালা। কাগজ হাতে নেয়ার দিন রীতিমত বাড়ীতে মিলাদ পড়িয়ে কাগজ হাতে দেয়া হল। চারদিকে একটা উৎসবের আমেজ। মনে হল এতদিনে ছাত্র হিসাবে জাতে উঠলাম।

গাঁয়ের যে মকতবে আমার শিক্ষা জীবন শুরু তাকে ঘিরে এখনও বহু স্মৃতি মনের কোণে উঁকি দেয়। এসব স্মৃতির মধ্যে সবটাই যে আনন্দের সুখস্মৃতি, তা বলা যাবে না। আমি সব সময় ক্লাসে ফার্স্ট হতাম, ভাল রেজাল্ট করতাম, তা সত্ত্বেও মাস্টারের হাতে প্রহারের ভাগটাও আমার ভাগ্যেই জুটতো বেশী। আমাদের মাস্টারের নাম ছিল কবিরুদ্দীন আহমদ, সংক্ষেপে কবির মাস্টার। গ্রাম সুবাদে

www.pathagar.com

আমার চাচা হতেন। তিনি আমাকে মারতেন আরও ভাল রেজাল্ট করি না কেন সে জন্য এবং এ শাসনের পেছনে আমার আব্বারও নাকি সায় ছিল। তাদের ধারণা ছিল, পড়ালেখা ভাল করলেও আমি খেলার পাগল ছিলাম, তা না হলে নাকি আমার রেজাল্ট আরও ভাল হত।

হ্যাঁ, ছোটকালে আমার মধ্যে দু'টি নেশা একটু বেশী মাত্রায়ই ছিল। একটি খেলার, আরেকটি মাছ ধরার। খেলার মধ্যে প্রধান ছিল হা-ডু-ডু, দাড়িয়াবান্দা আর গোল্লাছুট। তবে এসব খেলার জন্য নির্দিষ্ট সময় ছিল। স্কুলে ক্লাসের শেষে অথবা বিকালে। এবং এসব খেলা নিয়ে আমার শিক্ষক বা গার্জিয়ানদের তেমন আপত্তি ছিল না। কিন্তু আমার একটি নেশা ছিল মার্বেল খেলা, যার কোন সময়-অসময় ছিল না। আমার গার্জিয়ানদের যত রাগ ছিল এই খেলার বিরুদ্ধে।

খৃস্টধর্ম শিক্ষাদান

মার্বেল খেলায় আমার প্রবল আসক্তি সৃষ্টির পেছনে একটি ছোট্ট ঘটনা ছিল। আমি স্কুলে ভর্তি হই ১৯৩৩ সালে চার বছর বয়সে ইনফ্যান্ট ক্লাসে। আমি যখন ক্লাস টু-তে পড়ি একদিন আমাদের স্কুলে এলেন এক খৃস্টান পাদ্রী। দেশীয় খৃস্টান হলেও তার পরনে ছিল শার্ট ও হাফ প্যান্ট, মাথায় শোলার হ্যাট। ইংরেজ শাসনামলে তখন শুধু সাদা চামড়ার ইংরেজরাই নয়, দেশী খৃস্টান-পাদ্রীরাও আমাদের চোখে ছিলেন সাহেব। স্কুল ইন্সপেক্টরের উৎসাহেই কিনা জানি না, সাব্যস্ত হয় এই সাহেব আমাদের সপ্তাহে একদিন করে ক্লাস নেবেন। বছরান্তে পরীক্ষা ও আকর্ষণীয় পুরস্কার।

ছোট্ট একটা বই পড়তে হত আমাদের। প্রবল উৎসাহ নিয়ে আমরা পড়তে লেগে গেলাম– 'যিশু আমাদের প্রভু', 'যিশু স্বর্গে থাকেন' ইত্যাদি ইত্যাদি। বছর শেষে পরীক্ষা হল। পুরস্কার পেলাম রঙ্গিন সিল্কের একটি তোড়া ভর্তি একুশটি রঙ্গিন মার্বেল গুটি। মার্বেল খেলার প্রতি একটা আকর্ষণ আগেই আমার ছিল। এবার তা নেশায় পরিণত হল। এ নেশা থেকে মুক্তি পেতে অনেক দিন লেগেছিল।

এর অল্পদিন পরই অবশ্য আমাদের বাইবেল পড়া বন্ধ হয়ে যায়। সাহেবকে বলে দেয়া হয়, তিনি যেন আর না আসেন। তবে সে অন্য এক কাহিনী।

সে দৃশ্য এখনও আমার স্মৃতির পর্দায় গাঁথা হয়ে আছে। অন্যান্য দিনের মত সেদিনও সেই পাদ্রী সাহেব স্কুলে এসেছেন। স্কুলে এলে তাকে বিশেষ সমাদর করে চেয়ারে বসানো ছিল চিরাচরিত রেওয়াজ। শার্ট বা কোট এবং হাফ-প্যান্ট পরিহিত সাহেব সাধারণত আসতেন সাইকেলে। তাকে সমাদর করে চেয়ারে বসিয়ে ডাব কেটে দেয়া হত। কিন্তু সেদিন সব কিছুই ব্যতিক্রম। আমার আব্বা স্কুলের

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে স্কুল কমিটির সেক্রেটারী। অন্যান্য দিন সাহেবকে আদর-যত্ন করার সাথে নানা কথাবার্তা বলতেন। কিন্তু আজ তাঁর ভিন্ন চেহারা। সাহেব স্কুল প্রাঙ্গণে পা দিতেই আব্বা গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলে দিলেন, আপনি গাঁয়ের ছেলে-মেয়েদের খৃস্টান বানানোর তালে আছেন, আপনি আর কোন দিন এখানে আসবেন না।

আব্বার এ মেজাজের সাথে সাহেবের কোন পরিচয় ছিল না। কিছুক্ষণ স্তব্ধ বিস্ময়ে আব্বার দিকে তাকিয়ে কি যেন বলতে চেষ্টা করলেন। হয়ত তার কার্যক্রমের সমর্থনে কিছু বলতে চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু তাতে কোন ফল হলো না। আব্বার কণ্ঠস্বর আরও উচ্চগ্রামে উঠল। তিনি গর্জন করে উঠলেন, কোন কথা না-আপনি চলে যান। আর কখনও আমাদের স্কুলে আসবেন না।

সাহেব কি যেন বিড়বিড় করতে করতে চলে গেলেন। দাদপুর স্কুল তথা মাদ্রাসা এক বিরাট ফাঁড়া থেকে রক্ষা পেল। আমাদের বাড়ীতে সে সময় ফুরফুরা শরীফের পীর সাহেব ছাড়াও প্রায় প্রতি বছর আসতেন আরেক বুজুর্গ দরবেশ। গাঁয়ের সকলের কাছে তাঁর পরিচিতি ছিল 'বুড়া মৌলভী' নামে। পরে জেনেছিলাম তাঁর তাকিদেই দাদপুর মাদ্রাসায় বাইবেল পড়ানোর এ ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়।

তখন চারদিকে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন চললেও তা তেমন জোরদার হয়নি। সেই ব্রিটিশ শাসন চলাকালে আব্বা শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতাধন্য পাদ্রী সাহেবকে এভাবে অপদস্থ করে তাড়িয়ে দেয়াতে আমরাও কম শঙ্কিত ছিলাম না। প্রতিদিনই আমরা আশঙ্কা করতাম কিছু একটা ঘটতে পারে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তেমন কিছু ঘটেনি।

রাজা পঞ্চম জর্জের রজত জয়ন্তী

বাইবেল পাঠের দায় থেকে মুক্তি পেলেও ব্রিটিশ শাসনের অন্যান্য বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি পাওয়া আমাদের অত সহজসাধ্য ছিল না। ১৯৩৬ সালে আমি যখন ক্লাস থ্রিতে পড়ি সম্ভবত সেই বছরই ছিল ব্রিটিশ সম্রাট পঞ্চম জর্জের রজতজয়ন্তী। অর্থাৎ তার শাসনকালের ২৫ বছর সেবার পূর্ণ হয়েছিল। মহা ধুমধামের সাথে সর্বত্র রজতজয়ন্তী পালিত হলো।

এই রজতজয়ন্তী কর্মসূচীর একটি অংশ ছিল কালুখালি রেল স্টেশনের পাশে রতনদিয়া হাই স্কুল প্রাঙ্গণে একটি ছাত্র সমাবেশ। কয়েক ইউনিয়নের স্কুল ও মক্তবের ছাত্রদের গরু তাড়ানোর মতন করে শিক্ষকরা হাঁটিয়ে নিয়ে গেলেন সেই রতনদিয়া হাই স্কুলে। আমাদের স্কুল থেকে রতনদিয়া হাই স্কুল তিন মাইলেরও বেশী পথ। এ দীর্ঘ পথ হেঁটে আমরা স্বাভাবিকভাবেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। অথচ ওখানে পৌছার একটু পরেই আমাদের লাইনে বসিয়ে দেয়া হলো মিষ্টি খাওয়ানোর

www.pathagar.com

জন্য। বলা বাহুল্য, এই মিষ্টি খাওয়ানোও ছিল রজতজয়ন্তী কর্মসূচীর একটি অংশ। মিষ্টি বিতরণের আগে সকলের হাতে একটি করে কাগজ দেয়া হলো মিষ্টি ধরার জন্য। এরপরেই ভলান্টিয়াররা দ্রুত বেগে মিষ্টি বিতরণ শুরু করল। এত দ্রুত তারা একেক জনের কাগজে মিষ্টি দিয়ে যাচ্ছিল যে, অনেকের কাছ থেকেই মিষ্টি মাটিতে পড়ে যাচ্ছিল। আমারও একটি ছাড়া সব মিষ্টিই মাটিতে পড়ে গেল। মনটা চুপসে গেল। কিন্তু চুপসে গেলে কি হবে, আসল কর্মসূচী তখনও বাকী। ছাত্রদের ঐ সমাবেশে কে এক জন ব্রিটিশ শাসনের সুফল, বিশেষত রাজা পঞ্চম জর্জের গুণকীর্তন করে বক্তৃতা দিলেন। এরপরে শুরু হলো আমাদের সমবেত গান। কয়েক দিন ধরে রিহার্সেল দেওয়া সে গানে ব্রিটিশ রাজের বহু গুণকীর্তন ছিল। গানের প্রথম কলিটি ছিল– "আজিকে মোদের রাজার শাসন/ পঁচিশ বছর পূর্ণ হলো"। এমনিতে মিষ্টি হারানোর বেদনা, তার উপর ব্রিটিশ রাজের বন্দনায় গলার স্বর উচ্চগ্রামে তুলে গানে অংশগ্রহণ, মনটা আরও খিঁচিয়ে গেল।

তখন মুসলমানেরা শিক্ষাদীক্ষায় কতখানি পশ্চাৎপদ ছিল তা বলে শেষ করার নয়। আমাদের গ্রামে তখনও কেউ ম্যাট্রিকের দোরগোড়া পার হয়নি। আমাদের গ্রামে প্রথম যিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তাঁর নাম লুৎফর রহমান। এই লুৎফর রহমান ছিলেন আমার গ্রাম্য সুবাদের দাদা মুন্সী দরবেশ আলীর বড় ছেলে। পরবর্তীকালে আমি হয়েছিলাম আমাদের গ্রামের দ্বিতীয় ম্যাট্রিকুলেট। সেও অনেক পরের কথা।

আমি যখন মকতবে পড়ি তখন যারা হাই স্কুলে উপরের ক্লাসে পড়তেন তাদের সম্পর্কে আমাদের ছিল এক অভিনব সম্ভ্রমবোধ। কোন ছাত্র হাই স্কুলে ক্লাস এইটে উঠলেই তাকে বলা হতো থার্ডক্লাসের ছাত্র। এরপর নাইনে সেকেন্ড ক্লাস এবং টেনে ফাস্ট ক্লাসের ছাত্র বলে তাদের পরিচয় দেয়া হত। বর্তমানে যেটা এসএসসি তা কিছুকাল আগ পর্যন্তও ছিল ম্যাট্রিকুলেশন এবং আমি যে সময়ের কথা বলছি সেটাকে তখন এন্ট্রান্স বলা হতো।

এখন যেটা রাজবাড়ী জেলা, সেটা তখন ছিল গোয়ালন্দ মহকুমা। মহকুমার সদর দফতর তখনও রাজবাড়ীতেই ছিল। সারা মহকুমার মুসলমান সমাজের মধ্যে এমএ পাস ছিলেন সর্বসাকুল্যে চারজন। কাজী আব্দুল ওদুদ, কাজী মোতাহার হোসেন, মৌলভী তমিজউদ্দীন খান ও প্রিন্সিপাল কিতাবুদ্দীন আহমদ। এদের কাউকেই তখনও আমি দেখিনি। তবে আব্বার মুখে বিশেষ করে এদের শেষোক্ত দু'জনের নাম প্রায়ই শুনতাম। অনেক পরে জেনেছি এদের শেষোক্তজন অর্থাৎ কিতাবুদ্দীন আহমদ ছিলেন জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের ক্লাসফ্রেন্ড।

www.pathagar.com

সমগ্র বৃহত্তর ফরিদপুর জেলায় তখন একটি মাত্র কলেজ ছিল ফরিদপুরে। গোয়ালন্দ মহকুমায় ব্রিটিশ আমলে কোন কলেজ ছিল না। এ মহকুমায় রাজবাড়ীতে প্রথম কলেজ হয় পাকিস্তান আমলে।

আমার আব্বা যদিও খুব সামান্য লেখাপড়া জানতেন, তবুও গ্রামে শিক্ষার বিস্তারে তাঁর আগ্রহ ছিল সীমাহীন। তাঁর দেয়া জমিতেই গ্রামের একমাত্র মাদ্রাসা (স্কুল) প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়াও প্রত্যেক দিন ভোরে আমাদের কাচারি ঘরে পাড়ার ছেলে-মেয়েদের তিনি কোরআন শরীফ ও বাংলা পড়াতেন। বার্ধক্যভারে অক্ষম না হয়ে পড়া পর্যন্ত তিনি এ ব্যবস্থা চালু রেখেছিলেন।

আমাদের, অর্থাৎ আমার ও আমার বড় ভাইয়ের লেখাপড়া নিয়ে তার নিয়ম ছিল অতি কঠিন। ভোরে তো পড়াশুনা করতেই হত, সন্ধ্যার পরও অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমাদের পড়াশুনা করতে হত। ঘুম আসলে হুকুম হত দাঁড়িয়ে থাকতে এবং তাতেও ঘুমভাব না কাটলে চোখ ধুয়ে ঘুম তাড়ানোর হুকুম তামিল করতে হত। পড়া শেষ না করা পর্যন্ত রাতের খাবার নিষিদ্ধ ছিল। এ যে আমাদের জন্য কত কষ্টদায়ক ছিল তা বলে শেষ করা যাবে না।

কিন্তু এর চাইতে আরও কষ্টদায়ক ছিল, যখন আর একটু বড় হবার পর রাতের পড়াশেষে আমাদের বক্তৃতার অভ্যাস করার হুকুম জারি হল। দাঁড়িয়ে যে কোন বিষয়ে কিছুক্ষণ বক্তৃতা দিতে হবে– এটাই ছিল নির্দেশ। কী বললাম, কতটা যুক্তিযুক্ত বললাম, তা বড় কথা নয়। বড় কথা সাহসের সাথে, আত্মবিশ্বাসের সাথে দাঁড়িয়ে কিছু বলতে পারলাম কিনা। ১৯৩৮ সালে আমরা দু'ভাই জুনিয়ার মাদ্রাসায় পড়ার জন্য পাবনা জেলার তালিমনসর চলে যাই। আরও পরে ১৯৪১ সালে আমি হাই মাদ্রাসায় পড়বার জন্য যাই ফরিদপুর শহরে। কিন্তু সে সময়ও ছুটিতে বাড়ী এলে এই বক্তৃতা ক্লাস থেকে আমার রেহাই ছিল না।

ছোট্ট বয়সে এই বক্তৃতা চর্চা আমার জীবনে সুফল-কুফল দুই-ই বয়ে এনেছিল। আমাকে প্রায়ই গ্রামের জুম্মার ও ঈদের জামাতে বক্তৃতা দিতে হতো। এটা ছিল একটা বাড়তি ঝামেলা। ঈদের জামাতে বক্তৃতা দিতে যেয়ে একবার একটা অঘটনও ঘটে গিয়েছিল। অবশ্য যে ছিল অনেক পরের এক ঘটনা।

তখন আমাদের ঈদের জামাত হত প্রায় দেড় মাইল উত্তর-পশ্চিমে খানগঞ্জ গ্রামের স্থানীয় জমিদারদের বাড়ীর কাছের একটা মাঠে। অনেক দিনের রেওয়াজ ছিল জমিদার পরিবারের লোকদের জন্য প্রথম সারি নির্দিষ্ট থাকবে। তারা দেরীতে এলেও ওখানে অন্য কেউ বসতে পারবে না। জমিদার পরিবারের লোকেরা প্রায়ই আসতেন দেরীতে। এ জন্য অন্যান্যদের মধ্যে ক্ষোভ ছিল। একবার আমার বক্তৃতায় একথাটাই জোরেশোরে উচ্চারিত হল। আমি বললাম, ইসলাম সাম্যের

www.pathagar.com

ধর্ম। আশরাফ-আতরাফ বলে এখানে কিছু নেই। যারা আগে আসবেন তারাই সামনের কাতারে বসবেন। আমার এ বক্তৃতায় জমিদার সাহেবরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন। কিন্তু অন্যান্য মুসল্লীরা আমার বক্তব্য সমর্থন করলেন। ফলে জমিদার বাড়ীর একবারে কাছের কিছু লোকজন ছাড়া অন্য সবাই নতুন ঈদগাহ করলেন আমাদের গাঁয়ের মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে।

ধর্মসভা ওয়াজ মাহফিল

দাদপুর মাদ্রাসা প্রাঙ্গণ অবশ্য বহু পূর্ব থেকেই নিয়মিত ধর্ম সভা তথা ওয়াজ মাহফিলের স্থান হিসাবে এলাকার মধ্যে খ্যাতি লাভ করেছিল। এই সব ওয়াজ মাহফিলে প্রতি বছর ফুরফুরা শরীফের পীর সাহেবদের কেউ না কেউ অথবা তাদের কোন খলিফা, যেমন বশিরহাটের মওলানা রুহুল আমীন, সাতক্ষীরার মওলানা মোয়েজ্জুদ্দিন হামিদী অথবা অন্য কেউ যোগ দিতেন। এসব মাহফিলে জনগণের ধর্মীয় উন্নতির সাথে সাথে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিকও আলোচিত হত। ফলে এসব মাহফিলে জনগণের ভিড় হত অসম্ভব। সাধারণত অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত ছিল এসব ধর্মসভার মৌসুম। সভা সাধারণত শুরু হত বাদ আসর। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা হত মাগরেবের নামাজের পর। প্রধান ওয়ায়েজ (বক্তা)-এর ওয়াজ হত সবশেষে রাত এগারটা-বারটা পর্যন্ত। হাজার হাজার মানুষ, কখনও কখনও লক্ষাধিক লোকও জামায়েত হত এসব সমাবেশে। তখন মাইকের ব্যবহার ছিল না। অথচ হাজার হাজার লোকের সমাবেশে বক্তার ওয়াজ শুনতে কারও অসুবিধা হত না।

এই সব সভায় বক্তৃতার ফাঁকে ফাঁকে বক্তারা সুললিত কণ্ঠে কোরআনের নানা আয়াত ছাড়াও বহু উদ্দীপনাময়ী ফার্সী, উর্দু, বাংলা গজল সুর করে আবৃত্তি করতেন। এর মধ্যে একটি বাংলা জাগরণী গানের কথা আমার এখনও মনে পড়ে। "গাওরে মোসলেনগণ নবীগুণ গাওরে, পরান ভরিয়া সবে সাল্লে আলা গাওরে।" মুন্‌শী মেহেরুল্লার এই গজলটি স্টেজ থেকে যখন গাওয়া হত, তখন মাহফিলের লোকেরাও হেলে দুলে এতে কণ্ঠ মিলিয়ে এক অপূর্ব আবহ সৃষ্টি করত। এর ফলে ক্ষণিকের জন্য হলেও গোটা মাহফিল জাগরণী গানের মজলিশে রূপান্তরিত হয়ে যেত। একে তো ওয়ায়েজদের সুরেলা কণ্ঠের ওয়াজ, তারপর এই ধরনের উদ্দীপনাময়ী গজলের কারণে এসব মাহফিলের প্রতি আমি ছোট বয়স থেকেই একটা অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করতাম।

ধর্ম সভার সময় প্রতি বছরই একটা উৎসবের আবহ সৃষ্টি হত। পীর সাহেব বা অন্যান্য ওয়ায়েজদের সঙ্গে সফরসঙ্গী হতেন এলাকার বা বাইরের অনেক আলেম-ওলামা। এদের খাওয়ানো, দেখাশোনা ও অন্যান্য খেদমতে ব্যস্ত থাকতে ভালই

www.pathagar.com

লাগতো। এঁরা যে কয়দিন থাকতেন, সে কয়দিন আমরা ক্লাস করা ও অন্যান্য রুটিন মাফিক কাজ থেকে রেহাই পেতাম।

পীর-দরবেশ বা ওয়ায়েজ ছাড়াও তখন আর এক ধরনের মুসাফির আমাদের বাড়ীতে আসতেন প্রায় প্রতি বছর। আরব দেশের বলে এসব মুসাফিরকে খুবই তাজিম করা হত। এদের সফরের উদ্দেশ্য থাকত হাজী সংগ্রহ করা। সাধারণত এরা কোন না কোন মোয়াল্লেমের প্রতিনিধি হয়ে আমাদের দেশ থেকে হাজী সংগ্রহ করতেন। সৌদী আরব তখন অর্থনৈতিক দিক দিয়ে খুবই দরিদ্র ছিল বিধায় হাজীদের কাছ থেকে পাওয়া কমিশন আরবদের জীবিকার গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসাবে বিবেচিত হত। এই সব মুসাফিরের সঙ্গে সব সময়ই একজন বাঙ্গালী সাথী থাকতেন, যিনি প্রয়োজনে দোভাষীর কাজ করতেন। তবে এই সব আরব মুসাফিররাও সাধারণত ঠেকা কাজ চালাবার মত দু'চারটা বাংলা শব্দ শিখে নিতেন।

গ্রাম জীবনে আকিকা, ফাতেহা, বিয়ে শাদী বা অন্যান্য বিশেষ উপলক্ষে মিলাদ ছিল নিয়মিত ব্যাপার। মিলাদে সমবেত কণ্ঠে সুর করে 'আল্লাহুম্মা সাল্লেআলা সাইয়েদেনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়ালা আলে সাইয়েদেনা মাওলানা মুহাম্মদ'– এই দরুদ অথবা কেয়ামে সমবেত কণ্ঠে 'ইয়া নবী সালাম আলাইকা, ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা'– পাঠকালে সব সময়ই প্রবল উৎসাহ অনুভব করতাম। ওয়াজ মাহফিলের 'গাওরে মোসলেমগণ নবীগুণ গাওরে, পরান ভরিয়া সবে সাল্লেআলা গাওরে'– শীর্ষক সমবেত গজলের মত মিলাদের দরুদ ও কেয়াম পাঠকালেও আমি এক অনির্বচনীয় আনন্দে আপ্লুত হতাম।

সামাজিক পর্ব

সমাজের অধিকাংশ উৎসব ও পালা-পর্ব ছিল ধর্মকেন্দ্রিক। দুই ঈদ ছাড়াও ঈদে মিলাদুন্নবী, আশূরা, শবেবরাত প্রভৃতি খুব ঘটা করে পালন করা হত। ঈদে মিলাদুন্নবীকে তখন বলা হত ফাতেহা দোয়াজদাহম। এ উপলক্ষে মিলাদ ও শিরনী হত। আরেকটি পর্ব ছিল ফাতেহা ইয়াজদাহম, অর্থাৎ বড় পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)-এর ওফাত বার্ষিকী। এ উপলক্ষেও বেশ ধুমধামের সাথে শিরনী ও মিলাদের আয়োজন করা হত। গ্রামের সকল লোক একত্র হয়ে মাদ্রাসা ঘরে এটা করত। শবেবরাতে ছিল বিভিন্ন স্বচ্ছল গৃহস্থের বাড়ীতে মিলাদের রেওয়াজ। এ ছাড়া শবেবরাতে রুটি-হালুয়া খাওয়াও ছিল অন্যতম রেওয়াজ। মহররম তথা আশূরাতে মিলাদ ও শিরনীর পাশাপাশি কখনও কখনও লাঠিখেলা বা মেলার আয়োজন করা হত।

তবে একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, গ্রামের বড় উৎসব এখনকার মত

www.pathagar.com

তখনও ছিল দুই ঈদ। ঈদের দিন খুব সকালে উঠে মাঠ পরিষ্কার করা ও রঙ্গিন কাগজ কেটে সাজানো ছিল আমাদের একটা প্রধান কাজ। এর পর গোসল ও সেমাই খাওয়া সেরে নতুন কাপড় পরে ঈদগায় যাওয়া, নামাজ শেষে কোলাকুলি এবং সারাদিন বন্ধু-বান্ধবদের সাথে এ বাড়ী-ওবাড়ী ঘুর ঘুর করে বেড়ানোর মধ্যে অদ্ভুত মাদকতার আমেজ উপভোগ করতাম।

ফাতেহা দোয়াজদাহম, মহরম প্রভৃতির মত ঈদের দিনে জামাতের পর শিরনী খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। তবে এ শিরনী খাওয়া হত সাধারণত সমাজের যিনি প্রধান–তার বাড়ীতে। কোন কারণে যাকে সমাজ থেকে একঘরে করা হত তার শিরনী গ্রহণ করা হত না। ঈদের শিরনীর মত গ্রামে যে সব ভোজ (সমবেত খাদ্য খাওয়া) হত, সেখানেও সমাজের এ শৃংখলা কার্যকর থাকত। বিয়ে-শাদী মুসলমানী (খত্‌না) বা ফাতেহা উপলক্ষেই প্রধানত এসব ভোজ হত। ভোজকে সাধারণত বলা হত জিয়াফত।

ভোজ বা জিয়াফতে সমাজের লোকজন ছাড়াও মেজমানের আত্মীয় স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবদের দাওয়াত করা হত। বহুলোক এক সাথে খেজুরের পাতার পাটিতে লাইন দিয়ে খেতে বসত। খাদ্য পরিবেশন করা হত কলার পাতায়। এসব ভোজে কখনও কখনও মেজবানের হিন্দু বন্ধু-বান্ধবও আমন্ত্রিত হত। তবে একটা ব্যাপার সব সময় দেখা যেত ঃ কলার পাতায় যে পিঠে মুসলমানরা খাবার খান, হিন্দুরা খাবার খান তার উল্টা পিঠে। তাদের খাদ্য তালিকায়ও থাকত পার্থক্য। তারা কখনও গোস্ত খেতেন না। ঘন্ট, মাছ, ডাল, দই ইত্যাদিতে তাদের খাদ্য তালিকা সীমাবদ্ধ থাকত।

খাদ্যাভ্যাস ছাড়া অন্যান্য ব্যাপারেও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বেশ পার্থক্য দেখা যেত। যেমন হিন্দুরা পরতেন ধুতি, মুসলমানরা লুঙ্গি এবং বিশেষ ক্ষেত্রে পাজামা। ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির ক্ষেত্রে তো বটেই, বিয়ে-শাদী, সালাম-সম্ভাষণ, নাম ও নামকরণ, মৃতদেহের সৎকার এবং সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও হিন্দু-মুসলমানের ছিল বিস্তর ব্যবধান। আমাদের বাড়ীতে হিন্দু বন্ধু-বান্ধবরা এলে যেমন সহজভাবে তাদের গ্রহণ করা সম্ভব হতো, ওদের বাড়ীতে আমরা গেলে আমরা তত সহজে গৃহীত হতে পারতাম না। আমরা চলে আসার পর 'গোবরজলে' সংশ্লিষ্ট স্থান নিকিয়ে পবিত্র করে নেয়া হতো। এই ছুৎমার্গ যে শুধু মুসলমানদের ব্যাপারে ছিল তা নয়, উচ্চ ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যেও যথেষ্ট ছুৎমার্গ কাজ করত।

আমাদের গ্রামে বড় ধরনের ভোজ, আকীকা, কোরবানীর ঈদ বা অন্য কোন বিশেষ উপলক্ষ ছাড়া সাধারণত গরু বা বকরি জবেহ করা হতো না। হাট বাজারে এখনকার মত তখন গরু বা ছাগলের গোশতও বিক্রি হতো না। বাড়ীতে মেহমান

www.pathagar.com

এলে সাধারণত মুরগী জবেহ করেই তাদের আপ্যায়ন করা হতো। অন্যান্য সময় গ্রামের অধিকাংশ ঘরে সাধ্যমত ভর্তা-ভাজি, ডালসহ মাছ-ভাতই থাকত সাধারণ মেন্যু। এখনকার মত তখন রুটির ব্যাপক প্রচলন ছিল না। রুটিকে মনে করা হতো এক প্রকার পিঠা, যা শুধু বিশেষ উপলক্ষে গোশত বা হালুয়াযোগে খাবার জন্য তৈরী করা হতো এবং এ রুটি অবশ্যই হতো চালের রুটি, গমের আটার নয়। আমাদের এলাকার বহুল প্রচলিত পিঠার মধ্যে ছিল ঢাকুন বা সরা পিঠা (যাকে ভিজান হলে বলা হতো ভিজান পিঠা) কুশলি, ভাপা, পাটিসাপটা, পাকান পিঠা, ভাজা পিঠা। তবে এর প্রত্যেকটার আবার বিশেষ মৌসুম থাকত। সাধারণত শীতকালে ভিজান পিঠা, কুশলি পিঠা, ভাপা পিঠা ও সেমাই পিঠা খাওয়া হতো। তখন কলের সেমাই ওঠেনি। সেমাই তৈরী করা হতো হাতে এবং তা অন্যতম পিঠা হিসাবেই গণ্য হতো। পাকান, ভাজা ও বড়া পিঠা তৈরী করা হতো সাধারণত শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে তালের মৌসুমে।

মিষ্টির পোকা

ছোটকাল থেকেই আমি যেমন ছিলাম পিঠার পোকা, তেমনি মিষ্টির প্রতি আমার ছিল প্রচণ্ড আকর্ষণ। হাটে-বাজারে গেলে মিষ্টির দোকানে থরে থরে সাজানো মিষ্টি সামনে রেখে দোকানদার কি করে চুপচাপ বসে থাকে, তা ভাবতে আমার অবাক লাগতো। কখনও মিষ্টি খাবার নেশা চেপে বসলে মায়ের কাছ থেকে দু'এক সের চাল গামছায় বেঁধে হাটে নিয়ে যেতাম। তখন চালের দাম ছিল সের প্রতি এক আনা অর্থাৎ চার পয়সা। দু'সের চালের দাম কেউ সাত পয়সা বললেই বিক্রি করে দিতাম। মিষ্টি বলতে বুঝতাম রসগোল্লা। এক এক পয়সায় একটি বড় রসগোল্লা। পেট ভরে মিষ্টি খেয়ে বাড়ী ফিরতাম।

আমাদের গ্রামে হাট বসতো সপ্তাহে মাত্র দু'দিনঃ শুক্র ও সোমবার। একদিন হাটের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় বেশ ভীড় দেখে কাছে গেলাম। দেখলাম বিনা পয়সায় চা খাওয়ানো হচ্ছে। শুধু বিনা পয়সায় চা খাওয়ানো নয়, চা খাওয়ানোর পর বিনামূল্যে এক প্যাকেট লিপটনের চা-ও দিয়ে দেয়া হচ্ছে। অন্যদের দেখাদেখি আমিও একটা বেঞ্চিতে বসে গেলাম চা খেতে। জীবনে সেই আমার প্রথম চা খাওয়া। আচমকা গরম চা মুখে দিয়ে সেদিন যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তা কোনক্রমেই সুখকর ছিল না। চারদিকে লোকে কি মনে করবে সেই ভয়ে সেই অসম্ভব গরম চা নিঃশব্দে গলধকরণ করতে হয়েছিল।

সে সময় একটি ব্যাপার আমাদের মনে যথেষ্ট খুশীর সঞ্চার করতো। তখন প্রতি বছর সাধারণত কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে হালখাতা বা পুন্যাহ হতো। জমিদারের সেরেস্তায় বা মহাজনের গদীতে হতো পুন্যাহ, আর ডাক্তারের

www.pathagar.com

ডিসপেনসারিতে হতো হালখাতা। আশ্বিন-কার্তিকের মধ্যেই পাটের টাকা গৃহস্থদের হাতে এসে যেত। সারা বছরের খাজনা ও অন্যান্য দেনা-দাইক মেটানো হতো পাটের টাকায়। জমিদারের খাজনা, মহাজনের বাকি পাওনা শোধ করা হতো পুন্যাহকালে, আর ডাক্তারকেও এক ধরনের মান্যিত দেয়া হতো হালখাতার দিনে। এ উপলক্ষে থাকতো সালাম, আদাব বিনিময় ও মিষ্টি ভক্ষণের ব্যবস্থা।

বিয়ে-শাদীতে খাদ্য খাওয়ার পাশাপাশি বরপক্ষ ও কনে পক্ষের মধ্যে নানা ধরনের শ্লোক, উপস্থিত বুদ্ধি ও জ্ঞানের সূক্ষ্ম প্রতিযোগিতা হতো। এসবের উদ্দেশ্য থাকতো অপর পক্ষের তুলনায় নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা। কখনও কখনও কোন্ পক্ষ বেশী ইংরেজী বলতে পারে তারও প্রতিযোগিতা হতো। এ জন্য আগেভাগেই ইংরেজী জানা কোন লোককে দলভুক্ত করা হত। এ ছাড়াও পুঁথি পাঠের আসর বসত বিয়ে উপলক্ষে।

পুঁথি পাঠের আসর ছাড়াও জারী-সারী, ভাটিয়ালী, মুর্শিদী ইত্যাদি গান তখন গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের চিত্ত বিনোদনের প্রধান মাধ্যম ছিল। গ্রামের কৃষকরা দল বেঁধে মাঠে কাজ করার সময়, বিশেষ করে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ধান বা পাটের ক্ষেত নিড়ানোর সময় প্রায়ই গলা ছেড়ে সমবেত কণ্ঠে গান গাইত। এতে সারা মাঠে এক অপূর্ব আবহ সৃষ্টি হত।

হাডুডু, গোল্লাছুট, দাঁড়িয়াবান্ধা প্রভৃতি খেলাধুলার পাশাপাশি তখন বর্ষাকালে মাঝে মাঝে নৌকা বাইচ হত। এই নৌকা বাইচের অপরিহার্য অনুষঙ্গ থাকত, গায়েনদের উৎসাহব্যঞ্জক গান। তখন বিনোদনের আরেকটি মাধ্যম ছিল যাত্রা। সাধারণত শীতকালে আসত এসব যাত্রাপার্টি। এতে সীমাবদ্ধ সময়ের জন্য হলেও এলাকায় সাড়া পড়ে যেত। তবে ধর্মভাবাপন্ন পরিবারের সদস্যদের (যেমন আমাদের) পক্ষে পিতামাতার চোখ ফাঁকি না দিয়ে এসব অনুষ্ঠান দেখা সম্ভব হত না।

মেয়েদের জন্য অবশ্য বিনোদনের সব চাইতে বড় উপলক্ষ আসত নাইওর কালে। বছরে কম পক্ষে একবার গৃহবধূরা পিতৃগৃহে নাইওর যেতেন। আম-কাঁঠালের মওসুম অর্থাৎ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে মেয়েকে নাইওর নেয়া অনেক বাপ-মা'রই সখ থাকলেও সে সময় সংসারে কাজের চাপ থাকায় বেশীরভাগ ক্ষেত্রে নাইওর নেয়া হত বর্ষাকালে। বিশেষ করে ভাদ্র মাসে। আউশ ও পাট কাটার মওসুম শেষ হওয়ার ফলে এ সময়টাই গেরস্তদের প্রচুর অবসর থাকত। তাছাড়া চারদিকে বন্যার পানিতে খাল-বিল ভরে যাওয়ায় এ সময় নৌকা যোগে আত্মীয়স্বজনের বাড়ীতে বেড়াতে যাওয়াটাও হত সহজ। আমার এখনও মনে আছে, ছোটকালে প্রতিবছরই বর্ষাকালে আমার মায়ের সাথে নানাবাড়ী বেড়াতে

www.pathagar.com

যেতাম।

তখনকার দিনে রাস্তাঘাট বর্তমানকালের মত খুব উন্নত ছিল না। বাস, টেম্পো, রিক্সা কোনো কিছুই ছিল না। বর্ষাকাল ছাড়া অন্যান্য সময়ে গায়ের হালট বা অন্যান্য ভাঙাচোরা রাস্তা দিয়ে গরুর গাড়ী করে লোকে দূর-দূরান্তে যাতায়াত করত। গরুর গাড়ীতে ছই দিয়ে মেয়েদের জন্য পর্দা করা হত। নৌকাপথে চলার সময়ও মেয়েদের জন্য নৌকার উপর ছই তৈরী করা হত। মেয়েদের বহনের জন্য নৌকা এবং গরুর গাড়ী ছাড়া পাল্কীও ব্যবহৃত হত। বিবাহের সময় বর-কনে, বিশেষ করে নববধূর আনা নেয়ার কাজে পাল্কী বা ডুলির ব্যবহার ছিল প্রায় বাধ্যতামূলক। অতি দরিদ্র না হলে নববধূকে পায়ে হাঁটিয়ে নেয়ার কথা কল্পনাও করা হত না। মেয়েদের চলাফেরা ছাড়াও কোন কোন ক্ষেত্রে জমিদার বা পীর সাহেবদের যাতায়াতেও পাল্কী ব্যবহার করা হত।

বর্ষায় নৌকা করে নানা বাড়ী গেলেও শুকনা মৌসুমে আব্বার সাথে হেঁটেই নানা বাড়ী যেতাম। আমার নানা বাড়ী ছিল দু'টি। আমার মা ছিলেন আব্বার দ্বিতীয় স্ত্রী। আব্বা প্রথম বিবাহ করেছিলেন যাঁকে, তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় প্রাণত্যাগ করলে আব্বা আমার মাকে বিবাহ করেন। আমার নিজের নানা-নানীকে কখনও দেখিনি। তারা আমার জন্মের আগেই ইন্তেকাল করেছিলেন। আমাদের অদেখা সৎ মা সূত্রের নানা-নানীকেই আমরা আমাদের আপন নানা-নানীর মত পেয়েছিলাম। তাদেরও অন্য কোন ছেলে-মেয়ে না থাকাতে নানা-নানীর স্নেহ-মমতা আমরা পুরাপুরিই পেয়েছিলাম। আমার এ নানা বাড়ী ছিল ছ'সাত মাইল দূরে চর আফরা গ্রামে। সেখানে যেতে হত পদ্মার তীর ধরে।

নানা বাড়ী যাওয়া সূত্রেই পদ্মা নদীর সাথে আমার প্রথম পরিচয়। এর আগে বাড়ীর পাশের হরাই বা আরও পরে আরও একটু বড় নদী চন্দনা দেখেছি। কিন্তু পদ্মার সাথে সেসব নদীর কোন তুলনাই হয় না। সেই শুকনা মৌসুমেও প্রায় দেড়-দু'মাইল চওড়া নদীতে পানি আর পানি। নদীর এপারে ফরিদপুর, ওপারে পাবনা জেলা। বিশাল নদীর ওপারের গ্রামগুলোকে আবছা আবছা দেখা যায় মাত্র।

পদ্মার বুকে ছোট-বড় নানা ধরনের নৌকার পাশাপাশি মাঝে মাঝে ছুটে যেতে দেখতাম বিশাল আকারের দোতলা দালানের মত নৌযান তার মধ্যে নানা ধরনের লোক হেঁটে বেড়াত। আব্বার মুখে শুনেছিলাম এর নাম স্টীমার। আরও শুনেছিলাম গোয়ালন্দ থেকে এসব স্টীমারে চড়ে নাকি বিহারের পাটনা পর্যন্ত যাওয়া যায়।

পদ্মার তীর দিয়ে চর আফরায় নানা বাড়ী যাওয়ার ব্যাপারে আমার একটি বাড়তি আকর্ষণ ছিল হারোয়া গ্রাম। এই হারোয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেকালের অন্যতম নেতা খান বাহাদুর আলিমুজ্জামান চৌধুরী। এই নাম করা

www.pathagar.com

জমিদারের জনহিতকর কাজের বেশ সুখ্যাতি ছিল। আমাদের ইউনিয়নের একমাত্র এম-ই (মাইনর ইংলিশ) স্কুল ছিল বেলগাছিতে, তাঁরই প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁর পিতা ফয়েজ বখশের নামে। পরবর্তীকালে এ স্কুলটি হাই স্কুলে উন্নীত হলে এর নাম হয় আলিমুজ্জামান হাই স্কুল। এই খান বাহাদুর আলিমুজ্জামান চৌধুরী ছিলেন ফরিদপুর জেলা বোর্ডের প্রথম মুসলমান চেয়ারম্যান। পরবর্তীকালে জেনেছি, ১৯০৬ সালে ঢাকায় যে নিখিল ভারত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন হয়, যে সম্মেলনে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের জন্ম হয়, সে সম্মেলনে যোগদানকারীদের অন্যতম ছিলেন এই খান বাহাদুর আলিমুজ্জামান চৌধুরী। হারোয়া গ্রামের পাশ দিয়েই যেতে হত নানা বাড়ী। নানা বাড়ী যেতে-আসতে আমি প্রায়ই এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তির বাড়ীটি দেখতে যেতাম। কীর্তিনাশা পদ্মার করাল গ্রাসে পরবর্তীকালে এই ঐতিহ্যবাহী বাড়ীটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

আমার আপন নানা বাড়ী ছিল আর এক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গ্রামে। আমাদের গ্রাম থেকে সাত-আট মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত এই গ্রামের নাম পদমদী। থানা বালিয়াকান্দি। পদমদীর নবাব বাড়ীর নামডাক ছিল তল্লাট জুড়ে। আমি যখন এ নবাব বাড়ী প্রথম দেখি, তখন নবাবদের কেউ আর বেঁচেছিলেন না। নবাব বাড়ীর অতীত ঠাট-ঠমকের কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। দালান কোঠারও জরাজীর্ণ দশা। দেয়াল ঘেরা বিরাট নবাব বাড়ীর পূর্ব দিকে বিশালাকার সদর দরজা নবাব বাড়ীর এককালের শান-শওকতের শেষ চিহ্নটুকু যেন ধরে রেখেছে অতি কষ্টে। নবাব বাড়ীর ভেতরটা সম্পূর্ণই জঙ্গলে ছেয়ে গেছে। ভেতরে একটা দোতলা দালানের ওপর তলা ভেঙ্গে পড়েছে অযত্নে-অবহেলায়। নীচতলার একটা মাত্র কক্ষ তখনও ব্যবহারযোগ্য রয়েছে। জমিদারীর সেরেস্তা হিসাবে সেটা ব্যবহৃত হচ্ছে।

জমিদারের বাড়ী নবাব বাড়ীর পাশেই। জমিদারের নাম মীর সিরাজুল হক। ঘটনাচক্রে আমাদের জমি-জাতির বেশীরভাগের তিনিই ছিলেন জমিদার। আব্বার মুখে শুনেছি তিনি আই-এ পাস ছিলেন। জমিদার হলেও তার ব্যবহার ছিল অত্যন্ত অমায়িক। অন্যান্য অনেক জমিদারের মত তার বা তার ছেলেদের কথাবার্তায় কোন অহমিকার রেশ ছিল না। মীর সিরাজুল হক বছরে অন্তত একবার আমাদের গ্রামে আসতেন এবং সব সময়ই আমাকে পড়াশোনার ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন।

পদমদী নানা বাড়ী গেলে প্রথম সুযোগেই বেড়াতে যেতাম নবাব বাড়ী। নবাব বাড়ীর পূর্ব দিকে ছিল দীঘির আকারে এক বিশাল পুকুর। নবাব বাড়ীর যখন দবদবা ছিল তখন নবাবের চলাফেরার জন্য নাকি হাতি ছিল। পুকুরে দু'টি কুমীর ছিল বলে কেউ পুকুরে নেমে গোসল করত না। একবার ভয়াবহ বন্যায় পুকুরের পাড় ভেসে যাওয়ার ফলে কুমীর দু'টি বেরিয়ে যায় বলে জনশ্রুতি আছে। নবাব

www.pathagar.com

বাড়ীর পূর্ব পাশের দক্ষিণ দিকে ছিল সদর দরজা। পূর্ব পাশের উত্তর দিকে টালির ছাউনির চৌচালা পাকা মসজিদ। এই মসজিদ চত্বরে বসে জমিদার মীর সিরাজুল হকের মুখে একবার অনেক গল্প শুনেছিলাম।

এই মীর সিরাজুল হকের সঙ্গে কোন আত্মীয়তা সূত্রে সম্পর্কিত ছিলেন কি-না জানি না, তবে 'বিষাদ সিন্ধু'র অমর লেখক বিখ্যাত সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেনের কবর ছিল নবাব বাড়ী ও জমিদার বাড়ীর মাঝামাঝি জায়গায়। বহুদিন এ কবর ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে ঢাকা পড়ে ছিল। পরবর্তীকালে ঝোপ-জঙ্গলের মধ্য হতে কবরটি পুনরাবিষ্কৃত হয়। নবাব বাড়ীর স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখিয়ে স্থানীয় ইউনিয়নের নামও রাখা হয় নবাবপুর ইউনিয়ন। বাংলাদেশ আমলে সম্প্রতি পদমদী গ্রামের অনতিদূরে 'বিষাদ সিন্ধু'র অমর লেখকের নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'মীর মশাররফ কলেজ'।

কিশোর বয়সে আমি যেসব বই পাগলের মত পড়েছি তার অন্যতম ছিল মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদ সিন্ধু'। গার্জিয়ানদের অনেকেরই ধারণা ছিল নভেল-নাটক পড়া খারাপ। তাই তাদের চোখ এড়িয়ে পড়তে হত 'বিষাদ সিন্ধু' বা এ জাতীয় বই। প্রথমবার পড়ার পর এ বই যেখানে পেতাম, সেখানেই আর একবার পড়ার চেষ্টা করতাম। পেটের নীচে বালিশ দিয়ে উপুড় হয়ে নাওয়া-খাওয়া ভুলে জীবনে কত দিন কতবার যে 'বিষাদ সিন্ধু' পড়েছি তার ইয়ত্তা নেই।

সাহিত্য চর্চার দিকে আমার ঝোঁক কবে প্রথম শুরু হয় তা বলতে পারব না। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক সরদার জয়েনউদ্দিন ছিলেন আমার মামা। আমার চাচা মফিজউদ্দিন মন্ডল ছিলেন তার আপন ভগ্নীপতি। আমি যখন ছোট তখন বহুবার তাকে দেখেছি আমাদের গ্রামে বেড়াতে যেতে। আড্ডা দিতেন প্রধানত আমাদের গ্রামের প্রথম ম্যাট্রিকুলেট লুৎফর রহমান এবং কবিরউদ্দিন মাস্টারের সাথে। বয়সের ব্যবধান এবং সম্পর্কের কারণে আমি তার সান্নিধ্যে যেতে সংকোচ বোধ করতাম। তিনি তখন সাহিত্য চর্চা করতেন কি-না তা জানি না। তবে তার সম্পর্কে শুধু এটুকু শুনেছিলাম যে, সেই বৃটিশ আমলে সরকারী চাকুরী পাওয়ার সুবিধার জন্য তাকে বংশীয় পদবী বদলিয়ে নিজের নাম রাখতে হয়েছিল জয়েনউদ্দিন বিশ্বাস। স্বাধীনচেতা গন্ধ থাকায় 'সরদার' পদবী বৃটিশ সরকারের খুব পছন্দ ছিল না।

আমাদের গ্রামে তখন একজন সাহিত্যিক ছিলেন, আমার গ্রাম সুবাদের দাদা মুনশী দরবেশ আলী। তার দু'খানি কবিতার বই 'সুমতি ও সাধুকাজী' এবং 'কেলিদে নাজাত' এবং একখানি উপন্যাস গ্রন্থ 'রাহেলা' মুদ্রিত হয়েছিল। প্রথম কবিতার বইখানি নাকি ছিল তার নিজেরই এক ব্যর্থ প্রেম-কাহিনীর ছন্দোবদ্ধ

www.pathagar.com

বিবরণী।

মুন্‌শী দরবেশ আলী পেশায় ছিলেন হোমিও ডাক্তার। কোন অসুখ-বিসুখ হলে আমরা তার কাছেই ছুটে যেতাম চিকিৎসার আশায়। আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। তার সান্নিধ্য আমারও খুব প্রিয় ছিল। মুন্‌শী দরবেশ আলীর রক্তে সাহিত্যের নেশা ছিল কি-না জানি না– তবে তার দ্বিতীয় পুত্র শামসুর রহমানকে দেখে আমার মাঝে মাঝে সেরকমই মনে হতো। স্কুলে ছাত্রাবস্থায়ই সে পোলিও রোগে আক্রান্ত হয়ে চিরতরে পঙ্গু হয়ে যায়। এ অবস্থায়ও সে বেঁচেছিল প্রায় দশ-পনের বছর। এ দীর্ঘ সময়ে পঙ্গুত্বের কারণে নাওয়া-খাওয়া, পেশাব-পায়খানা সবই তার করতে হত বিছানায় অন্যের সাহায্যে। কিন্তু পঙ্গুত্বজনিত এই অসহায় অবস্থায়ও সে নিয়মিত পড়াশোনা করত এবং সুন্দর কবিতা লিখত।

আমাদের বাড়ীতে তখন কলিকাতা থেকে প্রকাশিত মওলানা রুহুল আমীন সম্পাদিত মাসিক 'সুন্নাত আল-জামাআত' ও সাপ্তাহিক 'হানাফী' পত্রিকা আসত। দুপুরের খাবার ও জোহর নামাজের পর আব্বা কিছুটা বিশ্রাম নিতেন। আমি বাড়ীতে থাকলে আমাকেই এ সময় ঐ পত্রিকাগুলো পড়ে শোনানোর দায়িত্ব পালন করতে হত। পত্রিকা পড়তে পড়তে আমার অজান্তেই খবরের কাগজ ও বই পড়ার একটা আগ্রহ আমার মধ্যে সৃষ্টি হয়ে যায়, যা তখন টের পাইনি।

লেখাপড়ার পাশাপাশি সংসারের অন্যান্য কাজকর্মে অংশগ্রহণও ছিল আমাদের কর্তব্যের অংশ। আমাদের বাড়ীতে দু'টি লাঙ্গল ছিল। আব্বা নিজে লাঙ্গল চালাতে জানতেন। তবে খুব জরুরী না হলে নিজে লাঙ্গল চালাতেন না। আমি নিজে লাঙ্গল চালানো শিখেছিলাম, তবে পারদর্শী হওয়ার সুযোগ পাইনি। চাষের জমি মাঝে মধ্যে মই দেয়াতে এবং ফসল ভরা জমি নিড়ানোর কাজে যোগ দেয়াতে প্রভূত আনন্দলাভ করতাম। তাছাড়া ধান কাটা, পাট কাটা, পাট ধোয়া, ধান মলন মলা এগুলোতে সব সময়ই সক্রিয় অংশ নিতাম। বিশেষ করে সবুজ ধান বা পাটের ক্ষেতে নিড়ানোর সময়ে আমি চিরকালই অব্যক্ত আনন্দ অনুভব করতাম। সবচাইতে আনন্দের ব্যাপার ছিল নতুন ধান কাটার দিন। নতুন ধানের সোঁদা গন্ধ প্রাণে যে পুলক জাগাতো তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তারপর সেই ধান আঁটি বেঁধে মাথায় করে বাড়ীতে নিয়ে আসা এবং মলন মলার পর প্রথম শুক্রবার মসজিদে শিরনী নিয়ে যাওয়ার মধ্যও ছিল অদ্ভুত এক তৃপ্তি। নতুন ধান ঘরে তোলা উপলক্ষে কখনও কখনও বাড়ীতে মিলাদও দেয়া হত।

আগেই বলেছি ছোটকালে মাছ মারা ছিল আমার অন্যতম নেশা। আমাদের গ্রামের উত্তর দিকের মাঠে ছিল একটা বিল, নাম নারানবাড়িয়ার বিল। শুকনা মৌসুমে চৈত্র-বৈশাখ মাসেও বিলের তলায় আধা হাঁটু, এক হাঁটু পানি থাকত। এই

www.pathagar.com

বিলে গোলাকৃতির ছোট পুকুর ধরনের জলাশয় খনন করা হত। এর একদিকে মুখ থাকত। এগুলোকে বলা হত আপা। বর্ষার পানি কমে এলে এইসব আপার মধ্যে নানা ধরনের গাছের ডালপালা দেয়া হতো। গাছের পাতা ও ডালপালা পচে মাছের জন্য লোভনীয় আহার্য হতো। বিলের অন্যান্য অংশ থেকে শোল, বোয়াল, রুই, কাতলা, চিতল, কৈ, মাগুর, শিং প্রভৃতি মাছ এসে এখানে জমা হতো। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে বিলের পানি যথেষ্ট কমে গেলে আপার মুখ বাঁশের চটার তৈরী বানা দিয়ে ঘিরে মাছ মারা হতো। সপ্তাহে অন্তত একদিন পলো, জাল, হুচা প্রভৃতি দিয়ে মাছ মারা হত। চৈত্র মাসে বিলের পানি একেবারে কমে গেলে তখন আপা সেচে ভেতরের মাছ ধরা হত। বছরের শেষে যখন এসব আপা সেচা হত, তখন বিশেষ করে কৈ, মাগুর, শিং প্রভৃতি মাছ এত বেশী পাওয়া যেত যে, এসব মাছ দু'তিন মাস ধরে খাওয়ার জন্য বাড়ীর উঠানের এক প্রান্তে গর্ত করে পানি দিয়ে জিইয়ে রাখা হত।

বিলে এভাবে মাছ মারা ছাড়াও বর্ষাকালে ধান বা পাট ক্ষেতের আইলে এবং ছোট ছোট নালা বা খালে বাঁধাল দিয়ে নানা ধরনের মাছ মারার ব্যবস্থা ছিল। রাবানী, চারু, টুবা, দোয়ার, খাদুন প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে মাছ মারা হত। বর্ষাকালে পানিতে জাল পেতেও কৈ, মাগুর, শিং, রয়না প্রভৃতি মাছ মারা সম্ভব হত।

বর্ষাকালে গেরস্তদের হাতে প্রচুর অবসর থাকায় এ সময় যেমন তাদের পক্ষে নৌকাযোগে আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ীতে বেড়াতে যাওয়া সহজ হত, তেমনি সহজ হত পদ্মায় ইলিশ মাছ মারতে যাওয়া। আমাদের গ্রামের দক্ষিণ দিক দিয়ে হরাই নামে যে ছোট নদী ছিল তা শুকনাকালে শুকিয়ে গেলেও বর্ষাকালে ছোট-খাট একটি স্রোতস্বিনী নদীর রূপ নিত। এই নদী দিয়ে দু'আড়াই মাইল উত্তর-পশ্চিমে গেলেই পাওয়া যেত পদ্মা। বর্ষায় পদ্মার রূপই হত আলাদা। দু'তীরের চর অঞ্চল বন্যার পানিতে প্লাবিত হওয়াতে পদ্মা ধারণ করত এক বিশাল ভয়াবহ রূপ। পদ্মার এক কূল থেকে আরেক কূল দেখা তখন খুবই কষ্টকর হয়ে যেত।

ইলিশ মারতে পদ্মায়

ভাদ্র-আশ্বিন মাসে পদ্মায় ইলিশ মারার ধুম পড়ে যেত। বছরের অন্যান্য সময়ে মাছ মারে প্রধানত জেলেরা। কিন্তু বর্ষায় জেলেদের তুলনায় গেরস্তদের ভিড়ই থাকত বেশী। বর্ষাকালে পদ্মায় ইলিশ মাছ মারতে যাওয়া গেরস্তদের জন্য ছিল এক ধরনের অবসর বিনোদনের শামিল। এই সুবাদে আমিও একাধিকবার এদের সহযাত্রী হয়েছি। আমার প্রথম পদ্মা অভিযানের কথা এখনও স্মৃতিপটে ভাস্বর হয়ে আছে।

www.pathagar.com

সাধারণত সন্ধ্যার দিকে দিনের কাজ-কর্ম সেরে গেরস্তরা রাতের খাবার সঙ্গে নিয়ে রওনা হতেন পদ্মার উদ্দেশ্যে। রাত আট-নয়টার মধ্যেই আমরা পৌঁছে গেলাম পদ্মায়। ভরা বর্ষার রাত্রিকালে পদ্মার সে এক ভিন্ন চেহারা। চারদিকে অন্ধকারের মধ্যে মাঝে মাঝে নেচে বেড়াচ্ছে ক্ষুদ্রাকৃতির বিক্ষিপ্ত আলোর দল। অনেকটা আঁধার জঙ্গলে নেচে বেড়ানো জোনাকীর আলোর মত। জঙ্গলের সে আলো নাচায় জোনাকীরা, আর পদ্মার বুকে এ আলো নাচছে ঢেউয়ের দোলায় ভেসে যাওয়া বিভিন্ন নৌকার হারিকেন বা লণ্ঠন থেকে।

ইলিশের ভাল ধারা পেতে হলে যেতে হবে গহীন নদীতে। অবশেষে নৌকা চালিয়ে দেয়া হয় গহীন গাঙের সেই অনিশ্চয়তা ঘেরা অন্ধকারের মধ্যে। অন্ধকারে চারদিকে শুধু পানির ভয়াল গর্জন। এ যেন মৃত্যুর প্রত্যক্ষ হাতছানি। কিন্তু না, শুধু পানির গর্জন নয়। গহীন পদ্মার মাঝখানে জীবন মৃত্যুর দোলাচলে ভাসমান নৌকার আরোহীদের কণ্ঠে হঠাৎ সমস্বরে ধ্বনিত হল– "একবার আল্লা রসূল বলো, আল্লা আল্লা, লা-ইলাহা ইলাল্লাহ"। আরও কয়েকটি নৌকা থেকেও একই আওয়াজ ভেসে এলো। দূরের আর একটি নৌকা থেকে অবশ্য ভেসে এলো অন্য একটি আওয়াজ– "হরি হরি– হরি বলো রে"।

চারদিকে মৃত্যুর হাতছানির মধ্যেও সকল দুঃখ-কষ্ট উদ্বেগের অবসান হল যখন প্রথম মাছটি ধরা পড়ল। পানির গভীরে সাংলে জাল নামিয়ে দিয়ে এক হাতে কাছি, আরেক হাতে টুনি ধরে নীরবে বসেছিলেন ইয়াদ আলী ভাই পাকা শিকারীর মত। মাছ জালে টোকা দিতেই খট করে আটকে দিলেন জালের মুখ। এর পর আস্তে আস্তে জাল টেনে তুললেন। রূপালী ইলিশটা নৌকার মধ্যে লাফালাফি করতে লাগলো। জীবনে কোনদিন ইলিশ মাছের নড়াচড়া দেখিনি। ফূর্তি চেপে রাখতে না পেরে ধরতে গেলাম মাছটি। লাফানো ইলিশের পেটে ছুরির মত ধার। সেধারে কেটে গেল আমার হাতের তালু। রক্ত ঝরতে লাগলো হাত দিয়ে। কিন্তু জীবনে প্রথম তাজা ইলিশ ধরতে পারার যে আনন্দ, তাকে এতটুকু ম্লান করতে পারল না হাত কাটার ব্যথা-বেদনা।

ফরিদপুর জেলা সম্বন্ধে একটা কথা তখন বহুল প্রচলিত ছিল– 'ইলিশ, তরমুজ, খেজুর গুড় তিনে মিলে ফরিদপুর'। ফরিদপুর, যশোর ও ঢাকার মানিকগঞ্জ অঞ্চল খেজুর গুড়ের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। গোয়ালন্দ চর এলাকার তরমুজের নামডাক ছিল সারা বাংলাদেশ জুড়ে। পাংশা থেকে গোয়ালন্দ পর্যন্ত অঞ্চলে পদ্মায় সবচাইতে বেশী ইলিশ ধরা পড়ত।

ইলিশের মওসুমে মাঝে মাঝে এত বেশী মাছ ধরা পড়ত যে, এক আনায় এক হালি বড় ইলিশও কেনা সম্ভব হত।

www.pathagar.com

বর্ষাকালে গেরস্তরা পদ্মায় ইলিশ মাছ নিজেরাই মারত। অন্যান্য মওসুমে হাট-বাজার ছাড়াও নদীর যে কোন বাঁকে গেলে জেলেদের কাছ থেকে টাটকা ইলিশ মাছ কিনতে পারত। গোয়ালন্দ ছাড়াও রাজবাড়ী, বেলগাছি, কালুখালী, পাংশা প্রভৃতি স্টেশন থেকে প্রচুর ইলিশ মাছ তখন রেলযোগে কলিকাতা, দার্জিলিং, শিলিগুড়ি প্রভৃতি অঞ্চলে চালান হত।

আমাদের গ্রামের অধিকাংশ লোক ছিল কৃষক। তবে পশ্চিম পাড়ায় বেশ কয়েক ঘর তাঁতী বাস করত। এ জন্য ঐ পাড়ার আরেক নাম মল্লিকপাড়া। কৃষকদের মত তাঁতীরাও ছিল প্রধানত মুসলমান। এলাকায় তাঁতী ছাড়া কলু, দর্জি ও মিস্ত্রীদেরও অধিকাংশই ছিল মুসলমান। তবে জেলে, কামার, কুমার ক্ষৌরকার (নাপিত) প্রভৃতি পেশায় হিন্দুদের একচেটিয়া প্রাধান্য ছিল। শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রসর বলে চাকরির ক্ষেত্রেও হিন্দুদেরই ছিল প্রাধান্য। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ছিল হিন্দুদের একচেটিয়া প্রভাব। ময়রা ছিল সবাই হিন্দু, যদিও তাদের দুধের যোগান দিত প্রধানত মুসলমান কৃষকর।

স্থানীয় সরকার বলতে তখন ছিল ইউনিয়ন বোর্ড। ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বার নির্বাচন হত প্রকাশ্যে। পরবর্তীকালে অবশ্য ব্যালট প্রথা চালু হয়। বিচার-আচার সাধারণত গ্রামের মাতবরদের শালিসের মাধ্যমেই সম্পন্ন হত। মাতবররা যে খুব শিক্ষিত হতেন এমন না, কিন্তু তাদের মধ্যে সূক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধি থাকত– যার ফলে তাদের সিদ্ধান্ত সবাই এক বাক্যে মেনে নিত। কোন কোন ক্ষেত্রে মাতবরদের বিচার কারো মনঃপুত না হলে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের কাছে বিচার দেয়া হত। প্রেসিডেন্টের সাথে থানা পুলিশের যোগাযোগ থাকত বলে তার বিচার সবাই মেনে নিত। শুধু খুনাখুনী বা জটিল কেস হলে মামলা কোর্টে যেত।

ডাক্তারী-ওকালতি উভয় পেশাতেই তখন হিন্দুদের সুস্পষ্ট প্রাধান্য ছিল। মহকুমার অন্যতম প্রধান মুসলিম উকিল ছিলেন আহমদ আলী মৃধা। এরপর খান বাহাদুর আলিমুজ্জামান চৌধুরীর ছোট ভাই ইউসুফ হোসেন চৌধুরী। মহকুমার মুসলিম সমাজের জাগরণে আলিমুজ্জামান চৌধুরী ও তমিজউদ্দিন খানের পর এই আহমদ আলী মৃধা ও মাজেদ আলী উকিল এবং পাংশার কাজী আবদুল মাজেদ প্রমুখের ঐতিহাসিক অবদান ছিল। সাতচল্লিশের পূর্বাপর বহুদিন পর্যন্ত মহকুমা মুসলিম লীগের সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে আহমদ আলী মৃধা এবং মাজেদ আলী খান। পাংশার কাজী আবদুল মাজেদ একজন রাজনীতিবিদ ছাড়াও ছিলেন একজন পন্ডিত ব্যক্তি। একজন লেখক ও বক্তা হিসেবেও তার খ্যাতি ছিল। আমাদের এলাকার প্রথম মুসলিম এমবিবিএস সাবেক সংসদ সদস্য ডাঃ এ কে এম আসজাদ তার সন্তান। আগরতলা মামলার দ্বিতীয় প্রধান আসামী লেঃ কমান্ডার

www.pathagar.com

মোয়াজ্জেম হোসেন ছিলেন এই কাজী আবদুল মাজেদের জামাতা।

পাংশা কখনও মহকুমা সদর না হলেও রাজনীতি-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে পাংশার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল বৃটিশ আমলেও। বিখ্যাত সাহিত্যিক মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরীর জন্মস্থান ছিল পাংশা থানা শহরেই। এয়াকুব আলীর ভাই সাংবাদিক, রাজনীতিক রওশন আলী চৌধুরীরও দীর্ঘদিনের কর্মস্থল ছিল পাংশা। কলিকাতায় তৎকালীন মুসলিম সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এয়াকুব আলী চৌধুরী, রওশন আলী চৌধুরী প্রমুখের সাহিত্য মাসিক 'কোহিনূর'-এর ভূমিকা ছিল ঐতিহাসিক। 'কোহিনূর'-এর প্রকাশনা দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। কিন্তু পাংশার অন্যতম সাংবাদিক খন্দকার নজির উদ্দীন আহমদ সম্পাদিত পাংশা কমলা প্রেস থেকে মুদ্রিত সাপ্তাহিক 'খাতক' পত্রিকার প্রকাশনা দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। বৃটিশ আমলে প্রায় কপর্দকশূন্য অবস্থায় কৃষক-প্রজা আন্দোলনখ্যাত এই খন্দকার নজিরউদ্দীন আহমদ কি অমানুষিক শ্রম দিয়ে এই পত্রিকাখানি পাংশার মত মফস্বল শহর থেকে প্রকাশ করতেন তা ভাবতেও অবাক হতে হয়।

আগেই বলেছি, আমার আব্বা ছিলেন ফুরফুরার বিখ্যাত পীর হযরত আবুবকর সিদ্দিকী (রঃ) সাহেবের মুরীদ। প্রতিবছর ফাল্গুন মাসের ২১, ২২ ও ২৩ তারিখে হুগলী জেলার ফুরফুরা শরীফে ইছালে ছওয়াবে যেতেন আব্বা। তাঁর মুখেই শুনেছি ফুরফুরার পীর সাহেব মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি ইংরেজী শিক্ষা দেয়া পছন্দ করতেন। এ জন্য ফুরফুরায় তাঁর বাড়ীতে তিনি ওল্ড স্কীম মাদ্রাসার পাশাপাশি একটি নিউ স্কীম হাই মাদ্রাসাও পরিচালনা করতেন। নিউ স্কীম মাদ্রাসায় আরবীর পাশাপাশি ইংরেজী তথা আধুনিক শিক্ষার সুব্যবস্থা ছিল। আবু নসর মোহাম্মদ ওয়াহেদ নামের একজন দূরদর্শী শিক্ষাবিদের প্রচেষ্টায় এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষার সমন্বয়কারী শিক্ষাব্যবস্থা হিসাবে এই অভিনব নিউ স্কীম মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এই ব্যবস্থায় শিক্ষাপ্রাপ্ত ম্যাট্রিকুলেটরা যেমন ধর্মীয় ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বিত ইসলামিক ইন্টারমেডিয়েট কলেজে আইএ ভর্তি হয়ে উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার পেত, তেমনি জেনারেল কলেজেও ভর্তি হতে পারত। এমন কি, যাদের হাই মাদ্রাসা (ম্যাট্রিক) পর্যায়ে সাবজেক্ট হিসাবে এডিশনাল ম্যাথমেটিক্স থাকত তারা আইএসসিতেও ভর্তি হতে পারত। সে সময় ওল্ড স্কীম মাদ্রাসার সিলেবাসে ইংরেজী বা আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানের কোন বিষয় পড়ানো হতো না বলে মাদ্রাসা লাইনে টাইটেল পাস ছাত্ররাও নতুন করে নিউ স্কীমের হাই মাদ্রাসা পাস না করে কেউ কলেজ শিক্ষার কোন সুযোগ পেত না।

আমার আব্বা ফুরফুরার পীর সাহেবের প্রভাবেই হোক বা অন্য কারণেই হোক,

www.pathagar.com

ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। সেই হিসেবে আমাকে নিউ স্কীম মাদ্রাসা লাইনে পড়ানো ছিল তার ইচ্ছা। অথচ আমাদের ইউনিয়নের আশপাশে কোন নিউ স্কীম মাদ্রাসা ছিল না।

একটি কথা এখানে বলে নেয়া দরকার যে, তখন প্রাইমারী স্কুলের শেষ সীমা ছিল ক্লাস ফোর। ফাইভ ও সিক্স পড়ানো হতো মাইনর স্কুলে। আর সেভেন থেকে টেন পর্যন্ত ছিল হাই স্কুল। জেনারেল লাইনের হাই স্কুলের সমপর্যায়ের নিউ স্কীম মাদ্রাসাকে বলা হত হাই মাদ্রাসা, আর মাইনর স্কুলের সমপর্যায়ের মাদ্রাসার নাম ছিল জুনিয়র মাদ্রাসা। আমাদের পাংশা থানায় গোটা কয়েক মাইনর ও হাই স্কুল থাকলেও কোন হাই মাদ্রাসা ছিল না। জুনিয়র মাদ্রাসাও ছিল মাত্র একটি, যশাইয়ে। এ যশাই গ্রাম ছিল আমাদের গ্রাম থেকে দশ-বার মাইল দূরে। তদুপরি এ মাদ্রাসার তেমন সুখ্যাতি ছিল না। আমাদের গ্রাম থেকে নিকটতম মাদ্রাসা ছিল তালিমনগরে সাত-আট মাইলের মধ্যে। এ মাদ্রাসার বেশ নামডাকও ছিল। তবে সমস্যা হল এ মাদ্রাসার অবস্থান ছিল পাবনা জেলায় এবং মধ্যে ছিল বিশাল পদ্মা নদী। ১৯৩৮ সালের জানুয়ারী মাসে আমার বয়স নয় বছরও পুরা হয়নি। এ বয়সে আমাকে পদ্মা নদীর ওপারে ভিন জেলায় পড়াশোনার জন্য যেতে হবে! মায়ের চোখে অশ্রুতে ভরে উঠল। তবুও নানা বিষয় চিন্তা করে শেষ পর্যন্ত আমার তালিমনগর মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়াই সাব্যস্ত হল।

এত অল্প বয়সে এতদূরে পড়াশোনার জন্য যাওয়া, মনটা স্বাভাবিকভাবেই কেমন যেন দমে যেতে চাইল। আমার এতদিনের সঙ্গী-সাথীরা, আব্বা-আম্মা, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-পড়শী সবার কাছ থেকে চিরতরে দূরে সরে যাওয়া। কেমন এক অব্যক্ত বেদনায় মন বার বার কেঁদে উঠছিল। এতসবের মধ্যে একটাই মাত্র সান্ত্বনা ছিল, আমার বড় ভাই আবদুস শুকুরও যাবেন আমার সাথে পড়াশোনা করতে। বড় ভাই হলেও তিনি আমার চাইতে মাত্র সোয়া দুই বছরের বড়। পিঠাপিঠি ভাই বলে এতদিন কত যে মারামারি করেছি তার সাথে। আমি একটু ডানপিটে ছিলাম বলে আমার সাথে মারামারিতে তেমন সুবিধা করতে পারতেন না তিনি। পড়াশোনাতেও তার মন তেমন ছিল না। ফলে প্রথমদিকে আমার এক ক্লাস উপরে থাকলেও ক্লাস ফোরে আমরা এক সাথেই পড়েছি। এতদিন যার সাথে কত মারামারি ঝগড়া-ঝাটি করেছি, এখন সেই বড় ভাই-ই হয়ে উঠলেন আমার সবচাইতে আপনজন।

আমরা তখন আব্বাকে যেমন 'আব্বা' বলতাম না, বলতাম 'বাজান'– তেমনি বড় ভাইকে বলতাম মিয়া ভাই।

গ্রামের মুসলিম পরিবারে সাধারণত পিতাকে বাজান, বাপজান বা বাজী বলে

www.pathagar.com

ডাকা হত। আর মিয়া ভাইয়ের পর ক্রমান্বয়ে মাজ্যা ভাই, সাজ্যা ভাই, নয়া ভাই, ছোট ভাই ইত্যাদি বলে ডাকা হত। বড় বোনকে ডাকা হত বু'জান, বু'জী বা বড়বু। তারপর মাজ্যা বু, সাজ্যা বু ইত্যাদি বলে। মুসলিম পরিবারে দাদা-দাদী, চাচা-চাচী, খালা, বুবু প্রভৃতি শব্দের বিপরীতে হিন্দু পরিবারে প্রচলিত ছিল ঠাকুরদা, ঠাকুরমা, জ্যেঠা, জ্যেঠি, কাকা, কাকী, মাসী, পিসী, দাদা, বৌদি, দিদি ইত্যাদি শব্দ।

তালিমনগর যাত্রার কিছুদিন আগে জানা গেল, আমার আর এক দূর সম্পর্কের চাচাতো ভাইও আমাদের সাথে সেখানে পড়াশোনা করতে যাবেন। তার নাম দেওয়ান আফসার উদ্দীন। বাড়ী রাজবাড়ী ও গোয়ালন্দের মাঝামাঝি উড়াকান্দি গ্রামে। দূর সম্পর্কের ভাই হলেও তাদের সাথে আমাদের পারিবারিক সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত নিবিড়। এ সম্পর্ক আরও নিবিড় হয়েছিল আফসার ভাইয়ের আব্বা ও চাচা যথাক্রমে মেহেরউদ্দীন দেওয়ান ও গহেরউদ্দীন দেওয়ানের সাথে আমার আব্বার 'বিদেশ' ভ্রমণকে কেন্দ্র করে। আগা গোড়া দেখেছি, আমার আব্বার মধ্যে দেশ-বিদেশ বেড়ানোর একটা প্রবল ঝোঁক ছিল। ঐ দুই চাচার সঙ্গে প্রায় প্রতিবছরই তিনি রংপুর, ময়মনসিংহ, এমন কি সুদূর আসামে যেতেন পিঁয়াজের দানা (বীজ) বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে। এসব অঞ্চলে পিঁয়াজ প্রচুর উৎপন্ন হলেও কৃষকরা পিঁয়াজের দানা রাখতে এবং ওগুলো দিয়ে হালি (পিঁয়াজের চারা) তৈরী করতে পারত না। পিঁয়াজের দানা বিক্রয় করে হালি তৈরীতে সাহায্য করতে একমাস- দেড়মাস লাগতো। এই একমাস-দেড়মাস আমার আব্বা 'বিদেশ' ভ্রমণ করতেন।

আব্বার মুখে বিদেশের কথা শুনতে শুনতে আমার মনেও যে কখন ভ্রমণের নেশা সৃষ্টি হয়েছিল জানি না। কিন্তু আমার বয়স অতি অল্প, দূরে বেড়াতে যাওয়ার তেমন সুযোগই বা কোথায়। 'মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত' হিসেবে আমার দৌড়ও ছিল রাজবাড়ী শহর পর্যন্ত। আমাদের বাড়ীর কাছের নিকটতম রেল স্টেশন বেলগাছি থেকে রেলপথে রাজবাড়ীর দূরত্ব ছিল ছয়-সাত মাইল। জীবনে প্রথম রেলগাড়ীতে চড়ি এই রাজবাড়ী যেতেই। প্রথম রেল ভ্রমণকালে যে বিচিত্র অনুভূতি জেগেছিল বালক মনে, তা কখনও ভুলতে পারব না। প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছি রেলগাড়ী আসার অপেক্ষায়। কিছুক্ষণের মধ্যে বিকট হুশ হুশ শব্দ করে দৈত্যের মত ছুটে এল অতি লম্বা চলন্ত ঘরের মত একটা কিছু। অতি কষ্টে ভিড়ের মধ্যে আব্বা আমাকে টেনে তুলে একটি বেঞ্চিতে বসিয়ে দিলেন। নানা ধরনের মানুষের বিচিত্র কথা শুনছি অবাক হয়ে। কিন্তু আমার জন্য আরো বড় বিস্ময় তখনও অপেক্ষা করছে। বিকট হুইসেল আর বিরাট ঝাকুনি দিয়ে এক সময় ট্রেন ছেড়ে দিলো। ক্রমেই গতিবেগ বেড়ে চলছিল। ট্রেনের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে

www.pathagar.com

তাকাতেই অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম, দু'পাশের গাছ-পালা, ঘরবাড়ী সবকিছু দ্রুতবেগে পিছনের দিকে ছুটে চলেছে।

আমার আব্বা শুধু পিঁয়াজের দানার ব্যবসা উপলক্ষেই ভ্রমণে বেরোতেন না, রাজনৈতিক জনসভা, ধর্মসভা, ওয়াজ মাহফিল প্রভৃতি উপলক্ষেও মাঝে মধ্যেই দু'একদিনের সফরে দূর-দূরান্তে চলে যেতেন। এভাবেই তিনি কয়েকবার গেছেন ফরিদপুর শহরে ফাতেহা দোয়াজদহম তথা মিলাদুন্নবী মাহফিল উপলক্ষে। ফরিদপুর শহরে সাবেক মন্ত্রী চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফের পিতা মরহুম ইউসুফ আলী চৌধুরী (ওরফে মোহন মিয়া) ফাতেহা দোয়াজদহম উপলক্ষে আয়োজন করতেন এসব মাহফিল। এসব মাহফিলে ওলামায়ে কেরাম ছাড়াও যোগ দিতেন মুসলিম সমাজের শীর্ষস্থানীয় জননেতাগণ। মাহফিল থেকে ফিরে তিনি বিভিন্ন বক্তা ও ওয়ায়েজের বক্তৃতা সম্বন্ধে আমাদের কাছে গল্প করতেন। একবার তিনি মাহফিল থেকে ফিরে এসে শোনালেন অদ্ভুত কাহিনী। সে মাহফিলে বক্তৃতা করেছেন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, খাজা নাজিমুদ্দীন, মৌলভী তমিজউদ্দীন খান ছাড়াও ফুরফুরার পীর সাহেবের অন্যতম খলিফা বিখ্যাত ওয়ায়েজ মওলানা রুহুল আমিন প্রমুখ। কিন্তু অবাক ব্যাপার হল, বক্তারা নাকি বক্তৃতা করলেন একটা লাঠির সামনে দাঁড়িয়ে। লাঠির মাথায় দিয়াশলাইয়ের মত ছোট্ট বাক্স। বক্তারা সেই ক্ষুদ্র বাক্সের সামনে মুখ রেখে বক্তৃতা দিলেন, আর সেই শব্দ নাকি স্পষ্ট শোনা গেল বহু দূরে লাগানো চোঙ্গার মধ্য দিয়ে।

বক্তা ও ওয়ায়েজদের বক্তৃতার প্রতি আগাগোড়াই আব্বার একটা প্রচণ্ড দুর্বলতা ছিল। আমাদের পড়াশোনার জন্য যে তালিমনগর মাদ্রাসা তিনি পছন্দ করেছিলেন তার মূলেও সম্ভবত এটাই ছিল অন্যতম কারণ। তালিমনগর মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মওলানা রইসউদ্দীন আহমদ নামের একজন প্রসিদ্ধ বাগ্মী। তিনি ছিলেন বিখ্যাত লোকসাহিত্য গবেষক, প্রফেসর মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু। দু'জনের বাড়ীও ছিল মাত্র মাইল তিনেকের ব্যবধানে। আমাদের এলাকায় এই মওলানা রইসউদ্দীন আহমদ বহুবার বক্তৃতা করেছেন বহু সভা-সমাবেশ ও মাহফিলে।

মওলানা রইসউদ্দীন আহমদ কোন ট্রাডিশনাল আলেম ছিলেন না। তিনি ছিলেন আরবী ও ইংরেজীতে সুপণ্ডিত এমএ ডিগ্রীপ্রাপ্ত একজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি। তদুপরি তিনি ছিলেন একজন উঁচুমানের সাহিত্যিক। তার দু'খানি কবিতার বই বেরিয়েছিল। যতদূর মনে পড়ে এর একটির নাম ছিল 'মরুবীনা', আরেকটি 'কোরআনের বাণী' বা এ ধরনের কোন নামের কাব্যগ্রন্থ। একটি কাব্যগ্রন্থ তিনি উৎসর্গ করেছিলেন তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্রফেসর মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন-এর নামে।

www.pathagar.com

দু'খানি গ্রন্থেরই ছত্রে ছত্রে অনুরণিত ছিল ইসলামী জাগরণের বাণী।

মওলানা রইসউদ্দীন তার বক্তৃতায় কোরআন-হাদীসের পাশাপাশি প্রায়ই উদ্ধৃতি দিতেন বাংলা, আরবী ও ফার্সী বয়েত বা কবিতা থেকে, কখনও বা ইংরেজী থেকে, যার ফলে তার বক্তৃতা প্রায়শই উঁচুমানের শিল্পের রূপ পরিগ্রহ করত। মওলানা রইসউদ্দীনের বাগ্মিতা, তার সাহিত্য চর্চা, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা– সবকিছুর মূলে তাকে সারা জীবন তাড়িত করেছে একটি উদগ্র আকাংক্ষা। সে আকাংক্ষা অনুন্নত, নিগৃহীত, পিছিয়ে পড়া বাংলার মুসলিম সমাজকে জাগিয়ে তুলে উচ্চ মর্যাদার আসনে তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার আকাংক্ষা।

যেদিন তালিমনগর মাদ্রাসায় পড়ার উদ্দেশ্যে প্রথম মওলানা রইসউদ্দিন সাহেবের বাড়ী যাই, সে দিনটি'র কথা কখনও ভুলতে পারব না। বাদাই নদীর ধারে তাঁর বাসগৃহ টিনের ছাউনির হলেও বেশ সুদৃশ্য। দূর থেকেই পথিকের নজর কাড়ে। বহু দূর থেকে হেঁটে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে গেছি আমরা চারটি প্রাণী– আমার আব্বা এবং দেওয়ান আফসারউদ্দিনসহ আমরা তিন ভাই। আমরা শুধু ক্লান্তই নই, বেশ ক্ষুধার্তও। এতদিন যিনি আমাদের এলাকায় বিভিন্ন সভা-জলসা উপলক্ষে গেছেন সম্মানিত মেহমান হিসাবে, তাঁর ঘরে আমরা উঠেছি শিক্ষা-জীবনের নতুন মোড় পরিবর্তনের প্রত্যাশায়। অতিথি হিসাবে আমাদের খুব আকাঙ্ক্ষিত হবার কথা নয়। আমাদের আপ্যায়নের জন্য প্রস্তুত থাকারও তাঁর কথা নয়।

কিন্তু না, আমাদের আশংকা মিথ্যা প্রমাণিত হল। হাত-মুখ ধুয়ে ঠিকঠাক হয়ে বসতেই আমাদের জন্য খাবার চলে এল। ভাতের সাথে বিরাট বাটি ভর্তি বড় বোয়াল মাছের সালুন। বাদাই নদীর মাছের সুনাম ছিল আমাদের গোটা তল্লাট জুড়ে। আমাদের গ্রামের হাটের মাছ বাজারেও পদ্মার ইলিশের পরই বাদাই নদীর বড় বড় মাছ বিক্রি হতো নিয়মিত। কিন্তু বোয়াল মাছ যে এত বড় হতে পারে তা ঐ দিন খাওয়ার আগে আমার পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না।

মওলানা রইসউদ্দিন আহমদের গ্রামের নাম পুখর্নিয়া। তবে এটি পোশাকী নাম। গ্রামটির জনপ্রিয় নাম সাতানী। এ নামেই সবাই এ গ্রামকে এক ডাকে চেনে। উত্তর-দক্ষিণ প্রায় পৌনে এক মাইল দীর্ঘ গ্রামটির এক প্রান্তে বাদাই নদী, অপর প্রান্তে শামগঞ্জ হাট। এই হাটের পাশ দিয়েই চলে গেছে পাবনা-ত্রিমোহিনী সড়ক। ধুলিধুসরিত এ কাঁচা সড়ক পথেই জেলা সদরের সাথে এলাকাবাসীর যোগাযোগ। এ সড়ক দিয়েই চলত বিশ্বাস কোম্পানীর লক্কড় মার্কা গাড়ী, যাকে না বলা যেত ট্যাকসি, না বাস। আমাদের এলাকার মত পাবনা জেলার এতদঞ্চলে কোন রেলপথ নেই। তাই এ অঞ্চলের অধিকাংশ লোক রেলগাড়ী খুব কমই দেখে। পদ্মা নদী খুব কাছে বলে এ এলাকার কেউ কেউ দুধের উচ্চ মূল্য পাবার আশায় পদ্মা নদীর

www.pathagar.com

ওপারে রাজবাড়ীতে দুধ বিক্রয় করতে যেয়ে দৈনন্দিন বাজার করে আসে। সেই সুবাদে তারা রেলগাড়ী দেখার দুর্লভ সুযোগও গ্রহণ করে। আমাদের এলাকায় রেলপথ থাকাতে রেলগাড়ী যখন তখন দেখলেও বিশ্বাস কোম্পানীর লক্কড় মার্কা গাড়ী দেখার আগে আমি কখনও মোটর গাড়ী দেখিনি।

মওলানা রইসউদ্দিন সাহেবের প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাটি তাঁর নিজ গ্রামে অবস্থিত নয়। মাদ্রাসার অবস্থান তালিমনগর গ্রামে। এ গ্রামটি সাতানী গ্রামের পূর্ব দিকে উত্তর-দক্ষিণ সমান্তরালভাবে অবস্থিত। মধ্যে একটি মাঠ। তালিমনগর এ গ্রামের আসল নাম নয়, আসল নাম শ্যামসুন্দরপুর। যারা এক বুক স্বপ্ন নিয়ে তালিমনগর মাদ্রাসার গোড়াপত্তন করেন, তারাই হয়ত মুসলমানদের জন্য একটি আদর্শ শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং গ্রামের নতুন নাম রাখেন 'তালিমনগর' তথা শিক্ষানগরী। তালিমনগর আসলেই সেকালে হয়ে উঠেছিল এতদঞ্চলের বিরাট এলাকার মুসলমানদের নবজাগরণের কেন্দ্রভূমি। এই নবজাগরণের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন যে দু'ব্যক্তি, তাদের একজন মওলানা রইসউদ্দিন আহমদ, অপরজন তাঁর মুরুব্বী বিখ্যাত ওলিয়ে কামেল শাহ মাহতাবউদ্দিন (রঃ)– যিনি 'সাতানীর শাহ সাহেব' নামেই এলাকায় সমধিক পরিচিত ছিলেন।

এমন একদিন ছিল যখন এক সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন জমিদার বাবুর অত্যাচারে এ এলাকার মুসলমানদের জীবন অতীষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।তাঁর জমিদারীর এলাকার মধ্যে মুসলমানদের গো-জবেহ ও গো-কোরবানী সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। মুসলমানদের মসজিদের সামনে দিয়ে নামাজের সময় জন্মাষ্টমির মিছিল ঢোল-বাদ্য সহকারে চালানো ছিল জমিদার বাবুর একটা প্রিয় হবি। কখনও কেউ গরু কোরবানী দিলেও তা দিত গোপনে কিন্তু কোনভাবে এ খবর জমিদারের কানে গেলে তার আর রক্ষা থাকত না। মুসলমানরা এমনিতে ছিল ইংরেজদের বিষ নজরে, তদুপরি শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-বাকরী সর্বত্র হিন্দুদের একচেটিয়া প্রভাব থাকায় মুসলমানরা মুখ বুঁজে সহ্য করতে বাধ্য হত সব কিছু।

মুসলমানদের এই দুরবস্থার কোনদিন পরিবর্তন হবে, তারা কখনও মানুষের মর্যাদা নিয়ে সমাজে বসবাস করতে পারবে এমনটা আশা করা সেদিন ছিল দুরাশা মাত্র। কিন্তু যা ছিল অসম্ভব, তাই একদিন সম্ভব হয়ে উঠেছিল ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে। এ মহা পরিবর্তন কিভাবে সংঘটিত হয় সে এক দীর্ঘ কাহিনী। কিন্তু অত্র অঞ্চলের সে মহা জাগরণের সাথে তালিমনগর মাদ্রাসার ইতিহাস যে ছিল ওতপ্রোতভাবে জড়িত, এ এক বাস্তব সত্য।

www.pathagar.com

তালিমনগর মাদ্রাসা

তালিমনগর মাদ্রাসা। তালিমনগর গ্রামের উত্তর পশ্চিম কোণ ঘেঁষে টিনের চৌচালা এল প্যাটার্নের ঘর। পূর্ব-দক্ষিণ দুয়ারী মাদ্রাসা ঘরটি প্রথম দৃষ্টিতেই আমার ভাল লেগে গেল। যাকে বলে- প্রথম দর্শনেই প্রেম। আমাদের গ্রামের সেই মক্তব ঘরটির চাল যদিও টিনের ছিল, কিন্তু সব মিলিয়ে তালিমনগরের এ মাদ্রাসা ঘরের সঙ্গে তার কোন তুলনাই চলে না। পৃথক পৃথক ক্লাস রুম, আলাদা অফিস রুম, প্রচুর দরজা-জানালাবিশিষ্ট মাদ্রাসা ঘরটির সামনে একটি মাঠ, মাঠের এক কোণে একটি আম গাছ। মাদ্রাসার দক্ষিণ দিক দিয়ে পাবনা-ত্রিমোহিনী সড়ক। সব মিলিয়ে মাদ্রাসাটি বেশ দূর থেকেই সকলের নজরে পড়ত। ছয়জন শিক্ষক নিয়ে মাদ্রাসার টিচিং স্টাফ। হেড মাস্টার ছিলেন নরেশ বাবু। অল্পদিনের মধ্যে তিনি চাকরি ত্যাগ করলে সেকেন্ড মাস্টার নজির উদ্দীন সাহেব হন হেড মাস্টার। তাছাড়া হেড মৌলভী ইয়াকুব আলী, সেকেন্ড মৌলভী আজহার উদ্দীন আহমদ, হেড পণ্ডিত আব্দুল গফুর এবং সেকেন্ড পণ্ডিত তাহের উদ্দীন আহমদ। এদের মধ্যে শুধু নরেশ বাবু ও তাহের উদ্দীন পণ্ডিত ছিলেন স্থানীয়। বাকী সবাই 'বিদেশী' অর্থাৎ অন্য এলাকার। তারা সকলেই থাকতেন জায়গীর।

তখনকার দিনে শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল জায়গীর প্রথা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা খুব কম ছিল বলে এলাকার বাইরের শিক্ষক ও ছাত্রদের কোন স্বচ্ছল লোকের বাড়ীতে বিনা খরচে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হত জায়গীর প্রথার মাধ্যমে। তবে তালিমনগরে যেয়ে দেখলাম, এখানে শুধু ধনী বা স্বচ্ছল লোক নয়, দরিদ্রদের অনেকের মধ্যেও জায়গীর রাখার ব্যাপারে প্রবল উৎসাহ। ঘটনাচক্রে আমার জায়গীরও হল এমনি এক বাড়ীতে। তালিমনগর মাদ্রাসা থেকে পৌনে এক মাইল দূরে মাধিয়ারকান্দি গ্রামের দরিদ্র কৃষক আজগর শেখ আমাকে জায়গীর রাখলেন। আজগর শেখের বাড়ীতে মাত্র একখানা থাকার ঘর। সুতরাং আমার থাকার ব্যবস্থা হল আমার বড় ভাইয়ের জায়গীর বাড়ী স্বচ্ছল গেরস্ত তমিজউদ্দীন মোল্লার বাড়ীতে। আজগর শেখের বাড়ী শুধু আমার দু'বেলা খাবার ব্যবস্থা হল। কিন্তু সে খাওয়া এমনই যে, কয়েক দিনেই আমার চোখে সর্ষে ফুল দেখার উপক্রম হল। খাবার মেনু এক বেলা কোন রকমে চাল-ডাল সিদ্ধ খিচুড়ি, আর এক বেলা নুনের জাউ। কোন মাছ নয়, কোন তরকারী নয়, দুধের কথা তো কল্পনা করাও সম্ভব নয়। একটানা এই খাবার দিনের পর দিন। আমি নিজে কৃষক পরিবারের সন্তান, কিন্তু একজন কৃষকের ঘরে যে এমন অসহনীয় দারিদ্র্য থাকতে পারে তা এর আগে কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে। জীবনের প্রথম জায়গীরদার এই আজগর শেখকে আমি কখনও ভুলব না। কারণ এই চরম

www.pathagar.com

দারিদ্র্যের মধ্যেও মাদ্রাসার একজন ছাত্র জায়গীর রাখতে তাঁর আগ্রহ ও আন্তরিকতার এতটুকু কমতি ছিল না।

সম্ভবত মাস দেড়েক পর আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হল। আমাকে জায়গীর রাখলেন পূর্বকথিত তমিজউদ্দীন মোল্লার ভাই আবদুল হাকিম মোল্লা। তিনিও দরিদ্র ছিলেন। তবে আজগর শেখের তুলনায় তার দারিদ্র্য কিছুটা সহনীয় পর্যায়ে ছিল। এ বাড়ীতে জায়গীর থাকাকালে মোল্লা সাহেবের দাইয়ান নামক ছেলেকে পড়াতে হত। তা ছাড়া অবসরে মাঝে মধ্যে কৃষি কাজেও সাহায্য করতে হত। অবশ্য পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকার জন্য এতে আমার তেমন অসুবিধা হত না। তবে যেদিন দেড় মাইল দূরের চরে জমি চাষরত মোল্লা সাহেবের জন্য আমাকে মাঠে নাস্তা (খাবার) নিয়ে যেতে হত, সেদিন আমার কষ্ট ও তাড়াহুড়ার অন্ত থাকত না।

মোল্লা সাহেব যতক্ষণ নাস্তা খেতেন, ততক্ষণ কোন রকমে লাঙ্গল চালু রাখতে অথবা গরু সামলে রাখতে তো হতোই, তাঁর নাস্তা খাবার শেষে ঐ থালা-বাসন নিয়ে জায়গীর বাড়ী ফিরবার পথেই কোল থেকে দুই তিন ডুবে গোসল সেরে নিতে হতো। তারপর ভিজা কাপড়ে প্রায় দৌড়ে জায়গীর বাড়ী এসে কাপড় বদলানোর পর নাকে-মুখে খাওয়া সেরে আবার দৌড়াতাম মাদ্রাসার পানে।

মাষ ছয়েক পর অবশ্য আমার এ ভোগান্তিরও অবসান হয়েছিল। এ ব্যাপারে আমার জন্য সহায়ক হয়েছিল প্রাকৃতিক দুর্যোগ। সে বছর দেশে প্রবল বন্যায় মাঠকে মাঠ ধান ডুবে যায়। বন্যার জন্য মাদ্রাসা বন্ধ ছিল। দীর্ঘ ছুটির পর বাড়ী থেকে ফিরে এসে মোল্লা সাহেবদের যে অবস্থা দেখি, তাতে তার পক্ষে আর জায়গীর রাখা সম্ভব ছিল না। নৌকা করে আমাদের দু'ভাইয়ের জন্য জায়গীর খুঁজতে বের হলেন আমাদের শিক্ষক তাহের উদ্দিন পণ্ডিত। সাতানী গ্রামের একটা বাড়ীতে বড় ভাইয়ের জায়গীর হল কোন মতে। বন্যা উপদ্রুত সেই দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে আমার জন্য সুবিধাজনক জায়গীরের সন্ধান পাওয়া গেল না। অগত্যা পণ্ডিত সাহেব আমাকে তাঁর বাড়ীতেই জায়গীর রেখে দিলেন। বলা বাহুল্য, পণ্ডিত সাহেবের বাড়ীও ছিল সাতানী গ্রামেই।

শাহ সাহেব ও মওলানা রইসউদ্দিন

সাতানী পাবনা জেলার একটি ঐতিহ্যবাহী গ্রাম। এ তল্লাটের বৃহত্তম হাট শামগঞ্জ এই গ্রামের প্রান্তেই অবস্থিত। হাটের পাশেই প্রাচীন একটি বিশালাকার জলাশয়। 'কুম' নামে পরিচিত এ প্রাকৃতিক জলাশয়ে সারা বছর পানি থাকত। ফলে এলাকার লোকজনের গোসল থেকে শুরু করে গরু-বাছুরের গা ধোয়ানো পর্যন্ত নানা কাজেই এই কুমের সাথে এলাকার জনগণের ছিল প্রাত্যহিক সম্পর্ক।

www.pathagar.com

কুমের অনতি দূরেই একটি ছোট ছাপড়া মসজিদ। ঢাকায় আজকাল অনেক বড় বড় দোতলা-তেতলা পাকা মসজিদও ছাপড়া মসজিদ নামে চালু থাকতে দেখা যায়। কিন্তু সাতানীর এ মসজিদ প্রকৃত অর্থেই ছিল টিনের ছাপড়া এবং বাঁশের জোড়াতালি বেড়ার একটি সাধারণ কাঁচা মসজিদ। তবে এই ছোট্ট অতি সাধারণ মসজিদটির ছিল এক অসাধারণ ইতিহাস।

সাতানীর শাহ সাহেব পরবর্তীকালে একজন ওলিয়ে কামেল হিসাবে খ্যাতিলাভ করলেও প্রথম জীবনে এককালে এক হিন্দু সন্ন্যাসীর পাল্লায় পড়ে পরম স্রষ্টাকে পাওয়ার জন্য বহুদিন সন্ন্যাস ধর্ম মতে সাধনা করেন। কিন্তু সাধনায় সিদ্ধিলাভে ব্যর্থ হয়ে তিনি ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে ফুরফুরা শরীফের পীর সাহেবের দরবারে গিয়ে হাজির হন। সেখানে গিয়ে তিনি তওবা করে পীর সাহেবের হাতে মুরীদ হন এবং কয়েক বছর একটানা আধ্যাত্মিক সাধনা মারফত কামালিয়ত হাছিল করেন। অতঃপর পীর সাহেবের নির্দেশেই দেশে ফিরে এসে ইসলামী সমাজ সংস্কার ও জাগরণীমূলক কর্মকাণ্ডে আত্মনিয়োগ করেন।

রইসউদ্দিন তখন তরুণ ছাত্র। অসামান্য মেধার অধিকারী রইসউদ্দিন এই শাহ সাহেবের তত্ত্বাবধানেই উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন এবং কলেজ শিক্ষা সমাপ্ত করে তাঁর পরামর্শেই তিনি আরবীতে এমএ ডিগ্রী গ্রহণ করেন। এই শাহ সাহেবের প্রেরণাতেই রইসউদ্দিন সাহেব কোন চাকরি গ্রহণ না করে স্বাধীনভাবে মুসলিম সমাজের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে আত্মনিয়োগ করেন। মুসলিম সমাজকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে রইসউদ্দিন আহমদকে তিনিই তালিমনগরে একটি নিউ স্কীম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করেন।

তালিমনগর মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা এই এলাকার মুসলমানদের জন্য ছিল এক যুগান্তকারী ঘটনা। মাদ্রাসার স্থান নির্বাচন করেন স্বয়ং শাহ সাহেব। মাদ্রাসার জন্য জমি দান করেন সংশ্লিষ্ট জমির মালিক তালিমনগরের মুন্সী পরিবার। মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার জন্য দিনের পর দিন এলাকার শত শত মুসলমান আনন্দের সাথে কায়িক শ্রম দান করেন। কেউ টাকা দিয়ে, কেউ জমি দিয়ে, কেউ অন্যান্য সামগ্রী দান করে, কেউ শিক্ষক-ছাত্র জায়গীর রাখার আশ্বাস দিয়ে, কেউ গতরের খাটুনি দিয়ে এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠাকে সম্ভব করে তোলেন। মোটের উপর এলাকার ধনী-দরিদ্র সমগ্র মুসলিম জনগোষ্ঠীর সম্মিলিত সাহায্য সহযোগিতায়ই গড়ে ওঠে তালিমনগর মাদ্রাসা এবং প্রতিষ্ঠার অল্পদিনের মধ্যেই এই মাদ্রাসা এক বিশাল এলাকার মুসলিম জাগরণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায়। ফলে শুরু থেকেই এ মাদ্রাসা এবং এর পেছনকার উদ্যোক্তারা মুসলিম-বিদ্বেষী জমিদার বাবুর চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়ায়। এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার আগে মুসলিম অধ্যুষিত এ এলাকার মুসলমানরা গরু কোরবানী

www.pathagar.com

দিলেও দিতো গোপনে। কিন্তু মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পর তারা রাখ-ঢাক না করে ঈদুল আজহায় প্রকাশ্যে গরু কোরবানী দিতে শুরু করল।

শুধুই কি গরু কোরবানী? হিন্দু জমিদারের সেরেস্তায় মুসলমান প্রজাদের চেয়ারে বসা তো দূরের কথা, বেঞ্চিতে বা চৌকিতে বসাও নিষিদ্ধ ছিল। তাদের বসতে হতো মেঝেতে, চটের ছালায়। মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পর এ বৈষম্যের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ উঠতে লাগল। হিন্দু জমিদারের অত্যাচার আর মহাজনদের শোষণের বিরুদ্ধে মুসলমান প্রজা ও খাতকদের পক্ষ থেকে যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা গেল তাকেও জমিদার বাবু এই মাদ্রাসা এবং মাদ্রাসার পেছনের দুই ব্যক্তিত্বের প্রভাব বলে সনাক্ত করলেন এবং এদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য সুযোগের সন্ধানে থাকলেন।

সে সুযোগ এসেও গেল অল্পদিনের মধ্যে। জমিদার বাবুর নির্দেশে ঢোল-বাদ্য সহকারে জন্মাষ্টমীর মিছিল চালানো হল সাতানীর সেই মসজিদের পাশ দিয়ে। পূর্ব পরিকল্পনা মতোই সময় বেছে নেয়া হয়েছিল মাগরিবের নামাজের সময়। মুসল্লীদের বাধা অগ্রাহ্য করে মিছিল ঢুকল মুসলমান পাড়ায়। মওলানা রইসউদ্দীন আহমদ ছুটে গেলেন শাহ সাহেবের কাছে মিছিল প্রতিরোধের অনুমতি চাইতে। কিন্তু শাহ সাহেব তাকে নিবৃত্ত করলেন।

পরদিন শাহ সাহেব মওলানা রইসউদ্দীন আহমদকে সঙ্গে নিয়ে সোজা গিয়ে হাজির হলেন সাগরকান্দী। সাগরকান্দী বাজারের সাথেই জমিদারের বাড়ী। দুর্ধর্ষ জমিদার সৌরিন দত্তের নাম-ডাক সারা পাবনা জেলা জুড়ে। দেখা হলে কেউ তাকে নমস্কার বা আদাব না করলে সাথে সাথে দশ টাকা জরিমানা দিতে হত। সেই দুর্ধর্ষ জমিদারের সামনা-সামনি হয়ে আদাব বা নমস্কার না, সোজা কৈফিয়ৎ তলব করে বসলেন শাহ সাহেব, কেন নামাজের সময় মসজিদের পাশ দিয়ে মিছিল চালানো হয়েছে? রাগে গরগর করতে করতে সৌরিন দত্ত জবাব দিলেন, মিছিল গেছে, আরও যাবে, শতবার, হাজারবার যাবে। শাহ সাহেব শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে জানিয়ে দিলেন, আবার যদি এভাবে মুসলমানদের নামাজে অসুবিধা সৃষ্টি করা হয় তাহলে তার উচিত শিক্ষা দেয়া হবে। অতঃপর যা ঘটার তাই ঘটল। জমিদার সৌরিন দত্তের হুকুমে তার পাইক-বরকন্দাজরা ঘিরে ফেলল শাহ সাহেব ও মওলানা রইসউদ্দীন সাহেবকে।

শাহ সাহেব ও মওলানা সাহেবকে জমিদার বাড়ীতে আটক করার খবর বিদ্যুৎগতিতে ছড়িয়ে গেল চারদিকে। আশপাশের গ্রাম থেকে শত শত মানুষ লাঠি, সড়কি, বল্লম, দা-খন্তা, কুড়াল হাতের কাছে যা পেল তা নিয়েই ছুটে এল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সমগ্র জমিদার বাড়ী অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল হাজার হাজার ক্রুদ্ধ

www.pathagar.com

জনতার হাতে। ক্রোধান্ধ জমিদার 'ছোট লোক'দের চিরতরে শিক্ষা দেয়ার জন্য বন্দুক বের করে তাক্ করলেন শাহ্ সাহেবকে লক্ষ্য করে। জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে শান্ত-সমাহিত শাহ্ সাহেব তাঁর হাতের ভাঙ্গা ছাতাটি উঁচিয়ে ধরে বললেন, তোমার ও বন্দুক আজ আর ফুটবে না।

কি অদ্ভুত ব্যাপার! সত্যিই জমিদারের হাজারো চেষ্টা সত্ত্বেও বন্দুক থেকে গুলী বেরুলো না। শাহ্ সাহেব জনগণকে ভবিষ্যতের জন্য সজাগ থাকতে উপদেশ দিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে ঘরে ফিরে যেতে বললেন।

এত বড় অপমান জমিদার বাবু সহজে মেনে নিতে পারেননি। পরিস্থিতি শান্ত হবার সাথে সাথেই শাহ সাহেব, মওলানা সাহেব এবং অন্যান্য নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের বিরুদ্ধে সদরে ফৌজদারী মামলা ঠুকে দিলেন।

এলাকায় আবার শুরু হল প্রবল উত্তেজনা। মুসলমানদের মধ্যে তখন উকিলের সংখ্যা খুবই কম। সিরাজগঞ্জ থেকে আফজাল মোকতার নামের একজন মোকতার নিয়ে আসা হল মামলা চালাতে। কিন্তু হিন্দুদের বাঘা বাঘা উকিলদের মোকাবিলা করা তো আর আফজাল মোকতার দিয়ে সম্ভব নয়। অবশেষে অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে কলিকাতা থেকে নিয়ে আসা হল বিখ্যাত আইনজীবী জননেতা শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হককে। হক সাহেবের অসাধারণ জেরা ও বাকপটুতায় শেষ পর্যন্ত মুসলমানদেরই জয় হল। চারদিকে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। সে বছর থেকে তালিমনগর মাদ্রাসায় জাঁকজমকের সাথে ফাতেহা দোয়াজদহম উৎসব পালন শুরু হল। উৎসাহের আতিশয্যে এলাকার বিভিন্ন ইউনিয়ন ও গ্রাম থেকে মোট ১৮টি গরু জবেহ করা হল মাদ্রাসার সেই ফাতেহা দোয়াজদহম মাহফিলে।

তালিমনগর মাদ্রাসায় এরপর প্রতিবছরই ফাতেহা দোয়াজদহম উপলক্ষে মাহফিল হয়েছে নিয়মিতভাবে। এসব মাহফিলে যেমন আলোচনা হত ধর্মীয় বিষয়ে, তেমনি আলোচনা হত সামাজিক, রাজনৈতিক বিষয়েও এবং এসব মাহফিলে অবশ্যই অন্যতম বক্তা থাকতেন মওলানা রইসউদ্দীন সাহেব। মাঝে মাঝে এলাকায় আসতেন ইতিহাস প্রসিদ্ধ সংস্কারক মওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (রঃ)-এর নাতী মওলানা আবদুল বাতেন জৌনপুরী। তিনি সাধারণত আসতেন বর্ষাকালে বজরা নৌকায়। তবে উর্দুতে বক্তৃতা দিতেন বলে তার বক্তৃতা তেমন ভাল বুঝতে পারতাম না।

মওলানা রইসউদ্দীন শুধু সভা-সমিতির অনুষ্ঠান করেই ক্ষান্ত ছিলেন না। তাঁর উদ্যোগে প্রতিবছর শামগঞ্জ হাটে লাঠি খেলার প্রতিযোগিতা হত। এতে অংশ নিতেন এলাকার এবং বহু দূর-দূরান্তের নামকরা লাঠিয়ালরা। বর্ষাকালে মওলানা সাহেবের বাড়ীর সামনে বাদাই নদীতে হত নৌকা বাইচ। ফুটবল ও অন্যান্য

www.pathagar.com

খেলাধুলার দিকেও তার ছিল প্রবল আগ্রহ। মোটের উপর সমাজের সর্বস্তরের মানুষ– বিশেষ করে তরুণ সমাজকে জাগিয়ে তুলতে কোন প্রয়াসই তিনি বাকী রাখতেন না।

জগলুল পাশা, ফজলুল হক

ত্রিশের দশকের শেষ দিকে সারা মুসলিম বিশ্বেই একটি নবজাগরণের জোয়ার বয়ে চলছিল। সে জোয়ারের ঢেউ যে আছড়ে পড়ছিল বঙ্গোপসাগরের কূলেও, তা বোঝা যেত রইসউদ্দীন আহমদের প্রতিটি বক্তৃতায়। তাঁর বক্তৃতায় দু'জন রাজনীতিকের নাম প্রায়ই শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারিত হত ঃ একজন মিসরের জগলুল পাশা, অন্যজন বাংলার ফজলুল হক। বাংলার মুসলিম সমাজের তখন অবিসংবাদিত নেতা শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক। সে সময় বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে ফজলুল হক ছাড়া আর কোন নেতা ছিলেন না, তা নয়। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক, তিনিই ছিলেন মুসলমানদের সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যমণি। ফজলুল হক ছাড়া বাংলার অন্য যেসব নেতার নাম তখন আমরা শুনতাম তাদের মধ্যে ছিলেন মওলানা আকরম খাঁ, খাজা নাজিমুদ্দীন, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মৌলভী তমিজউদ্দীন খান প্রমুখ। আর একটি নাম এ পর্যায়ে উল্লেখ না করলেই নয়। তিনি মূলত ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হলেও মুসলমানদের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তার প্রভাব ছিল অপরিসীম। তিনি ফুরফুরার পীর মওলানা শাহ সূফী আবুবকর সিদ্দিকী। বাংলাদেশে সে সময় যারা মুসলিম জাগরণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন তারা সবাই তার শুভেচ্ছা ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভকে অতিশয় গুরুত্ব দিতেন। বিশেষ করে এ কে ফজলুল হকের সঙ্গে আমৃত্যু তাঁর গভীর সুসম্পর্ক ছিল।

এ কে ফজলুল হক ১৯০৬ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা এবং হিন্দু সমাজের প্রবল বাধার মুখে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পেছনে ঐতিহাসিক অবদান রাখেন। পরবর্তীকালে তিনি কৃষক প্রজা সমিতির আন্দোলনে সক্রিয় নেতৃত্ব দেন। সে সময় বাংলাদেশের জনসংখ্যার বেশীরভাগ মুসলমান হলেও জমিদার অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু। তাদের অত্যাচারে মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে ভোগান্তি ও নিগ্রহের অন্ত ছিল না। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল মহাজনের শোষণ। এই মহাজনরাও অধিকাংশই ছিল হিন্দু। গরীব মুসলমানদের দারিদ্র্য ও অশিক্ষার সুযোগে প্রায়ই তাদের চক্রবৃদ্ধি হারে সুদে এমনভাবে টাকা ঋণ দেয়া হত যে, তারা জমি-জিরাত, ঘরবাড়ী, থালা-ঘটি-বাটি বিক্রি করেও ঐ ঋণ থেকে জীবনে মুক্ত হতে পারত না। একদিকে জমিদারের জুলুম, অন্যদিকে মহাজনের শোষণ– দুইয়ে মিলে বাংলার কৃষককুলের যখন

www.pathagar.com

দু'চোখে অন্ধকার দেখার অবস্থা, তখনই ফজলুল হক শুরু করেন কৃষক প্রজা আন্দোলন। কৃষক প্রজার মুক্তির জন্য তিনি একদিকে জমিদারী প্রথা, অন্যদিকে মহাজনী শোষণের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলেন। সাথে সাথে তিনি বাংলার মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারেও সক্রিয় প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। ফজলুল হক জীবনে বহুবার মন্ত্রী হন। তবে তিনি প্রায় প্রতিবারই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করতেন। ফুরফুরার পীর মওলানা আবুবকর সিদ্দিকীর মত তিনিও যেখানেই যেতেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রদেশসমূহের হাতে পর্যাপ্ত ক্ষমতা দেয়া হয়। এর ফলে এই আইনের অধীনে ১৯৩৭ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম সাধারণ নির্বাচন দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে যুগান্তকারী অবদান রাখে। এর আগে দেশে প্রাপ্ত বয়স্কদের সার্বজনীন ভোটাধিকার ছিল না। ভোটার করা হত অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে, শুধুমাত্র সচ্ছল ধনী ব্যক্তিদের। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের সময় বাংলাদেশে মুসলিম লীগ তেমন সুপরিচিত ছিল না। মুসলমানদের অনেকেই কৃষক প্রজা সমিতিকে সমর্থন করতেন ফজলুল হকের কারণে। ১৯৩৭ সালে এ কে ফজলুল হক নির্বাচন করেন কৃষক প্রজা দলের ব্যানারে, আর নাজিমুদ্দীন, সোহরাওয়ার্দী প্রমুখ নির্বাচন করেন মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে। নির্বাচনে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, কৃষক প্রজা দল কারো পক্ষেই নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন সম্ভব হয় না।

অবশেষে ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক প্রজা-মুসলিম লীগ কোয়ালিশন সরকার গঠিত হলে এ দেশের মুসলমানদের এক ঐতিহাসিক বিজয় অর্জন সম্ভব হয়। এ বিজয় আরও পূর্ণাঙ্গ হয় যখন ফজলুল হক সদলবলে মুসলিম লীগে যোগদান করেন। ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন এই সরকারই অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ও ঋণ সালিসী আইন পাস করে, যা দরিদ্র ও অশিক্ষিত মুসলিম সমাজের উন্নয়নে বিরাট অবদান রাখে।

আমি তালিমনগর মাদ্রাসায় পড়ি ১৯৩৮ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত। এ সময়টা নানা কারণে বাংলার মুসলিম জাগরণের ইতিহাসে একটি স্বর্ণযুগ হিসেবে বিবেচিত হবার দাবীদার। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ফজলুল হকের নেতৃত্বে সমগ্র মুসলিম সমাজ তখন ঐক্যবদ্ধ। কুসিদজীবী মহাজনদের অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে ঋণ সালিসী আইনের আওতায় গঠিত হয় ঋণ সালিসী বোর্ড। এর ফলে সুদখোর মহাজনদের শোষণের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে বাংলার কৃষককুল আবার তাদের নুয়ে পড়া মেরুদন্ড সোজা করে দাঁড়ানোর সুযোগ লাভ করে। একদিকে জমিদারী বিরোধী আন্দোলন জোরদার হবার ফলে জমিদারদের দাপট দ্রুত হ্রাস পেতে

www.pathagar.com

থাকে, অপরদিকে ঋণ সালিসী বোর্ড প্রতিষ্ঠার ফলে বাংলার কৃষককুল ধ্বংসের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভ করে। শিক্ষা ও অর্থনৈতিক মুক্তির দু'টি ক্ষেত্রেই ঐতিহাসিক অবদান রাখার ফলে ফজলুল হক পরিণত হন এ দেশের জনগণের চির প্রিয়, চির আপন 'হক সাহেব'-এ।

একজন কবি ও একটি পত্রিকা

শিক্ষা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও এ সময় মুসলমানদের মধ্যে দেখা দেয় জাগরণের নতুন জোয়ার। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এ নবজাগরণ শুরু হয়েছিল একজন কবি ও একটি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। কবির নাম কাজী নজরুল ইসলাম। পত্রিকার নাম দৈনিক আজাদ। সাহিত্য ক্ষেত্রে ইতোপূর্বে মহাশক্তিধর আর এক প্রতিভার সাক্ষাৎ আমরা পেয়েছিলাম মীর মশাররফের মধ্যে। তার অমর গ্রন্থ 'বিষাদ সিন্ধু' পাঠ করে আমাদের গৌরবোজ্জ্বল অতীতের সাথে পরিচিত হয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু তার সাথে সাথে আমরা এটুকুও জেনেছিলাম যে, আমাদের সে গৌরবোজ্জ্বল অতীত চিরতরে হারিয়ে গেছে এক বিষাদ সাগরের অতলান্ত গর্ভে। নজরুলই প্রথম শোনালেন অভয় বাণী– না, মুসলমানের অতীত শৌর্য-বীর্য চিরতরে হারিয়ে যায়নি। তিনি বেখবর দেশবাসীকে নতুন করে শোনালেন মুসলমানদের সে নবজাগরণের কথা। তিনি জানালেন ঃ "দিকে দিকে পুনঃ জ্বলিয়া উঠিছে দ্বীনি ইসলামী লাল মশাল/ ওরে বেখবর তুইও ওঠ জেগে তুইও তোর প্রাণ-প্রদীপ জ্বাল।"

মওলানা আকরম খাঁ

এ সময়ই মওলানা আকরম খাঁ বের করেছিলেন বাঙালী মুসলমানের দীর্ঘকালের গণজাগরণের সার্থক বাহন দৈনিক আজাদ। 'আজাদ' বাঙালী মুসলমানদের প্রথম দৈনিক পত্রিকা ছিল না। কিন্তু একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, দৈনিক আজাদই ছিল বাঙালী মুসলমানদের প্রথম সার্থক ও দীর্ঘস্থায়ী দৈনিক পত্রিকা। আজাদকে অবলম্বন করেই বাংলার মুসলমান সেদিন জেগে ওঠার প্রয়াস পেয়েছিল। আজাদকে কেন্দ্র করেই সেদিন তারা জানতে পেরেছিল দেশ-বিদেশে মুসলমানদের জেগে ওঠার খবরা-খবর, আরও জানতে পেলো কারা তাদের এ জেগে ওঠার প্রয়াসকে গোড়াতেই গলাটিপে শেষ করে দিতে চাইছে। দৈনিক আজাদ-এর পাশাপাশি আরও বের হয়েছিল সাপ্তাহিক মোহাম্মদী, মাসিক মোহাম্মদী, মাসিক সওগাত ইত্যাদি নানা ছোট-বড় পত্রিকা ও সাময়িকী। এসব পত্রিকা বের হবার আগে মুসলমানরা ভাবতেই পারতো না, তাদের মধ্যে এত লেখক আছে, কবি আছে, সাংবাদিক আছে, আছে দেশ চালাবার মত এত যোগ্য নেতা।

www.pathagar.com

এ কে ফজলুল হকের জনপ্রিয়তা তখন তুঙ্গে। তিনি বিভিন্ন জেলায় সফরে যেয়ে জনসভা করতেন। সঙ্গে কখনও যেতেন বাঙালী মুসলমানের সাংস্কৃতিক জাগরণের অগ্রদূত কবি কাজী নজরুল ইসলাম। কিন্তু বেশীলভাগ সময়ে সঙ্গে যেতেন কিংবদন্তীতুল্য গায়ক আব্বাস উদ্দীন আহমদ। একদিকে ফজলুল হকের অসাধারণ বাগ্মিতা, অন্যদিকে আব্বাস উদ্দীনের সুরেলা কণ্ঠে নজরুলের জাগরণী গান মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করতো অপূর্ব গণজাগরণের জোয়ার।

আব্বাস উদ্দীনের গান

আব্বাস উদ্দীনের গান শোনার সৌভাগ্য আমার প্রথম হয়েছিল তালিমনগর মাদ্রাসায় পড়াকালে। কোন সভা-সমিতি বা জলসায় নয়, গ্রামোফোন রেকর্ডে। তখন জায়গীর থাকতাম সাতানীর তাহের উদ্দীন পণ্ডিতের বাড়ীতে। একজন শিক্ষিত ও সমাজ সচেতন ব্যক্তি হিসাবে পণ্ডিত সাহেবকে গাঁয়ের লোকেরা বেশ মান্য করতো। মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করতেন বলে কিশোর ও তরুণ সমাজও তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করতো। তাঁর প্রতি তরুণদের আকর্ষণবোধের আরেকটি কারণ ছিল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রতি তাঁর উৎসাহ। তিনি নিজে ভাল পুঁথি পাঠ করতে পারতেন। গ্রামে বিয়ে-শাদী বা কোন পালা-পার্বণে তো বটেই, এমনিতেও অবসর সময়ে মাঝে মাঝে তিনি পুঁথি পাঠ করতেন। আর আমরা তাঁর চারপাশে ভিড় করে বসে নিবিষ্ট মনে পুঁথি শুনতাম। এমনিভাবে 'কাসাসোল আম্বিয়া' থেকে শুরু করে 'জঙ্গনামা', আমীর হামজার পুঁথি, 'শহীদে কারবালা', 'সোনাভান' প্রভৃতি কত পুঁথি যে তাঁর কাছে শুনেছি তার ইয়ত্তা নেই।

কলের গান

এই পণ্ডিত সাহেবের বাড়ীতেই প্রথম গ্রামোফোন রেকর্ডের সাথে আমার পরিচয় হয়। গ্রামোফোন রেকর্ড তো নয়, এর নাম তখন ছিল কলের গান। ছোট একটা বাক্স। কুকুরের ছবিযুক্ত 'হিজ মাস্টারস ভয়েস'-এর যন্ত্রটা চালিয়ে কালো থালার মতো রেকর্ডের উপর পিন এঁটে বসিয়ে দিলেই কলের মধ্য হতে তরতাজা গানের আওয়াজ বেরিয়ে আসে– কলের গান তো বটেই! নজরুল ইসলাম ও গোলাম মোস্তফার ইসলামী গান এবং জসীম উদ্‌দীনের পল্লীগীতি। তবে নজরুলের গানই বেশী। কলের গানে আব্বাস উদ্দীনের গাওয়া যে গানটি প্রথম শুনেছিলাম, সেটা ছিল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদ রসূল এই কালেমা পড়বে আমার পরাণ বুলবুল'। এরপর একে একে 'দিকে দিকে, পুনঃ জ্বলিয়া উঠিছে দ্বীনি ইসলামী লাল মশাল', 'ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ', 'বাদশা তুমি দ্বীন ও দুনিয়ার', 'ওরে ও দরিয়ার মাঝি' ইত্যাদি। এসব গান সেকালে আমাদের মনে কী যে উন্মাদনা সৃষ্টি করতো, তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

কিন্তু না, শুধু ফজলুল হকের উদ্দীপনাময়ী রাজনৈতিক নেতৃত্ব, দৈনিক আজাদ-এর জাতিজাগানিয়া সাংবাদিকতা, নজরুলের কবিতা, আর আব্বাস উদ্দীনের গাওয়া গানই নয়, খেলাধুলার ক্ষেত্রে কলিকাতার মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের উপর্যুপরি বিজয়াভিযানও সেদিন বাংলার মুসলিম জাগরণে অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছিল। সারা ভারতে ফুটবল জগতে তখন কলিকাতা ফুটবল লীগ এবং আইএফএ শীল্ডের মর্যাদা ছিল সর্বোচ্চ। এই দুই ক্ষেত্রেই মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব পর পর কয়েক বছর অসাধারণ সাফল্য অর্জন করে।

মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব

তখন টেলিভিশন তো দূরের কথা, রেডিও'রও ব্যাপক প্রচলন ছিল না। যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত থাকায় কলিকাতা থেকে দৈনিক আজাদ ডাক বিভাগের মাধ্যমে তালিমনগর পৌঁছতে কয়েকদিন লাগত। কিন্তু তাতে আমাদের উৎসাহে এতটুকু কমতি হতো না। দৈনিক আজাদ-এ রাজনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি সকল ক্ষেত্রে শুধু মুসলমানদের এগিয়ে যাওয়ার খবরই পড়তাম না, তার সাথে ফুটবল মাঠে মোহামেডানের অনন্য বিজয়গাঁথা পড়েও আমরা উৎসাহ-আনন্দে টগবগ করতাম। কেবলই আমাদের মনে হতো, যে জাতির মধ্যে ফজলুল হকের মতো নেতা আছেন, নজরুল ইসলামের মতো শ্রেষ্ঠ কবি আছেন, আব্বাস উদ্দীনের মতো সেরা গায়ক আছেন, মোহামেডান স্পোর্টিংয়ের মতো সেরা খেলোয়াড় দল আছে, সে জাতিকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না। আজাদ পত্রিকার পাতায় মোহামেডান ক্লাবের খেলোয়াড়দের ছবি দেখে আমরা তাদের একেকজন যুদ্ধজয়ী বীর হিসেবেই কল্পনা করতাম। জুম্মা খান, বাচ্চি খান, সামাদ, মাসুম, সাবু, হাফেজ রশীদ, ছোট রশীদ, সিরাজুদ্দীন প্রমুখ খেলোয়াড়ের নাম আমাদের মুখে মুখে উচ্চারিত হতো জাতীয় বীরের মর্যাদায়। খেলাধুলার ক্ষেত্রে মোহামেডানের এ বিজয় জাতীয় জাগরণে কতোটা প্রভাব বিস্তার করেছিল, তা বুঝা যায় তাদের বিজয় উপলক্ষে রচিত নজরুল ইসলামের আবেগোদ্বেল কবিতা থেকে।

নজরুলের প্রেরণাদায়ী এ কবিতাটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

মোবারকবাদ

[মোহামেডান স্পোর্টিং-এর চ্যাম্পিয়নশীপ প্রাপ্তিতে]

"এই ভারতের অবনত শিরে তোমরা পরালে তাজ।
সুযোগ পাইলে শক্তিতে মোরা অজেয়, দেখালে আজ।
একি অভিনব কীর্তি রাখিলে নিরাশাবাদীর দেশে।
আঁধার গগনে ঈদের চাঁদ উঠিল যেন সে হেসে।
আনিলে শুক্লা একাদশী তিথি একাদশ খেলোয়াড়।

www.pathagar.com

আবার ঝলকি উঠিল খালেদ তারেকের তলোয়ার।
শুষ্ক মনের সাহারায় যেন দজলা ফোরাত বহে।
পিজরার বুলবুল বসরার গোলাপের কথা কহে।
বিডিওয়ার্লারাও দেখিয়েছে যেন ফেরদৌসের সিঁড়ি।
(যেন) মজনু দেখেছে লায়লীরে ফরহাদে দেখেছে শিরী।
বীর খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তির দিলে নব পরিচয়।
মালা দিলে সেই বিজয়ীর যার সাথে হল পরাজয়।
হিন্দু মুসলমানের তোমরা ভারতের রেখেছ মান।
শক্তি যাহার দেখেছে, মানুষ তাহারেই দেয় প্রাণ।
যে চরণ দিয়ে ফুটবল নিয়ে জাগাইলে বিস্ময়।
সেই চরণের শক্তি জাগুক আবার ভারতময়।
এমনি চরণ আঘাতে মোদের বন্ধন ভয় ডর
লাথি মেরে মোরা দূর করি যেন– আল্লাহু আকবর।"

কলিকাতায় ফুটবল খেলা যখন অনুষ্ঠিত হতো তখনও তালিমনগর এলাকায় বর্ষার মৌসুমের রেশ থাকতো। বর্ষাকালে আমরা মাদ্রাসায় যাতায়াত করতাম তাহের উদ্দীন পণ্ডিত সাহেবের নৌকায়। যেদিন মোহামেডানের কোন জয়ের খবর থাকতো, সেদিন নৌকায় মাদ্রাসা থেকে ফিরবার পথে হেড মাস্টার নজিরুদ্দীন সাহেব আজাদ পত্রিকার সংশ্লিষ্ট অংশ পড়ে শোনাতেন। বিজয়ের খবর শুনতে শুনতে আমরা অনেকেই ফূর্তিতে লাফিয়ে উঠতাম এবং চীৎকার করে উঠতাম– 'নারায়ে তকবীর আল্লাহু আকবর', মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব জিন্দাবাদ'।

হেড মাস্টার নজিরুদ্দীন আহমদ সাহেব জায়গীর থাকতেন সাতানী গ্রামেই, তাহেরউদ্দীন পণ্ডিত সাহেবের পাশের বাড়ীতে। আমি ভাল ছাত্র হিসেবে তাঁর স্নেহদৃষ্টি লাভ করেছিলাম। এ হিসাবে তাঁর পাশের বাড়ীতে আমার থাকার ব্যবস্থা হওয়ায় আমার আনন্দিত হবারই কথা ছিল। কিন্তু বাস্তব কারণে তা সম্ভব হতো না। আমি দাদপুর থেকে যে বদভ্যাসটি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম তা হচ্ছে খেলাধুলার প্রতি, বিশেষ করে মার্বেল খেলার প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি। সাতানী গ্রামে আমার জায়গীর বাড়ীর অনতিদূরে কুম-এর কাছে ছিল বিশাল মাঠ। সেখানে হা-ডু-ডু, গোল্লাছুট তো খেলতামই, মাঝে মধ্যেই এখানে-সেখানে খেলতাম মার্বেল। হেড মাস্টার সাহেব কোনক্রমে তা দেখে ফেললে তক্ষুণি কিছু বলতেন না। কিন্তু পরদিন মাদ্রাসায় মনের ঝাল মিটিয়ে পিটাতেন। এ রকম একদিনের কথা আমি কখনও ভুলতে পারবো না। হেড মাস্টার সাহেব ক্লাসে ঢুকে অন্য কাউকে কিছু না বলে আমাকে একটার পর একটা কঠিন ইংরেজী শব্দের বানান ও অর্থ ধরতে লাগলেন।

www.pathagar.com

আমি সঠিক উত্তর দিয়ে যেতে লাগলাম। কিন্তু একবার একটা শব্দের বানানে সামান্য ভুল হওয়াতে সপাং সপাং বেতের বাড়ীতে আমার পিঠ ঝালাপালা করে দিতে দিতে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করলেন– আর যেন জীবনে মার্বেল না খেলি।

সাতানী গ্রামে আমি ছিলাম প্রায় আড়াই বছর। নিজ গ্রাম রাজবাড়ী জেলার দাদপুরের পর আমার সেই কিশোর বয়সের একটা বড় অংশই কাটে সাতানী গ্রামে। ফলে এই গ্রামের সাথে আমার সুখ-দুঃখের নানা স্মৃতিই জড়িয়ে আছে। বাহ্যত তাহেরউদ্দীন পণ্ডিত সাহেবের বাড়ীতে থাকলেও একই সাথে আমি জায়গীর ছিলাম দুইবাড়ীর। পণ্ডিত সাহেবের দুই মেয়ে শাহেদা ও শাহিদা এবং এক ছেলে তুফাজ ছাড়াও পণ্ডিত সাহেবের ভাই মফিজউদ্দীন মন্ডলের দুই ছেলে মোশাররর্ফ এবং মোবারককে আমি পড়াতাম। এই সুবাদে একদিন পণ্ডিত সাহেবের বাড়ীতে ও অন্যদিন তাঁর ভাইয়ের বাড়ীতে খেতাম। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শাহেদা ও মোশাররফ আমার প্রায় সমবয়সের ছিল বলে আমার মাস্টারী ফলানোর জায়গা ছিল শুধু অপর তিনজনের উপর। কিন্তু এদের মধ্যে অন্তত একজন প্রায়ই কিশোর মাস্টারটির মাস্টারীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসত। পণ্ডিত সাহেবের ছেলে তোফাজ্জল ওরফে তুফাজ পড়তে বসে প্রায়ই তার বোনদের, এমন কি আমার সাথেও মারামারি করে চলে যেত। পণ্ডিত সাহেবের পর পর দুই মেয়ের পর প্রথম ছেলে তুফাজ। স্বভাবত পরিবারে তার শাসন ছিল খুবই কম।

কিশোর বয়স বলেই হয়ত সাতানী গ্রামে আমার বন্ধু-বান্ধব জুটে গিয়েছিল এক দঙ্গল। এদের সাথে সারাদিন খেলাধুলা করতাম, কুম-এ সাঁতার কাটতাম, শামগঞ্জ হাটের পাশে জমিদারদের বিশাল বাগানে পাহারাদারদের চোখ ফাঁকি দিয়ে আম, জাম, পেয়ারা, লিচু, জামরুল প্রভৃতি খেয়ে বেড়াতাম। এইসব বন্ধু-বান্ধবদের কেউ স্কুলে, কেউ মাদ্রাসায় পড়তো। কেউ আবার লেখাপড়াই করতো না। এরা প্রায় সবাই ছিল ঐ এলাকার ছেলেপিলে। কিন্তু আমি ওদের খেলাধুলার সাথী ও বন্ধু হলেও আমার আরেকটি পরিচয় ছিল– আমি জায়গীর বাড়ীতে ছেলে-মেয়ে পড়ানোর সুবাদে একজন ক্ষুদে মাস্টার এবং মাদ্রাসার তালেবে এলম (ছাত্র) হওয়ার সুবাদে একজন ক্ষুদে আলেম ছিলাম। জায়গীর বাড়ীতে আমাকে ক্ষুদে মাস্টার হিসাবে যেমন মাঝে মাঝে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হতো, তেমনি আমার ক্ষুদে আলেমের ভূমিকা পালন করতেও মাঝে মাঝে বেশ অসুবিধায় পড়তে হতো।

ক্ষুদে মোল্লার ভূমিকায়

সাতানী গ্রামে তখন তিনটি মসজিদকে কেন্দ্র করে তিনটি মালত বা সমাজ ছিল। পণ্ডিত সাহেবের বাড়ীতে জায়গীর থাকার সুবাদে আমি যে মসজিদে জুমার নামাজ পড়তাম সেই শামগঞ্জ হাটের পাশের ছাপড়া মসজিদটির ছিল সব চাইতে

www.pathagar.com

জরাজীর্ণ দশা। পাড়ার একজন গরীব মোল্লাজী এই মসজিদে নামাজ পড়াতেন। আমি মাদ্রাসার তালেবে এলম বিধায় আমাকে বিবেচনা করা হতো মোল্লাজীর সহকারী। মসজিদে আমাকে শুক্রবারে মাঝে মাঝে আজান দিতে হতো।

আজান দেয়া নিয়ে তেমন কোন অসুবিধা ছিল না। কিন্তু ইমাম মোল্লাজীর সহকারী হিসাবে একদিন আমি সত্য সত্যই মুসিবতে পড়েছিলাম। অসুস্থতা, না কি একটা কারণে মনে নেই, মোল্লাজী একদিন জুমার নামাজে আসতে পারেননি। মোল্লাজীর অনুপস্থিতিতে কেউ কেউ আমাকে ইমামতি করার প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু তা কি করে হয়? ১৯৩৯ সালে ক্লাস ফাইভের ছাত্র আমি। আমার বয়স তখন মাত্র দশ কি এগার। নাবালেগকে দিয়ে আর যাই হোক, ইমামতি তো করানো যায় না। উপস্থিত একজন বৃদ্ধ মুসল্লীকে দিয়ে ইমামতি করানোর সাব্যস্থ হল। কিন্তু গোল বাধল খোতবা নিয়ে। ঐ মুসল্লী সাহেব বা উপস্থিত আর কেউই আরবীতে খোতবা পড়তে পারতেন না। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল আমি খোতবা পাঠ করব। পণ্ডিত সাহেব যুক্তি দিলেন জুনিয়র মাদ্রাসার ক্লাস ফাইভের ছাত্র হিসাবে আবদুল গফুর এখনই হাফ মৌলভী, আর এক বছর পর সিক্স ফাইনাল পাস করলেই পুরা মৌলভী হয়ে যাবে। সুতরাং তার খোতবা পড়তে অসুবিধা হবে না।

বিপদে পড়লাম মসজিদ মেম্বরে খোতবা পড়তে দাঁড়িয়ে। সারাদিন যাদের সাথে খেলাধুলা করে বেড়াই, জমিদারের বাগান চষে বেড়াই আম, জাম, লিচুর সন্ধানে, সেই বন্ধুদের কয়েকজন মসজিদের পূবের মাঠে দাঁড়িয়ে হি হি করে হাসছিল আমার দুরবস্থা দেখে। সেদিন অনেক কষ্টে নিজেকে সংবরণ করে ক্ষুদে খতিবের পদমর্যাদা রক্ষা করতে হয়েছিল।

সাতানী গ্রামের এই মোল্লাজীর সহকারী হিসাবে আমাকে আরেকদিনও বিষম অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। সেদিন ছিল শবে বরাত। শবে বরাত উপলক্ষে বিকাল থেকেই বাড়ীতে বাড়ীতে মিলাদের ব্যবস্থা করা হয়। প্রত্যেক বাড়ীতেই মিলাদ শেষে ছিলো রুটি, হালুয়া, গোশত ইত্যাদি খাওয়ার ব্যবস্থা। মোল্লাজীর সঙ্গে আমিও আমন্ত্রিত। প্রথম বাড়ীতে সংক্ষিপ্ত মিলাদের পর মোল্লাজী তার থালার অনেকগুলো রুটির মধ্যে একটি মাত্র রুটির সামান্য একটু অংশ ছিঁড়ে মুখে দিয়ে বাকী সব ফিরিয়ে দিলেন। আমি ভাবলাম বৃদ্ধ মোল্লাজী হয়ত তার পেটের অসুখের জন্য এরূপ করলেন। আমি আমার থালা থেকে বেশ কয়েকটি রুটি খেয়েছিলাম। দ্বিতীয় বাড়ীতে যেয়েও মোল্লাজীর ঐ একই আচরণ। এ বাড়ীতে আমি দু'টার বেশী রুটি খেতে পারলাম না। তৃতীয় বাড়ীতেও মোল্লাজীর আচরণ একই থাকলো। আমি অনেক কষ্টে একটি আস্ত রুটি খেলাম। এরপরে কোন বাড়ীতে আমি আর আস্ত রুটি খেতে পারিনি। তবে সৌজন্য রক্ষার খাতিরে একটু করে রুটি ছিঁড়ে

www.pathagar.com

খেতে খেতেও শেষ দিকে আমি অচল হয়ে পড়ার উপক্রম। রাত ৮/৯টায় শবে বরাতের মিলাদ পরিক্রমা যখন শেষ হল তখন বৃদ্ধ মোল্লাজী অত্যন্ত সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকলেও আমার অবস্থা কাহিল। সে রাতে পেট ফেঁপে ঢাউস হয়ে যাওয়াতে সারারাত অনিদ্রায় ছটফট করতে হয়েছিল আমাকে।

তাহেরউদ্দীন পণ্ডিত একজন শিক্ষিত ব্যক্তি হিসাবেই এলাকায় স্বীকৃত ও সম্মানিত ছিলেন। কিন্তু একজন শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যেও যে কুসংস্কার থাকতে পারে, তার এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছিল তাঁর বাড়ী থাকাকালে। পণ্ডিত সাহেবের বাড়ীতে আম, জাম, কাঁঠাল নানা গাছ প্রচুর থাকলেও কোন নারিকেল গাছ ছিল না। নারিকেল গাছ লাগানো তাদের বংশে নিষিদ্ধ ছিল। নারিকেলের চারা লাগালে মানুষ মারা যাবে এই ছিল তাদের বিশ্বাস। অথচ নারিকেল খাওয়ার প্রয়োজন পড়ে পিঠা ছাড়াও নানা উপলক্ষে। পণ্ডিত সাহেবের বাড়ীর পেছনে কিছু ফাঁকা জমি ছিল। সেখানে একটা নারিকেল চারা লাগানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন পণ্ডিত সাহেব। একটা ভাল নারিকেল চারাও যোগাড় করা হয়েছিল। কিন্তু গর্ত করে চারাটা পুঁতবে কে? আমি বললাম, আমাদের বাড়ীতে আমরা নারিকেল চারা লাগাই, আমিই এ চারা লাগাব। কিন্তু পণ্ডিত সাহেব 'পরের ছেলেকে' নারিকেল চারা লাগাতে দিয়ে 'বিপদে' ফেলতে কিছুতেই মত দিলেন না। অগত্যা ইউনিয়ন বোর্ডের চৌকিদারকে ডাকা হল এ কাজটি করার জন্য। সে নারিকেল চারাটি লাগিয়ে দিল আর আমরা দূরে দাঁড়িয়ে তা দেখলাম।

নারিকেল চারা তো লাগানো হল। কিন্তু চারার গোড়ায় নিয়মিত পানি দিতে হবে। সে কাজটি করবে কে? নারিকেল চারা লাগানো আর তাতে পানি দেয়া তো একই ধরনের 'ঝুঁকিপূর্ণ' কাজ। যেখানে নারিকেল চারাটা লাগানো হয়েছিল, তার একটু দূরে ছিল একটি টিউবঅয়েল। পরিবারের লোকদের বিশুদ্ধ খাবার পানি নিশ্চিত করার জন্য পণ্ডিত সাহেব ব্যক্তিগত উদ্যোগে এ টিউবঅয়েলটি বসিয়েছিলেন। অগত্যা ঠিক হল, এই টিউবঅয়েলের নিকট থেকে একটি চিকন নালা কেটে দেয়া হবে নারিকেল চারা পর্যন্ত। এভাবেই নারিকেল চারাটির স্বয়ংক্রিয় পানি সিঞ্চনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হল।

একেই হয়ত বলে বাত্তির নীচে অন্ধকার। যে গ্রামের শাহ সাহেব ও মাওলানা রইস উদ্দীন বিশাল একটি এলাকায় জ্ঞানের আলো জ্বালিয়েছিলেন, সেই গ্রামেরই একটি বংশে এই কুসংস্কার আমার কাছে অকল্পনীয় মনে হলেও এটা ছিল নির্মম বাস্তবতা।

তবে শাহ সাহেব ও মওলানা রইস উদ্দীন আহমদ আমার কাছে সব সময়ই ছিলেন পরম শ্রদ্ধার পাত্র এবং অফুরন্ত প্রেরণার উৎস। এদের মধ্যে মওলানা রইস

www.pathagar.com

উদ্দীন পরবর্তী জীবনে আমার উচ্চ শিক্ষার ব্যাপারে নানাভাবে উৎসাহিত করেন। আর শাহ সাহেবের কথা বলতে গেলে বলতে হয়, সাতানীতে আমার আড়াই বছর জীবনের সবচাইতে বড় পাওয়াই ছিল এই শাহ সাহেবের স্নেহময় সান্নিধ্য। হালকা গোলাপী আভার ফর্সা চেহারার এই বৃদ্ধ দরবেশের মুখাবয়ব থেকে সব সময় একটা আলো ঠিকরে পড়ত। একজন কামেল ওলীকে এত নিকট সান্নিধ্য থেকে এর আগে পরে কখনও দেখিনি। দাদার বয়সী এই সূফী সাধককে আমরা দাদু বলে ডাকতাম। তিনিও আমাদের তার নাতির মতই স্নেহের চোখে দেখতেন এবং দেখা হলেই আমাদের সাথে নানা কৌতুকালাপ করতেন। তাঁকে বুঝবার বয়স আমাদের তখনও হয়নি। কিন্তু এটুকু ঠিকই বুঝতাম, এমন ভাল মানুষ হয় না।

লাহোর প্রস্তাব পাসের পটভূমি

আমরা তালিমনগরে থাকতেই ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ গৃহীত হয়েছিল ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব। এ প্রস্তাবে উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাসমূহে একাধিক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের দাবী জানানো হয়েছিল। নিখিল ভারত মুসলিম লীগের যে বার্ষিক অধিবেশনে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় তা অনুষ্ঠিত হয় লাহোরে। সে কারণেই এই প্রস্তাব লাহোর প্রস্তাব নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ১৯৪০ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের এ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মুসলিম লীগের সভাপতি কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। আর প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন জনপ্রিয় মুসলিম লীগ নেতা ও প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক।

ফজলুল হকের নাম ও তাঁর কর্মকাণ্ডের সাথে আমরা আগেই পরিচিত ছিলাম। বাংলাদেশের বাইরে যেসব ভারতীয় মুসলমান খ্যাতনামা ব্যক্তির কথা পত্র-পত্রিকায় উল্লেখিত হতে দেখতাম তাদের মধ্যে মওলানা মোহাম্মদ আলী, কবি ডক্টর মোহাম্মদ ইকবাল এবং মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নাম অন্যতম। এদের প্রথম দু'জন ১৯৪০-এর বেশ আগেই ইন্তেকাল করেছেন। সমগ্র উপমহাদেশের মুসলিম নেতৃবৃন্দ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকেই তাদের সেই ক্রান্তিকালের যোগ্যতম নেতা হিসাবে গ্রহণ করেন।

ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ তাকে বলতেন কায়েদে আজম (প্রধান নেতা)। সেই কায়েদে আজমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সভায় শেরে বাংলার উত্থাপিত প্রস্তাবে দাবী জানানো হল উপমহাদেশকে বিভক্ত করে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাসমূহে স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের। এ দাবী যে কোন বিচারে ছিল একটি যুগান্তকারী দাবী। কিন্তু মুসলিম জাতি তথা মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে এ দাবী রাতারাতি হঠাৎ করে উত্থাপিত হয়নি। এই দাবী উত্থাপনের ছিল একটি

www.pathagar.com

সুদীর্ঘ ও দুঃখজনক পটভূমি।

পলাশীতে আমাদের স্বাধীনতা সূর্য অস্ত যাবার পর একশ' বছর ধরে মুসলমানরা স্বাধীনতা ফিরে পাবার লক্ষ্যে সশস্ত্র সংগ্রাম চালালেও হিন্দু নেতৃবৃন্দ সে সময় ইংরেজ তোষণেই অধিকতর উৎসাহী ছিলেন। মীর কাসিমের যুদ্ধ, হাজী শরীয়তউল্লাহ-দুদু মিয়ার ফরায়েজী আন্দোলন, টিপু সুলতানের সংগ্রাম, সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর জিহাদ আন্দোলন, তিতুমীরের লড়াই– এসব ঘটনা ছিল সেই ইতিহাসের এক একটি স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়। এই সশস্ত্র সংগ্রামের ধারারই বৃহত্তম ঘটনা ছিল ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব। এতেও প্রধানত মুসলমানরাই নেতৃত্ব দেন। সিপাহী বিপ্লব পর্যুদস্ত হবার পর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ প্রখ্যাত হিন্দু কবিগণ ইংরেজদের জয় ও মুসলমানদের পরাজয়ে আনন্দে গদগদ হয়ে কবিতা রচনা করেন। আর 'সাহিত্য সম্রাট' বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তো পষ্টাপষ্টিই লিখেন– 'ইংরেজ আমাদের শত্রু না, আমাদের শত্রু মুসলমান।'

এই পটভূমিতেই সিপাহী বিপ্লব পর্যুদস্ত হওয়ার পর মুসলিম নেতৃবৃন্দ সাময়িকভাবে হলেও হিন্দুদের অনুসরণে ইংরেজদের সাথে সহযোগিতার নীতি অবলম্বন করে ইংরেজ প্রবর্তিত আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের উপর জোর দেন। বাংলাদেশে নবাব আবদুল লতিফ থেকে নবাব সলিমুল্লাহ পর্যন্ত চলে এই সহযোগিতার যুগ। এই সহযোগিতার আমলেই ইংরেজ সরকার 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' নামক প্রদেশ গঠন করেন ১৯০৫ সালে এবং ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবে সম্মতি জানান। কলিকাতা প্রবাসী হিন্দু জমিদারদের প্রবল আন্দোলনের মুখে মাত্র ছয় বছরের মাথায় ১৯১১ সালে ঢাকা-কেন্দ্রিক 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশ বাতিল হয়ে গেলেও সলিমুল্লাহর মৃত্যুর ছয় বছর পর বহু ঝড়-ঝাপ্টা পেরিয়ে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় মূল প্লানের বহু রদবদল ঘটিয়ে। এসব ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই হিন্দু নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মুসলমানদের মনে নানা সন্দেহ দানা বেঁধে উঠতে থাকে।

বিশের দশকের গোড়ার দিকে বাংলার পিছিয়ে পড়া মেজরিটি মুসলিম জনগোষ্ঠীর চাকরির ক্ষেত্রে সুবিচার নিশ্চিত করার যে চেষ্টা চালানো হয় অপেক্ষাকৃত উদার হিন্দু নেতা চিত্তরঞ্জন দাশের উদ্যোগে স্বাক্ষরিত 'বেঙ্গল প্যাক্টে'র মাধ্যমে, হিন্দু নেতৃবৃন্দের মধ্যে উগ্র সাম্প্রদায়িক চেতনা প্রবল হয়ে উঠায় তাও অল্পদিনের মধ্যেই ভন্ডুল হয়ে যায়। এই দুঃখজনক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই নজরুল রচনা করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত অগ্নিস্রাবী কবিতাঃ 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার'।

হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি নির্মাণের লক্ষ্যে নজরুলের সাহিত্য প্রয়াস বা ফজলুল হকের রাজনৈতিক প্রচেষ্টা কোন কিছুই সেদিন ফলবতী হয়নি। পশ্চাৎপদ

www.pathagar.com

মুসলমানকে কিসে আরও পিছে ঠেলে দেয়া যায়, কিভাবে তাদের আগামীতেও স্থায়ীভাবে পদতলে রাখার ব্যবস্থা করা যায়, সেই চিন্তায় তখন বিভোর কংগ্রেসের হিন্দু নেতৃবৃন্দ। এসব ঘটনা সচেতন মুসলিম নেতৃবৃন্দের জন্য নিশ্চয়ই আনন্দদায়ক লাগার কথা নয়। এই প্রেক্ষাপটেই তিরিশের দশকে ভারতের সকল অঞ্চলের মুসলিম নেতৃবৃন্দের মধ্যে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের পতাকাতলে সংঘবদ্ধ হবার একটা তোরজার শুরু হয়ে যায়। তিরিশের দশকের গোড়ার দিকেও বাংলাদেশে মুসলিম লীগ ছিল গুটিকতক নেতার একটি পকেট সংগঠন। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন পাস হওয়ার পর সাধারণ নির্বাচনের আগেই হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী যোগ দিয়েছিলেন মুসলিম লীগে। নির্বাচনের কিছুদিন পর এ কে ফজলুল হকও সদলবলে যোগ দেন মুসলিম লীগে। অতীতে মওলানা আকরম খাঁ থেকে শুরু করে মৌলভী তমিজ উদ্দীন খান পর্যন্ত অনেকেই কংগ্রেস, খিলাফত আন্দোলন, কৃষক প্রজা পার্টি ইত্যাদি রাজনৈতিক সংগঠনে থাকলেও তারাও একে একে সমবেত হলেন মুসলিম লীগ প্লাটফর্মে।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ নিজেও এক সময় কট্টর কংগ্রেসী নেতা ছিলেন। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রশ্নে তিনি এত নিরাপস ছিলেন যে, ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়েও তিনি সম্মেলনে যোগদান করেননি। অনেক পরে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের ঐকান্তিক অনুরোধে তিনি যখন মুসলিম লীগে যোগদান করেন, তখনও শর্ত দেন, লীগ যেন কংগ্রেসের অকারণ বিরোধিতায় লিপ্ত না হয়। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রশ্নে তিনি এমন আন্তরিক ও একনিষ্ঠ ছিলেন যে, অনেকেই তাঁকে 'হিন্দু মুসলিম মিলনের অগ্রদূত' অভিহিত করেন। কিন্তু কংগ্রেসের হিন্দু নেতৃবৃন্দের কট্টর সাম্প্রদায়িক মনোভাবের ফলে এহেন ব্যক্তিও একদিন কংগ্রেসের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য হন।

ভারতীয় মুসলিম সমাজের তখন কাণ্ডারীবিহীন নৌকার মত অবস্থা। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বনামধন্য মুসলিম নেতা মওলানা মোহাম্মদ আলী তিরিশের দশকের শুরুতেই গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানকালে অকস্মাৎ প্রাণ ত্যাগ করেন। অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তাঁর পর ভারতীয় মুসলিম সমাজকে কে নেতৃত্ব দেবেন? তিনি বলেছিলেনঃ জিন্নাহ। জিন্নাহর অপূর্ব চারিত্রিক দৃঢ়তা, স্বীয় বিশ্বাসে অবিচলতা এবং ক্ষুরধার যুক্তিপরায়ণতার বিচারে তদানীন্তন ভারতের শ্রেষ্ঠ দুই আধ্যাত্মিক বুজর্গ হযরত আশরাফ আলী থানভী (রঃ) এবং ফুরফুরার পীর হযরত আবুবকর সিদ্দিকী (রঃ)-ও জিন্নাহকেই তদানীন্তন ভারতবর্ষের মুসলমানদের যোগ্যতম নেতা মনে করতেন।

www.pathagar.com

সর্বভারতীয় পরিমণ্ডলে কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে মুসলমানদের প্রধান নেতা মনে করা হলেও বাংলাদেশে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকই তখন ছিলেন আমাদের প্রিয়তম নেতা। বিশেষ করে কংগ্রেসী নেতাদের মুসলিম-বিদ্বেষী কর্মকাণ্ড ও কথাবার্তার তিনি যেমন দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতেন, তা আমাদের সেই কিশোর বয়সে প্রবলভাবে আলোড়িত ও আন্দোলিত করত। কংগ্রেস নেতা পণ্ডিত নেহরু একবার মুসলমানদের সম্বন্ধে আপত্তিকর মন্তব্য করায় হক সাহেব জবাবে বলেন, ও রকম একশ' নেহরুকে আমি আমার পকেটে পুরে রাখতে পারি। বিহারে কংগ্রেস মন্ত্রী সভার প্ররোচনায় মুসলিমবিরোধী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হওয়ায় তিনি কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন– আবার যদি বিহারে মুসলিমবিরোধী দাঙ্গা হয়, তাহলে বিহারে নিহত প্রতিটি মুসলমানের বদলায় বাংলাদেশে আমি দশ দশটি হিন্দু হত্যার ব্যবস্থা করবো। ফজলুল হকের এই কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণের পর সত্য সত্যই তখনকার মত বিহারে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধ হয়ে যায়। বিভিন্ন হিন্দু পত্র-পত্রিকায় শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের বিরুদ্ধে নিন্দা ও সমালোচনা প্রকাশিত হওয়ার প্রেক্ষিতে ফজলুল হক একবার বলেছিলেন– "হিন্দুরা যখন আমার তারিফ করে, তখন বুঝতে হবে, আমি মুসলমান সমাজের সর্বনাশ করছি, আর হিন্দুরা যদি আমার নিন্দা করে, বুঝতে হবে, আমি সঠিক পথে আছি।"

১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের অধিবেশনে শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক ভারতবর্ষকে মুসলিম ও অমুসলিম এলাকায় বিভক্ত করার মাধ্যমে মুসলিম অধ্যুষিত পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে একাধিক স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের দাবী তুললেও মুসলমানদের মধ্যে এ চিন্তা হঠাৎ আসেনি। বহুদিন পর্যন্ত মুসলিম নেতাদের লক্ষ্য ছিল মুসলমানদের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান সাপেক্ষে অখণ্ড ভারতীয় কাঠামোর মধ্যে স্বাধীনতা অর্জন। স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বনামখ্যাত মুসলিম নেতা মওলানা মোহাম্মদ আলীর ভাষায় এটা ছিল 'ফ্রি ইসলাম ইন ফ্রি ইন্ডিয়া' অর্থাৎ স্বাধীন ভারতে স্বাধীন ইসলাম। কিন্তু কংগ্রেসের হিন্দু নেতৃবৃন্দের লক্ষ্য ছিল মুসলমানদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্রের অবলুপ্তি ঘটানো এবং পশ্চাদপদ মুসলমানদের পুনর্জাগরণ প্রয়াসকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেয়া। পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ এবং বেঙ্গল প্যাক্ট বাতিলের মাধ্যমে তাদের এ সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রকট হয়ে পড়ার পরও মুসলিম নেতৃবৃন্দ হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ব্যাপারে সম্পূর্ণ আশা হারাননি। কিন্তু ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অধীনে ১৯৩৭ সালে সাধারণ নির্বাচনের পর তাদের মোহভঙ্গ হল বড় নির্মমভাবে।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রাদেশিক সরকারের হাতে প্রথমবারের

www.pathagar.com

মত যথেষ্ট ক্ষমতা দেয়া হয়। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের ফলাফলে দেখা গেল অধিকাংশ মুসলিম আসনে মুসলিম লীগ অথবা মুসলিম নেতৃত্বাধীন দলসমূহ যেমন বাংলাদেশে ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন কৃষক প্রজা পার্টি, পাঞ্জাবে সিকান্দর হায়াত খানের নেতৃত্বাধীন ইউনিয়নিস্ট পার্টি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা জয়লাভ করেছেন। কংগ্রেস প্রার্থীরা অধিকাংশ প্রদেশে মুসলিম আসনে শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। নির্বাচনের পর ফজলুল হক ও সিকান্দর হায়াত মুসলিম লীগে যোগ দেন। ফলে এটা স্পষ্টতই প্রমাণিত হয়ে যায় যে, মুসলিম লীগই মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন। এই বাস্তবতা মানতে নেহরু প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ কিছুতেই রাজি ছিলেন না। নেহরুর নিজের প্রদেশ সংযুক্ত প্রদেশের নির্বাচনে কংগ্রেস কয়েকটি মুসলিম আসনে প্রার্থী দিয়ে সবক'টিতেই পরাজিত হয়। নির্বাচন পূর্বকালীন অলিখিত এক চুক্তির মাধ্যমে প্রদেশের লীগ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ হিন্দু-মুসলমান মিলন কামনায় লীগ কংগ্রেস কোয়ালিশন সরকার গঠনের ব্যাপারে সমঝোতায় উপনীত হন। কিন্তু নির্বাচনের পর প্রাদেশিক কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ নেহরুর চাপে চুক্তি ভঙ্গ করতে বাধ্য হন। নেহরু বলেন, মুসলিম লীগ থেকে দু'জন মন্ত্রী নেয়া যেতে পারে, তবে তাদেরকে লীগের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে আসতে হবে। অথচ মুসলিম লীগ কংগ্রেসের সহযোগিতা পাবার আশায় তাদের এক সদস্যের ইন্তেকালের পর শূন্য আসনের উপনির্বাচনে শুভেচ্ছার নিদর্শন হিসাবে কংগ্রেস প্রার্থী রফি আহমদ কিদওয়াইকে সমর্থন দিয়ে জিতিয়ে দেন। ইউপি'র দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে অন্যান্য মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশেও মুসলিম লীগকে বাদ দিয়েই কংগ্রেস সরকার গঠন করে। মুসলিম নেতৃবৃন্দ এবার নিশ্চিত হলেন, হিন্দু অধ্যুষিত স্বাধীন অখণ্ড ভারতে মুসলমানদের সব সময়ই এভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বাইরে রাখা হবে।

১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর যেসব প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করে, সেসব প্রদেশেও শুরু হয় মুসলমান বিরোধী ষড়যন্ত্রের নতুনতর অধ্যায়। মুসলমানদের তাদের ঈমান, আকিদা বিরোধী অনুষ্ঠানে যোগদান করতে বাধ্য করা হতে লাগল। বৃটিশ সরকার কর্তৃক নির্যাতিত মুসলমানদের উপর এবার শুরু হল ব্রাহ্মণবাদী অত্যাচার-নির্যাতনের স্টীম রোলার। এসবের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগের প্রতিবাদ অরণ্যে রোদনে পর্যবসিত হল। মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে কংগ্রেস শাসিত প্রদেশসমূহে মুসলমানদের উপর অনুষ্ঠিত অত্যাচার সম্বন্ধে তদন্তের জন্য ১৯৩৮ সালে মুসলিম লীগের কলিকাতা অধিবেশনে পীরপুরের রাজা সৈয়দ মোহাম্মদ মেহদীর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি 'পীরপুর কমিটি' নামেই সমধিক খ্যাত হয়। এ ছাড়া এ কে ফজলুল হক নিজেও মুসলমানদের দুরবস্থা নিয়ে একটি রিপোর্ট তৈরি করেন। পীরপুর রিপোর্ট এবং

www.pathagar.com

ফজলুল হকের রিপোর্ট উভয়টিতেই কংগ্রেস সরকারের সুপরিকল্পিত মুসলিম বিরোধী চক্রান্ত প্রকটভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়।

এসবের ফলে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ সব কিছু নতুন করে চিন্তা শুরু করতে বাধ্য হন। এই নতুন ভাবনাই ছিল মুসলিম ও অমুসলিম প্রধান অঞ্চলে উপমহাদেশকে বিভক্ত করে একাধিক স্বতন্ত্র স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করা। ১৯৪০ সালে শেরে বাংলা ফজলুল হক কর্তৃক উত্থাপিত ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের এই দাবী মূলত ছিল উপমহাদেশের মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষার লক্ষ্যে একটি আত্মরক্ষামূলক দাবী। কংগ্রেস হিন্দুদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সারা ভারতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে মুসলমানদের দূরে সরিয়ে রাখার যে ষড়যন্ত্র চালাচ্ছিল, তার পাশাপাশি হিন্দু মহাসভার নেতৃবৃন্দের মুখে উচ্চারিত হচ্ছিল আর এক দাবী, যার সারমর্ম হল, ভারতবর্ষ হিন্দুদের দেশ, এদেশে মুসলমানদের থাকতে হলে হিন্দুদের পদানত হয়েই থাকতে হবে, নতুবা তাদের এদেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করা হবে। স্বাভাবিকভাবেই মুসলমানরা সেদিন আতংকিত হয়ে তাদের জন্য স্বতন্ত্র স্বাধীন আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার মধ্যেই নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার আশ্বাস খুঁজে পেয়েছিলেন।

১৯৩৭ সাল থেকেই মুসলমানদের মধ্যে দেশের সর্বত্র মুসলিম লীগ সংগঠন গড়ে তোলার উৎসাহ দেখা দেয়। ১৯৩৯-৪০ সালে এ প্রবণতা একটা স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনে রূপ নেয়। এ আন্দোলনের ঢেউ এসে লেগেছিল পাবনা জেলার অজপাড়া গাঁ সাতানী তালিমনগর অঞ্চলেও। এ উপলক্ষে তালিমনগর মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত হয় বিরাট জনসভা। আর আয়োজিত হয় মুসলিম লীগের চাঁদতারা খচিত পতাকা নিয়ে অভাবিত পূর্ব বিশাল এক মাইল দীর্ঘ মিছিল। এই মিছিলের এক প্রান্ত যখন ছিল তালিমনগরে, অপর প্রান্ত ছিল সাগরকান্দি বাজারে। মুহুর্মুহু ধ্বনিত হচ্ছিল ঃ 'নারায়ে তকবীর, আল্লাহু আকবর', 'মুসলিম লীগ, জিন্দাবাদ' প্রভৃতি শ্লোগান। বিশেষ করে এই মিছিল যখন সাগরকান্দি বাজারের জমিদার বাড়ীর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল, তখন শ্লোগান হয়ে উঠছিল অধিকতর উচ্চকণ্ঠ।

পদ্মা পারাপারের দুর্ভোগ

তালিমনগরে যে তিন বছর পড়াশোনা করি, সে তিন বছর যে একটানা সেখানেই ছিলম এবং আমার গ্রামের বাড়ীর সাথে কোন সম্পর্ক ছিল না, তা নয়। সেই কিশোর বয়সে নিজের ঘরবাড়ী, বাপ-মা ছেড়ে একটানা বেশী দিন বাইরে থাকা সম্ভবপর হত না। প্রথমবার তো সাতদিন পরেই আব্বা গিয়ে আমাদের দু'ভাইকে নিয়ে আসেন। এর পর প্রায় প্রতি একমাস পর পর একবার বাড়ী

www.pathagar.com

আসতাম। প্রথম দিকে আব্বা পদ্মা নদী পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে খেয়া নৌকায় তুলে দিয়ে যেতেন। পরে শুধু দু'ভাই আসা-যাওয়া করতাম। তবে এ অবস্থা ছিল শুকনার মৌসুমে যখন পদ্মা অপেক্ষাকৃত ছোট ও শান্ত থাকতো। বর্ষাকালে পদ্মা যে বিশাল ভয়ংকর আকার ধারণ করতো, তখন বড় কারো সঙ্গ ছাড়া পদ্মা পাড়ি দিতে সাহস পেতাম না। বর্ষাকালে বাড়ী থেকে আব্বা বা অন্য কেউ আসতেন আমাদের বাড়ী নিয়ে যেতে। নইলে শ্যামগঞ্জ ও বেলগাছি হাটের মধ্যে ব্যবসা করতো এমন কিছু পরিচিত ব্যাপারীর নৌকায় পদ্মার এপার-ওপার যেতাম। তারা কোন মতে পদ্মার দক্ষিণ পাড়ে বা বেলগাছি হাটে পৌছে দিলেই আমরা দু'ভাই নিজেরাই বাড়ী চলে যেতে পারতাম।

তবে বর্ষাকালে বাড়ী যাওয়া সব সময়ই যে সহজ হত, তা নয়। একবার ভরা বর্ষায় বাড়ী যেতে বেশ অসুবিধায় পড়েছিলাম। বাড়ী যাবার আশায় দু'ভাই শামগঞ্জ হাটের দিনে হাটে এসে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও এমন পরিচিত কোন ব্যাপারী পেলাম না, যে আমাদের তাদের নৌকায় পদ্মার ওপার নিয়ে যেতে রাজি হয়। কিন্তু বাড়ী যাব আশায় বেরিয়েছি বলে জায়গীর বাড়ী ফিরে যেতেও মন চাইল না কিছুতেই। আমাদের কাতর মিনতিতে এক ব্যাপারী তার নৌকায় নিতে রাজি হলো। কথা হলো, সে পদ্মা পাড়ি দেবে না, তবে তার বাড়ীতে রাতে থাকতে পারব, ভোরবেলা তার নৌকায় পদ্মার তীর পর্যন্ত পৌছে দেবে। দু'ভাই চরনন্দলালপুর ব্যাপারীর বাড়ীতে খেয়ে-দেয়ে শুয়ে থাকলাম। ভোরবেলা ঘাস কাটতে যাবার পথে ব্যাপারীর লোকেরা নৌকায় করে আমাদের পদ্মার তীর পর্যন্ত পৌছে দিলো।

বর্ষকালে তখন সাধারণ খেয়া পারাপার বন্ধ থাকত। পদ্মা পাড়ি দিতে হত গয়নার নৌকায়। গয়নার নৌকা পাওয়া যাবে প্রায় দু'মাইল পশ্চিমে নাজিরগঞ্জ ঘাটে। অগত্যা দু'ভাই পদ্মার তীর দিয়ে নাজিরগঞ্জ অভিমুখে যাত্রা শুরু করলাম। ভরা বর্ষায় পদ্মার তীর বেশীর ভাগই পানিতে ডুবে গেছে। আধ হাঁটু থেকে হাঁটু পানি। এর মধ্য দিয়েই দু'ভাই হেঁটে চললাম। পরনে আমাদের লুঙ্গী ও পাঞ্জাবী, হাতে একটা করে ছোট পোটলা। মাঝে মাঝে ছোট ছোট নালা মাঠ থেকে এসে পদ্মায় পড়েছে। সেসব নালায় পানি কোমর পর্যন্ত। অগত্যা লুঙ্গী খুলে পোটলাসহ মাথায় নিয়েই ঐসব নালা পার হতে হলো। আবহাওয়া খারাপ থাকায় পথে অবশ্য তেমন লোকজন ছিল না।

অনেক কষ্টে ঝড়ো হাওয়া আর টিপটিপ বৃষ্টির মধ্যে নাজিরগঞ্জ পৌছলাম। কিন্তু আবহাওয়া খারাপ থাকায় কোন গয়নার নৌকা নদী পাড়ি দিতে রাজি হল না।

www.pathagar.com

আবহাওয়ার কারণে অন্য কোন যাত্রীও ছিল না গয়নাঘাটে। এদিকে সকাল থেকে পেটে কিছু পড়েনি। খিদেয় পেট চুঁ-চুঁ করছে। তবুও সেদিকে মন ছিল না। শুধুই ভয় হচ্ছিল, এই অচেনা-অজানা ঘাটেই কি শেষ পর্যন্ত আটকে পড়ব? আমাদের অনেক অনুনয়-বিনয়ে অবশেষে এক মাঝির মন নরম হলো। সে ঝড়ো হাওয়ার মধ্যেও আমাদের দু'ভাইকে নিয়ে গয়না ছাড়তে রাজি হলো।

বৃহৎ গয়নার নৌকায় যাত্রী মাত্র আমরা দু'ভাই। মাঝিরা তিনজন। আল্লাহ-রসূলের নাম নিয়ে মাঝিরা নৌকা ভাসিয়ে দিল ভরা বর্ষার কূল-কিনারাহীন বিশাল পদ্মার বুকে। ঝড়ো হাওয়ায় বিশাল বিশাল ঢেউয়ের ধাক্কায় উথাল-পাথাল নদীতে নৌকা একবার উপরে উঠছিল, আবার নিচে পড়ছিল। আমরা দু'ভাই ছইয়ের মধ্যে শুধুই দোয়া-দরূদ পড়ছিলাম যেন ভালয় ভালয় পদ্মা পাড়ি দিতে পারি।

ছইয়ের মধ্যে বসেই টের পাচ্ছিলাম মাঝিরা রান্নার আয়োজন করছে। গয়নার নৌকায় পদ্মা পাড়ি দেয়ার সময় মাঝিদের রান্না করে ভাত খেতে আগেও দেখেছি। যাত্রীদের কেউ সে খাবারে শরীক হয় না, হবার কথাও নয়। কিন্তু আমরা তখন ক্ষুধায় অতিশয় কাতর। কেবলি মনে হচ্ছিল, ওরা যদি আমাদের খেতে ডাকত। অবশেষে সত্যিই মাঝিদের একজন জিজ্ঞেস করলো, আমরা এক মুঠ ভাত খাব কি-না? সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম। একটা থালায় সামান্য কিছু ভাত ও ডাল ঢেলে দেয়া হলো দু'ভাইয়ের জন্য। জীবনে বহু ভাল খানা খাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, কিন্তু সেদিনের ঐ সামান্য ডাল-ভাতে যে স্বাদ ও তৃপ্তি পেয়েছিলাম, তার সাথে সেসব ভাল খাবারের কোন তুলনাই হয় না।

সংক্ষিপ্ত খানা খাওয়ার পর দু'ভাই আবার ছইয়ের ভেতর চলে গেলাম। পেটে কিছু দানাপানি পড়াতে ঘুম ঘুম ভাব আসছিল। হঠাৎ এক বিরাট ঝাঁকুনি খেয়ে চমকে উঠলাম। মাঝ নদীতে হঠাৎ নৌকা কাত হয়ে পানি ওঠে ওঠে অবস্থা। মাঝিদের চোখে-মুখেও আতংকের আর ব্যস্ততার ভাব। আমাদের ভীত-সন্ত্রস্ত ভাব দেখে মাঝিরা বলে উঠলো, আল্লায় বড় বাঁচান বাঁচাইছে, ফাঁড়া কাইটা গেছে। নড়াচড়া কইরেন না। আল্লার নাম নেন।

পরে মাঝিরা বুঝিয়ে বলেছিল ঘটনাটা– মাঝনদীতে পাল খাটানোর সময় হঠাৎ সামান্য অসাবধানতার জন্য নৌকা কাত হয়ে পানি ওঠার উপক্রম হয়েছিল। বিরাট ফাঁড়া থেকে উদ্ধার পাবার জন্য মাঝিরা বার-বার আল্লাহর শোকর গোজারি করতে লাগলো। সেই কিশোর বয়সে ভরা বর্ষার দিনে মাঝপদ্মার সেই ঘটনায় কেমন ভয় পেয়েছিলাম, সে কথা মনে উঠলে আজও সারা শরীর আতংকে শিউরে উঠতে চায়।

www.pathagar.com

যতদিন তালিমনগর ছিলাম, পদ্মার এপার-ওপার করা ছিল আমাদের নিয়মিত বাধ্যবাধকতা। আব্বা, মা, বিশেষত মায়ের কথা মনে উঠলে সেই কিশোর বয়সে জায়গীর বাড়ী থাকতে কিছুতেই মন চাইতো না। অথচ পড়াশোনার প্রয়োজনে বাড়ীতেও বেশীদিন থাকতে পারতাম না। আবার বাড়ী আর তালিমনগরের মাঝখানে বিশাল নদী পাড়ি দিতে হতো নিয়মিত। এসবের ফলে বিশেষ করে আমার মনের উপর যে কী চাপ পড়তো, তা বলে শেষ করা সম্ভব নয়। তালিমনগর যাবার উদ্দেশে বাড়ী থেকে বিদায় নেবার বেলায় প্রতিবারই এক করুণ দৃশ্যের অবতারণা হত। বিদায় নেয়ার দিন মায়ের অশ্রুসজল চোখের দিকে আমি তাকাতেই পারতাম না। মা'য়ের মনে যাতে আঘাত না লাগে সেজন্য আমি বাহ্যত নিজেকেও শক্ত ও হাসি-খুশী দেখাতে চেষ্টা করলেও ভেতরে-ভেতরে বইতো আমার কান্নার ঝড়। পরের বাড়ীতে অর্থাৎ জায়গীর বাড়ীতে ক্ষুধার সময় ঠিক মত খেতে পাব কি-না এই চিন্তায় মা সব সময়ই আমাদের পোটলার মধ্যে কিছু চিড়া, মুড়ি, খই, নাড়ু ছাড়াও ঢাকুন, বড়া, পাকান, ভাজা পিঠা দিয়ে দিতেন। এসব কারণে যাত্রা বিলম্বিত হতো। বাড়ী হতে বিদায় নেবার সময় মা বাহির বাড়ীতে এসে দাঁড়াতেন। মাঠের মধ্য দিয়ে পথ চলতে যখনই পেছন ফিরে তাকাতাম, দেখতাম, মা ঠাঁয় দাঁড়িয়েই আছেন আমাদের দিকে চেয়ে।

যতদিন তালিমনগর মাদ্রাসায় পড়েছি, বাড়ী আর জায়গীর বাড়ীর মধ্যে যাতায়াতের প্রয়োজনে পদ্মা নদী পাড়ি দেয়া নিয়ে সব সময়ই আতঙ্কে ভুগতাম। আর এ আতঙ্ক শুধু যে ভরা বর্ষার পদ্মা-প্রমত্তা নিয়ে ছিল, তা নয়। এ ভয় ছিল শুকনা মৌসুমে পদ্মা পাড়ি দেয়া নিয়েও। শুকনা মৌসুমে ভরা বর্ষার তুলনায় পদ্মার আকার কিছুটা ছোট হলেও তার বিশালত্ব মোটেই কম ছিল না। শুকনা মৌসুমে বিকাল বেলা কাল বৈশাখীর ভয় যেমন ছিল, তেমনি কষ্টকর ছিল পদ্মার বুকে জেগে ওঠা বালিয়াড়ি চর ভর দুপুরে হেঁটে পাড়ি দেয়া। শুকনা মৌসুমে পদ্মার ঠিক মাঝখানে পূর্ব-পশ্চিম লম্বা চর জেগে ওঠায় এক খেয়ার স্থলে দুই খেয়ার ব্যবস্থা করা হত। এপারের খেয়া নৌকা থেকে নেমে পায়ে হেঁটে চর পাড়ি দিয়ে অন্য পারের খেয়া নৌকায় উঠতে হতো। অন্যান্য যাত্রীদের সাথে দ্রুত হেঁটে সময় মত চর পাড়ি দিতে না পারলে উপস্থিত যাত্রীদের নিয়েই ওপারের খেয়া নৌকা ছেড়ে দিতো। তখন নদীবেষ্টিত জনমানবহীন চরে আটকে পড়ার ভয় থাকত।

একবার সেই জনমানবহীন বিশাল চরে আমি সত্য সত্যই আটকা পড়েছিলাম বড় অসহায়ভাবে। সেবার বাড়ী থেকে ফিরবার ক'দিন আগে আমার বড় ভাই অসুখে পড়েন। ফলে একা আমাকেই তালিমনগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে হয়েছিল। একা একা কিছুতেই বিদেশ বিভুঁইয়ে যেতে মন সরছিল না। ফলে যাত্রা

www.pathagar.com

করতে সেদিন বেশ বিলম্ব হয়ে গেল। মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পথ চলতে চলতে এক সময় খেয়াঘাটে পৌঁছে দেখি, খেয়া নৌকা ঘাট ছেড়ে চলে গেছে। কথায় বলে, সারা পথ দৌড়াদৌড়ি খেয়াঘাটে গড়াগড়ি। আমার হলো সেই দশা। যাই হোক, বেশ কিছুক্ষণ পর খেয়া নৌকা ফিরল। কিন্তু সেই পড়ন্ত বিকালে আর কোন যাত্রী এলো না। অগত্যা একা আমাকে নিয়েই খেয়া ছেড়ে দিল। নদীর মাঝখানের চরে যখন নৌকা থেকে নামলাম ওপার থেকে আগত যাত্রীরা বলল, 'মণি, পা চালিয়ে হেঁটে যাও, নইলে খেয়া পাবে না'।

আমি যথাসাধ্য দ্রুত হেঁটে বালির চর পাড়ি দিয়েও চরের অপর প্রান্তে যখন পৌঁছলাম, তখন খেয়া নৌকা ছেড়ে ঐ নদীর প্রায় মাঝামাঝি চলে গেছে। মাঝ নদী থেকে নৌকা ফেরৎ আসার সম্ভাবনা কম। তাই আমিও নৌকা ফিরাতে চেষ্টা করলাম না। নৌকা ক্রমে দূর থেকে আরও দূরে চলে গেল এবং এক সময় ওপারের খেয়াঘাটে যেয়ে পৌঁছল। নৌকা থেকে নেমে যাত্রীরা নদীর তীর দিয়ে যার যার গন্তব্যে রওনা হয়ে গেল, তা এপার থেকে বেশ বুঝা গেল।

আমি খেয়া নৌকা ফিরবার আশায় নির্জন চরে অপেক্ষা করতে লাগলাম। বারবার নদীর দিকে তাকাই, ভাবি, এই বুঝি ওপারের ঘাট থেকে নৌকা ছেড়ে দেবে। কিন্তু কোন নৌকাই ওপারের খেয়াঘাট থেকে ছাড়ল না। এদিকে বেলা ক্রমেই শেষ হতে চলেছে। এবার সত্যিই ভয় হতে লাগল, শেষ পর্যন্ত এই জনমানবহীন চরে কি আটকে পড়ব? মনে মনে কান্না পেল। মনের কান্না মনে রেখে খেয়া নৌকার মাঝির উদ্দেশ্যে আহবান জানাতে লাগলাম এপারে নৌকা নিয়ে আসতে। আমার কান্নাজড়িত সে আহবান নদীর ওপারে মাঝির কানে পৌঁছল বলে মনে হল না। কারণ এরপরও নৌকা ছাড়ার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। এবার আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম, আজ এ নির্জন চর থেকে আমার পরিত্রাণের আর কোন আশাই নেই। দূর থেকে শেয়ালের ডাক ভেসে এল। শুনেছি নির্জন চরে নানারকমের হিংস্র পশু বাস করে। সূর্য পশ্চিম দিকে আগেই ঢলে পড়েছিল। মনে হল এবার তার শেষ অস্তাচল গমন শুরু হয়ে গেল। ভয়ে-আতঙ্কে কখন যে আমার গলা ফেটে কান্না বেরিয়েছে নিজেও টের পাইনি। একবার কাঁদি, আবার কান্না মেশানো কণ্ঠে যথাসাধ্য স্বর উঁচু গ্রামে তুলে ওপারের মাঝিকে ডাকি।

অবশেষে সত্যিই আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হল। দূর মাঝ নদীতে প্রথমে অস্পষ্টভাবে, পরে স্পষ্টভাবে একখানা নৌকা দেখা গেল। নৌকা চরের দিকে এগিয়ে আসছে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। তাড়াতাড়ি জামার খুট দিয়ে চোখের পানি মুছে ফেলে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করলাম। নৌকায় দু'জন মাঝি ছাড়া কোন যাত্রী ছিল না। স্পষ্টই বোঝা গেল, আমাকে অসহায় অবস্থা থেকে

www.pathagar.com

উদ্ধার করার জন্যই ছিল তাদের আগমন। নৌকা তীরে ভিড়ার পর মাঝিদের প্রথম প্রশ্নই ছিল, চরে কেউ একটু আগে কেঁদেছিল কি না? কি উত্তর দেব? আমি অস্পষ্টভাবে কিছু না জানার ভান করলাম। ওরা যা বুঝার, বুঝে নিল।

তালিমনগর মাদ্রাসায় পড়ার তিন বছরে কতবার যে পদ্মা পারাপার করেছি তার শুমার করা সম্ভব ছিল না। আমার গ্রামের বাড়ী, জায়গীর বাড়ী ও মাদ্রাসার মত পদ্মাও তখন যেন হয়ে উঠেছিল আমার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ। সব সময় যে এক ঘাট দিয়ে যে নদী পাড়ি দিয়েছি তা নয়। বেলগাছি, হাটবাড়িয়া এবং মাদারতলা ঘাট তিনটি ছিল এক থেকে দেড় মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। প্রতি বছর ঘাটের ডাক হত এবং প্রায় প্রতিবছরই ঘাটের নতুন ইজারাদার দেখা যেত। বর্ষাকালে ছৈ ওয়ালা নৌকায় নদী পাড়ি দিতে হলেও শুকনা মৌসুমে খোলা নৌকায়ই নদী পাড়ি দিতাম। তবে নৌকা থাকত বেশ বড় এবং তাতে সাধারণত দু'টি দাঁড় টানার দুই দাঁড়ী ছাড়াও পেছনের গলুইয়ে হাল ধরতে থাকত একজন মাঝি। শুকনা মৌসুমে বিশাল শান্ত পদ্মার বুক চিরে খেয়া নৌকায় যখন নদী পাড়ি দিতাম, এক অনির্বাচনীয় আনন্দে বুক ভরে উঠতো।

আমরা যখন পদ্মা পারাপার শুরু করি তখন, যতদূর মনে পড়ে, ভাড়া ছিল জন প্রতি দু'আনা। পরে ভাড়া বাড়িয়ে করা হয় দশ পয়সা। বলা বাহুল্য, তখন চৌষট্টি পয়সায় অর্থাৎ ষোল আনায় এক টাকা এবং চার পয়সায় এক আনার হিসাব করা হত। ভাড়া দু'পয়সা বৃদ্ধিকেই তখন রীতিমত জুলুম বলে মনে হয়েছিল।

মুরুব্বিদের মুখে শুনেছি, এর আগে নদী পারাপারের জন্য ভাড়া প্রথা ছিল না। ঘাটের পাটনিকে বছরে ধান ও পাটের মৌসুমে নির্দিষ্ট পরিমাণ ধান ও পাট দেয়া হত। এদিয়েই সারা বছর ঐসব বাড়ীর লোকেরা বিনা ভাড়ায় খেয়া পারাপার করতে পারত। শুধু ঐসব বাড়ীর লোকেরা নয়, তাদের আত্মীয়স্বজন বা অন্যান্য পরিচিত লোকেরাও ঐসব বাড়ীর নাম বলে বিনা পয়সায় খেয়া পার হতে পারত। পদ্মা নদীতে ভাড়া প্রথা চালু হবার পরও পাবনা জেলার বাদাই ও আত্রাই এবং ফরিদপুর (বর্তমান রাজবাড়ী) জেলার চন্দনা প্রভৃতি ছোট নদীতে বহু দিন পর্যন্ত ঐভাবে বিনা পয়সায় খেয়া পারাপার চালু থাকতে দেখেছি।

শুধু নদী পারাপারের ব্যাপারে নয়, অন্যান্য বহুতর ক্ষেত্রেও আগে এই ব্যবস্থা চালু ছিল বলে শুনেছি। তবে ক্ষৌরকাররা (নাপিত) যে এভাবে সারা বছর ক্ষৌরকর্ম করে বছর অন্তে ধান ও পাটের মৌসুমে ধান ও পাট নিয়ে যেত তা আমি নিজে দেখেছি– যেমনি আমাদের তদানীন্তন ফরিদপুর জেলায়, তেমনি পাবনা জেলায়।

প্রায় দেখতে দেখতেই এক সময় তালিমনগর মাদ্রাসা থেকে বিদায়ের পালা

www.pathagar.com

ঘনিয়ে এল। ১৯৪০ সালের নভেম্বরে জুনিয়র মাদ্রাসার ফাইন্যাল পরীক্ষা। ফাইন্যাল পরীক্ষার সেন্টার সিরাজগঞ্জে। সিরাজগঞ্জে আমাদের হেড মৌলভী ইয়াকুব আলী সাহেবের বাড়ী। তিনিই সব কিছুর ব্যবস্থা করেছেন। তালিমনগর মাদ্রাসার অদূরে ত্রিমোহিনী থেকে নৌকা যোগে নগরবাড়ী এবং সেখান থেকে স্টীমারে সিরাজগঞ্জ যেতে হবে।

এতদিন বাড়ী আর তালিমনগরের মধ্যে যাতায়াতে পদ্মা নদী পাড়ি দিতে হত। এবার যেতে হবে যমুনা নদী দিয়ে। নৌকা থেকে নেমে স্টীমার ঘাট পর্যন্ত কিছুটা পথ ফূর্তির চোটে কয়েক বন্ধু পায়ে হেঁটেই অতিক্রম করলাম। আমাদের মধ্যে দু'জন ছাড়া প্রায় সবার বাড়ীই ছিল পাবনা জেলায়। আমি ফরিদপুরের, আর আবদুল লতিফের বাড়ী ছিল ঢাকা (বর্তমান মানিকগঞ্জ জেলার বাঘুটিয়া গ্রামে)। আমরা হাঁটছিলাম যমুনার পশ্চিম পার দিয়ে। নদীর পূর্ব পারেই ঢাকা জেলা। আবদুল লতিফ দুষ্টুমিতে ওস্তাদ। সে মাঝে মাঝেই হাতের ছাতা দিয়ে গুঁতিয়ে পারের মাটির চাকা ঢলকে পানির মধ্যে ফেলে দিচ্ছিল আর বলছিল, পাবনা জেলার মাটি ঢাকায় গিয়ে উঠুক। এভাবেই ফুর্তি আর আনন্দের মাঝে এক সময় আমরা স্টীমার ঘাটে গিয়ে পৌঁছলাম।

স্টীমার পথে সিরাজগঞ্জ

বড় স্টীমারে সেই আমার প্রথম নদী ভ্রমণ। এতদিন শুধু নদীর তীর থেকে মাঝ নদী দিয়ে বড় বড় স্টীমার যাতায়াত করতে দেখেছি। এতদিনে নদীতে ভাসমান দোতলা বাড়ীর মত বৃহদাকায় স্টীমারে নদীপথ অতিক্রম করছি। তাও আবার এক গাদা বন্ধু-বান্ধবের সাথে। সুতরাং একই সাথে এ স্টীমার ভ্রমণ হয়ে দাঁড়াল নৌবিহার আর বনভোজনের মত। আমরা কয়েক বন্ধু ঠিক করলাম স্টীমার যত ঘাটে থামবে আমরা সব ঘাটে নেমে খানিকটা বেড়িয়ে নোঙ্গর তোলার আগেই আবার স্টীমারে ফিরে আসব।

নগরবাড়ীর পর প্রথম যে ঘাটে স্টীমার থামল সেটা ছিল ঢাকা জেলার বিনানই। এই বিনানই ছিল সেকালে রসগোল্লার জন্য বিখ্যাত। বিনানই থেকে রসগোল্লা খেলাম। এভাবে বিভিন্ন ঘাটে নামতে উঠতে শেষে সিরাজগঞ্জ পৌঁছার আগে সর্বশেষ যে ঘাটে স্টীমার থেমেছিল সেটা ছিল ময়মনসিংহ জেলার (তখনও টাঙ্গাইল আলাদা জেলা হয়নি) পোড়াবাড়ী। পোড়াবাড়ী চমচমের জন্য বিখ্যাত। পোড়াবাড়ী থেকে চমচম কেনা হলো। সবাই সে চমচম খেয়ে প্রচুর তৃপ্তি পেলেও আমার সে ভাগ্য হল না। এর কিছু আগে বন্ধুদের পীড়াপীড়িতে অনভ্যস্ত মুখে পান খেয়ে চুন লাগায় আমি পোড়াবাড়ীর এমন নাম ডাকের চমচমের স্বাদ থেকে বঞ্চিতই থেকে গেলাম।

www.pathagar.com

নগরবাড়ী থেকে আমরা শুধু তালিমনগর মাদ্রাসার পরীক্ষার্থীরা স্টীমারে উঠলেও পাবনা জেলার অন্যান্য ঘাট থেকে বেশ কয়েকটি মাদ্রাসার ছাত্ররাও উঠল সিরাজগঞ্জে জুনিয়র মাদ্রাসার ফাইন্যাল পরীক্ষায় অংশ নিতে। স্টীমারের দোতলার ডেকে বিভিন্ন মাদ্রাসার ছাত্ররা আমরা বিছানা পেতেছিলাম। আমরা ডেকেই পরস্পর পরিচিত হলাম। এক পর্যায়ে এখানেই বসলো গানের আসর। গান বলতে প্রধানত ইসলামী ও পল্লীগীতি। উল্লাপাড়া মাদ্রাসার একটি ছেলের গাওয়া একখানা গান আজও যেন আমার কানে বাজছে। গানের প্রথম কলি ছিল ঃ "বাদশা তুমি দীন ও দুনিয়ার, হে পরোয়ারদিগার।"

পরীক্ষা উপলক্ষে প্রায় এক সপ্তাহ আমরা সিরাজগঞ্জ ছিলাম। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর সিরাজগঞ্জ মাদ্রাসা হোস্টেল মিলনায়তনে একটি বিচিত্রানুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছিল। সেখানেও উল্লাপাড়া মাদ্রাসার সেই ছেলেটি গান গেয়ে সবার অকুণ্ঠ প্রশংসা কুড়িয়েছিল।

জীবনে প্রথম সিনেমা দেখা

সিরাজগঞ্জ ছিল আমার দেখা দ্বিতীয় শহর। আমার দেখা প্রথম শহর ছিল রাজবাড়ী। তবে রাজবাড়ীর তুলনায় সিরাজগঞ্জ ছিল অনেক বড়, অনেক উন্নত। বিশেষ করে ইসলামী শিক্ষার ব্যাপারে সিরাজগঞ্জ আসলেই অনেক বেশী অগ্রসর ছিল। তাছাড়া রাজবাড়ী ছিল মূলত, রেলকেন্দ্রিক শহর আর সিরাজগঞ্জে রেললাইন থাকলেও নদী বন্দর হিসেবেই এর প্রধান পরিচিতি ছিল। অন্তত প্রথম দর্শনে আমার তেমনটাই মনে হয়েছিল। আমার জীবনে অবশ্য সিরাজগঞ্জ আরেক কারণে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে। জীবনে আমি প্রথম সিনেমা দেখি এই সিরাজগঞ্জ শহরে। ১৯৪০ সালে দেখা সে প্রথম ছবি ছিল ঃ 'শাপমুক্তি'।

সিরাজগঞ্জ থেকে ফেরার পরই এল তালিমনগর মাদ্রাসা থেকে আমাদের বিদায় নেবার পালা। সেই কিশোর বয়সে তিন তিনটি বছর নানা সুখে-দুঃখে যাদের সাথে একত্রে কেটেছে, তাদের চিরতরে ছেড়ে যাবার কথা মনে হতেই মনটা হু হু করে কেঁদে উঠতে চাইল। মনে পড়ে, শেষ বিদায়ের প্রাক্কালে সিক্সের ক্লাশ রুমে সবাই জড়ো হয়েছিলাম। একেক জনের সাথে কোলাকুলি করে শেষ বিদায় নিচ্ছিলাম এবং অনেকেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ছিলাম।

মাদ্রাসার বন্ধু-বান্ধবদের সবার নাম এতদিন পর এখন মনে নেই। যাদের নাম এখনও বেশ মনে পড়ে তারা হচ্ছে ঃ আবদুল লতিফ, আবুল হোসেন, মশাররফ, খোরশেদ, আজহার, কোরবান, মোকসেদ, সোবহান, হাবীবুর রহমান ইত্যাদি।

প্রথমোক্ত আবদুল লতিফের কথা মনে হলে আজও আমার মন কেঁদে উঠতে

www.pathagar.com

চায়। সে ছিল আমাদের ক্লাসের সবচাইতে মেধাবী ছাত্র। তিন বছর এক সাথে পড়েছি। সে আগাগোড়া ফার্স্ট হয়েছে, আমি হয়েছি সেকেন্ড। শত চেষ্টা করেও আমি কখনও ফার্স্ট হতে পারিনি। সেই আমি পরবর্তীকালে হাই মাদ্রাসা পরীক্ষায় অনেক ভাল রেজাল্ট করে কত সুনাম কুড়ালাম, আর আবদুল লতিফ জুনিয়ার ফাইনালে ফার্স্ট ডিভিশন পেলেও হাই মাদ্রাসা পাস করেছিল সেকেন্ড ডিভিশনে। আবুল হোসেনও জুনিয়ার ফাইনালে ফার্স্ট ডিভিশন পায়। তবে হাই মাদ্রাসা ফাইনালে আবদুল লতিফের মত একই পাবনা হাই মাদ্রাসা থেকে সে সেকেন্ড ডিভিশন পায়। কিন্তু তারও ইন্টারমিডিয়েটের পর আর পড়া হয়ে ওঠেনি। আবুল হোসেন পরবর্তীকালে কৃষি ব্যাংকে চাকরি নিয়ে যথেষ্ট সুনামের সাথে সিনিয়র একাউন্টস অফিসার হিসাবে রিটায়ার করে। ঢাকায় থাকার সুবাদে তালিমনগর মাদ্রাসার বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র এই আবুল হোসেনের সঙ্গেই অদ্যাবধি আমার সম্পর্ক রয়েছে।

তালিমনগর মাদ্রাসার প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে একজন যথেষ্ট সিনিয়র হওয়া সত্ত্বেও আমাদের খুব আপন হয়ে উঠেছিলেন- তিনি জনাব আবদুল ওয়াহাব। সম্পর্কে আবুল হোসেনের মামা ছিলেন বলে আমরাও তাঁকে মামা বলেই ডাকতাম। তিনি যেমন ছিলেন অমায়িক, তেমনি ছিলেন একজন দরদী সমাজসেবক ও সার্থক সংগঠক। তিনি উচ্চশিক্ষা লাভ করেন হুগলীর মহসীন কলেজে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ঢাকায় যে পাবনা সমিতি এবং রাজশাহী বিভাগীয় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় তার পেছনে তাঁর ছিল ঐতিহাসিক ভূমিকা।

আগেই বলেছি তালিমনগর মাদ্রাসায় ছাত্র থাকাকালে শাহ সাহেব এবং মওলানা রইস উদ্দিন সাহেবের যে সান্নিধ্য আমি লাভ করেছিলাম তা ছিল আমার জীবনের একটি বড় প্রাপ্তি। শাহ সাহেব আমার কাছে ছিলেন আদর্শের মূর্ত প্রতীক। আর মওলানা সাহেবের কাছ থেকে আমি পাই উচ্চশিক্ষা, সাহিত্য চর্চা ও একনিষ্ঠ সমাজসেবার প্রেরণা। বিশেষ করে মওলানা সাহেবের কথা স্মরণ হলে এখনও আমার মন ব্যথিত হয়ে ওঠে। যিনি তাঁর সমস্ত দেহ-মন-মস্তিষ্ক উজাড় করে দিয়ে একটি বিশাল এলাকার মানুষকে জাগিয়ে তুললেন, তিনি পরিনামে কী পেলেন? বলতে গেলে, কিছুই না। এমনিতে তিনি জীবনের বিরাট অংশ কাটান ব্যাচেলার হিসাবে, ফলে ব্যক্তি জীবনেও তাঁর বিরাজ করছিল মহাশূন্যতা, তদুপরি এমন এক বিরাট প্রতিভার অধিকারী হয়েও জীবনের প্রায় সারাটাই তিনি পচে মরলেন গ্রামে। অথচ তার তুলনায় কত কম প্রতিভার লেখক, বাগ্মী ও সমাজসেবক অনেকে জাতীয় অঙ্গনে প্রচুর যশ-খ্যাতির অধিকারী হয়েছেন আমাদের দেশে।

মওলানা রইস উদ্দিন অবশ্য ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের অন্যতম

www.pathagar.com

শরীক দল নেজামে ইসলাম পার্টির টিকেটে এমপিএ নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু স্বাপ্নিক মওলানা রইস উদ্দিনের মেধা ও স্বপ্নের কদরদানি করবার যোগ্যতাই বা সে সময় ঐ দলের ক'জনের ছিল?

মওলানা রইস উদ্দীন প্রৌঢ়ত্বে পৌছে বিবাহও করেছিলেন এক প্রৌঢ়া ভদ্র মহিলাকে। কিন্তু বিবাহের অল্প দিন পরই তার স্ত্রী প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। তিনি জীবনে আর কখনই ঐ রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করেননি। এক সময় মওলানা সাহেব নিজেও বার্ধক্যজনিত ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় প্রহর গুণতে শুরু করেন।

তালিমনগর থেকে চলে আসার পরও বহুদিন ধরে বছরে অন্তত একবার ঐ এলাকায় গিয়েছি। মওলানা সাহেবের স্ত্রী যখন অসুস্থ এবং তিনি নিজেও অসুস্থতার পথে, তখন তাঁর সাথে আমার শেষবারের মত দেখা হয়। জীবন সায়াহ্নে তাঁর চোখে সেদিন স্বপ্নের ঝলকানি ছিল না, ছিল স্বপ্ন ভঙ্গের ধূসর বেদনা। তাঁর বাড়ীর পাশেই তিনি একটি মসজিদ ঘর নির্মাণ করেছিলেন। মসজিদ পাকা করার জন্য ইট তৈরী করেছিলেন নিজে ফরমাইস দিয়ে। কতকগুলো ইটের উপর বাংলায় স্পষ্ট হরফে লিখিয়েছিলেন 'র-ই-স'। আমার কাছে ব্যাখ্যা করলেন, মুসল্লীরা যে পথ দিয়ে হেঁটে মসজিদে যাবেন, সেই পথে বিছানো হবে এই ইটগুলো। মুসল্লীদের পায়ের ধূলিতে তাঁর জীবনের সব গ্লানি কেটে যাবে এটাই তাঁর শেষ আশা। কবির সংবেদনশীল অন্তর নিয়ে জন্মেছিলেন স্বাপ্নিক মওলানা রইস উদ্দীন। মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও তিনি নতুন স্বপ্ন দেখতে ভুললেন না।

তালিমনগর পর্ব তো শেষ হলো, এবার কোথায় কোন তল্লাটে নতুন করে আস্তানা গাড়তে হবে, এই জল্পনা-কল্পনায়ই কেটে গেল পরীক্ষাপরবর্তী দিনগুলো। রেজাল্ট বেরুলে জানলাম– আবদুল লতিফ, আবুল হোসেন ও আমি ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছি। আমার মিয়া ভাইসহ বাকীরা সেকেন্ড ডিভিশন পেয়েছে। আনন্দের মধ্যেই আবার বিষাদের সুর বেজে উঠলো। ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করেছি, অতএব ভাল কোন হাই মাদ্রাসায় পড়তে হবে। কিন্তু কোন্ সে মাদ্রাসা? হুগলী মাদ্রাসার কথা কেউ কেউ বললেন। তালিমনগর মাদ্রাসার সাবেক ছাত্রদের দু'একজন হুগলীতে পড়াশোনা করছেন। কিন্তু অতদূরে এই অল্প বয়সে আমার যাওয়া গার্জিয়ানরা পছন্দ করলেন না। আবদুল লতিফ ও আবুল হোসেন পাবনা কাদেরিয়া হাই মাদ্রাসায় ভর্তি হল। কিন্তু একে তো পদ্মা নদীর ওপার, তদুপরি তালিমনগর থেকেও অতদূরে পাবনা যাওয়া নয়– শেষ পর্যন্ত ফরিদপুরের হাই মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়ার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হল।

প্রায় দেড় মাস গ্রামের বাড়ীতে আপনজনদের মধ্যে কাটানোর পর আবার

www.pathagar.com

বাইরে যাবার পালা। মনটা স্বাভাবিকভাবেই বেদনার্ত হয়ে উঠলো। বেদনার ভাবটা অধিক মনে হলো এ কারণে যে, এবার মিয়া ভাইয়ের সঙ্গ আমি পাব না। আব্বা, না, মিয়া ভাইয়ের, কার ইচ্ছায় জানি না, মিয়া ভাইয়ের পড়া সাব্যস্ত হলো ফুরফুরা শরীফে, পীর সাহেবের নিজের মাদ্রাসায়। ঐ ফুরফুরায়ই একদিন মিয়া ভাইয়ের শিক্ষা জীবনের অকাল সমাপ্তি ঘটে। কিন্তু সে ভিন্ন প্রসঙ্গ।

হাই মাদ্রাসায় ভর্তির উদ্দেশে ১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাসের কোন তারিখে ফরিদপুর গিয়েছিলাম, তার সঠিক দিনক্ষণ আজ মনে নেই। তবে সেদিনটি ছিল আমার জীবনে অশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আপনজনদের ছেড়ে যাবার বেদনার মধ্যেও শহরে পড়তে যাবার একটা চাপা আনন্দ আমার মধ্যে কাজ করছিল।

ফরিদপুরে

আমাদের বেলগাছি রেল স্টেশন থেকে ফরিদপুরের দূরত্ব সাতাশ মাইল। বেলগাছি থেকে রাজবাড়ী সাত মাইল, রাজবাড়ী থেকে ফরিদপুর বিশ মাইল। তখন রাজবাড়ী-ফরিদপুর সড়ক পথ চালু হয়নি। বেলগাছি থেকে ফরিদপুর যাবার প্রধান অবলম্বনই ছিল রেলপথ। ফরিদপুর শহর গোয়ালন্দ-শিয়ালদহ (কলিকাতা) এই প্রধান রেলপথের যথেষ্ট দূরে ছিল বলে রাজবাড়ী-ফরিদপুর ব্রাঞ্চ লাইন দিয়ে মূল রেলপথের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছিল। গোয়ালন্দ-শিয়ালদহ মূল রেল লাইনে যেমন ঘন ঘন গাড়ী পাওয়া যেত ফরিদপুর লাইনে তা সম্ভব ছিল না। কালুখালী জংশন থেকে ভাটিয়াপাড়া পর্যন্ত ব্রাঞ্চ লাইনে যে ট্রেন যাতায়াত করত সাধারণত সেই ট্রেনই কালুখালী-বেলগাছি-সূর্যনগর-রাজবাড়ী হয়ে ফরিদপুর পর্যন্ত যাতায়াত করত এবং সেই গাড়ীর সংখ্যাও সারা দিন-রাতে চারটির বেশী ছিল না। গোয়ালন্দ-শিয়ালদহ মূল রেলপথে যাতায়াতকারী প্যাসেঞ্জাররা সাধারণত রাজবাড়ীতে গাড়ী বদল করে ফরিদপুরের গাড়ীতে উঠত।

ফরিদপুর রেল স্টেশন থেকে হাই মাদ্রাসার দূরত্ব আধা মাইলের বেশী নয়। ভর্তি তো হবো, কিন্তু থাকবো কোথায়? সুতরাং, ভর্তিরও আগে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা দরকার। সে ব্যাপারে সুরাহার জন্যই আব্বা আমাকে নিয়ে গেলেন মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতার বাড়ী। প্রতিষ্ঠাতার ডাক নাম মোহন মিয়া– ভাল নাম ইউসুফ আলী চৌধুরী। ফরিদপুরের মুসলিম জমিদার ইউসুফ আলী চৌধুরীর নাম আগেও শুনেছি। আব্বার মুখে বহুবার ফাতেহা দোয়াজদহম উপলক্ষে মোহন মিয়া সাহেবের আয়োজিত ধর্মীয় মাহফিলে তাঁর যোগ দেয়ার কথা শুনেছি। শুনেছি, ঐসব মাহফিলে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, খাজা নাজিমুদ্দিন, মৌলভী তমিজউদ্দিন খাঁ প্রমুখ রাজনীতিক ছাড়াও ফুরফুরা শরীফের পীর সাহেবের অন্যতম খলিফা মওলানা রুহুল আমীনের বক্তৃতা দেয়ার কথা।

www.pathagar.com

মাদ্রাসার কাছেই জমিদার ইউসুফ আলী চৌধুরীর বাড়ী। বিশাল দোতলা অট্টালিকা। নাম 'ময়েজ মঞ্জিল'। জমিদারী সেরেস্তায় গিয়ে শুনলাম, অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি নীচে নামবেন। সুতরাং এবার আমাদের প্রতীক্ষার পালা। কিন্তু না, বেশীক্ষণ প্রতীক্ষা করতে হলো না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নেমে এলেন সৌম্য সুদর্শন জমিদার ইউসুফ আলী চৌধুরী ওরফে মোহন মিয়া। পেছনে অনেক লোক। তিনি এগিয়ে চলেছেন আর দু'দিকের অপেক্ষমাণ লোকজনদের সাথে কথা বলছেন। সেই সাথে কারো সাথে কোলাকুলি, কারো সাথে সংক্ষেপে হাত মিলাচ্ছেন বা সালাম বিনিময় করছেন, কাউকে দূর থেকেই হাসি মুখের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। এক সময় আব্বার সাথেও তার কুশল বিনিময় হল। আব্বা আমার কথা বললেন তাকে। তিনি তৎক্ষণাৎ পাশের একটি লোককে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলে দিলেন।

এরপর আব্বা আমাকে নিয়ে গেলেন সামান্য দূরের আরেকটি বাড়ীতে। ফরিদপুর শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত কমলাপুর মহল্লা। কিন্তু কমলাপুরকে শহরের মহল্লা না বলে আমার কাছে গাছগাছালি ঘেরা একটি গ্রাম বলাই অধিকতর সঙ্গত মনে হল। এই কমলাপুরেই জায়গীর থাকতেন আমাদের পাশের গ্রাম বাবুপুরের আবদুল আজিজ ভাই। আদুল আজিজ ভাই ছিলেন দাদপুর মাদ্রাসায় আমার ধর্মীয় শিক্ষক মৌলবী তোরাবউদ্দিন এবং আমার এককালের শিক্ষক ডাঃ মুহম্মদ ইয়াসিন সাহেবের ভাতিজা। তোরাবউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে আমার আব্বার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সেই সুবাদে তিনি আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। আবদুল আজিজ ছিলেন আমাদের এলাকার সাধারণ মুসলিম পরিবার থেকে উঠে আসা প্রথম কলেজ ছাত্র। সেই হিসেবে আমরা তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতাম। আমার শিক্ষা জীবনে আমি তাঁর কাছ থেকে যে উৎসাহ পেয়েছি, তা আমার এগিয়ে যাবার পথে অসামান্য প্রেরণা যুগিয়েছে।

তখনকার দিনে দূর গ্রাম থেকে শহরে পড়তে আসা ছাত্রদের পড়াশোনা চালাবার জন্য প্রধানতম অবলম্বনই ছিল জায়গীর। ধনী ঘরের ছাত্রদের জন্য অবশ্য শহরের বিভিন্ন হাই স্কুল ও হাই মাদ্রাসায় হোস্টেলের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু আমার তো হোস্টেলে থাকার প্রশ্নই ওঠে না। আব্বা আবদুল আজিজ ভাইয়ের কাছেও আমার একটা জায়গীরের ব্যবস্থা করে দিতে অনুরোধ জানালেন। মোহন মিয়া সাহেব, আবদুল আজিজ ভাই, না মাদ্রাসার শিক্ষকদের চেষ্টায় জানি না, অচিরেই আমার জন্য একটা জায়গীরের ব্যবস্থা হয়ে গেল।

জায়গীর বাড়ী অবশ্য একটু দূরেই বলতে হবে। ফরিদপুর শহরের শেষপ্রান্তে অবস্থিত অম্বিকাপুর রেল স্টেশন থেকেও প্রায় দুই মাইল দূরে চর এলাকায়

www.pathagar.com

চরকৃষ্ণপুর গ্রামে এক দরিদ্র কৃষকের বাড়ী আমার জায়গীর হল। দরিদ্র হলেও তালিমনগর মাদ্রাসায় অধ্যয়নকালে আমার প্রথম জায়গীরের মত অত গরীব নয়। তাছাড়া ইতোমধ্যে তিন বছর বাড়ীর বাইরে কাটিয়ে সবরকম খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কিছুটা অভ্যস্ত হয়েও উঠেছিলাম। তাই থাকা-খাওয়ার ব্যাপারে নয়, অসুবিধা অনুভব করতাম মাদ্রাসায় যাওয়া-আসার ব্যাপারে। মাদ্রাসা থেকে জায়গীর বাড়ী সাকুল্যে প্রায় চার মাইল দূরে অবস্থিত। আসা ও যাওয়া বাবদ প্রতিদিন চার চার আট মাইল হাঁটা আমার জন্য বেশ কষ্টদায়কই মনে হত। বলাবাহুল্য ক্লাসে আমিই ছিলাম সর্বকনিষ্ঠ ছাত্র।

অবশ্য, খুব বেশীদিন আমাকে এত দূরের এই জায়গীর বাড়ী থাকতে হয়নি। কয়েক মাসের মধ্যে আমার ভাল আরেকটি জায়গীর জুটে গেল। সে জায়গীরও চর এলাকায়। তবে অপেক্ষাকৃত নিকটে, মাদ্রাসা থেকে প্রায় আড়াই মাইল দূরে। জায়গীর হলো চর মাধবদিয়া গ্রামের মৌলভী বাড়ী। মৌলভী বাড়ী মানে মৌলভী ফজলুর রহমান ও মৌলভী ফজলুল করিম ভ্রাতৃদ্বয়ের বাড়ী। পড়াতে হতো মৌলভী ফজলুল করিমের ছেলে ইউসুফকে। ইউসুফ বয়সে ছিল আমার চাইতে সামান্য ছোট।

চর মাধবদিয়ার মৌলভী ভ্রাতৃদ্বয় ছিলেন প্রচুর ভূ-সম্পত্তির অধিকারী। চর মাধবদিয়া গ্রামে দু'টি বাড়ীই সবচাইতে নাম-ডাকের ছিল। অপর বাড়ীটি ছিল হাফেজ ইব্রাহীম সাহেবের। তাঁর বাড়ীতে একটি মসজিদ তো ছিলই, একটি মাদ্রাসাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। হাফেজ ইব্রাহীম সাহেবের প্রতিষ্ঠিত আলিয়া নেসারের মাদ্রাসাটি অদ্যাবধি যথেষ্ট সুনামের সাথে চালু রয়েছে। মসজিদ ও মাদ্রাসা পরিচালনা ছাড়াও হাফেজ ইব্রাহীম নানাবিধ সমাজহিতকর কাজের সাথে জড়িত ছিলেন।

সম্ভবত চর মাধবদিয়া থাকতেই আমাদের হাফ ইয়ার্লি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হল। আমি একটি ছাড়া সব বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করলাম। আমাদের ক্লাসে জুনিয়র ফাইনালে ফার্স্ট ডিভিশন পাওয়া আরও অনেক ছাত্র ছিল। তদুপরি ছিল একজন স্কলারশীপ হোল্ডার, যে জুনিয়র ফাইনাল পরীক্ষায় স্ট্যান্ড করে স্কলারশীপ লাভ করেছিল। অন্যদের তো দূরের কথা, একজন স্কলারকে পর্যন্ত ডিফিট দিয়ে আমি ফার্স্ট হয়েছি, এ ঘটনায় সমগ্র মাদ্রাসার মধ্যে রীতিমতো একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে গেলো। আমি গ্রাম থেকে আগত লাজুক ছেলে বিধায় আমার ক্লাস পার্টিসিপেশন কারো চোখে পড়ার মত ছিল না। সেই আমিই একটি ছাড়া সব বিষয়ে ফার্স্ট হয়েছি, এ ঘটনা রীতিমত বিস্ময়কর লাগলো অনেকের কাছেই। অনেকেই একে একটা আকস্মিক ঘটনা বা দুর্ঘটনা বলে ধরে নিল।

www.pathagar.com

পরীক্ষার রেজাল্ট জানাতে কমলাপুর গিয়েছিলাম আবদুল আজিজ ভাইয়ের জায়গীর বাড়ী। শুনে তিনি দারুণ খুশী হলেন। তার ঘরে উপস্থিত এক ভদ্রলোককে আনন্দের আতিশয্যে পরীক্ষায় আমার কৃতিত্বের কথাটা জানিয়ে দিলেন ইংরেজীতে ঃ 'দিস বয় হ্যাজ স্টুড ফার্স্ট বিটিং ডাউন এ স্কলার'। আমাকে উৎসাহ দিয়ে বললেন, তোমাকে যে কোন মূল্যে এ পজিশন ধরে রাখতে হবে। যে বিষয়ে সেকেন্ড হয়েছ ওটাতেও ফার্স্ট হতে হবে পরের পরীক্ষায়। আবদুল আজিজ ভাইয়ের কাছে আমি সম্ভবত নিজের অজান্তেই চিরঋণী হয়ে গেলাম সেদিনের সেই ছোট্ট ঘটনার মধ্য দিয়ে। তাঁর উৎসাহপূর্ণ দু'টি বাক্য আমার মধ্যে সৃষ্টি করলো এমন এক দৃঢ় সংকল্প ও আত্মবিশ্বাস, যা পাল্টে দিতে চাইলো জীবনের প্রতি আমার গোটা দৃষ্টিভঙ্গিই। মনে হলো, আমি চেষ্টা করলেই পারবো আবদুল আজিজ ভাইয়ের আশা পূরণ করতে।

সত্য বলতে কি, পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করবার জন্য এমন উৎসাহ অতীতে কখনও পাইনি। নিজ গ্রাম দাদপুরের মকতবেও আমি ক্লাস ওয়ান থেকে ফার্স্ট হয়েছি। তারপরেও কবিরউদ্দিন মাস্টারের হাতে নিয়মিত পিটুনি খেতাম– রেজাল্ট আরও ভাল হল না কেন, সেই অপরাধে। শুধুই কি মাস্টারের পিটুনি? ওয়ান-টুতে পড়ার সময় আমার উপরের ক্লাসের ছাত্ররা প্রায়ই আমাকে ভয় দেখাতো ঃ তারা নাকি আমার মাথা ফাটিয়ে ঘিলু বের করে দেখবে,আমি এমন ভাল রেজাল্ট করি কিভাবে? আর আশ্চর্য, উপরের ক্লাসের ঐ ছাত্রদের সে কথা বিশ্বাস করে ভয়ও পেতাম আমি!

দাদপুরের পর যে তিন বছর তালিমনগর মাদ্রাসায় পড়ি, সেখানে আমি কখনও ফার্স্ট হতে পারিনি। ফার্স্ট হতো আবদুল লতিফ, আমি হতাম সেকেন্ড। অন্যতম ভাল ছাত্র হিসাবে অনেকে আমার তারিফ করতো ঠিকই, কিন্তু ক্লাসের সেরা ছাত্র হতে পারবো– এ আত্মবিশ্বাস কখনই গড়ে ওঠেনি আমার মধ্যে।

কিন্তু ফরিদপুরে আমার এ মানসিক রূপান্তরের কৃতিত্ব কি শুধুই আবদুল আজিজ ভাইয়ের? তা নিশ্চয়ই বলা যাবে না। যে রেজাল্টকে ভিত্তি করে আবদুল আজিজ ভাই আমাকে উৎসাহিত করার সুযোগ পেলেন, হাফ ইয়ার্লির সে রেজাল্ট তো আগেই এসেছিল এবং তার কৃতিত্ব ছিল নিশ্চয়ই ঐ মাদ্রাসার শিক্ষকদের।

হ্যাঁ, ফরিদপুরের ঐ হাই মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসাবে যাদের পেয়েছিলাম, তাদের কাছে আমার ঋণের অন্ত নেই। এতদিনের ব্যবধানে সব শিক্ষকের নাম হয়ত আজ বলতে পারব না। কিন্তু তাঁদের অধিকাংশের নাম স্পষ্ট মনে আছে। মাদ্রাসার শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন সুপারিনটেনডেন্ট মওলানা মোহাম্মদ আফতাবুদ্দিন, এসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেনডেন্ট মৌলভী বালাগাতউল্লাহ, বাবু নলিনী রঞ্জন, বাবু

www.pathagar.com

শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, জনাব তাজউদ্দিন আহমদ, মওলানা ফজলুল হক, মৌলভী রফিকউদ্দিন আহমদ, বাবু অমূল্য চরণ চক্রবর্তী, কাজী সুলতান আহমদ, ফজর আলী পণ্ডিত, ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাকটার বাবু দ্বিজেন শর্মা প্রমুখ। এদের মধ্যে নলিনী বাবু কিছুদিন পর অন্যত্র চলে যান। এক পর্যায়ে সুবোধ চন্দ্র রায় বলে একজন শিক্ষক এসেছিলেন। তবে যতদূর মনে পড়ে, তিনিও বেশীদিন থাকেননি।

যতদূর মনে পড়ে মওলানা ফজলুল হকও শেষ পর্যন্ত ছিলেন না, তাঁর পদে এসেছিলেন মওলানা নূরুল ইসলাম নামের একজন আরবী শিক্ষক। এক পর্যায়ে শিক্ষক হিসেবে আমরা পেয়েছিলাম বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত সনেটিয়ার সূফী মোতাহার হোসেনকে। তাঁর বাড়ী ফরিদপুর শহরের কাছেই একটি গ্রামে। খুবই অস্থায়ীভাবে মাত্র কিছুদিন পরে আরও দু'জনকে আমরা আরবী শিক্ষক হিসাবে পেয়েছিলাম। এদের একজন ছিলেন মওলানা এ. কে. এম সফিয়ুল্লাহ। তিনি ছিলেন মৌলভী বালাগাতউল্লাহ সাহেবের জামাতা। পরবর্তীকালে তিনি রাজেন্দ্র কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল হয়েছিলেন এবং নোয়াখালী সরকারী কলেজ থেকে রিটায়ার করেছিলেন। অপরজন ছিলেন ফরিদপুর কোর্ট মসজিদের ইমাম এবং বিখ্যাত আলেম মওলানা আবদুল আলী। আর একজনের নাম এ মুহূর্তে কিছুতেই মনে পড়ছে না, যিনি ছিলেন মাদ্রাসার লাইব্রেরীয়ান। আউট বই পড়ার ব্যাপারে তাঁর যথেষ্ট সাহায্য আমি পেয়েছিলাম।

মাদ্রাসার অধিকাংশ শিক্ষকই ছাত্রদের পড়াশোনার ব্যাপারে অত্যন্ত মনোযোগী ছিলেন। তারপরও সকল শিক্ষকের সঙ্গেই যে ছাত্রদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তা নয়। যাদের সাথে ছাত্রদের অত্যন্ত নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তাদের মধ্যে ছিলেন সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট মৌলভী বালাগাতউল্লাহ, বাবু শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, মৌলভী রফিউদ্দিন আহমদ এবং জনাব তাজউদ্দিন আহমদ। বলতে গেলে, এঁরা চারজনই ছিলেন মাদ্রাসার প্রাণ। সুপারিনটেনডেন্ট মওলানা মোহাম্মদ আফতাবুদ্দিন সাহেব ছিলেন এঁদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত নবাগত। শিক্ষকদের মধ্যে একমাত্র এম এ এবং স্বভাবগতভাবেই হোন বা পজিশনের কারণেই হোন, তিনি ছিলেন যথেষ্ট গুরুগম্ভীর প্রকৃতির লোক। আমরা তাঁকে দূর থেকে যথেষ্ট সমীহ করে চলতাম।

হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোবার পর শিক্ষক-ছাত্র সবার দৃষ্টিতে পড়ে গিয়েছিলাম। সেই সুবাদেই আমার আর এক দফা ভাগ্য খুলে গেল। চর মাধবদিয়া মৌলভী বাড়ীতে প্রথম জায়গীরের তুলনায় আমি বেশ ভালই ছিলাম। ছাত্র ইউসুফ আমার প্রায় সমবয়সী বলে তার সাথেও আমার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। দু'জন প্রায়ই পদ্মার সেই বিশাল চরের খোলা হাওয়ায় ঘুরে বেড়াতাম, আর মাঝে

www.pathagar.com

মাঝে পদ্মার কোলে মাছ মারতাম। ইউসুফরা ধনী পরিবার হওয়াতে খাওয়া-দাওয়াও বেশ ভালই চলছিল। একটা ব্যাপারে শুধু খারাপ লাগত, মাদ্রাসায় আমাকে যেতে প্রতিদিন আড়াই আড়াই পাঁচ মাইল হাঁটতে হতো। আমার এই অসুবিধা চিন্তা করেই কি-না জানি না, সুপারিনটেন্ডেন্ট মওলানা আফতাবুদ্দিন সাহেব তাঁর বাসায় আমাকে জায়গীর রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন।

সুপারিনটেন্ডেন্ট সাহেবের বাসা ছিল ফরিদপুর শহরের উত্তর-পূর্ব প্রান্ত টেপাখোলায়। মাদ্রাসা থেকে দূরত্ব ছিল এক মাইলেরও কম। দক্ষিণমুখী পাশাপাশি তিনটি বাড়ী। প্রত্যেক বাড়ীতে পাকা মেঝে টিনের চৌচালা ঘর দু'খানা করে। সুপারিনটেন্ডেন্ট সাহেবের বাসা ছিল মাঝেরটায়। পূবেরটায় থাকতেন ইয়াসিন হাইস্কুলের হেড মাস্টার। পশ্চিম পাশের বাসায় থাকতেন জনৈক সরকারী কর্মকর্তা। সে বাসায় জায়গীর থাকতো মোহাম্মদ আবুবকর নামের আমার এক ক্লাসফ্রেন্ড। আবুবকরের আব্বা ছিলেন একজন হাফিজে কোরআন এবং সম্ভবত চকবাজার মসজিদের ইমাম। আবুবকর ছাত্র হিসেবে তেমন মনোযোগী ছিল না। তবে ফরিদপুরের অদূরে তাদের বাড়ী ছিল বলে অনেক ব্যাপারেই তার সাহায্য ও পরামর্শ গ্রহণ করতাম আমি।

সুপারিনটেন্ডেন্ট সাহেবের নিজের বাড়ী রাজশাহী। বিয়ে করেছিলেন পাবনা (বর্তমান সিরাজগঞ্জ) জেলার শাহজাদপুরে। স্ত্রী, ২ ছেলে ও ১ মেয়ে নিয়ে তার ছোট সংসার। স্ত্রী রওশন আরা ছিলেন সুশিক্ষিতা মহিলা। আমি তাঁকে 'আম্মা' ডাকতাম আর তিনিও আমাকে মায়ের মতই স্নেহ করতেন। কোমলে-কঠোরে অপূর্ব এ মহিলার কাছে আমি শাসন ও আদর দুই-ই পেয়েছি প্রচুর পরিমাণে। যদিও বাহ্যত তাদের দু'ছেলে লুলু ও আলমকে পড়ানোর জন্যই আমাকে জায়গীর রাখা হয়েছিল, তবুও আমার পড়াশোনার তদারক করাও যে তাদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল তা অল্পদিনের মধ্যেই স্পষ্ট বুঝা গেল। এর আগে যত জায়গীর বাড়ী ছিলাম, সবখানেই জায়গীরদারদের দৃষ্টিতে আমি ছিলাম নিছক 'মাস্টার', কিন্তু সুপারিনটেন্ডেন্ট সাহেবের বাড়ীতে একই সাথে আমি হয়ে গেলাম মাস্টার ও ছাত্র। আমি মাদ্রাসা থেকে বাসায় ফেরার পর ঠিকমত হাতমুখ ধুয়ে নাস্তা করেছি কিনা, বিকাল বেলা তাঁর দুই ছেলে লুলু ও আলমকে নিয়ে বেড়াতে গেলাম কিনা এবং মাগরেবের পর ঠিকঠাক পড়তে বসলাম কিনা, এসব বিষয়েই কড়াকড়ি তদারকি করতেন মাতৃসমা রওশন আরা।

ভালো রেজাল্টের ঝকমারী

এরকম আদরে, শাসনে পড়াশোনার প্রতি আমার আগ্রহ ও মনোযোগ বেড়ে যায় বহুগুণে এবং বার্ষিক পরীক্ষায় তার প্রতিফলনও পড়ে। হাফ ইয়ার্লি পরীক্ষায়

www.pathagar.com

আমি শুধু একটি পেপারে সেকেন্ড হয়েছিলাম, অন্য সব বিষয়েই ফার্ষ্ট হয়ে ক্লাসে প্রথম হয়েছিলাম। বার্ষিক পরীক্ষায় আমি বাকী পেপারেও ফার্স্ট হয়ে অর্থাৎ সব বিষয়ে সব পেপারে ফার্স্ট হয়ে প্রথম স্থান দখল করে ক্লাস এইটে প্রমোশন পেলাম। নিঃসন্দেহে এটা আমার জীবনে ছিল এক মহা আনন্দদায়ক ঘটনা। কিন্তু তখন কে জানতো, এ আনন্দদায়ক ঘটনা, এই ভাল রেজাল্টই সেদিন আমার জন্য কাল হয়ে দাঁড়াবে?

গ্রাম থেকে জেলা শহরে নতুন আসায় প্রথম প্রথম আমার চালচলন ও কথাবার্তায় কেমন একটা দ্বিধা ও জড়তার ভাব ছিল। ক্লাসে অনেক সময় স্যারদের প্রশ্নের সঠিক উত্তরটা জানা থাকা সত্ত্বেও দাঁড়িয়ে উত্তর দিতে সাহস করতাম না। ফলে ক্লাসে আমার পার্টিসিপেশন মোটেই নজর কাড়ার মত হতো না। এর বিপরীতে আমার অনেক ধনী শহুরে ক্লাসফ্রেন্ডই ভুল-শুদ্ধ মিলে চটপট জবাব দিতো যে কোন প্রশ্নের। এদের কেউ কেউ হাফ ইয়ার্লি পরীক্ষায় আমার রেজাল্টকে একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা বলে চালিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল। বার্ষিক পরীক্ষার রেজাল্ট দেখে তারা নিশ্চুপ হয়ে যাবার বদলে তারা আমার নামে অকল্পনীয় এক কুৎসা অভিযানে নেমে পড়লো। তারা বলে বেড়াতে লাগলো যে, সুপারিনটেন্ডেন্ট সাহেবের বাসায় জায়গীর থাকার সুযোগে আমি প্রশ্নপত্র ফাঁস করে এমন ভাল রেজাল্ট করেছি। তা না হলে, "যে ছেলে ক্লাসে একটি কথাও বলে না, সে এমন ভাল রেজাল্ট করবে কি করে!"

মিথ্যার নিজস্ব কোন শক্তি আছে কি-না জানি না, তবে সমাজের কতিপয় ভাগ্যবান পরিবারের কয়েকটি অহমিকাগ্রস্ত ক্লাসফ্রেন্ডের বিরামহীন প্রচার অভিযানের কল্যাণে মাদ্রাসার গোটা আবহাওয়া অচিরেই বিষাক্ত হয়ে উঠলো। সবচাইতে বিব্রতকর অবস্থায় পড়লেন সুপারিনটেন্ডেন্ট সাহেব। মাদ্রাসার প্রধান হিসাবে তাঁর ব্যক্তিগত কাস্টোডীতে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র থাকতো। কিন্তু প্রশ্নপত্র তো থাকতো মাদ্রাসায়, বাসায় নয়। খলের তো ছলের অভাব হয় না কোনকালেই, তাই প্রচার করা হলো, বাসার কোন প্রয়োজনের অছিলায় সুপারিনটেন্ডেন্ট সাহেবের অফিস রুমে ঢুকে আমি এ কাজটা করে থাকবো!

শিক্ষকরা কেউ এ অপবাদ বিশ্বাস করেছিলেন বলে মনে হয়নি। তবুও নীতিবাদী সুপারিনটেন্ডেন্ট সাহেব নিজে এ অপপ্রচারের ব্যাপারে একটা হেস্তনেস্ত করার কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়ে বসলেন অনেকটা এককভাবেই। প্রথমে তিনি শিক্ষকদের দিয়ে নতুন প্রশ্নপত্র করিয়ে প্রায় অপ্রস্তুত অবস্থায় আমার কয়েকটা বিষয়ে পরীক্ষা নিলেন। তাতেও আমার রেজাল্ট সন্তোষজনক প্রমাণিত হলো।

এই পরীক্ষার কত পরে মনে নেই, সুপারিন্টেনডেন্ট সাহেব আমাকে তাঁর

www.pathagar.com

অফিস রুমে ডেকে পাঠালেন। রুমে কেউ ছিল না। তিনি একথা সেকথার পর আমাকে বললেন, 'দেখো, তোমার সম্বন্ধে যে কথা প্রচার করা হচ্ছে, তা আমি নিজেও বিশ্বাস করি না। তবুও তোমার নিজের মুখ থেকে এ সম্বন্ধে শুনতে চাই।' এ ধরনের একটা জ্বলজ্যান্ত মিথ্যা প্রচারণাকে তিনি এভাবে গুরুত্ব দেয়াতে আমার অত্যন্ত খারাপ লাগলো। দুঃখে, অভিমানে অনেকক্ষণ আমার মুখ থেকে কোন কথাই বেরুলো না। এর পর অতি সংক্ষেপে আমার জবাব দিয়ে এক বুক ক্ষোভ নিয়ে তাঁর অফিস রুম থেকে বেরিয়ে এলাম।

সেদিন বাসায় ফিরবার পরও আমার অস্বস্তির ভাব কিছুতেই কাটছিলো না। রাতে ভাল ঘুম হলো না। পরদিন ভোর বেলায় আমার বাইরের ঘরে বসে পড়বার চেষ্টা করছিলাম। এমন সময় অন্দরে আমার ডাক পড়লো। সুপারিন্টেনডেন্ট সাহেবের স্ত্রী তাঁদের শয়ন কক্ষের পাশের রুমে একটা চৌকিতে তাঁর পাশে আমাকে বসিয়ে প্রথমে আমার শরীর, স্বাস্থ্য, পড়ালেখা সম্বন্ধে বিভিন্ন খোঁজ-খবর নিতে লাগলেন। এরপর এক পর্যায়ে মমতা ঝরানো কণ্ঠে বললেন, 'আবদুল গফুর, আমি তোমাকে নিজের সন্তানের মতই মনে করি; তুমি আমার কাছে সত্য করে বলো, দুনিয়ার কেউ জানতে পারবে না। তুমি কি আসলে পরীক্ষার আগে কোন প্রশ্ন দেখেছিলে?' এক শ্রেণীর বিদ্বিষ্ট ক্লাস ফ্রেন্ডের কুৎসা আমাকে এতটুকু বিচলিত করতে পারেনি। সুপারিন্টেনডেন্ট সাহেবের প্রশ্নে পেয়েছিলাম প্রথম আঘাত। সে আঘাতজনিত বেদনাও চাপা দিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু এই বিদেশ-বিভূঁইয়ে যাঁর কাছে এতদিন ধরে পেয়েছি অনাবিল মাতৃস্নেহ, তাঁর এ প্রশ্নে আমি নিজেকে আর স্থির রাখতে পারলাম না। মুহূর্তে আমার মধ্যকার এতদিনের চাপা সমস্ত ক্ষোভ ও অভিমান যেন বাঁধভাঙ্গা কান্নায় রূপান্তরিত হয়ে আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে চললো।

আমার কান্না মাতৃসমা রওশন আরার মধ্যেও এনে দিল এক অদ্ভুত পরিবর্তন। ক্রুদ্ধা ফণিনীর মতই তিনি পাশের রুমে সুপারিন্টেনডেন্ট সাহেবের কাছে ছুটে গিয়ে তাঁর হৃদয়ের সবটুকু ক্ষোভ মিশিয়ে আর্তনাদ করে উঠলেন– 'তোমাদের এ ভারী অন্যায়। আর কতদিন এভাবে এই নিরীহ ছেলেটাকে তোমরা দগ্ধে মারতে চাও? সারা দুনিয়ার লোক বললেও আমি ওদের ঐ মিথ্যা কথা বিশ্বাস করবো না।'

তাঁর এ ক্ষুব্ধ আর্তনাদের ত্বরিত ফল ফলেছিল। সুপারিন্টেনডেন্ট সাহেব মাদ্রাসায় গিয়ে সেদিনই কুৎসা রটনাকারী ছেলেদের ডেকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, অবিলম্বে ভিত্তিহীন এ অপপ্রচার তারা বন্ধ না করলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর এ্যাকশন নেয়া হবে। কিন্তু সে এ্যাকশনের আর প্রয়োজন পড়েনি কারণ এই হুঁশিয়ারির পর এই কুৎসা অভিযানের সেখানেই ইতি হয়। এরপর ক্লাস টেন পর্যন্ত আমি একটানা সব পরীক্ষায়ই সব বিষয়ে সব পেপারে ফার্স্ট হই। এইট থেকে

www.pathagar.com

একইভাবে ফার্স্ট হয়ে নাইনে উত্তীর্ণ হওয়ায় মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ আমাকে আরও উৎসাহ প্রদানের নিমিত্ত মাসিক তিন টাকার একটি বিশেষ স্টাইপেন্ডের ব্যবস্থা করেন। আর মৌলভী রফিউদ্দিন আহমদ আমাকে একটি জামা উপহার দেন।

আমার ঐ অভাবনীয় রেজাল্ট অবশ্য আর একটি ভাল ছেলের জীবনেও যথেষ্ট ক্ষতির কারণ হয়েছিলো। আমার সেই দুর্ভাগা ক্লাসফ্রেন্ডের নাম আবদুর রহমান। জুনিয়ার মাদ্রাসা ফাইনালে সে স্কলারশীপ পেয়েছিলো। সে ক্লাসে ফার্স্ট হবে এটাই ছিল সবার ধারনা। কিন্তু হাফ ইয়ার্লিতে সে দ্বিতীয় স্থান পেল। বার্ষিক পরীক্ষায়ও তার অবস্থার উন্নতি হল না। এই রেজাল্টজনিত মানসিক আঘাতে কিনা জানি না, পরবর্তীকালে সে দৈহিকভাবেও অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং তার শিক্ষা জীবনে ছেদ পড়ে যায়।

শহর জীবনের প্রথম ছোঁয়া

ফরিদপুর হাই মাদ্রাসায় পড়তে এসেই শহর জীবনের সাথে আমার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তবুও সুপারিন্টেনডেন্ট সাহেবের বাসায় জায়গীর পাওয়ার আগ পর্যন্ত, বলা চলে, আমার জীবন প্রধানত পদ্মার চরের গ্রামীণ পরিবেশেই কেটেছে। সুপারিন্টেনডেন্ট মওলানা আফতাবুদ্দিন সাহেবের বাসায়ই আমি প্রথম শহর জীবনের ছোঁয়া পাই। এর আগে যত জায়গায়ই জায়গীর থেকেছি, খাবার মেনুতে সবখানে গ্রামীণ জীবনের ছাপ থাকত। কিন্তু সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেবের বাসায়ই প্রথম এর ব্যতিক্রম ঘটলো। ভোরের নাস্তায় গুড় সহযোগে মুড়ি বা চিড়া, শীতকালে ঠান্ডা কড়কড়ে ভাত, অন্যান্য সময় পান্তা ভাত খাওয়া আমার চিরকালের অভ্যাস। এ সবের স্থান দখল করলো রুটি, পাউরুটি, হালুয়া, সুজী, মোহনভোগ, হাফবয়েল ডিম ইত্যাদি। এতদিন খাবার খেয়ে এসেছি ঘরের মেঝেতে পাটি পেতে বা পিঁড়িতে বসে। এখন তা পরিবর্তিত হয়ে গেল শোয়ার চৌকির পাশে বসানো টেবিলে, চেয়ারে। তাছাড়া মাদ্রাসা থেকে ফিরবার পর জায়গীর বাড়ীতে এসে জামা-জুতা খুলে খোলা মাঠে যে স্বাধীনভাবে ছোটাছুটি করে বেড়াব, তার সুযোগ আর রইলো না। রাস্তার পাশেই জায়গীর বাড়ী। বাসা থেকে বেরুলেই জামা পরতে হবে। তাছাড়া স্বাধীনভাবে হাওয়া খেয়ে বেড়াবার উপযোগী দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠই বা কোথায় পাব শহরে?

ফরিদপুর শহরে বাস করতে শুরু করেই প্রথম আমার গ্রামের সেই স্বাধীন খোলামেলা জীবনের জন্য মনে একটা হাহাকার বোধ করতে শুরু করি। সে হাহাকার, সে বেদনাবোধ আমার জীবনে কখনও দূর হয়নি। অথচ শহর জীবনের চাকচিক্য, জীবন-ভোগের নানা উপকরণ আর ব্যবস্থার প্রতি আমার মধ্যে আকর্ষণ যে সৃষ্টি হয়নি, তা নয়। বিশেষ করে সিনেমা। সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেবের স্ত্রী

www.pathagar.com

আমাকে খুব স্নেহ করতেন, সে কথা আগেই বলেছি। তিনি ধর্মপরায়ণ হয়েও ছিলেন আধুনিক সুশিক্ষিতা মহিলা। আমার পড়াশোনার তদারকি তো করতেনই, তদুপরি সব সময় খেয়াল রাখতেন, বাপ-মায়ের সান্নিধ্যের অভাবে আমার মনে যেন কোন দুঃখবোধ সৃষ্টি না হয়। আমার মন খারাপ বুঝতে পারলে মাঝে মধ্যেই তিনি আমার হাতে চার আনা পয়সা গুঁজে দিয়ে সিনেমা দেখতে পাঠিয়ে দিতেন। তখন ফরিদপুরে চার আনায় সেকেন্ড ক্লাসে সিনেমা দেখা যেত।

সুপারিন্টেন্ডেন্ট মওলানা আফতাবুদ্দিন সাহেবও একই সাথে ছিলেন ধর্মপরায়ণ ও আধুনিক। আর আধুনিক বলেই বোধ হয় তিনি তাঁর স্ত্রীকে ডাকতেন নাম ধরে। তাঁর কথাতেই বুঝতাম, তাঁর স্ত্রীর ডাকনাম ছিল 'রোজী'। কোন লোক তাঁর স্ত্রীকে ছেলেমেয়ে সবার সামনে নাম ধরে ডাকবেন– এটা কল্পনা করাও কঠিন ছিল আমার পক্ষে। ছেলেমেয়ে হবার আগ পর্যন্ত স্বামী স্ত্রীকে 'শোন' আর স্ত্রী স্বামীকে 'শোনেন' বলবে, আর ছেলেমেয়ের জন্মের পর 'অমুকের বাপ' বা 'অমুকের মা' এ ধারার সম্বোধন শোনাই ছিল যার অভিজ্ঞতা, সেই আমি এ সম্বোধন শুনতে যথেষ্ট সংকোচ ও অস্বস্তি বোধ করতাম।

গ্রামে আমরা দেখেছি, স্বামী-স্ত্রী কখনো অন্যদের সামনে একে অন্যের নাম ধরে তো ডাকেই না, এমনকি মেয়েরা স্বামীর অনুপস্থিতিতেও কখনও স্বামীর নাম উচ্চারণ করে না। এ সম্পর্কে গ্রামে সংস্কার এত প্রবল যে, গল্প শুনেছি, গ্রামের এক মেয়েলোকের স্বামীর নাম এলাহি বখশ থাকাতে সে নামাজ পড়ার সময় সূরা 'নাছ'-এর যেখানে 'এলাহিন্নাছে' আছে, যেখানে স্বামীর নাম উচ্চারণ এড়াতে যেয়ে 'বাড়িঅলান্নাছে' বলতো। এটা অবশ্য নেহায়েত শোনা গল্প। এর মধ্যে সত্য কতখানি ছিল, তা বলতে পারব না। কিন্তু এ ব্যাপারে আমার নিজের অভিজ্ঞতাও কম মজাদার নয়। নিজের দাদা-দাদী, নানা-নানী দেখার সৌভাগ্য আমর না হলেও আমার আব্বার নানীকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমার মক্তবে পড়ার সময় তাঁর বয়স ছিল প্রায় সোয়া একশ' বছর। তাঁর স্বামী অর্থাৎ আমার আব্বার নানার নাম ছিল গরীবুল্লাহ ফকির। 'দুধ' শব্দের সঙ্গেও জড়িত কোন নাম তাঁর কোন মুরুব্বীর ছিল কিনা জানি না। তবে তিনি তাঁর বিবাহের পর কখনও গরীবুল্লাহ-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত 'গরু' এবং 'দুধ' শব্দ ব্যবহার করতেন না। গরুকে তিনি বলতেন 'ছেওট' আর দুধকে 'গোটা'। গরু আর দুখের পরিবর্তে যে দু'টি বিশেষ শব্দ তিনি ব্যবহার করতেন তার মাজেজা কখনো আমার বুঝে আসেনি। শেষ বয়সে তাঁর মেজাজ এত তিরিক্ষি থাকতো যে, ঐ দু'টি শব্দ চয়নের কারণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করার সাহসও আমাদের কারো হতো না।

ফরিদপুরে শহর-জীবনে এমনিতে নানা আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও হারিয়ে যাওয়া

www.pathagar.com

গ্রামীণ জীবনের জন্য মন আমার প্রায়ই উতলা থাকতো। তাই ছুটিছাটার সুযোগ পেলেই ট্রেনে চড়ে সোজা বাড়ী চলে যেতাম। বাড়ী যেয়ে হাতমুখ ধুয়ে মায়ের বাড়া খানা খাওয়ার আগেই আমি জামা-কাপড় বদলিয়ে খালি গায়, খালি পায় শুধু লুঙ্গি পরে বেরিয়ে পড়তাম গ্রাম প্রদক্ষিণে। আর বর্ষাকাল হলে পদ্মায় ইলিশ মাছ মারা এবং শুকনা মৌসুম হলে বিলে মাছ মারার আয়োজনে নেমে পড়তাম। এ ব্যাপারে আমার মিয়া ভাইয়ের সাথে ছিল আমার মৌলিক পার্থক্য। তিনি মাছ মারামারির মধ্যে কখনও ছিলেন না। কিন্তু প্রতি ওয়াক্তে মাছ না থাকলে তার খাওয়া ভাল হতো না। তার বিপরীতে আমি ছিলাম– সব ওয়াক্তে মাছভাত খেতেই হবে– এমন বাধ্যবাধকতা কখনও অনুভব করিনি। কিন্তু মাছ মারতে অনুভব করতাম অপার আনন্দ, যা মাঝে মাঝেই নেশার পর্যায়ে চলে যেতো।

মাছ মারার ব্যাপারে অবশ্য আমার আব্বারও উৎসাহ ছিল প্রচুর। তবে তাঁকে কখনও পদ্মায় ইলিশ মাছ মারতে যাওয়ার ব্যাপারে উৎসাহী দেখেছি বলে মনে পড়ে না। পদ্মায় ইলিশ মাছ মারতে যাওয়া-আসা মিলে কমপক্ষে একদিন লাগত। রাতে ঘুমাতে হত নৌকায়, পদ্মার বুকে। এতটা সময় অপচয় তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি মাছ মারতেন কারণ মাছের ব্যাপারে বাজারের উপর নির্ভরশীল থাকা তিনি পছন্দ করতেন না।

শুধু মাছের ব্যাপারেই নয়, সংসারের অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ব্যাপারেও তিনি পরনির্ভরশীলতা পছন্দ করতেন না। ধান, পাট, যব, গম, ডাল থেকে শুরু করে বিভিন্ন তরি-তরকারি, শাক-সবজি উৎপাদন এবং ফল-ফলাদির গাছ লাগানো তো বটেই, এমনকি তেলের জন্য সরিষা, তিল, তিশি এবং রান্নার জন্য পেঁয়াজ, রসুন, হলুদ, মরিচ, আদা, এমনকি পান খাওয়ার জন্য সুপারি ও ছাচি পানের চাষও তিনি করতেন পরিকল্পিতভাবে। আমাদের নিজেদের জমিতেই কুশার (আখ) চাষ হত প্রচুর পরিমাণে। বছর শেষে কুশার কলে ভাঙ্গিয়ে গুড় তৈরী হত। তাছাড়া খেজুরগাছ কাটতেও তিনি জানতেন, যার ফলে খেজুর রস, খেজুর গুড় বা পাটালী খেতেও আমাদের কোন অসুবিধা হত না। সংসারের নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের মধ্যে একমাত্র কাপড়, কেরাসিন, লবণ আর পানের সাথে খাওয়ার চুন ছাড়া সাধারণত আমাদের সংসারে খুব কম জিনিসই কিনতে হত।

শুধু খাদ্য নয়, চিকিৎসার ব্যাপারেও স্বাবলম্বী হবার চেষ্টা ছিল তাঁর। ছোটখাট অসুখের চিকিৎসার জন্য মওলানা মোয়েজউদ্দিন হামিদী সাহেবের লিখিত 'সরল টোটকা চিকিৎসা' নামক বইয়ের সাহায্যে গাছ-গাছালির কবিরাজী চিকিৎসা ছাড়াও মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য এন্ড কোং প্রকাশিত 'পারিবারিক হোমিও চিকিৎসা' বইয়ের সাহায্যে ছোট এক বাক্স হোমিও ওষুধ দিয়ে তিনি আমাদের চিকিৎসা করতেন।

www.pathagar.com

অবশ্য তখন আমাদের জীবনযাত্রার মানও ছিল খুব সাধারণ পর্যায়ের। আমি যতদিন দাদপুর মক্তবে পড়েছি ততদিন নিয়মিত জুতা পরেছি বলে মনে পড়ে না। বাড়ীতে কাঠের বোলেওয়ালা খড়ম ব্যবহার করতাম হাত-পা ধোয়া বা ওজু করার সময়। তালিমনগর মাদ্রাসায় ভর্তি হয়েই প্রথম নিয়মিত জুতা ব্যবহার শুরু করি। তবে ছোটকালে গ্রাম এলাকায় দূর-দূরান্তে আত্মীয়-স্বজন বাড়ী যেতে সাধারণত দীর্ঘপথ অতিক্রম করতাম জুতা হাতে নিয়ে খালি পায়ে হেঁটে। গন্তব্য স্থানের কাছাকাছি পৌঁছলে কোন খাল বা পুকুর থেকে পা ধুয়ে জুতা পরে নিতাম।

তখনকার দিনে মেয়েছেলেরা নাইওর বা অন্য উপলক্ষে আত্মীয়-স্বজন বাড়ী গেলে সাধারণত প্রচুর পরিমাণ চাল-ডাল সঙ্গে নিয়ে যেতেন। আর পুরুষরা দু'একদিনের জন্য আত্মীয় বাড়ীতে গেলে সাধারণত বড় দেখে কয়েকটা ইলিশ মাছ সঙ্গে নিয়ে যেতেন। কখনও কখনও গরমকালে কেউ কেউ নিজ গাছের আম-কাঁঠাল বা নিজের ক্ষেতের তরমুজ, বাঙ্গি (ফুটি) ইত্যাদি নিয়েও যেতেন। আমি যতদিন ফরিদপুরে মওলানা আফতাবুদ্দিন সাহেবের বাসায় জায়গীর ছিলাম, আব্বা মাঝে মধ্যেই বস্তা ভর্তি আম-কাঁঠাল, তরমুজ, কলা ইত্যাদি নিয়ে আমাকে দেখতে যেতেন। একবার চৈত্র বা বৈশাখ মাসে আব্বা ইয়া বড় বড় তাজা কৈ, শিং, মাগুর, শোল মাছ পানিসহ এক বিশাল কোলা ভর্তি করে নিয়ে ফরিদপুরে হাজির। এ অভাবনীয় ব্যাপারে আমার জায়গীর বাড়ীর সকলের চক্ষু চড়ক গাছ হবার যোগাড় হলেও তারা খুশিও হয়েছিলেন প্রচুর। ওজন দিলে প্রায় এক-দেড় মণ হত মাছগুলো। এতগুলো বড় তাজা মাছ একত্রে তারা কখনও ইতিপূর্বে দেখেছেন কি-না এ বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করলেন। বিলের আপা সেঁচার সময় চৈত্র-বৈশাখ মাসে আমাদের বাড়ীতে এরকমই তখন মাছের ধুম পড়ে যেত।

আমাদের বাড়ীতে মাছ খাওয়ার ধুম পড়তে দেখেছি বছরে অন্তত দুই মৌসুমে। চৈত্র-বৈশাখে বিল সেঁচার সময়ে একবার। আর একবার বর্ষাকালে বা বর্ষার পানি টান পড়ার মৌসুমে। সে সময় পদ্মায় এত বেশী ইলিশ ধরা পড়ত যে, সেই ইলিশ ট্রেনে কলিকাতা, শিলিগুড়ি বা অন্যত্র চালান দেবার মত অত বেশী বরফ তৈরী করে উঠতে পারতো না রাজবাড়ীর বরফ কল। ফলে পদ্মার মাছ বিক্রয়ের বিভিন্ন বাঁকে ইলিশের স্তুপ জমে যেতো। মাছ পচে যাওয়ার উপক্রম হলে জেলেরা বড় বড় ইলিশ মাছ পানির দামে হালি প্রতি তিন-চার আনায় বিক্রি করে দিতো। ঐ সুযোগে নরম হয়ে যাওয়া ইলিশ 'ঝুরি' খেতো গ্রামের লোকেরা। ইলিশের এসব ভর মৌসুমে মাঝে মাঝে ডায়রিয়ার প্রকোপ দেখা দিতো 'নরম' ইলিশ খাওয়ার কারণে।

বিল-সেঁচার বা ইলিশের এসব মৌসুমে বাড়ীতে আত্মীয়-স্বজন বা অন্যান্য

www.pathagar.com

মেহমান এলে যেমন তাদের আছুদা করে মাছ খাওয়ানো সম্ভব হতো, তেমনি ঐসব সময়ে বাড়ীর কামলা-পরেতরাও তৃপ্তি সহকারে মাছ খেয়ে নিতো। তখনকার দিনে যেমন আমাদের বাড়ীতে প্রায় সারা বছরই দু'একজন কামলা বাঁধা থাকতো, তেমনি থাকতো 'বিদেশী' পরেত। এরা সবাই মুসলমান বলে এদের খাওয়ানো নিয়ে কোন সমস্যা হতো না। তবে বড় গাছ চেরাই করার সময় হিন্দু করাতি এবং আসবাবপত্র তৈরীর জন্য কখনও কখনও হিন্দু কাঠমিস্ত্রী আসলে তাদের খাওয়ানো নিয়ে সমস্যা হতো। তারা আমাদের সাথে তো নয়ই, আমাদের রান্না করা খাবারও খেতো না। তাদের আমরা চাল, ডাল, মরিচ, লবণ, তেল দিতাম। তা দিয়ে তারা নিজেরা আলাদাভাবে খানা পাকিয়ে নিতো।

আমাদের এলাকায় দেখেছি একই গ্রামে বাস করেও হিন্দুরা মুসলমানদের থেকে সব সময়ই একটা স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলতো। শুধু ধর্মীয় পালা-পার্বণে নয়, সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে তো বটেই, রাজনৈতিক ব্যাপারেও তারা সব সময়ই মুসলমানদের থেকে পার্থক্য ও দূরত্ব বজায় রেখে চলতো। এটা শুধু যে জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে ছিল তা নয়, ইউনিয়ন বোর্ড তথা স্থানীয় রাজনীতির ক্ষেত্রেও তাদের নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে দেখা যেতো। তারা কেউ কংগ্রেস করতো, কেউ হিন্দু মহাসভা করতো, কিন্তু হিন্দু স্বার্থের ব্যাপারে তারা সব সময়ই এক থাকতো। এর বিপরীতে মুসলমানরা সব সময়ই থাকতো নানা দল-উপদলে বিভক্ত। হিন্দুরা শুধু মুসলমানদের তুলনায় অধিক শিক্ষিতই ছিল না, অনেক বেশী রাজনীতি-সচেতনও ছিল। চাকরি ও ব্যবসা-বাণিজ্যে তাদের প্রায় একচেটিয়া প্রভাব ছিল, একথা আগেই বলেছি। স্থানীয় রাজনীতিতেও তারা মুসলমানের অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ গ্রহণ করতে কখনও কার্পণ্য করতো না।

বাংলাদেশের অন্যান্য অধিকাংশ এলাকায় হিন্দু জমিদার থাকলেও আমাদের এলাকায় জমিদার ছিল মুসলমান। কিন্তু এই জমিদার মুসলমান থাকাটা এলাকার সাধারণ মুসলমানদের উন্নতির জন্য যতটা সহায়ক হওয়ার কথা ছিল তা হতে পারেনি। কারণ একমাত্র আলিমুজ্জামান চৌধুরী ছাড়া জমিদারদের অধিকাংশই সাধারণ মুসলমানদের, যাদের অধিকাংশই ছিল চাষা-ভুষা, সবসময়ই তাদেরকে একটা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখতো। তারা বরং শিক্ষিত ও উন্নত হিন্দুদের সাথে মেলামেশা করতেই অধিক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতো। সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার আলো প্রসারকে তারা তেমন সুনজরে দেখতো না। চাষা-ভুষার ছেলেমেয়েরা শিক্ষিত হয়ে উঠলে তাদের বেশী বাড় বেড়ে যেতে পারে– এটাই ছিল তাদের আশংকা। সাধারণ মুসলমান ঘরের ছেলেরা উচ্চশিক্ষিত হয়ে উঠলে তাদের সামনে চেয়ারে বসবে, এটা কল্পনা করাও ছিল তাদের কাছে অসহ্য। এতে

www.pathagar.com

করে সাধারণ মুসলমানদের সাথে জমিদারদের একটা দ্বন্দ্বও বিরাজ করছিল বহুদিন ধরে। ফলে সাধারণ মুসলমানদের উন্নতির পথে শিক্ষিত-উন্নত হিন্দু সমাজ তো অন্তরায় ছিলই, এ ধরনের মুসলিম জমিদাররাও কম বিপত্তি সৃষ্টি করেনি।

এ নিরিখেই ফরিদপুরের পরিস্থিতি আমার কাছে অনেক স্বতন্ত্র ও আশাব্যঞ্জক মনে হত। ফরিদপুর শহরেও ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রে হিন্দুদের ছিল বিরাট প্রভাব। ফরিদপুর শহরে অবস্থিত তদানীন্তন ফরিদপুর জেলার একমাত্র কলেজ রাজেন্দ্র কলেজের প্রিন্সিপাল, ভাইস প্রিন্সিপাল দু'জনই ছিলেন হিন্দু। শুধু তাই নয়, আরবী ও ফার্সির দু'জন অধ্যাপক ছাড়া বাকী সব অধ্যাপকই ছিলেন হিন্দু। এই দুই অধ্যাপক পরিচিত ছিলেন 'গোল মৌলভী' ও 'লম্বা মৌলভী' বলে। এই দুই অধ্যাপকের এই পরিচিতি থেকেই বুঝা যায় সমাজে তাদের অবস্থান কতটা মর্যাদার ছিল। শহরের অধিকাংশ বাসিন্দা মুসলমান হলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই ছিল হিন্দুদের নেতৃত্বে পরিচালিত।

ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, ডাক্তারি, মোক্তারি, ওকালতিতে হিন্দুদের প্রায় একচেটিয়া প্রাধান্য ছিল। স্বর্ণকার সকলেই ছিল হিন্দু। অন্যান্য পেশার ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। ব্যবসায়ে মুসলমানদের মধ্যে একমাত্র উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন ওসমান খাঁ। ফরিদপুর শহরের প্রধান বাজার চকবাজারে হিন্দুদের অনেকগুলো বইয়ের দোকানের বিপরীতে মুসলমানদের একটিমাত্র দোকান ছিল 'মোসলেম লাইব্রেরী"। 'ইসলামিয়া বুক ডিপো' নামে মুসলমানদের দ্বিতীয় বইয়ের দোকান প্রতিষ্ঠিত হয় অনেক পরে চল্লিশের দশকের প্রায় মাঝামাঝি সময়ে। জেলার প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, একমাত্র কলেজ, রাজেন্দ্র কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা অম্বিকা চরণ মজুমদার। তাঁর নামে শহরের কেন্দ্রস্থলে অম্বিকা ময়দান ছিল সভা-সমিতির একমাত্র মাঠ। ফরিদপুর শহরের শেষ প্রান্তে অবস্থিত রেল স্টেশনটির নামও ছিল অম্বিকাপুর রেল স্টেশন। রাজেন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ কামাখ্যা মিত্র অনেকটা দার্শনিক টাইপের লোক হলেও ভাইস প্রিন্সিপাল অবনী বাবু ছিলেন সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন একজন ব্যক্তি। তিনি রাজনীতির ক্ষেত্রে ছিলেন হিন্দু মহাসভার সমর্থক।

শহরে একটি সরকারী জিলা স্কুল ছিল। এটার কথা বাদ দিলে শহরের সব চাইতে নামকরা দু'টি হাই স্কুল ঈশান ইনস্টিটিউশন ও সরোজিনী হাই স্কুল (অপর নাম ফরিদপুর হাই স্কুল) ছাড়াও মহিম হাই স্কুলসহ অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ তো বটেই, শিক্ষক ও ছাত্রদেরও অধিকাংশই ছিল হিন্দু। এর বিপরীতে মুসলমানদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত একমাত্র হাই স্কুল ছিল শহরের পূর্ব প্রান্তে টেপাখোলায় অবস্থিত ইয়াসিন হাই স্কুল এবং হাই স্কুল পর্যায়ের মাদ্রাসা

www.pathagar.com

ময়েজউদ্দিন হাই মাদ্রাসা। হাই মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জমিদার ইউসুফ আলী চৌধুরী ওরফে মোহন মিয়া, সে কথা আগেই বলেছি। ইয়াসিন হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা টেপাখোলার মৌলভী মোতাহার হোসেন। পাকিস্তান আমলে ষাটের দশকে রাজেন্দ্র কলেজ সরকারী কলেজ হয়ে গেলে এই ইয়াসিন হাই স্কুলকে ইয়াসিন কলেজে উন্নীত করা হয়।

ময়েজউদ্দিন হাই মাদ্রাসা ছাড়াও ইউসুফ আলী চৌধুরী এই হাই মাদ্রাসার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে একটি গার্লস জুনিয়র মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। পাকিস্তান আমলে এই দু'টি মাদ্রাসাই হাই স্কুলে রূপান্তরিত হয়ে যথাক্রমে ময়েজউদ্দিন হাই স্কুল ও হালিমা গার্লস হাই স্কুল নামে নতুন পরিচিতি লাভ করে।

স্টুডেন্টস হোম

ময়েজউদ্দিন হাই মাদ্রাসা ছাড়াও মোহন মিয়া সাহেব ফরিদপুর শহরে একটি অভিনব প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন, যার তুলনা বাংলাদেশের অন্য কোন জেলায় আছে কি-না বলা শক্ত। ফরিদপুর শহরে হিন্দুরা সব ব্যাপারে উন্নত ছিল সে কথা আগেই বলেছি। বাইরের থেকে গরীব, মেধাবী হিন্দু ছাত্ররা ফরিদপুর শহরে এসে রামকৃষ্ণ মিশন ছাড়াও শহরের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত শ্রী অঙ্গনে থাকতে পারত। মুসলমানদের জন্য এ রকম কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না। তাদের একমাত্র ভরসা ছিল জায়গীর। জায়গীর যাদের ভাগ্যে জুটতো না, তারা হাজার মেধাবী হলেও উচ্চ শিক্ষার আশা ত্যাগ করে গ্রামে ফিরে যেতে বাধ্য হত। এই প্রেক্ষাপটেই ইউসুফ আলী চৌধুরী ওরফে মোহন মিয়া দরিদ্র, মেধাবী মুসলমান ছাত্রদের ফ্রি থাকা-খাওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠা করেন মুসলিম স্টুডেন্টস হোম। হাই মাদ্রাসার উত্তর-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত এ স্টুডেন্টস হোম থেকে বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার অসংখ্য দরিদ্র মেধাবী মুসলমান ছাত্র উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ লাভ করে পরবর্তীকালে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। শুধু শিক্ষা ক্ষেত্রেই নয়, অর্থনৈতিক দিক দিয়েও পশ্চাৎপদ মুসলমান সমাজ যাতে এগিয়ে যেতে এবং স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে তার জন্য মোহন মিয়া ফরিদপুর শহরের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রতিষ্ঠা করেন 'বায়তুল আমান' নামক একটি অভিনব প্রতিষ্ঠান, যেখানে মুসলমান ছেলেরা সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে ভোকেশনাল ট্রেনিং নিয়ে স্বাধীনভাবে জীবিকার্জনের পথে অগ্রসর হতে পারতো। সেকালে মুসলমান নেতাদের মধ্যে শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়নের লক্ষ্যে এতটা ব্যাপক ও অগ্রসর চিন্তাধারা প্রায় অকল্পনীয় ব্যাপার ছিল। এসব কারণেই ফরিদপুর এসে জমিদার ইউসুফ আলী চৌধুরীর কর্মকান্ডের সাথে পরিচিত হবার পর তাঁর সাথে আমার নিজ এলাকার জমিদারদের পার্থক্যটা বড় প্রকটভাবে ধরা পড়তো।

www.pathagar.com

মোহন মিয়া সাহেবদের জমিদারীর বয়স যে খুব বেশী তা নয়। এলাকার লোকশ্রুতি অনুসারে তাদের জমিদারী ছিল মাত্র দু'পুরুষের। মোহন মিয়া সাহেবদের পিতা খান সাহেব ময়েজউদ্দীন চৌধুরী খুব সাধারণ অবস্থার মধ্য থেকে উঠে এসে পদ্মার চরের বিশাল এলাকার জমিদারী গড়ে তুলেছিলেন নিজের শ্রম ও বুদ্ধিমত্তা এবং অবশ্যই আল্লাহর নির্ধারিত ভাগ্যের জোরে। সাধারণ অবস্থা থেকে মাত্র এক পুরুষ আগে জমিদারে উন্নীত হন বলেই বোধ হয় সাধারণ মানুষদের সাথে তাদের সুসম্পর্ক বজায় ছিল এবং বৃহত্তর সমাজের প্রতি তাদের মধ্যে একটা গভীর দায়িত্ববোধ কাজ করছিল। কথাটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য ছিল খান সাহেব ময়েজউদ্দীন চৌধুরীর মধ্যম পুত্র ইউসুফ আলী চৌধুরী ওরফে মোহন মিয়া সম্পর্কে। এখানে আরেকটি বিষয় বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। মোহন মিয়া সাহেব বিবাহ করেছিলেন উপমহাদেশের ঐতিহাসিক ফারায়েজী আন্দোলনখ্যাত হাজী শরীয়তুল্লাহর বংশে। হাজী শরীয়তুল্লাহর চতুর্থ অধস্তন পুরুষ বিশিষ্ট বুযর্গ হযরত আবু খালেদ মোহাম্মদ রাশিদুদ্দিন ওরফে পীর বাদশা মিয়ার কন্যা ছিলেন ইউসুফ আলী চৌধুরীর স্ত্রী। এই প্রভাবেই হোক বা অন্য কারণেই হোক, ইউসুফ আলী চৌধুরীর মধ্যে ইসলাম ও মুসলিম সমাজ সম্পর্কিত একটি অনুভূতি আগাগোড়া কাজ করেছে।

আমি ফরিদপুর ময়েজউদ্দীন হাই মাদ্রাসায় পড়াশুনা করি ১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ সালের প্রথমাংশ পর্যন্ত। এর আগেই ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে গৃহীত হয় ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব। সে প্রস্তাবেই ভারতীয় উপমহাদেশকে দ্বিখন্ডিত করে উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাসমূহে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহ প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। লাহোর প্রস্তাবের কোথাও একথা বলা হয়নি যে, এ রাষ্ট্রে মুসলমানরা ছাড়া অন্য সম্প্রদায়ের কেউ থাকতে পারবে না। বরং লাহোর প্রস্তাবের পরিকল্পিত হিন্দু ও মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্রসমূহের প্রত্যেকটিতে সংখ্যালঘুদের অধিকার যাতে নিশ্চিত হয় তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। লাহোর প্রস্তাবের কোথাও 'পাকিস্তান' শব্দটিও স্থান পায়নি। অথচ পরদিন সকল হিন্দু পত্রিকায় ফলাও করে প্রকাশিত হয় 'পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত'। হিন্দুদের কাছে হিন্দু ও মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে ভারতবর্ষকে বিভক্ত করার নামই ছিল পাকিস্তান। মুসলমানরাও শেষ পর্যন্ত এ নামেই লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়নের সংগ্রামে এগিয়ে যায়। পরবর্তী বছর অর্থাৎ ১৯৪১ সালে মুসলিম লীগের মাদ্রাজ অধিবেশনে লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন তথা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাই মুসলিম লীগের লক্ষ্য হিসাবে নির্ধারণ করা হয়। এভাবেই পাকিস্তান আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয়। বাংলার মুসলমানদের জন্য ১৯৪১ সালের

www.pathagar.com

শুরুটা হয় যত আনন্দদায়ক পরিবেশে, ততটা আনন্দদায়ক থাকেনি তার সমাপ্তি-পর্ব।

ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব উপমহাদেশের মুসলমানদের মুক্তির একটা সুস্পষ্ট লক্ষ্য, একটা দিক-নির্দেশনা এনে দেয়। মুসলমানরা বহু বছর পর স্বাধীনতা সংগ্রামের একটা সুস্পষ্ট লক্ষ্য সামনে পেয়েছিল এবং এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে দ্রুত ঐক্যবদ্ধ হয়ে পড়ছিল। সর্বত্র মুসলিম লীগের আন্দোলন দ্রুত প্রসার লাভ করছিল। এটা বাংলাদেশে যে অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অনেক বেশী সাফল্য লাভ করছিল, তার পেছনে অন্তত দু'টি বড় কারণ ছিল ঃ (এক) ফজলুল হকের বিপুল জনপ্রিয়তা, (দুই) শহীদ সোহরওয়ার্দীর অসাধারণ সাংগঠনিক দক্ষতা। এ কে ফজলুল হক তখন বাংলার জনগণের মধ্যে কেমন জনপ্রিয় ছিলেন, সে কথা আমরা আগেই বলেছি। সোহরওয়ার্দী সাহেব সম্বন্ধে শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, পরবর্তীকালে অন্যতম দক্ষ সংগঠক আবুল হাশিম বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত হোসেন শহীদ সোহরওয়ার্দীই ছিলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রধান সাংগঠনিক প্রাণ-পুরুষ। ১৯৪১ সালের যাত্রা লগ্নে এ কে ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরওয়ার্দী ছিলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক।

তখন চলছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ১৯৩৯ সালে ইউরোপের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই যুদ্ধের সূচনা হলেও দ্রুত এই যুদ্ধের বিস্তৃতি ঘটে সারা বিশ্বময়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ কোন না কোন পক্ষে যোগ দিতে থাকে। ভারতবর্ষ তখন পরাধীন দেশ। ভারতবর্ষের জনগণের একমাত্র লক্ষ্য তখন স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা কংগ্রেসের নেতৃত্বে জনগণের একাংশ চাইছে ভারতকে অখণ্ড রেখে, জনগণের আরেক অংশ চাইছে মুসলিম লীগের নেতৃত্বে লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়নের মাধ্যমে। কিন্তু ভারতবর্ষের পরাধীনতার সুযোগে তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড লিনলিথগো ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে হঠাৎ বৃটেনের পক্ষে ভারতবর্ষের যুদ্ধে যোগদানের ঘোষণা দিয়ে বসেন। এই ঘোষণা দেয়ার আগে কংগ্রেস বা মুসলিম লীগ কোন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গেই তিনি কোন আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করেননি। স্বভাবতই রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া আনন্দদায়ক হয়নি। কংগ্রেস সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সহযোগিতা না করার সিদ্ধান্ত নেয়। মুসলিম লীগ প্রথমে সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় নিরপেক্ষ থাকার কথা ঘোষণা করলেও ১৯৪০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এক সভায় সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সহযোগিতা না করার সিদ্ধান্ত নেয়।

১৯৪১ সালের ২০ জুলাই বোম্বাই প্রদেশের গভর্নর স্যার রোজার নাসলী লীগ

www.pathagar.com

সভাপতিকে এক পত্রে জানান, 'গভর্নর জেনারেল ৩০ জন সভ্য নিয়ে জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদ গঠন করেছেন এবং তার মধ্যে বাংলাদেশ, আসাম ও পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রীদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে'। উত্তরে জিন্নাহ লিখেন যে, লীগের সভাপতি ও কমিটির সাথে পরামর্শ ছাড়া বড়লাট যেভাবে মুসলমান প্রধানমন্ত্রীদের প্রতিরক্ষা পরিষদে গ্রহণ করেছেন, তাকে মুসলিম লীগ কিছুতেই মেনে নিতে পারে না।

শেরেবাংলার লীগ ত্যাগ

মুসলিম লীগ সভাপতি শুধু প্রতিবাদ করেই বসে থাকেননি। দলীয় শৃংখলা ভঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত করে জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদের মুসলিম লীগ দলীয় সদস্যদের প্রতি শো'কজ নোটিশ জারি করে সব কিছু বিবেচনার জন্য ১৯৪১ সালের ২৪ আগস্ট বোম্বাইয়ে কেন্দ্রীয় লীগ কমিটির এক সভা ডাকেন। সভায় এসে পাঞ্জাব ও আসামের মুসলিম লীগ দলীয় প্রধানমন্ত্রীদ্বয় প্রতিরক্ষা পরিষদ থেকে পদত্যাগ করলেও এ কে ফজলুল হক সে সভায় যোগই দিলেন না। তিনি অত্যন্ত আবেগপ্রবণ লোক ছিলেন। শোকজ নোটিশ তাঁর আত্মমর্যাদাবোধে গভীরভাবে আঘাত করেছিল। ২৪ আগস্টের সভায় তিনি যোগ তো দিলেনই না উপরন্তু তিনি ৮ সেপ্টেম্বর একপত্রে তাঁর সিদ্ধান্ত জানান যে, তিনি প্রতিরক্ষা পরিষদ থেকে পদত্যাগ করছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি লীগ কমিটি ও লীগ পরিষদ থেকেও পদত্যাগ করছেন। পত্রে তিনি আরও অভিযোগ করেন, লীগ সভাপতি সম্পূর্ণ অনিয়মতান্ত্রিক আচরণ করছেন।

ফজলুল হক অনেক পরে তাঁর অসমাপ্ত মূল্যায়নধর্মী আত্মজীবনীর মুখবন্ধে লিখেছেন ঃ 'আমার জীবনের সকল কাজ ক্ষণিকের আবেগের প্রাবল্য দ্বারা পরিচালিত হয়েছে'। তাঁর উপরোক্ত সিদ্ধান্তও তাঁর জীবনের এই প্রবণতার অন্যতম প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

বাংলাদেশে পাকিস্তান আন্দোলন সবে মাত্র দানা বেঁধে উঠছে। এ সময়ে বাঙ্গালী মুসলমানদের জনপ্রিয়তম ব্যক্তিত্ব এ কে ফজলুল হকের সঙ্গে মুসলিম লীগের সম্পর্কচ্ছেদের ঘটনাটা মোটেই চাট্টিখানি ব্যাপার ছিল না। এ আঘাত বাংলাদেশের মুসলিম লীগ কাটিয়ে উঠতে পারবে, এটা অনেকেরই বিশ্বাস হয়নি। কিন্তু এতবড় বিপর্যয় কাটিয়ে উঠে বাংলার মুসলিম জনগোষ্ঠী সেদিন প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিল, কোন ব্যক্তি নয়, আদর্শের জন্য সংগ্রামেই তারা অভ্যস্ত।

অবশ্য একথা বাস্তব সত্য যে, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের আওতায় ১৯৩৭ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম সাধারণ নির্বাচনের সময় পর্যন্ত ফজলুল হক মুসলিম লীগের বাইরেই ছিলেন। তিনি তখন কৃষক প্রজা দল করতেন। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস, কৃষক প্রজা দল বা মুসলিম লীগ কোনটাই নিরংকুশ

www.pathagar.com

সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেনি। ফলে মুসলিম লীগের সমর্থন নিয়ে তিনি কৃষক প্রজা-মুসলিম লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করেছিলেন। বাংলাদেশে সেই যে মুসলিম লীগের একটা গণভিত্তি সৃষ্টি হয় তার মূলে ছিল হোসেন শহীদ সোহরওয়ার্দীর অবদান। এমন কি, মুসলিম লীগ নেতা খাজা নাজিমুদ্দিন বরিশালে তাঁর জমিদারীর মধ্যে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হলে শহীদ সোহরওয়ার্দী কলিকাতায় তাঁর বিজিত দু'টি আসনের একটি থেকে পদত্যাগ করে উপনির্বাচনে খাজা নাজিমুদ্দিনকে জিতিয়ে আনেন।

তাছাড়া বাঙ্গালী মুসলমানের জাগরণে আত্মনিবেদিত তাদের বিশ্বস্ত মুখপত্র দৈনিক 'আজাদ' এবং তার প্রতিষ্ঠাতা, মুসলিম সাংবাদিকতার জনক মওলানা আকরম খাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকার কথাও এ প্রসঙ্গে কোন মতেই খাটো করে দেখার উপায় নেই। মুসলিম লীগের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন তথা পাকিস্তান আন্দোলনের প্রশ্নে সেদিন যে আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল, তা নাড়া দিয়েছিল বাংলার জনতার মর্মমূলে। লাহোর প্রস্তাব উপমহাদেশের বহু শতাব্দীর ইতিহাসের বাস্তবতাকে ধারণ করতে পেরেছিল বলেই হয়ত এখনও মূলত এই লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক পথেই সেদিনের ভারতবর্ষে এখন ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ এই তিন তিনটি স্বাধীন রাষ্ট্র বিরাজ করছে। তবে সেদিন আমাদের জন্য একটা চরম দুর্ভাগ্য ছিল যে, লাহোর প্রস্তাবের প্রস্তাবক শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হককে বাদ দিয়েই মওলানা আকরম খাঁ, হোসেন শহীদ সোহরওয়ার্দী, খাজা নাজিমুদ্দিন, মৌলভী তমিজুদ্দিন খাঁ প্রমুখের নেতৃত্বে বাংলায় আমাদের লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন তথা পাকিস্তান আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছিল।

এ কে ফজলুল হক শুধু মুসলিম লীগ থেকে ইস্তফা দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না, ১৯৪১ সালের ১১ অক্টোবর আইন সভার হিন্দু সদস্যদের সাথে মিলে একটি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করলেন তিনি। নতুন দলের নাম দিলেন প্রগ্রেসিভ মুসলিম লীগ কোয়ালিশন দল। মুসলিম লীগ নামটির তখন অসাধারণ জনপ্রিয়তা থাকায় তিনি মুসলিম লীগের সাথে প্রগ্রেসিভ শব্দ জুড়ে দিলেও আসলে এ দলে প্রধানত ছিলেন তাঁর পুরাতন কৃষক প্রজা দলের নেতৃবৃন্দের বৃহদাংশ। বৃহদাংশ এ জন্য বলছি যে, মওলানা আকরম খাঁ, মৌলভী তমিজউদ্দিন খাঁ, আবুল মনসুর আহমদ এক সময় কৃষক প্রজা দলে ছিলেন। কিন্তু লাহোর প্রস্তাব পাস হওয়ার পর এঁরা কেউই আর মুসলিম লীগের বাইরে থাকেননি।

এ কে ফজলুল হক মুসলিম লীগ থেকে পদত্যাগ করে যে নতুন কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করলেন, তা শুধু কংগ্রেসের সমর্থন লাভেই ধন্য হলো না, এদেশের চরম মুসলিম বিদ্বেষী সাম্প্রদায়িক হিন্দু মহাসভা নেতা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীও এই

www.pathagar.com

মন্ত্রিসভায় গুরুত্বপূর্ণ পদ লাভ করলেন। শ্যামাপ্রসাদের সংশ্লিষ্টতার কারণেই বাংলার ইতিহাসে এই মন্ত্রিসভা পরিচিতি লাভ করল 'শ্যামা হক মন্ত্রিসভা' নামে। স্বাভাবিক কারণেই বাংলার নবজাগ্রত মুসলিম সমাজ এই 'শ্যামা হক মন্ত্রিসভা' গঠনকে কখনও সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি।

ফজলুল কাদের গ্রেফতার

চারদিকে বিক্ষোভ-প্রতিবাদ শুরু হল মুসলিম লীগ ও মুসলিম ছাত্র লীগের নেতৃত্বে। এ বিক্ষোভ, এ প্রতিবাদের ঢেউ এসে লেগেছিল ফরিদপুরেও। তবে ফরিদপুরে এ আন্দোলনের মধ্যে কিছু বাড়তি বিষয়ও ছিল। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর মুসলিম-বিদ্বেষী রাজনীতির কথা আগেই বলেছি। তিনি ফজলুল হকের নেতৃত্বে প্রগ্রেসিভ মুসলিম লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার মন্ত্রী হওয়ার পরও তাঁর কথা-বার্তা, বক্তৃতা-বিবৃতি আগের মতই চালিয়ে যাচ্ছিলেন। মুসলিম লীগের নেতৃত্বে মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমির আন্দোলনের বিরোধিতায় পূর্ব অভ্যাস মত একবার তিনি বলে বসলেন ঃ 'মুসলমানরা ভারতবর্ষে বহিরাগত। তারা যদি পাকিস্তান দাবী নিয়ে বাড়াবাড়ি করে, তা হলে তাদের ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করে আরব সাগরে নিক্ষেপ করা হবে।" এর জবাবে মুসলিম ছাত্রনেতা জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরী ফরিদপুরে এক সভায় ঘোষণা করলেন, "হিন্দু তথা আর্যরা এদেশে এসেছিল ককেশাস পর্বতের গুহা থেকে বের হয়ে। তারা বাড়াবাড়ি করলে তাদেরকে পুনরায় সেই ককেশাস পর্বতে পাঠিয়ে দেয়া হবে।"

জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরী শ্যামা হক মন্ত্রিসভার মন্ত্রী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর নাম ধরে তাঁর বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। মন্ত্রীর বিরুদ্ধে বক্তৃতার কারণে তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা হল। ফরিদপুরে সভা করে ফজলুল কাদের চৌধুরী স্টীমার যোগে গোয়ালন্দ থেকে চাঁদপুর হয়ে চট্টগ্রাম ফিরছিলেন। তখনকার দিনে ফরিদপুর হতে চট্টগ্রাম যেতে প্রথমে ট্রেনে ফরিদপুর থেকে গোয়ালন্দ, তারপর গোয়ালন্দ থেকে স্টীমারে চাঁদপুর এবং চাঁদপুর থেকে ট্রেনে চট্টগ্রাম যাবার ব্যবস্থা ছিল। ফজলুল কাদের চৌধুরী চাঁদপুর পৌঁছলে তাঁকে সেখান থেকে গ্রেফতার করে ফরিদপুরে এসডিও কোর্টে হাজির করার নির্দেশ দেয়া হয়।

ফরিদপুরে এ খবর পৌঁছা মাত্র চারদিকে চরম উত্তেজনা দেখা দেয়। ছাত্ররা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। তারা সরকারের নির্দেশের প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং বন্দী ছাত্রনেতাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে দলে দলে ফরিদপুর রেল স্টেশনে জমায়েত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ট্রেন আসার নির্দিষ্ট সময়ের আগেই ছাত্র জনতার ভীড়ে স্টেশন গমগম করতে থাকে। ট্রেন প্লাটফর্মে আসার সাথে সাথে মুসলিম লীগ

www.pathagar.com

জিন্দাবাদ, পাকিস্তান জিন্দাবাদ, ফজলুল কাদের চৌধুরী জিন্দাবাদ, শ্যামা হক মিনিস্ট্রি মুর্দাবাদ প্রভৃতি ধ্বনিতে সমগ্র রেল স্টেশন প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। ফজলুল কাদের চৌধুরীকে পুলিশের গাড়ীতে করে এসডিও কোর্টে হাজির করা হয়।

রেল স্টেশন থেকে এসডিও কোর্টের দূরত্ব একেবারেই কম। এক ফার্লংও হবে না। মধ্যে শুধু ছোট্ট স্টেশন রোড। আগে পিছে হাজার হাজার ভক্ত ও সমর্থক পরিবেষ্টিত অবস্থায়ই ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল ফজলুল কাদের চৌধুরীকে বহনকারী পুলিশের গাড়ী। এসডিও কোর্টের ভেতর বাইরেও শত শত লোকের ভীড়। ফজলুল কাদের চৌধুরী কাঠগড়ায় দাঁড়ালেন। সুদর্শন ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক নেতৃসুলভ চেহারা। কাঠগড়ায় হাসি মুখে আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে তিনি দাঁড়িয়ে। হাতে সিগারেটের কৌটা। কোর্টে কিছুক্ষণ সওয়াল জবাবের পর জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরীর জামিন মঞ্জুর হল। আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে যার যার ঘরে ফিরে গেলাম।

ফরিদপুরে ফজলুল কাদের চৌধুরীর থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল জেলা বোর্ডের ডাক বাংলোতে। তখন জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন মুসলিম লীগ নেতা ইউসুফ আলী চৌধুরী ওরফে মোহন মিয়া। সন্ধ্যার পর আমরা আমাদের জামিন প্রাপ্ত নেতা ফজলুল কাদের চৌধুরীকে দেখতে ডাক বাংলোতে গেলাম। সেখানে আর এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হল। বাঙ্গালী মুসলমানদের অন্যতম ছাত্রনেতা সদ্য জামিন প্রাপ্ত ফজলুল কাদের চৌধুরী এখানে বিচারকের ভূমিকায়। আর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে জনাব মোজাম্মেল হোসেন (ওরফে মঞ্জু)। মোজাম্মেল হোসেন ফরিদপুর জেলা মুসলিম ছাত্রলীগের সভাপতি। এ কে ফজলুল হক মুসলিম লীগের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ এবং শ্যামা হক মন্ত্রিসভা গঠন করার পরও মোজাম্মেল হোসেন হক সাহেবের প্রতি সমর্থন অব্যাহত রেখেছেন এটাই তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ। মোজাম্মেল হোসেন আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছু বলতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু স্থানীয় মুসলিম ছাত্র লীগ নেতা-কর্মীদের বিরোধিতা, বিশেষ করে জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরীর ক্রুদ্ধ গর্জনের মুখে তাঁর সব প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। মোজাম্মেল হোসেনকে দলীয় আদর্শ ও শৃংখলা ভঙ্গের অপরাধে মুসলিম ছাত্রলীগ থেকে বহিষ্কার করা হল।

চল্লিশের দশকের প্রথম দিকে, সর্বভারতীয় মুসলিম ছাত্র আন্দোলনে বাংলাদেশের দু'জন ছাত্রনেতা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এদের একজন চট্টগ্রামের এ কে এম ফজলুল কাদের চৌধুরী, অপরজন ঢাকা জেলার আবদুল ওয়াসেক। নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ছাত্র সংগঠনটির নাম ছিল নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশন। এই ফেডারেশনের সভাপতি ছিলেন কায়েদে আজমের বিশ্বস্ত অনুসারী মাহমুদাবাদের রাজা সাহেব (নামটা এ মুহূর্তে মনে পড়ছে না)।

www.pathagar.com

যতদূর সম্ভব এই সংস্থার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরী। জনাব আবদুল ওয়াসেক সম্ভবত ছিলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম ছাত্রলীগের সভাপতি। দু'জনই খুব ভাল বক্তা ছিলেন। নিখিল ভারত-মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের সকল ইউনিটই যে একই নামে অভিহিত ছিল তা নয়। যেমন, আসামের প্রাদেশিক ইউনিটের নাম আসাম প্রাদেশিক মুসলিম ছাত্র ফেডারেশন থাকলেও অবিভক্ত বঙ্গ প্রদেশে এর নাম ছিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম ছাত্র লীগ। সেই সুবাদে আমরা মুসলিম ছাত্র লীগের সদস্য হিসাবেই পাকিস্তান আন্দোলনে শরীক হয়েছিলাম।

স্বাধীনতা আন্দোলনে হিন্দু ও মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গীগত একটা বড় পার্থক্য ছিল, পলাশীতে আমাদের স্বাধীনতা হারানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে। মুসলিম তরুণদের মধ্যে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজুদ্দৌলাহ সম্পর্কে যে আবেগ অনুভূতি ছিল, তা হিন্দুদের একটি ক্ষুদ্রাংশ ছাড়া অনেকের মধ্যেই ছিল না। ইংরেজদের চক্রান্তে সিরাজুদ্দৌলাহর চরিত্রে কালিমা লেপনের উদ্দেশ্যে 'অন্ধকূপ হত্যা'র যে কল্প-কাহিনীকে ইতিহাস বলে এতদিন চালিয়ে দেয়া হয়েছে, সেই মিথ্যা অপবাদ থেকে সিরাজুদ্দৌলাহ'র চরিত্রের কলংকমোচনের জন্য মুসলিম ছাত্র লীগ 'হলওয়েল মনুমেন্ট' অপসারণ আন্দোলনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। মুসলিম তরুণদের মধ্যে এ আন্দোলন ব্যাপক সাড়া জাগায়। এ আন্দোলনে বিশেষ করে মুসলিম ছাত্রনেতা আবদুল ওয়াসেকের ভূমিকা ছিল খুবই বলিষ্ঠ।

এক কালের নামকরা এ দু'জন মুসলিম ছাত্রনেতা ত্রিশের দশকের শেষ দিকে এবং চল্লিশের দশকের প্রথমদিকে খুব খ্যাতি অর্জন করলেও পরবর্তীকালে ছাত্র আন্দোলনে তাদের নাম তেমন আর শোনা যায়নি। জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরী চট্টগ্রামে মুসলিম লীগ সংগঠনে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেনএবং পাকিস্তান আমলে পাকিস্তান গণপরিষদের স্পীকার পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। কিন্তু ঢাকার ছাত্রনেতা জনাব আব্দুল ওয়াসেক রাজধানী ঢাকার রাজনীতির বিশাল সাগরে বলতে গেলে চিরতরে প্রায় তলিয়েই যান। পাকিস্তান আমলে ঢাকা জেলা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসাবে তাঁর কিছু ভূমিকা ছাড়া এক কালের এই জাঁদরেল ছাত্রনেতার আর তেমন কোন ভূমিকাই দেখা যায় না। অথচ এদেশে এমন এক দিন ছিল যখন আবদুল ওয়াসেক ছাড়া এদেশের মুসলিম ছাত্র আন্দোলনের কথা কেউ কল্পনাও করতে পারতো না।

বাংলাদেশে পাকিস্তান আন্দোলনকালে মুসলিম ছাত্র আন্দোলনে অন্যান্য যারা নেতৃত্ব দেন তাদের মধ্যে ছিলেন সর্বজনাব নূরুদ্দীন আহমদ, আনোয়ার হোসেন, সাদেকুর রহমান, মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী, জহিরুদ্দিন, শাহ আজিজুর রহমান,

www.pathagar.com

আবু সালেক, কাজী গোলাম মাহবুব, সুলতান হোসেন খান, আবু সাঈদ চৌধুরী, শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ। অবিভক্ত বঙ্গের রাজধানী কলিকাতায় অবস্থিত হওয়াতে তখন স্বাভাবিকভাবে কলিকাতাই রাজনৈতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু ছিল, যদিও ঢাকায় মুসলমানদের দাবীতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে মুসলিম রাজনীতিতে, বিশেষ করে পাকিস্তান আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করেও একটি বলিষ্ঠ ধারা গড়ে উঠেছিল।

ফরিদপুরে পাকিস্তান আন্দোলনে ছাত্রদের যারা নেতৃত্ব দেন, তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন জেলা মুসলিম ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন ওরফে বুলবুল। তিনি যেমন ছিলেন একজন সুবক্তা তেমনি ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী। এ জন্য তিনি ছাত্রদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। আমি যখন ফরিদপুরে ময়েজউদ্দিন হাই মাদ্রাসার ছাত্র, তখন আনোয়ার হোসেন ছিলেন রাজেন্দ্র কলেজের ছাত্র। স্কুল জীবনে তিনি জেলা স্কুলের ছাত্র ছিলেন। অন্যান্য স্কুলের মত জেলা স্কুলেও হিন্দুদের তুলনায় মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা ছিল খুবই কম। এই জেলা স্কুলে প্রতি বছর অত্যন্ত ধুমধামের সাথে স্বরস্বতী পূজা হত। শিক্ষক ও ছাত্রদের চাপে মুসলমান ছেলেরাও পূজার চাঁদা দিতে বাধ্য হত। ফরিদপুর জেলা স্কুলে এই আনোয়ার হোসেনের চেষ্টায়ই সর্বপ্রথম ফাতেহা দোয়াজদহম উপলক্ষে মিলাদ মাহফিল এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) জীবনাদর্শের উপর আলোচনার ব্যবস্থা হয়। অবশ্য এ মাহফিল অনুষ্ঠানের পেছনে জনাব ইউসুফ আলী চৌধুরী ওরফে মোহন মিয়ার প্রেরণা ও সাহায্যও কার্যকর ছিল। মোহন মিয়া সাহেবই জেলা স্কুলের এই প্রথম মিলাদ মাহফিল সফল করে তোলার জন্য বিখ্যাত মুসলিম বিজ্ঞানী ডঃ কুদরত-এ-খুদাকে ঐ মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসাবে আনার ব্যবস্থা করে দেন।

আমি ক্লাস সেভেনের ছাত্র থাকাকালেই ময়েজউদ্দিন হাই মাদ্রাসার সুপারিন্টেন্ডেন্ট মওলানা আফতাবউদ্দিন সাহেবের বাসায় জায়গীর থাকা শুরু করি, সে কথা আগেই বলেছি। এই জায়গীর বাড়ীতে বিশেষ করে সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেবের স্ত্রীর যে মাতৃস্নেহ আমি লাভ করেছিলাম তা জীবনে কখনও ভুলতে পারব না। কিন্তু এর মধ্যে সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেব বি-টি পড়ার সুযোগ পেয়ে দীর্ঘ ছুটি নিয়ে ফরিদপুর ত্যাগ করেন। তাঁর পরিবার ফরিদপুর ত্যাগ করাতে আমার জীবনে কিছুদিনের জন্য একটু সমস্যার সৃষ্টি হয়। আমার শিক্ষকদের আন্তরিক চেষ্টায় অবশ্য অল্পদিনের মধ্যে আমি প্রথমে গোপালপুরে এক পুলিশ কনস্টেবলের বাড়ীতে জায়গীর পাই এবং এর পরে স্টুডেন্টস হোমে আবাসিক ছাত্র হিসাবে চান্স পেয়ে যাই। হাই মাদ্রাসা ফাইনাল পরীক্ষা পর্যন্ত আমি এই স্টুডেন্টস হোমেই ছিলাম।

www.pathagar.com

স্টুডেন্টস হোম সম্পর্কে আগেই বলেছি, এটা ছিল দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের ফ্রি থাকা-খাওয়ার এক অভিনব প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনের পেছনে যদিও মোহন মিয়া সাহেবের অবদান ছিল প্রধান, এর পরিচালনার সাথে জড়িত ছিলেন ফরিদপুর শহরের সর্বস্তরের মুসলিম নেতৃবৃন্দ। স্টুডেন্টস হোমের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন মৌলভী বালাগতউল্লাহ। তিনি একই সাথে ছিলেন ময়েজউদ্দিন হাই মাদ্রাসার সহকারী সুপারিন্টেন্ডেন্ট এবং সুপারিন্টেন্ডেন্ট মওলানা আফতাবুদ্দিন সাহেব বি-টি পড়তে চলে গেলে তিনি হাই মাদ্রাসারও সুপারিন্টেন্ডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন।

স্টুডেন্টস হোমে শুধু ময়েজউদ্দিন হাই মাদ্রাসার নয়, কলেজ এবং অন্যান্য স্কুলের ছাত্রদের অনেকেও থাকত। আমরা যারা স্কুল ও মাদ্রাসার ছাত্র ছিলাম, তারা স্বাভাবিকভাবেই কলেজের ছাত্রদের বড় ভাই হিসাবে যথেষ্ট সম্মান করতাম এবং তারাও আমাদের স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতেন। আমাদের পড়াশোনার ব্যাপারে প্রয়োজনে আমরা কলেজের ছাত্রদের সাহায্য নিতে পারতাম, এটা স্টুডেন্টস হোমে আমাদের জন্য ছিল একটা বাড়তি সুবিধা। মোটের উপর বড়-ছোট নানা বয়সের ভাই ও বন্ধু-বান্ধবদের সাথে মিলে স্টুডেন্টস হোমে বেশ সুখেই ছিলাম বলতে হয়। তবুও জায়গীর বাড়ীতে বিশেষত সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেবের বাড়ীতে জায়গীর থাকাকালে যে একটা ঘরোয়া পারিবারিক পরিবেশে ছিলাম, স্টুডেন্টস হোমে তার অভাব অনুভব করতাম। সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেব বি-টি অধ্যয়ন শেষে ফরিদপুর ফিরলেও পুরাতন জায়গীর বাড়ীতে আর আমার ফিরে যাওয়া হয় নাই।

পরবর্তীকালে সরকারী চাকুরী নিয়ে মওলানা আফতাবুদ্দিন সাহেব ফরিদপুর ছেড়ে চলে যান। আমিও ১৯৪৫ সালের মার্চে হাই মাদ্রাসা ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে ফরিদপুর ত্যাগ করি। ফলে তাঁদের সাথে আমার দেখা-সাক্ষাতের সম্ভাবনা আর থাকে না। তবে অনেকটা দৈবাৎই বলতে হবে, বহু, বহুদিন পরে ঢাকায় একবার সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেবের স্ত্রী বেগম রওশন আরার সাথে দেখা হয় আমার। ঠিক কোন্ বছর তা মনে নেই। তার যে মেয়েকে দু'তিন বছরের দেখে এসেছিলাম– সে এখন বড় হয়েছে, তার বিয়ে হয়েছে। শান্তিনগর-রাজারবাগ রোডে তিনি মেয়ের বাসায় উঠেছিলেন। খবর পেয়ে গেলাম। বয়সের ভারে ক্লান্তির ছাপ পড়েছে তাঁর চেহারায়। তবুও আমাকে দেখে মনে হল তাঁর মাতৃস্নেহ নতুন করে উথলে উঠেছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জানতে চেষ্টা করলেন আমার সম্বন্ধে– কোথায় থাকি, কি করি ইত্যাদি ইত্যাদি। শরীরের দিকে যত্ন নিতে উপদেশ দিলেন এবং সবশেষে নতুন করে জানালেন একটি অতি পুরনো অনুরোধঃ সুযোগ পেলে যেন একবার শাহজাদপুরে তাদের বাড়ীতে যাই। তাদের বাড়ী মানে অবশ্য তাঁর পৈতৃক বাড়ী।

www.pathagar.com

পুরাতন অনুরোধ বলছি এ জন্য যে, আমি ফরিদপুরে যখন তাঁর বাসায় জায়গীর থাকতাম তখনও তিনি প্রায়ই শাহজাদপুরের কথা বলতেন। বলতেন তাঁর ভাইদের কথাঃ রাজা, আমীর, বাদশা, পাশা– যারা কৃতী ফুটবলার হিসাবে শুধু শাহজাদপুর কেন, যারা পাবনা জেলায়ই সুপরিচিত ছিলেন। শাহজাদপুর শহরে এই বনেদী পরিবারের ঠিকানা খুঁজে পাওয়া কোন ব্যাপারই নয়। জায়গীর থাকাকালেই তাঁর মুখে এসব গল্প শুনে বহুবার ইচ্ছা হয়েছে একবার শাহজাদপুর যাব। কিন্তু সে ইচ্ছা অদ্যাবধি অপূর্ণই রয়ে গেছে। আর এতদিন পর এখন তো জানিই না আদৌ তিনি বেঁচে আছেন কিনা, বা বেঁচে থাকলেও কোথায়, কি অবস্থায় আছেন।

স্টুডেন্টস হোমে বেশ ভালই ছিলাম। মাদ্রাসার উত্তর-পূর্ব পাশে স্টুডেন্টস হোম। আর মাদ্রাসার ঠিক দক্ষিণ দিকে ছিল মাদ্রাসা হোস্টেল। হোস্টেলে যারা থাকত তারা সবাই ধনীর দুলাল ছিল বলে তাদের কেউ কেউ স্টুডেন্টস হোমের বোর্ডারদের একটু হেকারতের দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করতো। তবে লেখাপড়ায় আমাদের রেকর্ড ভাল ছিল বলে আমরা সেই হিসাবে যথেষ্ট গৌরব অনুভব করতাম। স্টুডেন্টস হোম মাদ্রাসা-সংলগ্ন হওয়াতে আমরা ২৪ ঘন্টা মাদ্রাসা ক্যাম্পাসেই থাকতাম বলা চলে। হোমের সুপারিন্টেন্ডেন্ট মৌলভী বালাগতউল্লাহ সাহেব প্রশাসক হিসাবে অত্যন্ত কঠোর ও নিয়মতান্ত্রিক হলেও তাঁর মধ্যে যে একটা স্নেহশীল পিতৃহৃদয় ছিল তা আমাদের কারো অসুখ-বিসুখ বা কোন সমস্যা হলে টের পেতাম।

স্টুডেন্টস হোম চলতো প্রধানত জেলা বোর্ডের গ্রান্টস, সরকারী অনুদান, হোম পরিচালনা কমিটির সদস্যবৃন্দের চাঁদা এবং অন্যান্যা শুভানুধ্যায়ীদের দান থেকে। আমরা স্টুডেন্টস হোম-এর পরিচালকদের বাড়ী যেয়ে যেয়ে তাদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করতাম। স্টুডেন্টস হোম-এর প্রতিষ্ঠাতা ইউসুফ আলী চৌধুরী একজন রাজনীতিবিদ হওয়াতে স্টুডেন্টস হোম-এর উপর অনিবার্যভাবেই রাজনৈতিক প্রভাব পড়ে। কলিকাতা থেকে বড় মাপের কোন নেতা বা মন্ত্রী ফরিদপুর এলে মোহন মিয়া সাহেব তাঁকে নিয়ে আসতেন স্টুডেন্টস হোম-এ। আমরা এই সুযোগে হোম-এর চাঁদার খাতাটা তাঁর সামনে মেলে ধরতাম। এটা অনিয়মিত হলেও এভাবে হোম-এর জন্য বেশ ভাল সাহায্য পাওয়া যেতো। স্টুডেন্টস হোম-এ আমরা যারা ছিলাম, তারা প্রায় সবাই কম-বেশী পাকিস্তান আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলাম। এটা ছিল তখনকার পটভূমিতে অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। বাংলাদেশের প্রায় সমগ্র মুসলিম ছাত্র সমাজই তখন পাকিস্তান আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। কলিকাতা থেকে প্রবীণ বা তরুণ মুসলিম নেতাদের প্রায় সবাই ফরিদপুর এলে স্টুডেন্টস হোম-এ একবার আসতেন। কলিকাতা থেকে ১৯৪২ কি ১৯৪৩-এ

www.pathagar.com

একবার এলেন লম্বা ছিপছিপে চেহারার একজন ছাত্রনেতা। পরনে সাদা পাজামা ও কালো শেরোয়ানী। চোখে চশমা। কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজে আইএ পড়েন। শুনলাম নাম তার শেখ মুজিবুর রহমান। শেখ মুজিবের সঙ্গে তখন দেখা হলেও তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হয় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ঢাকায় ভাষা আন্দোলনকালে।

বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার মত তখন ফরিদপুরেও মুসলিম সমাজ ঐক্যবদ্ধভাবে পাকিস্তান আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিল। ব্যতিক্রম যে একেবারে ছিল না, তা নয়। এই ব্যতিক্রমী ধারার অন্যতম ছিলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক হুমায়ূন কবীর। তাঁর বাড়ী ছিল ফরিদপুর শহরের আলীপুরে। ফরিদপুর জেলার নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের অনেকেই ইউসুফ আলী চৌধুরীর সাথে রাজনীতি ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করলেও পাকিস্তান আন্দোলনের প্রশ্নে এক ছিলেন। কিন্তু হুমায়ূন কবীর আগা-গোড়াই ছিলেন কংগ্রেসী রাজনীতির সমর্থক এবং পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধী। ফজলুল হক ১৯৪১ সালের অক্টোবর মাসে মুসলিম লীগ ত্যাগ করে শ্যামা হক মন্ত্রিসভা গঠন করলে জনাব হুমায়ূন কবীর হক সাহেবের সঙ্গে যোগ দিলেন।

হুমায়ূন কবীর রাজনীতি ক্ষেত্রে যাই করুন, ব্যক্তিগতভাবে মুসলিম সমাজে তাঁর সম্পর্কে একটা উচ্চ ধারণা ছিল একজন উচ্চ শিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তি হিসেবে। সত্য-মিথ্যা জানি না, সে সময় তাঁর সম্পর্কে একটি কথা প্রচলিত ছিল যে, তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পেলেও তাঁকে প্রথম স্থানের মর্যাদা থেকে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করা হয়। কিন্তু তিনি একজন হিন্দু মেয়েকে মুসলমান না করে বিবাহ করেন, এ জন্য মুসলিম সমাজে তাঁর সম্পর্কে বিরূপ ধারণাও ছিল।

কবীর সাহেবের বাড়ীতে তখন দু'জন যুবক জায়গীর থাকতেন। একজন আবদুল হাকিম। অপরজন ফজলে আলী। আবদুল হাকিম ছিলেন রাজনৈতিক কর্মী। ফজলে আলী ছিলেন ময়েজউদ্দিন হাই মাদ্রাসার ছাত্র। পড়তেন যতদূর সম্ভব আমার এক ক্লাস উপরে। আমি মাদ্রাসা ছাত্র সংসদে সাহিত্য সম্পাদক ছিলাম। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বিতর্ক সভার আয়োজন করা আমার অন্যতম দায়িত্ব ছিল। এই ফজলে আলী বিতর্ক সভায় নিয়মিত অংশ নিতেন। ফরিদপুর ত্যাগ করার পর বহুদিন ফজলে আলী সাহেবের খবর জানতাম না। বছর কয়েক আগে হঠাৎ করেই একদিন তিনি ইনকিলাব অফিসে এসে হাজির। কথাবার্তায় মনে হল, আগের চিন্তাধারার খুব কমই তাঁর মধ্যে অবশিষ্ট আছে।

আবদুল হাকিম রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন। তাঁর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল ঃ তিনি যখন যে কাজে লাগতেন, তাতে মন-প্রাণ ঢেলেই নামতেন। জনাব হুমায়ূন

www.pathagar.com

কবীরের দৃষ্টান্ত অনুসরণে শ্যামা-হক মিনিস্ট্রীর আমলে তিনিও অতিমাত্রায় মুসলিম লীগ বিরোধী ভূমিকা পালন করেছিলেন। আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে, শ্যামা-হক মন্ত্রিসভার এক মন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে আমরা কালো পতাকা দেখাতে গিয়েছিলাম গোয়ালন্দ। আমরা সবাই ছিলাম নিরীহ ছাত্র। কালো পতাকা প্রদর্শনের মুহূর্তে হঠাৎ আবদুল হাকিম এক লম্বা লাঠি নিয়ে বেধড়ক পিটিয়ে যেভাবে আমাদের আহত করেছিলেন তা বহুদিন আমরা ভুলতে পারিনি।

পাকিস্তান হওয়ার পর জনাব হুমায়ূন কবীর তাঁর রাজনীতিক ভাই জাহাঙ্গীর কবীরসহ ভারতে চলে গেলেও আবদুল হাকিম ফরিদপুরেই রয়ে যান। পাকিস্তান আমলে ফরিদপুর শহরে প্রতিষ্ঠিত 'কায়েদে আজম পাঠাগারের' লাইব্রেরিয়ান হিসেবে তিনি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। বাংলাদেশ আমলে ঐ লাইব্রেরীর নাম পরিবর্তিত হয়ে 'শেরে বাংলা পাঠাগারে' রূপান্তরিত হয়। একজন নিষ্ঠাবান সমাজসেবী হিসাবে আবদুল হাকিম নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন এবং এক পর্যায়ে ফরিদপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

হুমায়ূন কবীর সাহেবকে আমি প্রথম দেখি ১৯৪১ কি ১৯৪২ সালে ফরিদপুর জেলা স্কুলে একটি মিলাদুন্নবী অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে। আমার এখনো মনে আছে, তিনি ইসলামের বিশ্বজনীন রূপের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, মুসলমানদের পাশ্চাত্য জগতে মোহামেডান রূপে ব্যাখ্যা দেয়ার যে চেষ্টা চালানো হয় তা বিভ্রান্তিকর। তাঁর বক্তব্য ছিল খুবই পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং বক্তব্য উপস্থাপনের পদ্ধতি ছিল খুবই হৃদয়গ্রাহী।

পরবর্তীকালে তিনি ভারতীয় কংগ্রেসের ব্যানারে রাজনীতি করতে যেয়ে যে ভূমিকাই পালন করে থাকুন, তাঁর শেষ বই 'সায়েন্স, ডেমোক্র্যাসী এন্ড ইসলাম' প্রমাণ করে, ইসলাম আমৃত্যু তাঁর বিশ্বাসে ও মননে একটা শ্রদ্ধাপূর্ণ আসনে অধিষ্ঠিত ছিল। সাতচল্লিশ-পরবর্তীকালে তিনি একবার ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে মিসর সফর করেন। সেখানে তিনি ভারত সম্বন্ধে মুসলিম বিশ্বের প্রচলিত ধারণা দূর করতে গিয়ে বলেছিলেন, 'যারা প্রচার করে ভারত ইসলামের বিরোধী, তাদের বক্তব্য ঠিক নয়। ভারতে ইসলামী আদর্শকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়। হিন্দু নারীদের সম্পত্তির অধিকার দিয়ে ভারত যে আইন প্রণয়ন করেছে তা নেয়া হয়েছে ইসলাম থেকেই'। ইসলাম সম্বন্ধে প্রফেসর হুমায়ুন কবীরের এসব বক্তব্য কতটা আন্তরিক, কতটা কূটনৈতিক ছিল তা নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে, তবে ভারতীয় সেকুলারিজমের যে নমুনা তিনি বাস্তব ক্ষেত্রে দেখেছিলেন তাতে যে তিনি যথেষ্ট হতাশ ছিলেন, তা তিনি তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধুদের কাছে প্রকাশ করতে দ্বিধা করেননি। একাত্তর পূর্বকালে বিশিষ্ট দার্শনিক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ গিয়েছিলেন

www.pathagar.com

পাকিস্তান ফিলোজফিক্যাল কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসেবে দক্ষিণ ভারতের আন্নামালাইনগর ইন্ডিয়ান ফিলোজফিক্যাল কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিতে। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফকে একান্তে পেয়ে তিনি মনের অনেক ক্ষোভ ও বেদনার কথাই তাকে জানান বলে জানা যায়।

প্রফেসর হুমায়ূন কবীর একজন পণ্ডিত ব্যক্তি হিসাবে একদা মুসলিম সমাজের গর্ব ও গৌরবের পাত্র ছিলেন। অতি উদারতাবশত তিনি হিন্দু মহিলাকে বিবাহ করেছিলেন। পারিবারিক জীবনে অসাম্প্রদায়িকতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের পরিণতিতে তাঁর সন্তান-সন্ততিদের মুসলিম পরিচিতি কতখানি অক্ষুণ্ন আছে, সে প্রশ্নের কথা বাদ দিলেও জীবন সায়াহ্নে তিনি ভারতীয় সেকুলারিজমের যে নমুনা দেখে গেছেন তা তাঁর জন্য মোটেও সুখকর ছিল না। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারীতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলিম-বিরোধী যে দাঙ্গা হয়, তার প্রতিবাদ করায় কলিকাতার 'দৈনিক যুগান্তর' পত্রিকায় দিনের পর দিন হুমায়ূন কবীরের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অপবাদ দিয়ে কুৎসাপূর্ণ সমালোচনা প্রকাশ করা হয়।

হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার যে রূপ দেখে হুমায়ূন কবীর শেষ বয়সে দুঃখ নিয়ে মৃত্যুবরণ করেন, সে অভিজ্ঞতা তাঁর একার ছিল না।

একই রূপ দুঃখজনক অভিজ্ঞতা লাভ করেন এককালের কংগ্রেস সভাপতি মওলানা আবুল কালাম আজাদ, শের-এ-কাশ্মীর শেখ আবদুল্লাহ, পশ্চিমবঙ্গের প্রসিদ্ধ বাগ্মী জননেতা সৈয়দ বদরুদ্দোজা এবং কমরেড মুজফফর আহমদ। এরা অনেকে নিজ নিজ দুঃখজনক অভিজ্ঞতার কথা জীবন সায়াহ্নে বর্ণনাও করে গেছেন। মজার ব্যাপার এই যে, যারা পাকিস্তান আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করেন, সেই কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ থেকে শুরু করে যুক্ত প্রদেশের চৌধুরী খালেকুজ্জামান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের খান আবদুল কাইউম খান, পাঞ্জাবের মিয়া ইফতিখার উদ্দিন এবং বাংলা-আসামের এ কে ফজলুল হক, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, হোসেন শহীদ সোহরওয়ার্দী, মৌলভী তমিজুদ্দিন খাঁ, শামসুদ্দীন আহমদ, মওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ, আবুল কালাম শামসুদ্দিন, আবুল মনসুর আহমদ, মোহাম্মদ মোদাব্বের, চৌধুরী মোয়াজ্জেম হোসেন (লালমিয়া) প্রমুখ নেতৃবৃন্দের অনেকেই একদা কংগ্রেসের রাজনীতির সাথে সংযুক্ত ছিলেন। কংগ্রেসের হিন্দু নেতৃত্বের সেকুলারিজমের স্বরূপ সম্বন্ধে মোহভঙ্গ হবার ফলেই তারা পাকিস্তান আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। হুমায়ুন কবীর, শেখ আবদুল্লাহ বা মওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখের সাথে তাঁদের পার্থক্য ছিল এই যে, তারা যে বাস্তবতা উপলব্ধি করেছিলেন অনেক আগে এবং সেই দুঃখজনক অভিজ্ঞতার আলোকে পাকিস্তান

www.pathagar.com

আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন, এঁরা সেই একই বাস্তবতা অনুধাবন করলেন অনেক পরে, অনেক বিলম্বে, এত বিলম্বে যে, তখন অর্থহীন বিলাপ করা ছাড়া এঁদের আর করার কিছুই ছিল না।

হিন্দু নেতাদের ইংরেজ প্রীতি

উপমহাদেশের সংখ্যাগুরু হিন্দুদের প্রভাবশালী অংশের যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পাকিস্তান আন্দোলনের দিকে ঠেলে দেয়, তার সূত্রপাত অবশ্য হঠাৎ হয়নি। তবে একথা অবশ্যই অনস্বীকার্য, বৃটিশ শাসনকে আশ্রয় করে এটা বেড়ে উঠার সুযোগ পায়। ইতিহাস বলে পলাশীতে আমাদের স্বাধীনতা সূর্য যে অস্ত যায় তার পেছনে সিরাজুদ্দৌলার কুচক্রী অমাত্যবর্গের মধ্যে মীর জাফরের নাম বহুল উচ্চারিত হলেও মীর জাফর ছিল মূল চক্রান্তকারীদের শিখণ্ডী মাত্র। মূল চক্রান্ত পর্বে ক্লাইভদের সাথে জড়িত ছিল জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ, উর্মি চাঁদ প্রমুখ। ফলে ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এক পর্যায়ে মীর জাফর, মীর কাশিম প্রভৃতি মুসলিম অমাত্যবর্গ ইংরেজদের কুনজরে পড়লেও হিন্দু নেতৃবর্গের অধিকাংশের সাথে ইংরেজদের সুসম্পর্ক একশ' বছরেও নষ্ট হয়নি। এই একশ' বছরে মীর কাসিম থেকে শুরু করে মজনু শাহ, মুসা শাহ, হাজী শরীয়তুল্লাহ, দুদুমিয়া, তিতুমীর এবং জেহাদ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ইংরেজ শাসন উৎখাতের জন্য নানাভাবে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে গেলেও হিন্দু নেতৃত্ব ইংরেজদের মুসলিম দমন নীতির প্রতি সহযোগিতা দান করে নিজেদের দ্রুত শ্রীবৃদ্ধি সাধনে ব্রতী থাকেন। এভাবেই একটি সমৃদ্ধ মুসলিম জাতিকে মাত্র একশ' বছরের মধ্যে ভিক্ষুকের জাতিতে পরিণত করবার যে কৃতিত্ব ইংরেজ দেখাতে পেরেছিল তার পেছনে উপমহাদেশের সংখ্যাগুরু হিন্দু নেতৃবৃন্দের সোৎসাহ সমর্থন ও সহযোগিতা না থাকলে এমনটা কিছুতেই সম্ভবপর হত না। হিন্দু নেতৃত্বের এই ইংরেজ তোষণ ও মুসলিম বিদ্বেষী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় সাহিত্য সম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে, যিনি বলতে পেরেছিলেন– "ইংরেজ আমাদের শত্রু নয়, আমাদের আসল শত্রু মুসলমান।" আর সিপাহী বিপ্লবের ব্যর্থতার পর প্রখ্যাত কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ইংরেজের হাতে মুসলিম নির্যাতনে উল্লসিত হয়ে মুসলমানদের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ এবং ইংরেজের জয়গান গেয়ে কবিতা রচনা করতে পেরেছিলেন। অন্যতম কবি হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় তার কবিতায় ইংরেজ স্তুতি করতে যেয়ে লিখতে পেরেছিলেনঃ

"না থাকিলে এ ইংরাজ
ভারত অরণ্য আজ, কে শিখাত, কে দেখাতো,

www.pathagar.com

কে বা পথে লয়ে যেতো
যে পথ অনেকদিন করেছ বর্জন।"

এই ইংরেজ স্তুতির সুফল হিন্দুরা হাতে হাতেই পেয়েছিলেন। ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে মুসলমানরা শাসনকর্তৃত্বে থাকা সত্ত্বেও তারা হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে একটা ভারসাম্য বজায় রাখতে সক্ষম হন। কিন্তু ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার পর সে ভারসাম্য আর রইল না। গবেষক শ্রী অমলেন্দু দে'র ভাষায় ঃ

"প্রাক পলাশী যুগে শাসক সম্প্রদায়রূপে মুসলমানরা সেনাবাহিনী ও ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থা পরিচালনা করতেন। আমিল ও ফৌজদার পদে অধিষ্ঠিত থাকায় শাসন ব্যবহার প্রধান পরিচালকও তারাই ছিলেন। অন্যদিকে ভূমি ব্যবস্থায় ও ব্যবসা-বাণিজ্যে হিন্দুদের যথেষ্ট প্রাধান্য ছিল। দশ ভাগের নয় ভাগ জমিদারীই হিন্দুদের দখলে ছিল। কানুনগো বিভাগে কর্মরত সবাই, আর বড় বড় ব্যবসায়ী ও ব্যাংকার হিন্দু ছিলেন। অন্যদিকে বেশীরভাগ কৃষক মুসলমান ছিলেন। ফৌজদারী বিচারের ক্ষেত্রে হিন্দুরা কিছু কিছু অসুবিধা ভোগ করলেও বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক এমনভাবে নিযুক্ত ছিলেন যে, সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনের ভারসাম্য কখনও বিনষ্ট হয়নি। কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া'য় অবস্থার মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। খুব দ্রুতগতিতে মুসলমানরা দুরবস্থায় পতিত হন। শাসনযন্ত্রে নিযুক্ত মুসলমান আমিল-ফৌজদাররা অধিকারচ্যুত হন। মুসলমান সৈন্যদের পরিবর্তে সিপাহীরা নিযুক্ত হওয়ায় তারাও কর্মচ্যুত হন। বিচার বিভাগে মুসলমানদের ক্ষমতা লুপ্ত হয়। এইভাবে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই মুসলমানদের অধোগতি হয়।"

(দ্রষ্টব্য ঃ "বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ "– অমলেন্দু দে, পৃষ্ঠা- ১০৫)

শ্রী অমলেন্দু দের লেখা থেকেই বুঝা যায়, ইংরেজ শাসনামলে মুসলমানদের দ্রুত 'অধোগতি' হয়েছিল। কিন্তু সে অধোগতির স্বরূপ ও পরিমাণটা কেমন ছিল? সে অধোগতি ছিল এক কথায় সার্বিক এবং সামগ্রিক। একটি সমৃদ্ধ জাতিকে মাত্র একশ' বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ নিঃস্ব ভিখারীর জাতিতে পরিণত করা হয়েছিল। ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে মুসলমানদের জন্য সরকারী চাকরি ও প্রশাসনের মর্যাদাপূর্ণ পদের দরজাই শুধু বন্ধ হয়ে গেল না; তাদের আয়মা-জমিদারী-জায়গীরদারী থেকেও সুপরিকল্পিতভাবে উৎখাত করা হল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

১৭৯৩ সালে পূর্বতন ভূমি ব্যবস্থা পাল্টে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয়। তাতে একদিকে যেমন জমির ওপর জমিদারের নিরংকুশ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়,

www.pathagar.com

অপরদিকে এই ব্যবস্থার অধীনে যারা জমিদার হন তাদের প্রায় সবাই ছিলেন হিন্দু। বৃটিশ শাসন শুরুর থেকেই নব্য শাসকেরা মুসলমানদেরকে এক নম্বর দুশমন ধরে নিয়েছিল। কিসে কতভাবে মুসলমানদের সর্বনাশ করা যায় ইংরেজদের সেটাই ছিল প্রধান চিন্তা, আর এ ব্যাপারে হিন্দু নেতৃবৃন্দ ছিলেন তাদের সক্রিয় দোসর ও সহযোগী। শুধু অর্থনৈতিক দিকেই নয়, শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারেও যে মুসলমানদের পেছনে ঠেলে দেয়ার অপচেষ্টা চালানো হয় তার এক নির্মম দৃষ্টান্ত ছিল হাজী মহসিনের ওয়াকফ সম্পত্তির অর্থে পরিচালিত মহসিন ফান্ডের শিক্ষা কার্যক্রম নিয়ে ছিনিমিনি খেলা। মহসিন ফান্ড প্রবর্তিত হয় পিছিয়ে পড়া মুসলমানদের শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে। কিন্তু এই ফান্ডের টাকা মুসলমান ছাত্রদের বঞ্চিত করে হিন্দু শিক্ষার্থীদের পেছনেই অধিক ব্যয় করা হতো। শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমানদের প্রতি বৈষম্যের আরেকটি উদাহরণ ছিল সরকারী টাকায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা। দেশের তৎকালীন এই উচ্চতম শিক্ষায়তনটি একটি সরকারী কলেজ হলেও এর দরজা মুসলমান শিক্ষার্থীদের জন্য বন্ধ ছিল। বাঙালী মুসলমানের আধুনিক শিক্ষার পথিকৃৎ নওয়াব আবদুল লতিফ এই অন্যায় অব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। তাঁর প্রচেষ্টাতেই মহসিন ফান্ড নিয়ে ছিনিমিনি খেলা বন্ধ হয় এবং হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সী কলেজে রূপান্তরিত হয়। ফলে সেই কলেজে মুসলমান শিক্ষার্থীরা উচ্চ শিক্ষার সুযোগ লাভ করে।

প্রথম বঙ্গভঙ্গ

আজ যে অঞ্চল নিয়ে বাংলাদেশ গঠিত, কমবেশী এই অঞ্চল নিয়েই ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করে ১৯০৫ সালে গঠিত হয় 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশ। এতে বৃটিশ আমলের দীর্ঘ অবহেলিত মুসলিম অধ্যুষিত পূর্ববাংলার জনগণ একটু উন্নতির মুখ দেখার সুযোগ পায়। কিন্তু কলিকাতা-প্রবাসী হিন্দু জমিদাররা প্রবল আন্দোলন করে সেই সম্ভাবনা ভণ্ডুল করে দেয়। বিক্ষুব্ধ মুসলমানদের শান্ত করার উদ্দেশ্যে সরকার তাদের অন্যতম দাবী ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিষয় বিবেচনার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেন। কিন্তু এতেও বাধ সাধেন কলিকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু কবি-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা। তারা এবার যুক্তি দিলেন– পূর্ববঙ্গের বেশীর ভাগ মানুষ মুসলমান কৃষক, তাদের উচ্চ শিক্ষার জন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন নেই। তাদের প্রবল প্রতিরোধের ফলেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা প্রায় এক দশক পিছিয়ে যায়।

বেঙ্গল প্যাক্টের অকাল মৃত্যু

চাকরির ক্ষেত্রে মুসলমানদের বঞ্চনার প্রতিকারার্থে ১৯২৩ সালে দেশবন্ধু সি আর দাস, এ কে ফজলুল হক, শহীদ সোহরওয়ার্দী প্রমুখ হিন্দু-মুসলিম নেতৃবৃন্দ

www.pathagar.com

স্বাক্ষর করেন ঐতিহাসিক 'বেঙ্গল প্যাক্ট'। কিন্তু কট্টরপন্থী হিন্দু সাম্প্রদায়িক নেতৃবৃন্দের কল্যাণে প্রায় আঁতুর ঘরেই এই মহতী প্রচেষ্টা অক্কাপ্রাপ্ত হয়। এভাবে কি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, কি শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, কি চাকরি ও সরকারী প্রশাসনের ক্ষেত্রে– সর্বত্র মুসলমানরা একদিকে ইংরেজ, অন্যদিকে প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায়ের আগ্রাসী বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গির শিকার হওয়ার ফলে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমির আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া আর গত্যন্তর রইল না।

উপমহাদেশের মধ্যে বাংলাদেশেই যে এ আন্দোলন সব চাইতে জোরদার হয়েছিল, তার অন্যতম কারণ, সমগ্র উপমহাদেশের মধ্যে এই বাংলায়ই ইংরেজ শাসন দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠিত থাকে। বাংলার মুসলমানরা ইংরেজ শাসনের দরুন যেরূপ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তেমনটা আর কোন অঞ্চলে মুসলমানরা হয়নি। ১৯৪২-৪৩ সালের মধ্যেই পাকিস্তান আন্দোলন, বিশেষত বাংলাদেশে, ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। পাকিস্তান আন্দোলনের এই গণভিত্তি লাভের পেছনে ঐতিহাসিক অবদান রাখে মুসলিম লীগের অঘোষিত ওলামা ফ্রন্ট জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম। ১৯৪২ সালে কলিকাতার গড়ের মাঠে এক সর্বভারতীয় ওলামা সম্মেলনে এই সংস্থা গঠিত হয়। এই ওলামা সম্মেলনই কংগ্রেসপন্থী জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ-এর সাথে সংস্রব ছিন্ন করে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অসংখ্য ওলামায়ে দীন জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম-এ যোগ দেন। উপমহাদেশের সর্বজনমান্য আলেম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম-এর সভাপতি নির্বাচিত হন। বিখ্যাত দার্শনিক আলেম আল্লামা আজাদ সুবহানী এই জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম সংগঠনে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন। বাংলাদেশের সমস্ত নেতৃস্থানীয় আলেম, যেমন ফুরফুরা শরীফের গদ্দীনশীন পীর হযরত মওলানা আবদুল হাই সিদ্দিকী, হযরত মওলানা জাফর আহমদ ওসমানী, হযরত মওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী, মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতার জনক মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মওলানা আবদুল্লাহিল বাকী, মওলানা আবদুল্লাহিল কাফী প্রমুখ– এক কথায় বাংলার সকল দল ও মতের পীর, মাশায়েখ ও ওলামায়ে কেরাম এই জমিয়তে যোগদান করে পাকিস্তান আন্দোলনে তাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন।

১৯৪২ সাল বাংলাদেশে পাকিস্তান আন্দোলনের ইতিহাসে আরেক কারণেও বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। এই বছরেই পাকিস্তান আন্দোলনের সমর্থক দু'টি সাংস্কৃতিক সংস্থা ঢাকার পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ এবং কলিকাতার পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দু'টি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিসেবী মহলে পাকিস্তান আন্দোলনের দ্রুত প্রসার লাভ করে। এসবের পাশাপাশি পাকিস্তান এবং মুসলিম জাগরণের বাণী জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে

www.pathagar.com

দেবার লক্ষ্যে কাজ করে যেতে থাকে কলিকাতার দৈনিক আজাদ, সাপ্তাহিক মিল্লাত, সাপ্তাহিক মোহাম্মদী, মাসিক মোহাম্মদী, মাসিক সওগাত, সাপ্তাহিক মোসলেম, সাপ্তাহিক মদীনা, ঢাকার পাক্ষিক পাকিস্তান, সিলেটের পাক্ষিক প্রভাতী প্রভৃতি পত্রিকা। কলিকাতার দু'টি ইংরেজী দৈনিক মর্নিং নিউজ এবং স্টার অব ইন্ডিয়াও এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১৯৪৩ সাল আরও দু'টি ঘটনার জন্য বিশেষ গুরুত্বের দাবীদার। বিখ্যাত দার্শনিক রাজনীতিক জনাব আবুল হাশিম ১৯৪৩ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। মুসলিম লীগের তিনিই ছিলেন প্রথম হোলটাইমার সাধারণ সম্পাদক। তিনি ক্ষমতার রাজনীতি তথা মন্ত্রীত্বের লোভের তোয়াক্কা না করে একই সাথে পাকিস্তান আন্দোলনের একটি দার্শনিক দিকনির্দেশনা এবং গণভিত্তি দানে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪৩ সালের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল ঃ এই বছরই শ্যামা হক মন্ত্রিসভার পতন ঘটে এবং খাজা নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে বাংলায় মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।

পাকিস্তান আন্দোলনের কর্মীদের জন্য মুসলিম লীগের মন্ত্রিসভা গঠন যেমন আনন্দদায়ক ঘটনা ছিল, তেমনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সেই কঠিন দিনগুলোতে এই মন্ত্রিসভা গঠন একই সাথে ছিল একটি চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার। বিশ্বযুদ্ধের এক পর্যায়ে অক্ষশক্তির অন্যতম দেশ জাপান গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া দখল করে বার্মা পর্যন্ত কবজা করে নেয়। কলিকাতা, চট্টগ্রাম, ফেনীসহ বাংলার বিভিন্ন শহরে জাপানী যুদ্ধ বিমান থেকে বোমা বর্ষণ করা হয়। বাংলাদেশের যে কোন শহরে জাপান যে কোন দিন বিমান হামলা চালাতে পারে এই আশংকা যেমন জনগণকে ভীত শংকিত করে তুলেছিল, তেমনি ইংরেজ সরকার আতংকিত হয়ে পড়েছিল অগ্রসরমান জাপানী বাহিনীর হাতে বাংলার পতনের আংশকায়।

ইংরেজ সরকারের এ আশঙ্কা-তাড়িত কতিপয় গণবিরোধী সিদ্ধান্তের ফলেই ১৯৪৩ সালে বাংলার জনগণের জীবনে নেমে আসে এক মহাবিপর্যয়। ১৯৪৩ সাল ছিল বাংলা ১৩৫০ সাল। ১৯৪৩ সাল বাংলার কোটি কোটি দারিদ্র্য পীড়িত মানুষের কাছে পরিচিত হয়ে আছে 'পঞ্চাশের মন্বন্তরের' বছর হিসেবে। কমপক্ষে ৫০ লক্ষ মানুষ এই দুর্ভিক্ষে প্রাণ হারায় এবং এ দুর্ভিক্ষ ছিল অনেকটাই মনুষ্য সৃষ্ট।

শ্যামাহক মন্ত্রিসভার পতনের পর ১৯৪৩ সালের ২৪ এপ্রিল খাজা নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে বাংলায় মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। কিন্তু বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষের আলামত আগের সরকারের আমলেই দেখা গিয়েছিল। ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এক খাদ্য সম্মেলনে তদানীন্তন প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক ঘোষণা করেন, প্রদেশে পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য মজুদ রয়েছে, সুতরাং খাদ্য শস্য সংকটের কোন আশঙ্কা নেই। কেন্দ্রীয় সরকার এ কারণে বাংলায় খাদ্য শস্য

www.pathagar.com

প্রেরণের কোন গরজ অনুভব করে নাই। তখনই বিরোধী দলের অন্যতম নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সরকারের এ বক্তব্যের কড়া প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, পর পর দু'টি মৌসুমে কৃষি ফলন ভাল না হবার ফলে প্রদেশে দুর্ভিক্ষ আসন্ন।

নতুন মন্ত্রিসভায় জনাব সোহরওয়ার্দী পেয়েছিলেন বেসামরিক সরবরাহ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব। তিনি দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। এবার তাঁর উপরই পড়লো দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের দায়িত্ব। কিন্তু ইতোমধ্যেই অবস্থা যথেষ্ট নাজুক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে সময় আমাদের দেশে চাল আমদানী করা হতো প্রধানত বার্মা থেকে। বার্মা জাপানের দখলে চলে যাওয়ায় সে সুযোগ বন্ধ হয়ে যায়। সরকার যে খাদ্যশস্যের মজুদ গড়ে তুলেছিল তা সৈন্যদের মধ্যে বিতরণের অগ্রাধিকার দিয়ে নির্দেশ জারি করল ইংরেজ সরকার। যুদ্ধের কৌশল হিসাবে আন্তঃপ্রাদেশিক ও আন্তঃজিলা কর্ডন প্রথা প্রবর্তনের ফলে সারপ্লাস অঞ্চল থেকে ঘাটতি অঞ্চলে খাদ্যশস্য চলাচলের উপায় ছিল না। তখন বাংলাদেশে বর্তমানের মত ব্যাপক সড়ক ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। খাদ্যশস্যসহ যে কোন মাল পরিবহনের প্রধান বাহন ছিল নৌকা। অগ্রসরমান জাপানী বাহিনীর হাতে পড়তে পারে আশঙ্কায় সরকার সমস্ত বড় নৌকা সীজ করে নেয়। খাদ্য গুদাম শত্রুর হাতে পড়বে এ আশংকায় খাদ্য গুদামের পরিচালনাও কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে লাগল ইংরেজ সরকার। এমতাবস্থায় জনাব সোহরওয়ার্দী আপ্রাণ চেষ্টা করে সারপ্লাস প্রদেশসমূহ, বিশেষত আশপাশের প্রদেশ হতে বাংলায় খাদ্যশস্য প্রেরণে কেন্দ্রীয় সরকারকে রাজি করান। সোহরওয়ার্দী পাঞ্জাবের মত দূরবর্তী প্রদেশ থেকে কিছু খাদ্যশস্য ক্রয় করতে সক্ষম হলেও সারপ্লাস খাদ্যশস্যের প্রদেশ প্রতিবেশী বিহার থেকে বাংলা সরকারের প্রতিনিধিদের সম্পূর্ণ খালি হাতে ফিরতে হল। কট্টর কংগ্রেসপন্থীদের নিয়ন্ত্রণাধীন বিহার সরকার বাংলার জন্য বরাদ্দকৃত ও ক্রয়কৃত খাদ্যশস্য পাঠাতেও সরাসরি অস্বীকৃতি জানায়। অবশ্য উড়িষ্যা সরকার তার ক্ষুদ্র বরাদ্দ ঠিকঠাকই দেয়। আসাম সরকারও বরাদ্দ খাদ্যশস্যের অনেকটাই সরবরাহ করে।

এভাবে প্রায় হাত-পা বাঁধা অবস্থায়ই সোহরওয়ার্দীকে দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় অগ্রসর হতে হয়েছিল। তিনি শহরে রেশন ব্যবস্থা চালু করেন। গ্রামাঞ্চলেও দরিদ্র জনগণের জন্য রেশন চালু করা হয়। প্রদেশের শহর বন্দরে বিভিন্ন স্থানে বিত্তহীন মানুষদের জন্য খোলা হল লঙ্গরখানা। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও অসংখ্য লোক দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলার বিভিন্ন শহর-বন্দর-গ্রামে এক মুঠো খাবারের অভাবে অখাদ্য, কুখাদ্য খেয়ে কুকুর-বিড়ালের মত প্রাণ দিতে বাধ্য হয়।

দুর্ভিক্ষের অভিজ্ঞতা

দুর্ভিক্ষের কথা এর আগে শুনেছি। বইয়ে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কথাও পড়েছিলাম। কিন্তু দুর্ভিক্ষ কাকে বলে, দুর্ভিক্ষ কবলিত মানুষের অবস্থা কেমন হতে

www.pathagar.com

পারে তা স্বচক্ষে দেখার দুর্ভাগ্য সেবারই আমার প্রথম হয়। ১৯৪৩ সালে আমি ক্লাস নাইনে পড়ি। থাকি স্টুডেন্টস হোমে। দেড় বছর পরেই হাই মাদ্রাসা ফাইনাল পরীক্ষা। পড়াশোনার চাপ। ক্লাস করতে হয় নিয়মিত। দিন-রাত ২৪ ঘন্টার অন্য সময় যাই হোক, খাবার কথা মনে হলেই এক অব্যক্ত বেদনায় মন বিষিয়ে উঠতো। তরকারী যেন তেন, ভাত যেন গলার নীচে নামতেই চাইতো না। দুর্গন্ধযুক্ত পচা চাল সরবরাহ করা হতো রেশন কার্ডে। ভাত রান্না হবার পর পর যতক্ষণ ভাঁপ উঠতো, দুর্গন্ধে তিষ্টানো যেতো না। কিন্তু এই দুর্গন্ধময় ভাতের জন্যই আমাদের দৌড়াদৌড়ির অন্ত থাকত না। ভাতের জন্য আমাদের লাইন দিতে হতো যার যার থালা হাতে নিয়ে। প্রত্যেকের পাতে ভাত বেড়ে দিতো স্টুডেন্টস হোমের বাবুর্চি। নাম তার গইজুদ্দিন। ভাতের পরিমাণ মাপা। গইজুদ্দিনকে 'গইজুদ্দিন ভাই' বলে এক চামচ অতিরিক্ত দুর্গন্ধ ভাত দিতে অন্যান্যের মত আমিও কাতর মিনতি জানাতাম। কখনও মিনতিতে কাজ হত। কখনও হত না। এমনি করে দু'বেলা সেই দুর্ভিক্ষের বছরে মাপা দুর্গন্ধযুক্ত ভাত খেয়ে জীবন বাঁচাতে হতো। তবুও এতেই আমরা নিজেদেরকে পরম সৌভাগ্যবান মনে করতাম। খোলাবাজারে চাল পাওয়া যেত না। কালো বাজারে অতিরিক্ত টাকা দিয়ে চাল কেনার সামর্থ ছিল না শতকরা পচানব্বই ভাগ মানুষের। তাদের জন্য দিনান্তে একবার কোন লঙ্গরখানায় এক চামচ খাবার নামের বিচিত্র ঘাঁটি খেতে পারাকেই সৌভাগ্য বলে মেনে নিতে হত। যারা এ সৌভাগ্যটুকু থেকেও বঞ্চিত হত, তারা কচু-ঘেঁচু, ঘাস-পাতা নুন-পানি দিয়ে জ্বাল দিয়ে ছেলে-মেয়েসহ প্রাণে বাঁচার অক্ষম প্রচেষ্টা চালাত। রাস্তার পাশেই গাছতলায় এদের রাতদিন পড়ে থাকতে দেখতাম। এর পর কোনদিন হয়ত রাস্তার পাশেই এদের লাশ হয়ে পড়ে থেকে শকুন কুকুরের খাদ্যে পরিণত হতে দেখতাম। এভাবে সারা দেশে কত মানুষ যে অসহায়ভাবে মৃত্যুবরণ করেছে, কত মায়ের বুক যে খালি হয়েছে, কত অবোধ শিশু যে পিতা-মাতা হারিয়ে এতিমের খাতায় নাম লিখিয়েছে তার কোন প্রকৃত হিসাব কেউ করেছে বলে মনে হয় না।

স্টুডেন্টস হোমের পচা, দুর্গন্ধযুক্ত ভাত খেতে অসহ্য হয়ে পড়ায় একবার খানিকটা মুখ বদলের আশায়ই গ্রামের বাড়ী গেলাম। দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া গ্রাম জীবনকেও গ্রাস করেছিল। বহুদিন পেটভরে খেতে না পাওয়াতে আমার দেহ অনেকটাই কৃশ হয়ে গিয়েছিল– মা আমাকে দেখে প্রায় কঁকিয়ে উঠলেন। বাড়ীতেও দু'একদিন পর পর সীমিত পরিমাণ ভাত রান্না করা হয়। আমার জন্য ভাতের ব্যবস্থা করা হল। মনে হলো মা নিজে না খেয়ে আমার জন্য এক মুঠো অতিরিক্ত খাওয়ালেন।

এমন দুর্ভিক্ষের মধ্যেও গ্রামে একটা ভাল দিক নজরে পড়ল। সে বছর

www.pathagar.com

কলিকাতা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের খেলোয়াড়বৃন্দ

www.pathagar.com

আমাদের এলাকায় প্রচুর পরিমাণে গম ও যবের আবাদ করা হয়। শুনলাম আমাদের বাড়ীতে নিয়মিত গমের ভাত রান্না হয়। জীবনে সেই প্রথম গমের ভাত খেলাম। কেমন পিছলা পিছলা ভাত। নতুন হিসাবে মন্দ লাগলো না। অবস্থার চাপে সেবার আরেকটা ফসলও আমাদের ঐ অঞ্চলে প্রচুর আবাদ করা হয়। সেটা চিনার ধান। পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীনের বইয়ে আর্তি শুনেছিলাম 'আরও ফুটিক ডলক দিলে চিনার ভাত খাই"। আমাদের জমিতে চিনা জন্মানো হয়েছিল শীত ফসলের সাথে। দুর্ভিক্ষের অছিলায় জীবনে আমার সেই প্রথম 'চিনার ভাত' খাওয়ার সৌভাগ্যও হয়েছিল।

দুর্ভিক্ষের কল্যাণে অবশ্য ফরিদপুরে একটি বড় উপকারও হয়। ফরিদপুরে ইতোপূর্বে কোন সরকারী এতিমখানা ছিল না। ফরিদপুর শহরের টেপাখোলা প্রান্তে একটি সরকারী এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করা হয় দুর্ভিক্ষের পর পর। দুর্ভিক্ষে হাজার হাজার শিশু অসহায়-এতিম হয়ে পড়ে। তাদের সেবা-যত্ন, শিক্ষা ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ফরিদপুরে সরকারী পর্যায়ে একটি স্টেট অর্ফানেজ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এতিমখানাটির সূচনা অবশ্য হয় ঐতিহ্যবাহী সমাজকল্যাণ সংস্থা খাদেমুল ইনসান সমিতির পরিচালক, মাসিক, 'মোয়াজ্জিন' এবং 'সার্ভেন্ট অব হিউম্যানিটি' পত্রিকার সম্পাদক সৈয়দ আবদুর রবের হাতে। পরে সেই বেসরকারী এতিমখানাকেই সম্প্রসারিত করে স্টেট অর্ফানেজে রূপান্তরিত করা হয়। এই স্টেট অর্ফানেজ গড়ে তোলার পেছনে জেলার মুসলিম লীগ নেতা জনাব ইউসুফ আলী চৌধুরী এবং ফরিদপুরের তদানীন্তন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এফ এ করিম আই সি এসেরও যথেষ্ট অবদান ছিল।

টেপাখোলা ফরিদপুর শহরের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত। এই টেপাখোলায় এককালে একটি বিখ্যাত গরুর হাট ছাড়া নাম করার মত আর কিছুই ছিল না। পরবর্তীতে ইয়াসিন হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা টেপাখোলার গুরুত্ব বৃদ্ধির একটা কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। স্টেট অর্ফানেজ প্রতিষ্ঠা টেপাখোলার গুরুত্বকে আরেক ধাপ বাড়িয়ে দিয়েছিল। এখন অনেকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে না হতে পারে, তবে টেপাখোলা এককালে ভাল নদীবন্দর ছিল। বর্ষাকালে টেপাখোলা থেকে স্টীমারে উঠে নদীপথে বাংলাদেশের যে কোন স্থানে যাওয়া সম্ভব হতো।

কোহিনূর লাইব্রেরী

তবে আমার কাছে টেপাখোলার আকর্ষণ ছিল অন্য কারণে। এই টেপাখোলাতেই নদীঘাটের কাছাকাছি রাস্তার পাশে অবস্থিত ছিল শহরের অন্যতম সাধারণ পাঠাগার– কোহিনূর লাইব্রেরী। ফরিদপুর শহরের সকল হিন্দু পরিচালিত পাবলিক লাইব্রেরীর বিপরীতে কোহিনূর লাইব্রেরী ছিল মুসলিম পরিচালিত একমাত্র

www.pathagar.com

কার্জন হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

পাবলিক লাইব্রেরী। এই লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মৌলভী মোহাম্মদ আবদুল মজিদ নামের একজন উৎসর্গীকৃত মহান সমাজসেবক। মুসলিম সমাজে অর্থ-যশ-খ্যাতির মোহমুক্ত এমন নীরব সমাজসেবী এখনও খুব বেশী দেখা যায় না। তখনও যেতো না। আমি সিলেটের কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের মৌলভী মুহম্মদ নূরুল হক এবং দিনাজপুরের নাজিমুদ্দিন পাবলিক লাইব্রেরীর আলহাজ্ব হেমায়েত আলীর সাথে পরিচিত হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। আমার বিনীত ধারণা, ফরিদপুর কোহিনূর লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক মৌলভী মোহাম্মদ আবদুল মজিদের অবদান তাঁদের তুলনায় কোন অংশে কম নয়। শেষ জীবনে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে তিনি যখন প্রায় অন্ধ হয়ে যান, তখনও এই লাইব্রেরীর কাজে তাঁকে নিমগ্ন থাকতে দেখা গেছে।

ফরিদপুর শহরের মুসলিম পরিচালিত একমাত্র পাবলিক লাইব্রেরী এই কোহিনূর লাইব্রেরী স্বাভাবিক কারণেই তখন হয়ে উঠেছিল ফরিদপুরে মুসলিম জাগরণের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। এই লাইব্রেরী থেকে বই ও পত্র-পত্রিকা পড়েই আমরা আমাদের ইনটেলেকচুয়াল ক্ষুধা মিটাতাম। এখানে আমরা মুসলমান কবি-সাহিত্যিকদের বই পাঠের সুযোগই শুধু পেতাম না, কলিকাতা থেকে দৈনিক আজাদসহ মুসলমানদের প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী পাঠেরও সুযোগ লাভ করতাম। মোটের ওপর সেই গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলোতে ফরিদপুর শহরে এই কোহিনূর লাইব্রেরীই হয়ে উঠেছিল মুসলিম জাগরণের সূতিকাগার। কোহিনূর লাইব্রেরীর অবদান বাদ দিয়ে ফরিদপুরে মুসলিম জাগরণের ইতিহাস রচনা করা সম্ভব নয়।

স্টুডেন্টস হোমে থাকার সুবাদে আমার মাদ্রাসার লাইব্রেরীতে নিয়মিত বই পড়ার সুযোগ ছিল। তবুও অবসর পেলেই চলে যেতাম টেপাখোলার এই কোহিনূর লাইব্রেরীতে। দৈনিক আজাদ ছাড়া আর যেসব পত্র-পত্রিকা আমরা পড়তাম তার মধ্যে ছিল সাপ্তাহিক মোহাম্মদী, মাসিক মোহাম্মদী, মাসিক সওগাত। সে সময় কলিকাতা থেকে হিন্দুদের 'ভারতবর্ষ' ও 'প্রবাসী' নামের দু'টি মাসিক পত্রিকাও প্রকাশিত হতো। মাঝে মাঝে এগুলোও পড়তাম। তবে ঐসব পত্রিকায় মুসলমান লেখকদের লেখা সাধারণত থাকতো না বলে ওগুলো পড়তে তেমন উৎসাহ বোধ করতাম না। সে সময় কলিকাতা থেকে প্রকাশিত ছোটদের একটি পত্রিকা আমার খুব প্রিয় ছিল। নাম 'গুলবাগিচা'। সম্পাদক আবদুল ওহাব সিদ্দিকী। এই পত্রিকাতে নিয়মিত ধাঁধা এবং ধাঁধার সফল উত্তরদাতাদের নাম প্রকাশিত হতো। এই পত্রিকাতেই একটি ধাঁধার সফল উত্তরদাতাদের মধ্যে একবার আমার নাম প্রকাশিত হয়েছিল। ছাপার হরফে আমার নাম মুদ্রিত হয়েছে দেখে আমি সেদিন কত যে খুশী হয়েছিলাম, তা বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

পাঠ্যবই, আউট বই বা পত্র-পত্রিকায় যাদের লেখা আমাকে সবচেয়ে বেশী মুগ্ধ করতো, কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন তাদের শীর্ষে। নজরুল ছাড়া আর যাদের কবিতা আমার ভাল লাগতো, তাদের মধ্যে ছিলেন গোলাম মোস্তফা, জসীমউদ্‌দীন, রবীন্দ্রনাথ, মধুসূদন, সত্যেন্দ্রনাথ, কায়কোবাদ, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, বন্দে আলী মিয়া প্রমুখ। গদ্য লেখকদের মধ্যে মীর মশাররফ, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, ডাঃ লুৎফর রহমান, এস ওয়াজেদ আলী, শরৎচন্দ্র, বিভূতি ভূষণ, শহীদুল্লাহ, মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, ইব্রাহীম খাঁ প্রমুখের লেখা ভাল লাগতো। তবে স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, বঙ্কিমচন্দ্রের মুসলিম-বিদ্বেষী বইগুলো পড়ে মনে হতো, কে যেন আমার গায়ে বিছার হুল ফুটিয়ে দিলো। একইভাবে নজরুল, গোলাম মোস্তফা, জসীমউদ্‌দীন, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, শাহাদৎ হোসেন, ডাঃ লুৎফর রহমান প্রমুখের লেখা পড়ে নিজের অস্তিত্বের মধ্যে আত্মশক্তির অনুরণন অনুভব করতাম।

উপরে যেসব কবি-সাহিত্যিকের কথা উল্লেখ করলাম, তাদের অধিকাংশের লেখার সাথে আমার পরিচয় ঘটেছিল পাঠ্যপুস্তকে তাঁদের লেখা পড়ে। বলাবাহুল্য, ঢাকায় ১৯২১ সালে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও ঢাকার বাইরের কোন কলেজ বা হাইস্কুল তার এফিলিয়েশনের আওতাভুক্ত ছিল না। বাংলা ও আসামের সকল কলেজ ও হাইস্কুল ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন ছিল। ঐসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যপুস্তকে মুসলমান কবি-সাহিত্যিকদের লেখা খুব সামান্যই স্থান পেতো। আমরা যারা হাই মাদ্রাসার ছাত্র ছিলাম, আমাদের বেলায় ছিল কিছুটা ব্যতিক্রম। বাংলা ও আসামের বিভিন্ন হাই মাদ্রাসা ও ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ এবং ঢাকা শহরের বিভিন্ন হাইস্কুল ও কলেজের (সব কলেজই ছিল ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত) ছিল ঢাকা বোর্ডের অধীনে। এই সুবাদেই হাই মাদ্রাসার পাঠ্যপুস্তকে আমরা অনেক মুসলমান কবি-সাহিত্যিকের লেখা পাঠের সুযোগ পেতাম।

ফরিদপুরে সেই বয়সে এমন কতকগুলো বই পড়ার সুযোগ পাই, যেগুলো আমার মানস গঠনে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এর মধ্যে অবশ্য একখানি পাঠ্যপুস্তকও ছিল। ক্লাস এইটে 'পাথস অব পীস' নামের একখানি বই ইংরেজী র‍্যাপিড রীডার হিসাবে পড়েছিলাম। এই বইয়ের প্রথম রচনাটির শিরোনাম ছিল 'ওয়াইজ মেন অব দি ওল্ড'। এতে গ্রীসের তিন দার্শনিক সক্রেটিস, প্লেটো ও এরিস্টোটল সম্পর্কে আলোচনা স্থান পায়। এই রচনায় সক্রেটিসের সহজ-সরল জীবনধারার বর্ণনা আমাকে প্রচণ্ডভাবে মুগ্ধ করে। তিনি এথেন্সের বাজারের মধ্য দিয়ে যখন হেঁটে যেতেন, বিভিন্ন দোকানে থরে থরে সাজানো বিভিন্ন পণ্যের দিকে তাকিয়ে বলতেন ঃ "হাউ মেনি থিংস আই ক্যান ডু উইদাউট"। অর্থাৎ কত বেশী

www.pathagar.com

জিনিস ছাড়া আমার চলতে পারে। পরবর্তীকালে রসূলে করীম (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবাদের জীবনেতিহাস পড়ে আমার মনে হয়েছে সক্রেটিসের মধ্যে সহজ-সরল জীবনের প্রতি যে আকুতি লক্ষ্য করা যায়, তারই পূর্ণতম অভিব্যক্তি ঘটেছিল ইসলামের সহজ-সরল জীবনধারায়। এমনকি বাংলাদেশে ইসলামের প্রাথমিক যুগের প্রচারক ফকীর-দরবেশদের মধ্যেও এই সহজ-সরল জীবনধারার দিকটা ছিল চোখে পড়ার মত।

মীর মশারফের 'বিষাদ সিন্ধু' পড়েছিলাম অনেক আগেই। সম্ভবত ফরিদপুরে থাকাকালেই শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্নের 'আলমগীর' নামক ঐতিহাসিক উপন্যাসটি পড়ার সৌভাগ্য হয়। এই উপন্যাসে স্যার যদুনাথ সরকারের রেফারেন্স দিয়ে সম্রাট আওরঙ্গজেবের জীবনের যে মহৎ মানবিক দিকের পরিচয় দেয়া হয় তার ফলে এক শ্রেণীর ইতিহাসকারের আওরঙ্গজেব-বিদ্বেষের আসল চেহারা আমার চোখে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রায় একই সময়ে কাজী ইমদাদুল হকের উপন্যাস 'আবদুল্লাহ' পাঠ করে মনে হল, এই প্রথম একজন কথা-সাহিত্যিক অন্তরের সবটুকু দরদ ঢেলে বাঙালী মুসলমান সমাজের প্রকৃত সমস্যাসংকুল চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের 'নিগ্রো জাতির কর্মবীর' এবং 'মোসলেম জাতির কর্মবীর' শীর্ষক দু'খানি বইও এ সময়ে আমার হাতে পড়ে। এসব বই এবং নজরুল, গোলাম মোস্তফা, শাহাদৎ হোসেন, ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রমুখের লেখা বাঙালী মুসলমানদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার মধ্যে আশাবাদ সৃষ্টি করে।

কিন্তু এই আশাবাদের আলোকে কর্মস্পৃহায় উদ্দীপ্ত করে তোলে আরও কয়েকটি বই। যেগুলোর মধ্যে ছিল ডাঃ লুৎফর রহমানের 'উন্নত জীবন' ও ডেনিয়েল ডি ফো'র 'রবিনসন ক্রুশো' নামক দু'খানি বই। সে সময় শশধর দত্ত বা এমনি নামের এক হিন্দু লেখকের 'দস্যু মোহন' সিরিজের বইগুলো বাজারে হট কেকের মত চলতো। আমিও সেগুলো গোগ্রাসে গিলতাম। ঐ একই সময়ে ইংরেজী আরেকখানি বই পড়ি 'রবিন হুডের' উপর। 'রবিন হুড' সম্পর্কে পড়ার পর কেবলই মনে হতো, মুসলমানদের মধ্যে কি এমন কেউ নেই, যিনি সমাজের অত্যাচারী শোষকদের সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দেবেন এবং স্বাধীনতার জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে এগিয়ে আসবেন?

বাঙালী মুসলমানদের সে 'রবিন হুড'-এর সঙ্গে আমার অবশ্য দেখা হয়েছিল ১৯৪৪ সালের এপ্রিলেই। কিন্তু সে দেখা এত সংক্ষিপ্ত ছিল যে, তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় তখন সম্ভব হয়নি। তখন টেরই পাইনি, ইনিই আমার স্বপ্নের সেই মুসলিম 'রবিন হুড'।

www.pathagar.com

মুসলিম লীগের ট্রেনিং ক্যাম্প

১৯৪৪ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এক মারাত্মক পর্যায়ে উপনীত হয়। যে কোনদিন শহরে জাপানীরা বোমাবর্ষণ করতে পারে- এই আশংকায় ফরিদপুর শহরের বিভিন্ন অফিস-আদালত ও রাস্তার পাশে পরিখা খনন করা হতে লাগল এবং বিমান হামলার সময়ে কিভাবে এসব পরিখায় আশ্রয় নিতে হবে, তার জন্য সরকারী পর্যায়ে ট্রেনিং দেয়া হতে লাগলো। এই কাজের জন্য বেসামরিক প্রতিরক্ষা দফতরের অধীনে এয়ার রেইড প্রিকশান (সংক্ষেপে এআরপি) কার্যক্রম হাতে নেয়া হলো। মুসলিম লীগের তরফ থেকে এ সময় ১৯৪৪ সালের এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে এক সপ্তাহব্যাপী একটি বেসামরিক প্রতিরক্ষা শিক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। অন্যতম ট্রেইনী হিসাবে আমিও এ শিবিরে যোগদান করি। বেসামরিক প্রতিরক্ষা প্রশিক্ষণের জন্য ক্যাম্প হলেও এ শিক্ষা শিবিরের কার্যক্রম ছিল বহুমুখী এবং প্রত্যেকটা পর্বের জন্য সময় ছিল সুনির্দিষ্ট। সামান্য এদিক ওদিক হবার উপায় ছিল না, এমনি ছিল কঠোর শৃংখলা। শেষ রাত ৪টার থেকে দিনের কার্যক্রম শুরু হত। রাত ৪টার সময় ঘন্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম থেকে উঠে পেশাব-পায়খানা, ওজু-নামাজ সেরে সূর্য উঠার যথেষ্ট আগে ৫টার মধ্যে আবছা আঁধারে শুরু করতে হত পি-টি। প্রায় দুই মাইল খালি পায় একটানা দৌড়ানোর পর ক্যাম্পে ফিরে আসতাম। কিছুটা বিশ্রাম ও চা-পর্ব সারার পর শুরু হত প্যারেড। অনেকটা সামরিক প্যারেডের মতই। কেউ সামান্য অমনোযোগী হলে কঠিন শাস্তি। ক্যাপ্টেন শফিক ছিলেন প্রধান ট্রেনার। আরেক জন ট্রেনারের নাম মনে আছে। তিনি ছিলেন মামুন মাহমুদ। পরে জেনেছি ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদের পুত্র। সকল ট্রেনারই প্যারেডের সময়ে থাকতেন যেমন কড়া, প্যারেডের বাইরে তেমনি থাকতেন অত্যন্ত অমায়িক।

ক্যাম্পে প্যারেড, বিশ্রাম, গোসল, নামাজ, নাস্তা ও খাবারের জন্য নির্দিষ্ট সময় ছিল। পি-টি, প্যারড, ফার্স্ট এইড প্রভৃতি ছাড়াও ক্যাম্পে পাকিস্তানের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনার নির্দিষ্ট সময় ছিল। দিনশেষে মাগরেবের পর বসত কোরআন ক্লাস। ক্লাস নিতেন বিখ্যাত মনীষী-রাজনীতিবিদ বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবুল হাশিম। জনাব আবুল হাশিমের একজন সহকারী তাঁর নির্দেশ মোতাবেক প্রথমে কোরআন শরীফের কোন আয়াত তেলাওয়াত করতেন। তারপর জনাব হাশিম ঐ আয়াতের তরজমা ও ব্যাখ্যা করতেন। এই কোরআন ক্লাসে ইসলামের মানবিক দিকগুলো ইসলামের প্রথম যুগের খোলাফায়ে রাশেদার দৃষ্টান্তের আলোকে ব্যাখ্যা করে আধুনিক যুগে ইসলামের অপরিহার্যতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হতো। জনাব হাশিম বুঝিয়ে দিতেন কেন ইসলামের

www.pathagar.com

এই বৈপ্লবিক আদর্শ বাস্তবায়নের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য স্বতন্ত্র স্বাধীন আবাসভূমির প্রয়োজন।

ক্যাম্পে শুধু পি-টি, প্যারেড, বিমান হামলাকালীন ব্যবস্থা বা পাকিস্তানের রাজনৈতিক দার্শনিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে গুরুগম্ভীর আলোচনাই হতো না, ক্যাম্প-কর্মসূচীর মধ্যে গান-বাজনা, ক্যারিকেচার প্রভৃতি হালকা চিত্তবিনোদনমূলক প্রোগ্রামের জন্যও সময় নির্দিষ্ট ছিল। বিভিন্ন জেলা থেকে আগত ট্রেইনীরা আঞ্চলিক ভাষায় গানের পাশাপাশি মুসলিম জাগরণ বা পাকিস্তান আন্দোলন বিষয়ক সঙ্গীত পরিবেশন করতেন কখনও সমবেত কণ্ঠে, কখনও এককভাবে। এসব গানের অধিকাংশ বাংলা ভাষায় হলেও কলিকাতা থেকে আগত প্রতিনিধি দল শুনিয়েছিলেন সহজ উর্দু ভাষায় একখানি কোরাস, যার কয়েকটি কলি ছিল নিম্নরূপঃ

হাম পাকিস্তান বানায়েঙ্গে
ইসলাম কি শান বাড়হায়েঙ্গে
এক দুনিয়া নয়া বছায়েঙ্গে
হাম পাকিস্তান বানায়েঙ্গে॥

চট্টগ্রাম থেকে আগত এক ট্রেইনীর (এ মুহূর্তে তার নাম মনে পড়ছে না) চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় গাওয়া একখানি গান ক্যাম্পে দারুণ সাড়া জাগিয়েছিল। এই গানের কয়েকটি কলি ছিল নিম্নরূপ ঃ

গরবা বুজাইনা মাছ
মেলা চুবাইনা মাছ
রাক্কুনি চতুল
অ মাছ ইলিশ্যা রে....
ছেঁড়া জালে গাব দিয়া
হালাইলাম খালে
হক্কল মাছগুন ধাইয়া গেল
উগ্‌গা রইলো জালে
অ মাছ ইলিশ্যা রে...

এই ক্যাম্প উপলক্ষে ফরিদপুর জেলা ছাড়াও অন্যান্য জেলা থেকে যেসব ট্রেইনী এসেছিলেন, তাদের সংখ্যা একশ'র কম হবে না। তবে যারা এই ক্যাম্পে সবার প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন সব চাইতে বেশী, তাদের মধ্যে ছিলেন নোয়াখালির চার সদস্যের প্রতিনিধিদল। বিশেষ করে এই চারজনের তিনজন। এই তিনজন ছিলেন জনাব খাজা আহমদ, জনাব বজলুর রহমান ও সন্দ্বীপের জনাব রফিকুল্লাহ চৌধুরী। এদের মধ্যে একমাত্র শেষোক্ত ব্যক্তি ছাড়া আর সবাই বর্তমানে

www.pathagar.com

পরলোকগত। তখন সন্দ্বীপ ছিল নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত। সেই সুবাদেই জনাব রফিকুল্লাহ চৌধুরী নোয়াখালীর প্রতিনিধিদলের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। জনাব চৌধুরী পরবর্তীকালে ভাষা আন্দোলনসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে আমার সহকর্মী ছিলেন। বাংলাদেশ আমলে সন্দ্বীপের এমপি ও উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। জনাব বজলুর রহমান বর্তমানে জীবিত প্রবীণ সাংবাদিকদের কাছে প্রধানতঃ 'বজলু ভাই' হিসাবেই সুপরিচিত ছিলেন। ভাষা আন্দোলনে এবং ভাষা আন্দোলনের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক সৈনিকে তিনি আমার সহকর্মী ছিলেন। বজলু ভাই জীবনের সিংহভাগ কাটান ব্যাচেলর হিসাবে। তবে আজীবন ছিলেন দারুণ রসিক। তিনি যখন ব্যাচেলর, তাঁকে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করত, তিনি কেমন আছেন, গম্ভীরভাবে উত্তর দিতেন, 'আমি ভালই আছি, তবে ছোট মেয়েটার দু'দিন ধরে জ্বর'। তিনি জীবনে বহু দৈনিক ও সাপ্তাহিকেই সাংবাদিকতা করেছেন। তবে যতদূর মনে পড়ে, তিনি জীবনের শেষদিকে 'দৈনিক দেশ' পত্রিকার ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করেন। ট্রেনিং ক্যাম্পে নোয়াখালীর অন্যতম ট্রেইনী জনাব খাজা আহমদ পরবর্তী জীবনে ফেনী আওয়ামী লীগের নেতা হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন।

বিপ্লবী কবি বেনজীর আহমদ

ক্যাম্পের নিয়ম-শৃংখলার ক্ষেত্রে ছিল দারুণ কড়াকড়ি। শেষ রাতে ৪টার মধ্যে আমাদের শয্যা ত্যাগ করতে হত। আর রাত ১০টার মধ্যেই সকলকে বাধ্যতামূলকভাবে শয্যা গ্রহণ করতে হত। রাত ১০টার পর ক্যাম্প ডরমিটরির আলো নিভিয়ে দেয়া হত। এর পর কোন কথা বলা বা আওয়াজ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। আমি যে ডরমিটরীতে থাকতাম, একদিন রাত ১০টার পর একটা ছেলে মনের স্ফূর্তিতে হঠাৎ গান গেয়ে ফেলে। আর যায় কোথায়? কিছুক্ষণের মধ্যেই মূর্তিমান আজরাইলের মত ক্যাম্প পরিচালক এসে হাজির। এক হাতে হারিকেন, আর এক হাতে বেত। না, তিনি বেত মারলেন না। কিন্তু তৎক্ষণাৎ ঐ ছেলেকে তার বিছানাপত্রসহ ক্যাম্প থেকে বহিষ্কার করে দিলেন। কোন অনুনয়-বিনয়, ক্ষমা-প্রার্থনা কিছুই কাজে লাগলো না।

ক্যাম্প পরিচালকের নাম আগেই শুনেছিলাম।

কবি বেনজীর আহমদ। তাঁর কবিতার সাথে আমার আগেই পরিচয় হয়েছিল। নজরুলের মতই বিপ্লবী ভাবধারার কবি। এমনিতে অত্যন্ত ভদ্র, কিন্তু ক্যাম্পের শৃংখলার ব্যাপারে, তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর।

অনেক পরে জানতে পেরেছি কবি বেনজীর আহমদ শুধু বিপ্লবী কবিতাই লিখতেন না– তিনি বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সাথেও দীর্ঘদিন সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন।

www.pathagar.com

তিনি একটি গোপন বিপ্লবী সংস্থাও গড়েছিলেন। তার নাম ছিল আজাদ পার্টি। এই দলে যারা সক্রিয়ভাবে জড়িত হন তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ফজলুল হক সেণবর্ষী। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, কলিকাতা থেকে প্রকাশিত 'দি মুসলমান' নামক ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক মৌলভী মুজিবর রহমান, খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা জালালুদ্দিন হাশেমী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও কবি বেনজীর আহমদের এসব কর্মকাণ্ডের খবর রাখতেন এবং এর প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন।

কবি বেনজীর আহমদ কিশোর জীবন থেকেই বৃটিশবিরোধী বিপ্লবী কর্মকান্ডে উৎসাহী ছিলেন। জীবনে এ জন্য তিনি ২০/২২ বার কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। প্রবেশিকা পরীক্ষার আগেও ২ বার তাকে কারাভোগ করতে হয়। বেনজীর আহমদের প্রতিষ্ঠিত আজাদ পার্টি প্রথমদিকে প্রধানত অত্যাচারী জমিদারদের বাড়ীতে হামলা চালিয়ে সংগৃহীত অর্থসম্পদ দরিদ্র প্রজাদের মধ্যে বিলিয়ে দিত। পরবর্তীকালে বৃটিশ বিরোধী সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামই হয়ে দাঁড়ায় তাদের প্রধান কার্যক্রম।

আজাদ পার্টি গঠনের পূর্বে বেনজীর এবং তার সহযোগীরা অবশ্য সেকালের হিন্দুদের পরিচালিত 'অনুশীলন', 'যুগান্তর', 'প্রবর্তক সংঘ' প্রভৃতি বিপ্লবী সংস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার চেষ্টা করেন। শেষোক্ত সংস্থার কর্মসূচী ছিল হিন্দু জাগরণ। অন্য যে দু'টি সংস্থা মুখে হিন্দু-মুসলিম সমঝোতার কথা বলতো, তাদের সংস্থাতেও সদস্য হতে হতো মন্দিরে কালীমূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে শপথ গ্রহণ করে। তাছাড়া মুসলমান যুবকদের তারা যথাসাধ্য এড়িয়ে চলতো বলে মুসলিম বিপ্লবী তরুণরাও ঐসব দলে যোগদানের আগ্রহ বা সুযোগ কোনটাই পেত না।

কবি বেনজীর আহমদ আজাদ পার্টির কার্যক্রম শুরু করেন ১৯২৫ সালে। বৃটিশবিরোধী সশস্ত্র কার্যক্রম শুরু করার অল্পদিনের মধ্যেই পুলিশ মহলে কবি বেনজীর একজন দুর্ধর্ষ ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হন। থানা হাজত ও জেল থেকে বহুবার সুকৌশলে পালিয়ে যাবার ব্যাপারে তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে সবচাইতে চমকপ্রদ ছিল চাঁদপুরের কাছে পদ্মা ও মেঘনার স্রোত যেখানে একত্রে মিলিত হয়েছে, সেখানে চলন্ত স্টীমার থেকে লাফিয়ে পড়ার ঘটনা।

একটা কেসের শুনানির জন্য তাঁকে ঢাকায় আনা হয়েছিল। এর পর নারায়ণগঞ্জ স্টীমার ঘাট থেকে স্টীমারে করে চাঁদপুর নিয়ে যাবার পথে ঘটে এ অবিশ্বাস্য ঘটনা। দুর্ধর্ষ আসামী হিসেবে তাঁর দু'হাতে ছিল হ্যান্ডকাপ। সঙ্গে প্রহরায় ছিল একজন বাঙালী ও ছয়জন গুর্খা পুলিশ। বেনজীর যতই দুর্ধর্ষ হোক, সমুদ্রের মত এই ভরা নদীতে তাঁর পালাবার প্রশ্নই ওঠে না– এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েই গুর্খা সেপাইরা

www.pathagar.com

ভরা নদীতে ঢেউয়ের অপূর্ব দৃশ্য দেখছিল মুগ্ধ চিত্তে। বেনজীর তাদের কাছে পায়খানায় যাবার অনুমতি চাইলেন। দু'জন সেপাই তাকে পায়খানার কাছে নিয়ে গেলেন। পায়খানার দরজায় পৌঁছার পর বেনজীরের অনুরোধে একজন গুর্খা সেপাই তাঁর একটা হাতের হ্যান্ডকাপ খুলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে বেনজীর দুই ঘুষিতে দু'জনকে ধরাশায়ী করে সেই মধ্য নদীর স্রোতে স্টীমার থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এর পর একবার তলিয়ে গিয়ে আবার ভেসে উঠে এভাবে মৃত্যুর সাথে যুদ্ধ করতে করতে প্রায় অলৌকিকভাবে তীরে উঠতে সক্ষম হন। এর পর তিনি জীবনে আরও বহুবার পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। আবার ছাড়াও পেয়ে যান। কখনও কোর্ট থেকে আইনের পথে, কখনও জেল হাজত থেকে তার নিজের ও সহযোগীদের চেষ্টায়। এভাবেই কবি বেনজীর কিংবদন্তী পুরুষে পরিণত হন।

কবি বেনজীর সম্পর্কে এসব তথ্য অবশ্য আমি জানতে পারি অনেক পরে, সাতচল্লিশের পর এমন এক সময়ে, যখন এদেশে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটেছে এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর সাথে পরিচয় হয় ১৯৪৮ সালে কবি ফররুখকে খুঁজতে যেয়ে। তাঁর অন্যতম সহযোগী প্রবীণ সাংবাদিক ফজলুল হক সেলবর্ষীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় আরও পরে ১৯৫৯ সালে। দৈনিক 'নাজাত' পত্রিকায় সহকারী সম্পাদক হিসেবে এই প্রবীণ সাংবাদিকের সহকর্মী হবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম আমি। আজীবন অবিবাহিত জনাব সেলবর্ষীর শেষ জীবন কবি বেনজীর আহমদের শাজাহানপুরের বাড়ীতেই কাটে। সে সময় তাঁদের বার্ধক্যজনিত শান্ত-সমাহিত জীবনধারা দেখে কারও বিশ্বাস করার উপায়ই ছিল না যে, এদের বুকের ভেতরে এককালে পরাধীনতা বিরোধী আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতো।

পাকিস্তান আন্দোলনের সমর্থনে কোন গোপন বিপ্লবী সংস্থা গড়ে উঠেছিল কি-না জানি না, তবে যারা ফরিদপুরের বেসামরিক প্রতিরক্ষা শিক্ষা শিবিরে অংশগ্রহণ করেন, তাদের অনেকেই পরবর্তীকালে মুসলিম লীগের স্বেচ্ছাসেবক ফ্রন্ট মুসলিম লীগ ন্যাশনাল গার্ডে নাম লিখিয়েছিলেন। পাকিস্তান আন্দোলনের পথে যে কোন প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলায় তাদের সদা প্রস্তুত থাকতে হতো। নিখিল ভারত পর্যায়ের এই মুসলিম লীগ ন্যাশনাল গার্ডের সালারে আলা তথা সর্বাধিনায়ক ছিলেন নবাব সিদ্দিকী আলী খান। যতদূর মনে পড়ে তার বাড়ী ছিল ভারতের মধ্যপ্রদেশে। মুসলিম লীগ ন্যাশনাল গার্ডের প্রাদেশিক অধিনায়কের পদবী ছিল সালারে সুবা। বাংলার ন্যাশনাল গার্ডের সালারে সুবা ছিলেন আইএ মোহাজের। ডেপুটি সালারে সুবাদের মধ্যে যাদের নাম মনে আছে তারা ছিলেন কলিকাতার জনাব জহিরউদ্দিন, যিনি পরবর্তীকালে জনাব সোহরওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের

www.pathagar.com

শিক্ষামন্ত্রী হয়েছিলেন, দিনাজপুরের মীর্জা গোলাম হাফিজ (বিএনপি নেতা, সাবেক মন্ত্রী ও স্পীকার) এবং বরিশালের মাওলানা নূরুজ্জামান খান। শেষোক্ত ব্যক্তি, আমার যতদূর মনে পড়ে, জনাব আইএ মোহাজেরের অনুপস্থিতিতে কিছুদিন ভারপ্রাপ্ত সালারে সুবার দায়িত্বও পালন করেন। তিনি বাংলাদেশ আমলে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর ইমাম প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর প্রথম পরিচালকের দায়িত্বও পালন করেন। এই মুসলিম লীগ ন্যাশনাল গার্ডের সদস্য হিসাবে আমিও ১৯৪৭ সালে সিলেট রেফারেন্ডামে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছিলাম।

পাকিস্তান আন্দোলন যতই জোরদার হচ্ছিল ততই এই আন্দোলনকে প্রতিহত করার প্রচেষ্টাও কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা মহলে জোরেশোরে এগিয়ে যাচ্ছিল। আসন্ন সংগ্রামের ভয়াবহতা আশঙ্কা করে মুসলিম লীগের কোন কোন অতি হিসাবী নেতার মধ্যে দোদুল্যমানতা দেখা দিচ্ছিল। কিন্তু কায়েদে আজমের অনমনীয় নেতৃত্ব এবং চরম আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ মুসলিম যুব সমাজের বিপ্লবী মনোভাবের কারণে সুবিধাবাদী নেতারা তেমন সুবিধা করে উঠতে পারেনি। পাকিস্তান আন্দোলন যখন তুঙ্গে, তখন এ ধরনের দোদুল্যমান নেতাদের সুবিধাবাদী মনোভাবের বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়ে বহু গোপন ইশতেহার বিলি হয় বলে বন্ধু-বান্ধবদের মুখে শুনেছি। এরকম একটি গোপন ইশতেহার একবার আমার হাতেও এসে পড়েছিল। তাতে কায়েমী স্বার্থবাদী দোদুল্যমান নেতাদের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলা হয়েছিল, তারা সুবিধাবাদিতার কারণে যেন মিল্লাতের প্রতি কোনরূপ গাদ্দারী বা বিশ্বাসঘাতকতা না করে। কারণ তাদের প্রতিটি পদক্ষেপের উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে এবং মৃত্যুদূত প্রতি মুহূর্তে তাদের অনুসরণ করছে।

ফজলুল হকের বিরুদ্ধে কালো পতাকা

ফরিদপুরে পাকিস্তান আন্দোলন জোরদার হয় শ্যামাহক মন্ত্রিসভার সময় থেকেই। পাকিস্তান আন্দোলনের প্রতি জনগণের সমর্থন যে কত গভীর ও ব্যাপক ছিল, তার আলামত তখনই ফুটে উঠেছিল। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের মত জনপ্রিয় নেতাও সেদিন গণদাবীর বিরুদ্ধে গিয়ে স্বস্তি পাননি। শ্যামাহক মন্ত্রিসভা আমলের একটা ঘটনার কথা আমি কখনও ভুলতে পারব না। প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তিনি ফরিদপুর সফরে আসছেন। খুব ভোরে কলিকাতা থেকে ট্রেনযোগে তাঁর ফরিদপুর রেল স্টেশনে এসে পৌছার কথা। স্টেশনেই তাঁকে কালো পতাকা দেখাতে হবে। কালো পতাকা প্রকাশ্যে নিয়ে গেলে পুলিশ ছিনিয়ে নিতে পারে। ভোরে ট্রেন আসার আগ মুহূর্তে স্টেশনে যাবার চেষ্টা করলেও পুলিশ তা ভণ্ডুল করে দিতে পারে। তাই সিদ্ধান্ত হল, সারা রাত ধরে বিচ্ছিন্নভাবে আমরা প্লাটফর্মে সমবেত হব। তখন শীতকাল। রাতের আঁধারে হাঁড় কাঁপানো শীত উপেক্ষা করে

www.pathagar.com

আমরা সবাই চাদর গায়ে স্টেশনে সমবেত হতে থাকলাম। সবারই চাদরের মধ্যে কালো পতাকা লুকানো রইলো। শেষ রাতের মধ্যেই ফরিদপুর রেল স্টেশনের পুরাটা লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। গাড়ী আসার কিছু আগে গাড়ীর ঘন্টা, সিগন্যাল, টিকেট বিক্রয় ও অন্যান্য প্রস্তুতিমূলক কাজের জন্য যখন স্টেশন মাস্টার এবং অন্যান্য রেল কর্মচারী এসে এই বিরাট সমাবেশ দেখলেন তারা ভাবলেন, প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে তাঁকে সংবর্ধনা জানাতেই বুঝি এই বিশাল জনসমাগম। কিন্তু ট্রেন প্লাটফর্মে ইন করার পর যে দৃশ্য সৃষ্টি হলো তাতে তাদের চক্ষু চড়ক গাছ। ট্রেন স্টেশনে এসে পৌছার সাথে সাথে প্লাটফর্মে সমবেত সেই হাজার হাজার মানুষের চাদরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো অসংখ্য কালো পতাকা। কালো পতাকা আন্দোলিত হচ্ছে আর সঙ্গে অযুত কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে 'নারায়ে তাকবীর- আল্লাহ আকবর, পাকিস্তান জিন্দাবাদ, শ্যামা হক মিনিস্ট্রি মুর্দাবাদ, ফজলুল হক ফিরে যাও' ইত্যাদি শ্লোগান। শ্লোগানে শ্লোগানে সারা প্লাটফর্ম প্রকম্পিত হতে লাগল।

কঠোর পুলিশ প্রহরায় অবশেষে হক সাহেব ট্রেন থেকে নামলেন। অতি কষ্টে স্টেশনের পাশে অপেক্ষমাণ মোটর গাড়ীতে আরোহণ করলেন। বিক্ষোভকারীদের প্রবল ভিড়ের কারণে কড়া পুলিশ প্রহরার মধ্যে গাড়ী এগোচ্ছিল অতি সন্তর্পণে। আমরা বিক্ষোভকারীরাও শ্লোগান দিতে দিতে দ্রুত বেগে হেঁটে যাচ্ছিলাম গাড়ীর পাশাপাশি। অনেকে হক সাহেবের গাড়ীর মধ্যে জানালা দিয়ে কালো পতাকা ঢুকিয়েও দিয়েছিলেন। গাড়ী ধীরে ধীরে নিকটস্থ সার্কিট হাউসে গিয়ে হাজির হল। আমরা অনেকেই সার্কিট হাউজের ভিতর ঢুকে পড়তে চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু পুলিশের বাধাদানের ফলে সে চেষ্টা সফল হল না। হক সাহেব ভেতরে ঢুকে গাড়ী থেকে নেমে প্রথমেই পুলিশকে অবাক করে দিয়ে হুকুম দিলেন, ওরা যারা ভেতরে আসতে চায়, আসতে দাও। আমরা হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়লাম। এরপর আমাদের অবাক করে দিয়ে হক সাহেব সার্কিট হাউজের স্টাফকে হুকুম দিলেন, ওদের সকলকে চা খাইয়ে দাও, অনেকক্ষণ চেঁচামেচি করে ওরা হয়রান হয়ে পড়েছে।

আগেই বলেছি, ফরিদপুরে সে সময় একমাত্র হুমায়ূন কবীর ছাড়া উল্লেখযোগ্য আর কোন মুসলিম ব্যক্তিত্বই পাকিস্তানবিরোধী ছিল না। জেলায় আন্দোলনের মূল নেতা ও জেলা লীগের সভাপতি ছিলেন মোহন মিয়া সাহেব। জেলা মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন এডভোকেট আবদুস সালাম খান। তিনি পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি হয়েছিলেন। আইনজীবীদের মধ্যে মুসলমান ছিলেন হাতেগোনা যায় এমন অল্পসংখ্যক। মোক্তারদের মধ্যে নাসিরুদ্দিন

www.pathagar.com

বেগ, উকিলদের মধ্যে আবদুল হামিদ মল্লিক এবং সরকারী উকিল খান বাহাদুর ইসমাইল ছিলেন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত ব্যক্তি সরকারী উকিল হলেও পাকিস্তান আন্দোলনের প্রতি তার সহমর্মিতা কখনও তিনি গোপন করতেন না। এই স্বল্পসংখ্যক মুসলিম আইনজীবীর সঙ্গে ঐ সময়ে যোগ দেন দু'জন সদ্য পাস করা উকিল আবদুল হাকিম মৃধা ও আদিল উদ্দিন আহমদ। এরা বারে যোগ দেয়ায় ফরিদপুরে পাকিস্তান আন্দোলনের কর্মীরা আমরা দারুণ খুশী হয়েছিলাম। এ দু'জনের মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তি পাকিস্তান আমলে আওয়ামী লীগে যোগ দেন এবং স্বল্পকালের জন্য মন্ত্রিত্বও করেন।

ফরিদপুরে পাকিস্তান আন্দোলনের ক্ষেত্রে তিনজন আলেমের ঐতিহাসিক অবদান ছিল। এঁরা হলেন মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী, মাওলানা আবদুল আলী ও মৌলভী রফিউদ্দিন আহমদ। এদের প্রথমোক্তজন শুধু ফরিদপুর নয়, সারা দেশের আন্দোলনেই অন্যতম নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁকে পাকিস্তান আন্দোলন সমর্থক ওলামা সংস্থা জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতাও বলা যায়।

মওলানা আবদুল আলী ছিলেন কোর্ট মসজিদের ইমাম। জুম্মার খোতবার আগে তিনি সেকালেই বাংলায় বক্তৃতা দেয়ার নিয়ম চালু করেন। তাঁর বক্তৃতা যেমন ছিল উদ্দীপনাময়ী, তেমনি সেই যুগে খোতবার বই না দেখে আরবীতে বলিষ্ঠ ভঙ্গীতে খোতবা প্রদানের ব্যাপারটা ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়। ফরিদপুর থাকা অবস্থায় শুক্রবারে কোর্ট মসজিদে জুম্মার জামাত আমি সহজে মিস করতাম না শুধু তার বলিষ্ঠভঙ্গীর খোতবার কারণে। ব্যক্তিগত জীবনে তার মত এমন সাদা দীলের মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি। ইসলামী জীবনাদর্শ প্রচারের এই নীরব নিরলস সাধককে আমি অল্পদিনের জন্য ময়েজউদ্দিন হাই মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসাবেও পেয়েছিলাম।

হাই মাদ্রাসায় আমার শিক্ষকমন্ডলী

মৌলভী রফিউদ্দিন আহমদ ছিলেন ময়েজ উদ্দিন হাই মাদ্রাসার সেকেন্ড এরাবিক টিচার। ফারায়েজী আন্দোলনের ঐতিহ্যবাহী কমলাপুরের মুন্সীবাড়ীর অন্যতম সন্তান মৌলভী রফিউদ্দিন আহমদ যেমন ছিলেন একজন চৌকস শিক্ষক, তেমনি ছিলেন একজন সমাজসচেতন দরদী ব্যক্তিত্ব। তাঁর মত সফল শিক্ষক আমি জীবনে খুব কমই দেখেছি। আরবী ব্যাকরণের অতি কঠিন বিষয়ও যেমন সহজভাবে বুঝিয়ে দিতে পারতেন তার তুলনা মেলা ভার। আমি ফরিদপুরে থাকতেই সিরাজগঞ্জে মুসলিম লীগের একটি সম্মেলন হয়। ফরিদপুর থেকে ঐ সম্মেলনে যারা যোগ দেন, তিনি তাদের অন্যতম ছিলেন। আমি একাদিক্রমে দু'বছর সব পরীক্ষায় ফার্স্ট হওয়ায় আমাকে উৎসাহিত করার জন্য তিনি উদ্যোগী

www.pathagar.com

হয়ে মাদ্রাসার পক্ষ থেকে তিন টাকার একটা মাসিক স্টাইপেন্ডের ব্যবস্থা করে দেন এবং ব্যক্তিগতভাবে আমাকে একটি জামা উপহার দেন।

বিখ্যাত সনেটকার সূফী মোতাহার হোসেনকে বেশ কিছুদিন আমরা বাংলা শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলাম। ব্যক্তিগত আচার-আচরণে তিনি অত্যন্ত অমায়িক ছিলেন। তিনি কথা বলতেন খুব কম, সব সময়ই চিন্তামগ্ন থাকতেন। তাঁর পোশাক ছিল সাধারণত শার্টের উপর কোট এবং পাজামা। রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময়ও তিনি প্রায়ই আত্মমগ্ন থাকতেন। এমন কি বৃষ্টি বা প্রখর রৌদ্রের মধ্যেও তাঁর মধ্যে দ্রুত পায়ে হেঁটে কোন ঘরে আশ্রয় নেবার তাড়া দেখা যেতো না। প্রয়োজনে তিনি কখনও কখনও নিজের কোটটি খুলে মাথার উপর দিয়ে রোদ বৃষ্টির হাত হতে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতেন। এহেন ব্যক্তির ক্লাসরুমে খুব জনপ্রিয় শিক্ষক হবার কথা নয়। তবে তাঁর মতো একজন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকের ছাত্র হতে পেরেছি এ জন্য আমাদের গর্বের অন্ত ছিল না।

মাদ্রাসায় অন্যতম সফল শিক্ষক হিসাবে পেয়েছিলাম বাবু অমূল্যচরণ চক্রবর্তীকে। সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে তাঁর উপদেশ আমার জীবন যথেষ্ট ফলপ্রসূ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ' পড়াতেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে ক্লাসে প্রকাশ্যেই তিনি উষ্মা প্রকাশ করতেন। এই কট্টর হিন্দু ব্রাহ্মণ শিক্ষক মনে করতেন, ব্রাহ্ম হবার কারণে রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছা করেই 'অনধিকার প্রবেশ' গল্পে পূজামণ্ডপে শূকর ছানা ঢুকিয়ে হিন্দু ধর্মের অমর্যাদা করেছেন।

জনাব তাজউদ্দিন আহমদ আমাদের অংকের শিক্ষক ছিলেন। খুব সফল শিক্ষক হলেও আমরা বেশীদিন তাঁকে পাইনি। তিনিও পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। পরবর্তীকালে তিনি তাঁর নিজ এলাকা গোয়ালন্দের উজানচরে একটি হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। যতদূর মনে পড়ে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে তিনি কৃষক শ্রমিক পার্টির পক্ষ থেকে যুক্তফ্রন্টের ব্যানারে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

ময়েজ উদ্দিন হাই মাদ্রাসায় যাদের শিক্ষক হিসাবে পেয়েছিলাম তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন বাবু শ্রীশচন্দ্র ঘোষ। একজন হিন্দু শিক্ষক হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তান আন্দোলনের সেই পরিবেশেও হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সবার কাছে নিজ ব্যক্তিত্বগুণে তিনি শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। আমাদের তিনি সাধারণত ইংরেজী ও গণিতের ক্লাস নিতেন। কিন্তু প্রয়োজনে অন্যান্য শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে তিনি বাংলা, ভূগোল, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ক্লাসও নিতেন। কি শিক্ষাঙ্গনে কি বাইরে যে কোন সাংঘর্ষিক পরিস্থিতি মোকাবিলায় তাঁর ছিল নজিরবিহীন দক্ষতা। একবার আমার এক ক্লাসফ্রেন্ডের সাথে আমার কী নিয়ে দারুণ ঝগড়া বেধে যায়।

www.pathagar.com

নালিশ গেল তাঁর কাছে। উভয়কে তিনি জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। আমরা উভয়ে নিজেদের নির্দোষ প্রমাণের চেষ্টা করলাম। উনি সব শুনে বললেন, "দেখ্, দোষ তোদের কারো নয়, দোষ বাংলা ব্যাকরণ যাঁরা তৈরী করেছেন, তাঁদের। সব আমিই তো উত্তম পুরুষ, তোরা দু'জনেই যে 'আমি নির্দোষ' বললি,তা তো ঠিকই। উত্তম পুরুষ তো কখনও দোষী হতে পারে না।"

ছাত্রদের অসুখ-বিসুখ বা ব্যক্তিগত সমস্যায় তিনি খোঁজ-খবর নিতেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতেন। ফলে ছাত্ররাও তাঁকে অত্যন্ত আপন মনে করত। ফরিদপুরে সে সময় হাই মাদ্রাসার ফাইনাল পরীক্ষার কোন সেন্টার ছিল না। ফাইনাল পরীক্ষায় সাধারণত শ্রীশ বাবুই ছাত্রদের সঙ্গে যেতেন। ফাইনাল পরীক্ষায় যাবার আগে পরীক্ষার্থীদের একবার তাঁর বাড়ীতে দাওয়াত খাওয়া– এটাও বহুদিন ধরে ট্রাডিশন হয়ে উঠেছিল। ঐ দাওয়াতের মেনুতে গোস্ত না থাকলেও ইলিশসহ বিভিন্ন মাছ, মুড়িঘন্ট এবং অবশ্যই দইয়ের ব্যবস্থা থাকত।

পাকিস্তান আন্দোলনের ক্ষেত্রে ফরিদপুরের অনন্য অবদান থাকলেও ফরিদপুরে কখনও কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি। হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতি রক্ষার ব্যাপারেও মুসলিম লীগ নেতা ইউসুফ আলী চৌধুরীর কৃতিত্বই ছিল সর্বাধিক, যদিও মুসলমানদের দাবিয়ে রাখার ব্যাপারে হিন্দু নেতৃবৃন্দের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তিনি সব সময়ই সচেতন ও সক্রিয় থেকেছেন। ফরিদপুর জেলা বোর্ডের প্রথম চেয়ারম্যান খান বাহাদুর আলিমুজ্জামান চৌধুরী যখন ১৯৩১ সালে শেষ টার্মে চেয়ারম্যান নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, তখন ফরিদপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন বাবু অম্বিকা চরণ দত্ত। তিনি জনৈক হিন্দু প্রার্থীকে চেয়ারম্যান করার উদ্দেশ্যে আলিমুজ্জামান চৌধুরীর সমর্থক কয়েকজন সদস্যকে আটক করে রাখেন। এ খবর পেয়ে মোহন মিয়া দ্রুত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বাসভবনে ছুটে যান এবং তাদের উদ্ধার করে খানবাহাদুর সাহেবের বিজয় নিশ্চিত করেন।

এ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে ফরিদপুরে মুসলমানরা সামাজিক ক্ষেত্রে কত পিছিয়ে ছিল তার করুণ চিত্র পাওয়া যায় আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনার নিকট আত্মীয় খোন্দকার নূরুল হোসেনের একটি রচনায়। "মোহন মিয়া সাহেবকে যেমন দেখেছি" শীর্ষক এক নিবন্ধে তিনি বলেন, "এদের ছোট সময়ে দেশে বিশেষ করে শহর অঞ্চলে যে সমাজব্যবস্থা ছিল, তাকে মোটামুটি হিন্দু সংস্কৃতিপ্রধান সমাজ-ব্যবস্থাই বলা যায়। কারণ শহরাঞ্চলে তখন মুসলমানদের কোন অস্তিত্বই ছিল না। ঐ সময়ে গ্রাম থেকে শহরে আসতে হলেই সমস্ত চলনসই শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন মুসলমানগণ হিন্দুদের মত ধুতী-পাঞ্জাবী পরে চলাফিরা করতেন। এমনকি শুধু ঈদের সময় ছাড়া পাজামা ব্যবহার করতেন না। তাই বলে এটা ঠিক

www.pathagar.com

নয় যে, তিনি (মোহন মিয়া) হিন্দুদের পছন্দ করতেন না। বা তার কোন হিন্দু বন্ধু ছিল না বরং তার ক্ষেত্রে তা ছিল উল্টা। হিন্দুদের প্রতি তিনি ছিলেন সহানুভূতিশীল ও উদারভাবাপন্ন। যে কারণে তার সময়ে বিভিন্ন এলাকায় হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে দাঙ্গা বাধলেও ফরিদপুরে তা তেমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারেনি।" [দ্রষ্টব্য ঃ মরহুম মোহন মিয়ার সপ্তদশ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা, মোহন মিয়া স্মৃতি সংসদ, ফরিদপুর, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা ৪৯-৫০]।

ফরিদপুরের সে সময়ের আরও কয়েকজন নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তির নাম উল্লেখের দাবী রাখে। একজন ছিলেন তকী মোল্লা। ফরিদপুর শহরের উত্তর প্রান্তে চরাঞ্চলের মুখে তার বাড়ী ছিল। তিনি অনেক গরীব মুসলমান ছাত্রকে তাঁর বাড়ীতে দীর্ঘদিন ধরে জায়গীর রেখে শিক্ষার ক্ষেত্রে অমূল্য অবদান রাখেন। পড়াশোনার পাশাপাশি ঐ ছেলেদের দিয়ে তিনি একটি খেলার টিমও করে দেন। চর এলাকায় এ সময় দু'জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি মুসলিম জাগরণে ও পাকিস্তান আন্দোলনে বিশেষ অবদান রাখেন। এরা হচ্ছেন চর টেপাখোলার হাজী রহমত পাল এবং চর মাধবদিয়ার হাফেজ মোহাম্মদ ইব্রাহীম। শেষোক্ত জনের প্রতিষ্ঠিত বাকীগঞ্জ মাদ্রাসা অদ্যাবধি এতদঞ্চলে ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখছে।

পাকিস্তান আন্দোলন চলাকালেই মুসলিম লীগ এবং মুসলিম ছাত্র লীগে গ্রুপিং ছিল। তবে আমরা এসব জানতাম না বলে এসবের সাথে আমাদের জড়িত থাকার প্রশ্নও ছিল না। কিন্তু আমাদের যারা নেতা ছিলেন, তারা এ ব্যাপারে অবহিত ছিলেন বলেই এখন মনে হয়। আমি যখন নাইন বা টেনের ছাত্র, তখন জেলা মুসলিম ছাত্র লীগের সভাপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় যতদূর মনে পড়ে, রাজেন্দ্র কলেজের একটি কক্ষে। আমাদের নেতা হাফেজ মতিয়র রহমানের পরামর্শে আমরা ভোট দিয়েছিলাম আবদুল গণি হাজারীকে। হাজারী সাহেবের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন আবদুল হামিদ চৌধুরী। অনেক পরে জেনেছিলাম, এই চৌধুরী সাহেব ছিলেন মুসলিম লীগের সোহরাওয়ার্দী-হাশিম গ্রুপের এবং হাজারী সাহেব ছিলেন নাজিমুদ্দিন-আকরম খাঁ গ্রুপের সমর্থক।

ময়েজউদ্দিন হাই মাদ্রাসায় আমাদের অবিসংবাদিত ছাত্র নেতা ছিলেন মাদ্রাসার সিনিয়র ছাত্র হাফেজ মতিয়র রহমান। মাদ্রাসা চত্বরের বাইরেও ফরিদপুরে মুসলিম জাগরণ ও পাকিস্তান আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাঁর প্রচুর অবদান ছিল। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও রাজনীতি ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে গিয়ে তিনি ফাইনাল পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল লাভ করতে পারেননি। যতদূর জানি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এই মেধাবী ছাত্রনেতাকে মুসলিম ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের মত একটি সামান্য চাকরি নিয়েই জীবন কাটিযে দিতে হয়। জেলা মুসলিম ছাত্রলীগের সভাপতি পদে

www.pathagar.com

প্রতিদ্বন্দ্বী উল্লেখিত আবদুল হামিদ চৌধুরীকে পরবর্তীকালে শেখ মুজিবর রহমানের ডান হাত তথা বুদ্ধিদাতা বিবেচনা করা হত। কিন্তু পাকিস্তান আন্দোলন ও আওয়ামী লীগের এই মেধাবী সংগঠকও পরবর্তীকালে রাজনীতির মূল স্রোত থেকে ছিটকে পড়ে বিস্মৃতির অন্তরালে হারিয়ে গেছেন।

ফরিদপুরে পাকিস্তান আন্দোলনের এ ধরনের হারিয়ে যাওয়া আরেক ছাত্রনেতার নাম আবদুল গফুর। রাজবাড়ী জেলার অন্তর্গত রাজধরপুর গ্রামের এই আবদুল গফুর একদা ফরিদপুর জেলা মুসলিম ছাত্র লীগের সভাপতি হিসাবে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন। পরবর্তীকালে নিজ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হিসাবে তাঁর কর্মজীবন সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। জাতীয় রাজনীতিতে অবদান রাখার যোগ্য আরেকজন মেধাবী ছাত্রনেতারও এ ধরনের করুণ পরিণতির কথা এ মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে। তিনি কামারখালির জনাব রুস্তম আলী। তিনি ময়েজউদ্দিন হাই মাদ্রাসা থেকে আমার কয়েক বছর আগে পাস করে বেরিয়ে যান। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র এই রুস্তম আলী বাংলা, ইংরেজী ও উর্দুতে তুখোড় বক্তৃতা দিতে পারতেন। ব্যক্তি জীবনে সিম্পল লিভিং হাই থিংকিং যাকে বলে তার মূর্ত প্রতীক ছিলেন তিনি। এককালের এই ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র, যাঁর জাতীয় জাগরণ ও পাকিস্তান আন্দোলনে বিরাট অবদান ছিল, তিনি অনেক বড় চিন্তা মাথায় নিয়েও শেষ পর্যন্ত হারিয়ে যান ইউনিয়ন পরিষদের সংকীর্ণ রাজনীতির আবর্তে।

মেধাবীদের সবাই যে এভাবে হারিয়ে গেছেন, তা হয়ত সত্য নয়। ময়েজ উদ্দিন হাই মাদ্রাসায় আমার এক ক্লাস উপরে পড়তেন দু'জন মেধাবী ছাত্র। একজন আবদুর রহমান, অপর জন এনামুল হক। উভয়েই জুনিয়র মাদ্রাসার স্কলার। আবদুর রহমান পরবর্তীকালে কোথায় গেছেন জানি না। তবে এনামুল হক শুধু পাকিস্তান আন্দোলনেই নয় ভাষা আন্দোলনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সরকারের অধীনে উচ্চ দায়িত্বপূর্ণ পদেও তিনি দীর্ঘদিন অধিষ্ঠিত ছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে আমার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে তার ছিল অগ্রজ প্রতীম এক সুহৃদের ভূমিকা। এনামুল হক আমার এক বছর আগে ১৯৪৪ সালে কৃতিত্বের সাথে হাই মাদ্রাসা পাস করেন এবং সপ্তম স্থান অধিকারের গৌরব অর্জন করেন। আমার মত এনামুল হকও স্টুডেন্ট হোমে থাকতেন।

স্টুডেন্টস হোমে আমার সময়ে আর যারা থাকতেন, তাদের মধ্যে বিশেষভাবে মনে পড়ছে রাজেন্দ্র কলেজের ছাত্র আবুল হাশেম, রুস্তম আলী, খোন্দকার রওশন আলী, কাওসার আলী, মকবুল হোসেন, আবদুল খালেক, বজলুর রহমান, আবুল হোসেন, মোয়াজ্জেম হোসেন, আবিদুর রেজা ও মজিবর রহমানের কথা। এদের মধ্যে আবুল হাশেমকে পরবর্তীকালে রাজেন্দ্র কলেজে অধ্যাপনাকালে আমার

www.pathagar.com

সহকর্মী হিসেবে পেয়েছিলাম। আবদুল খালেক ফরিদপুরের তদানীন্তন এসপি'র সুনজরে পড়ে যাওয়ায় তার ভাগ্য খুলে যায়। খোন্দকার রওশন আলী পাংশা জর্জ হাই স্কুলের হেড মাস্টার হিসাবে, মকবুল হোসেন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা হিসাবে এবং বজলুর রহমান, আবুল হোসেন ও মোয়াজ্জেম হোসেন আইনজীবী হিসাবে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। আবিদুর রেজা প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য হিসেবে রাজনীতি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

স্টুডেন্টস হোমে আমার সময়ের মাদ্রাসা ও স্কুল পর্যায়ের ছাত্রদের মধ্যে আরও ছিলেন সিনিয়র ছাত্র নাজমুল হক, আবদুল কাদের, খলিলুর রহমান, আমার ক্লাসফ্রেন্ড আবদুল মান্নান খান এবং চাঁদ মিয়া, জয়নাল আবেদীন প্রমুখ। এদের মধ্যে বিশেষ করে খলিলুর রহমান, আবদুল মান্নান খান ও জয়নাল আবেদীনকে দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠিন সংগ্রাম করে পড়াশোনা করতে হয়েছে। চাঁদ মিয়া পরবর্তীকালে সায়েন্স লাইনে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে নাইজেরিয়ায় যাবার সুযোগ পান। জয়নাল আবেদীন আমার কয়েক ক্লাস নীচে পড়তেন। তার মত এত মেধাবী ছাত্র আমি জীবনে খুব কম দেখেছি। তবে জীবনযুদ্ধে তিনি কতখানি জয়ী হতে পেরেছেন, তা আমি জানি না।

স্টুডেন্টস হোমে পড়াশোনার পাশাপাশি একস্ট্রা-কারিকুলার কার্যক্রমেও আমরা নিয়মিত অংশ নিতাম। বিকাল বেলায় আমরা ফুটবল, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন প্রভৃতি খেলায় অংশ নিতাম। মাঝে মাঝে সময় কাটানোর জন্য ঘরোয়া জলসার আয়োজন করা হত। উপস্থিত বক্তৃতা, ধাঁধার খেলা, গান প্রভৃতির পাশাপাশি মাঝে মধ্যে এতে ক্যারিকেচারও পরিবেশন করতেন বিভিন্ন জন। ক্যারিকেচার পরিবেশনের ক্ষেত্রে অবশ্য কলেজের ছাত্র মজিবর রহমানের জুড়ি মেলা ভার ছিল। তিনি রাজনৈতিক নেতাদের বক্তৃতা হুবহু নকল করে পরিবেশন করতে পারতেন। তিনি নেতাদের নকল বক্তৃতা পরিবেশনের সময় যথাসাধ্য সংশ্লিষ্ট নেতাদের মত পোশাক পরিধান করতেন। কিন্তু নেতাদের মত পোশাক যোগাড় করে বক্তৃতা নকল পরিবেশন করতে গেলেই তো শুধু হবে না, নেতাদের মত ভুঁড়িও তো বানাতে হবে। অগত্যা তিনি শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের বক্তৃতা পরিবেশনকালে একটি বালিশ ও খাজা নাজিমুদ্দিনের বক্তৃতা পরিবেশনের সময় ২/৩টি বালিশ জামার নীচে ভরে নিতেন।

তবে আমার মতে স্টুডেন্টস হোমে সব চাইতে আকর্ষণীয় ও বৈশিষ্ট্যব্যঞ্জক কার্যক্রম ছিল এর বাগান কার্যক্রম। হোমের দক্ষিণ দিকের মাঠ ছোট ছোট প্লটে ভাগ করে এক বা একাধিক ছাত্রের নামে বরাদ্দ করে দেয়া হত। কোদাল দিয়ে কুপিয়ে এতে আমরা ফুল এবং নানা রকমের সবজি ফলাতাম। বছর শেষে এ জন্য

www.pathagar.com

আমাদের সার্টিফিকেট দেয়া হত। আমার স্পষ্ট মনে আছে, আমার প্লটে আমি সাধারণত গোল আলু জন্মাতাম। স্টুডেন্টস হোমে একবার আমাদের দেশী পদ্ধতিতে কাগজ তৈরীর কৌশলও শেখানো হয়েছিল। বলাবাহুল্য ছাত্রদের স্বনির্ভর করে গড়ে তোলাই ছিল এসব কার্যক্রমের লক্ষ্য।

ময়েজউদ্দিন হাই মাদ্রাসায় আমার ছাত্র জীবনের শেষ পর্যায়ে ক্লাস টেনে পাবনা থেকে দু'জন ছাত্র এসে ভর্তি হয়। আমাদের এ দু'জন নতুন ক্লাসফ্রেন্ডের নাম ছিল ফয়েজউদ্দিন ও কায়েমুদ্দিন। আমি অতীতে পাবনায় জুনিয়র মাদ্রাসা পর্যন্ত পড়েছি, তাই এদের সাথে সহজেই আমার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। এদের মধ্যে ফয়েজউদ্দিন কমলাপুরে আর কায়েমুদ্দিন চরটেপাখোলায় জায়গীর পায়। চরটেপাখোলায় কায়েমুদ্দিন জায়গীর পায় চরের অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব হাজী রহমত পালের বাড়ীতে। এখানে উল্লেখ্য যে, এই রহমত পাল সাহেবেরই নাত জামাই ছিল আমার অন্যতম ক্লাসফ্রেন্ড ডিক্রির চরের শামসুদ্দিন আহমদ।

শামসুদ্দিন ও কায়েমুদ্দিন দু'জনই মেধাবী ছাত্র ছিল। অতীতে আমার স্কলার ক্লাসফ্রেন্ড আবদুর রহমান মাদ্রাসা ছেড়ে চলে যাবার পর শামসুদ্দীন বরাবরই ক্লাসে দ্বিতীয় স্থান পেত। আমি পেতাম প্রথম স্থান। হাই মাদ্রাসা ফাইনালে এরা উভয়েই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিল। শামসুদ্দীন একজন আদর্শবাদী স্বাপ্নিক ছিল। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে মানিকগঞ্জের পাটগ্রাম ও ফরিদপুরের মহিম হাইস্কুলে হেড মাস্টারী করা ছাড়াও চক বাজারের কাপড়ের দোকান, ভাসানী ন্যাপের রাজনীতি, সাংবাদিকতাসহ নানা ধরনের কাজে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে এবং আদর্শ সমাজ গঠনের অপূরিত স্বপ্ন বুকে নিয়েই অকাল মৃত্যুবরণ করে। কায়েমুদ্দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়ন শাস্ত্রে এমএসসি করে কলেজ অধ্যাপনায় যোগদান করে। ফরিদপুরে রাজেন্দ্র কলেজ ও পটুয়াখালী কলেজের পর সে রাজবাড়ী কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করে এবং এই কলেজ সরকারী কলেজ হবার পর এখান থেকেই অবসর গ্রহণ করে।

১৯৪৫ সালে মার্চে আমাদের হাই মাদ্রাসা ফাইনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষার সেন্টার পড়ে সিরাজগঞ্জে। আমরা যথারীতি শ্রীশবাবু স্যারের তত্ত্বাবধানেই সিরাজগঞ্জ যাই। ফরিদপুর থেকে ট্রেনে গোয়ালন্দ, গোয়ালন্দ থেকে বিশাল স্টীমারে চড়ে সিরাজগঞ্জ। নদী বন্দর হিসাবে গোয়ালন্দ ঘাটের তখন খুবই নামডাক। গোয়ালন্দ ঘাট থেকে পদ্মা দিয়ে পাটনা পর্যন্ত এবং যমুনা দিয়ে গৌহাটি পর্যন্ত স্টীমার যাতায়াত করত। এই নামডাকের গোয়ালন্দ ঘাট থেকে স্টীমারে চড়ে সিরাজগঞ্জ যেতে যেতে মনে হল, আমরা যেন ইতিহাসের এক বিরাট স্তর অতিক্রম করছি।

www.pathagar.com

ইতিহাসের স্তর অতিক্রম করি কিনা জানি না, তবে সিরাজগঞ্জ হাই মাদ্রাসা ফাইনাল পরীক্ষা দিতে যেয়ে আমার জীবন তরী যে এক মহা বিপর্যয়ে পতিত হতে হতে বেঁচে গিয়েছিল, এ সত্যকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। হাই মাদ্রাসা পরীক্ষার জন্য আমার সর্ববিষয়ে পূর্ণ প্রস্তুতি ছিল। আমি পরীক্ষায় স্ট্যান্ড করব এরকম আশা প্রায় সকল শিক্ষকই প্রকাশ্যে ব্যক্ত করতেন। হাই মাদ্রাসার পরীক্ষায় মোট ১০০০ নম্বরের মধ্যে ১০০ মার্কের একটি পেপার ছিল অপশনাল। আর সব কম্পালসারী। এই অপশনাল সাবজেক্ট হিসাবে অধিকাংশ ছাত্র নিত ইসলামের ইতিহাস। আমি নিয়েছিলাম এডিশনাল ম্যাথমেটিক্স। এই এডিশনাল ম্যাথমেটিক্স পরীক্ষার আগেই কম্পালসারী ম্যাথমেটিক্স পরীক্ষা হয়ে যায়। আমি তাতে খুব ভাল পরীক্ষা দিয়েছিলাম। ঐ আনন্দেই কিনা জানি না, এডিশনাল ম্যাথমেটিকসের কঠিন প্রশ্নগুলোও সহজ মনে হল এবং এগুলোই আগে উত্তর দানের সিদ্ধান্ত নিলাম। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য! যেটা করতে যাই সেটাই আর মিলতে চায় না। এভাবে এক একটা প্রশ্ন ধরি, কিছুটা করতে যেয়ে মেলে না বলে বাদ দিতে দিতে কখন যে এক ঘন্টা সময় চলে গেল। আমি রীতিমত ঘামতে শুরু করে দিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম এবার পরীক্ষা দিব না, আগামী বার আরও ভালভাবে প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষা দেব। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে চুপচাপ বসে আছি। ইতিমধ্যে কোত্থেকে যেন শ্রীশ বাবু এসে হাজির। জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন পরীক্ষা দিচ্ছি। আমার অবস্থা জানালাম। তিনি শান্ত স্বরে বললেন, কোন চিন্তার কারণ নেই। সহজ প্রশ্নগুলোর উত্তর আগে দিতে থাকো। আমি তাঁর কথামত সহজ প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে শুরু করলাম। সবই মিলে যেতে লাগল। এবং কী আশ্চর্য, যেসব প্রশ্ন আগে মেলেনি, সেগুলোও এবার মিলে যেতে লাগলো! এভাবে মাত্র দু'ঘন্টায় উত্তর দিয়েও ঐ পেপারে আমি সত্তরের মত নম্বর পেয়েছিলাম।

পরীক্ষার পর শুধু সিরাজগঞ্জে বন্ধু-বান্ধবদের সাথে মিলে সিনেমা দেখাই নয়, ফরিদপুরে ফিরে এসে ফরিদপুরের সিনেমা হলেও সকলে মিলে দেখলাম বিদায়ী সিনেমা। আমার বন্ধু-বান্ধবদের অনেকেই তখন ধূমপান করত। ধূমপান মানে বিড়ি। তখনও সিগারেটের তেমন চল হয়নি সমাজের সর্বপর্যায়ে। বন্ধুরা জানত আমি ধূমপান করি না। তাদের মধ্যে যারা ধূমপানে অধিক অভ্যস্ত, তারা জিদ ধরল আজ এ খুশীর দিনে তাদের সাথে আমাকেও বিড়ি টানতে হবে। আমি যতই 'না' করি, ততই তাদের জিদ বেড়ে যাচ্ছে। সিনেমা শুরু হবার পূর্ব মুহূর্তে আলো-আঁধারীর মধ্যে আমাকে নিয়ে চলছে তাদের এই জোরাজুরি। বন্ধুদের কেউ বলল, জীবনে বিড়ি কিনতে তোর যতটাকা লাগে, আমি দেব, তবুও বিড়ি খা। কেউ বলল, আমাদের কথা রক্ষার্থে একটা মাত্র টান দে, এই বলে আমার মুখে বিড়ি

www.pathagar.com

গুঁজে দিল। একবার ভাবলাম একটা টান দিয়েই দেখি না। আবার কি মনে করে মন বিদ্রোহ করে উঠল, এতদিন যা খাইনি তাই আজ খাব! আমি সিট থেকে জোর করে উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, তোরা এমন জোরাজুরি করলে আমি সিনেমাই দেখব না। অগত্যা বন্ধুরা জোরাজুরি থেকে নিবৃত্ত হল।

হাই মাদ্রাসা ফাইনাল পরীক্ষার শেষে ফরিদপুর থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে আবার চলে এসেছি গ্রামের বাড়ীতে। গ্রামের জীবন মানেই মুক্ত-স্বাধীন জীবন। ঘন্টা বাজতেই হুড়মুড় করে ক্লাসে যাবার তাড়া নেই, নেই ক্লাসের জন্য পড়া তৈরীর ঝামেলা। রাত জেগে পরীক্ষার প্রস্তুতি নেবার তাগিদ নেই। নেই মাদ্রাসা ও স্টুডেন্টস হোমের হরেক রকমের নিয়ম-রীতি ও আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার বাধ্যবাধকতা। খালি গায়ে, খালি পায়ে শুধু লুঙ্গী পরে খোলা হাওয়ায় এ বাড়ী থেকে সে বাড়ী, এ পাড়া থেকে সে পাড়া, এ মাঠ থেকে সে মাঠে ছুটে বেড়ানোর এমন অফুরন্ত অবসর কত দিন পাইনি। লম্বা অবসর কাটাতে আত্মীয়-স্বজনের বাড়ী ঘুরলাম। আত্মীয় বাড়ী মানে ফুফু বাড়ী, মামা বাড়ী আর নানা বাড়ী। লম্বা ফুরসতে বেড়িয়ে নিলাম থানা শহর পাংশা, মহকুমা শহর রাজবাড়ী। এমন কি যেখানে ক্লাস ফোর থেকে সিক্স পর্যন্ত পড়েছি সেই তালিমনগর।

গ্রামে শহরে যেখানেই গেছি, মনে হয়েছে সর্বত্র যেন একটা পরিবর্তনের আমেজ লেগেছে। পাকিস্তান আন্দোলনের ঢেউ এসে লেগেছে সবখানে। সর্বত্র মুসলমানরা মুসলিম লীগের পতাকাতলে পাকিস্তানের দাবীতে ঐক্যবদ্ধ, আর হিন্দুরা ঐক্যবদ্ধ অখণ্ড ভারতের দাবীতে কংগ্রেসের পতাকাতলে। হিন্দু আর মুসলমানরা ঘন ঘন সভা-সমিতি করে যার যার দাবী তুলছে সবখান থেকে। তবে একটা কথা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল শিক্ষা-দীক্ষা, চাকরি-বাকরী, ব্যবসা-বাণিজ্যে অনগ্রসর থাকার কারণে বিভিন্ন এলাকার নেতৃস্থানীয় হিন্দুদের উপর অতীতে সাধারণ মুসলমানদের অনেকের যে নির্ভরশীলতা ছিল, তা দ্রুত কেটে যাচ্ছে, মুসলমানরা সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নিজেদের ন্যায্য অধিকার বুঝে নিতে সংকল্পবদ্ধ হয়ে উঠছে। দেশের রাজনৈতিক এ হাওয়ার ছোঁয়া লেগেছিল আমাদের ইউনিয়ন খানগঞ্জে এবং বেলগাছিতেও। বেলগাছি হাই স্কুলে মাঝে-মধ্যে রাজনৈতিক সভা বসত। কখনও হিন্দু-মুসলমান পৃথক পৃথকভাবে, কখনও মিলিতভাবে। মিলিত সভায়ও হিন্দু ও মুসলমানরা স্ব স্ব বক্তব্য পেশ করতেন। এরকম সভায় আমাকে প্রায়ই মুসলমানদের পক্ষ থেকে বক্তব্য দিতে হত। আমাদের গ্রামের মধ্যে আমি দ্বিতীয় ম্যাট্রিকুলেট হয়ে কলেজে পড়তে যাচ্ছি ভেবে আমাকে সবাই যথেষ্ট সমীহ করতেন। আমার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম স্থানীয় মুসলিম জমিদারদের মধ্যেও। পাকিস্তান আন্দোলন তখন সর্ব শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে

www.pathagar.com

এমন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল যে, এর থেকে দূরে সরে থাকা সমাজের নেতৃত্বকামী কারো পক্ষেই সম্ভবপর ছিল না।

হাই মাদ্রাসা ফাইনাল পরীক্ষা ভাল দিলেও আমি রেজাল্ট আউট না হওয়া পর্যন্ত প্রতি মুহূর্তে উদ্বেগের মধ্যে ছিলাম। কেবলই ভয় হত– অজান্তেই হয়ত কোন পেপারে কোন ভুল করে থাকব, যার কারণে অন্যান্য পেপারে ভাল মার্ক পেয়েও এক সাবজেক্টে ফেল করে বসতে পারি। যতই রেজাল্টের দিন এগিয়ে আসছে, ততই বুকের মধ্যে তড়পানি বেড়ে যাচ্ছে। আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে শামসুদ্দীনের বাড়ী ফরিদপুর শহরের অতি সন্নিকটে। তার উপরই দেয়া ছিল রেজাল্ট আউট হওয়া মাত্র চিঠি দিয়ে তা আমাকে জানানোর দায়িত্ব। ডাকঘরের পিয়ন চিঠি বিলি করে প্রধানত হাটের দিন। আমাদের হাট বসে সপ্তাহে দু'দিন শুক্র ও সোমবার। প্রতি হাটের দিন চিঠির আশায় হাটে যাই। কিন্তু চিঠি না আসায় একপশলা বাড়তি উদ্বেগ নিয়ে ঘরে ফিরি। তবে কি আমার রেজাল্ট খারাপ হয়েছে বলেই শামসুদ্দীন চিঠি দিচ্ছে না? কিন্তু আমি তো তার কাছ থেকে ওয়াদা নিয়েছিলাম, রেজাল্ট ভাল হোক বা মন্দ হোক সে সাথে সাথে জানাবে।

প্রাথমিক শিক্ষক হতে পারলাম না

একটানা দীর্ঘদিন ধরে বাড়ীতে নিষ্কর্মা বসে আছি। রেজাল্ট জানিয়ে চিঠিও পাঠাচ্ছে না আমার বন্ধু। এ অবস্থায় আমার রেজাল্ট খারাপ হতে পারে সন্দেহ করেই কিনা জানি না, আব্বা একটা চাকরি নিতে আমাকে চাপ দিতে লাগলেন। আমাদের গ্রামের মক্তব এতদিনে প্রাইমারী স্কুলে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে আব্বা স্কুল ইনস্পেক্টরের নিকট সুপরিচিত ছিলেন। তাকে বলে প্রাইমারী শিক্ষক পদে আমার নিয়োগের ব্যবস্থা করতে পারবেন এই ভরসায় আব্বা আমাকে একদিন অনেকটা জোর করেই রাজবাড়ী মহকুমা সদরে স্কুল ইনস্পেক্টরের অফিসে নিয়ে গেলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে, সেদিন স্কুল ইনস্পেক্টর রাজবাড়ীতে ছিলেন না। ফলে জীবনে আমার প্রাথমিক শিক্ষক হওয়া আর হয়ে উঠল না।

এর অল্পদিনের মধ্যে এক হাটের দিনে হাটে যেতেই পিয়ন জানাল, আমার চিঠি আছে। একখানি পোস্টকার্ড। হ্যাঁ, শামসুদ্দিনেরই হাতের লেখা। দুরু দুরু বুকে চিঠি পড়তে লাগলাম। কিন্তু চিঠি কি পড়ব। প্রথম লাইন পড়েই আমার সারা শরীরের রক্ত হিম হয়ে গেল। ইংরেজীতে লিখেছে শামসুদ্দীন— Dear Ghafur, I am sorry to inform you that you have failed....

আমি আর অগ্রসর হতে পারলাম না। দু'চোখে ঝাপসা দেখতে লাগলাম। সাথে আব্বা ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, চিঠিতে কি লিখেছে? আমি বিষয়টা চাপা দিতে বললাম, বুঝতে পারছি না, কাল আমাকে ফরিদপুর যেতে হবে।

www.pathagar.com

পরদিনই রওনা হলাম ফরিদপুরের উদ্দেশ্যে। ট্রেনে সারাপথ আমার কাটল প্রায় নীরবে। আমার চার পাশের প্যাসেঞ্জারদের কোলাহল কিছুই আমার ভাল লাগছিল না। চারদিকের হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে থেকেও আমি যেন ছিলাম এক ভিন্ন জগতের নিঃসঙ্গ বাসিন্দা। এক সময় পড়ন্ত বিকেলে ট্রেন এসে পৌঁছল ফরিদপুর রেল স্টেশনে। পরীক্ষায় যদি ফেল করে থাকি, এ লজ্জা নিয়ে আমি কিভাবে মানুষকে মুখ দেখাব। যে কোন মূল্যে শামসুদ্দীনকে খুঁজে বের করতে হবে ভেবে পা বাড়ালাম টেপাখোলা কোহিনূর লাইব্রেরীর দিকে, যেখানে সে বিকালে বইপত্র পড়তে আসে। লাইব্রেরীতে যখন পৌঁছলাম, তখনও লোকজন তেমন আসেনি। শামসুদ্দীনও আসেনি। নাম জানতাম না মুখে চিনতাম এমন কয়েকটি ছেলে আমাকে দেখে নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করতে লাগল। এরপর একজন উঠে এসে আমাকে বলল, আপনার রেজাল্ট জেনে আমরা দারুণ খুশি হয়েছি। আমি তো অবাক। আমার পরীক্ষার রেজাল্ট খারাপ হয়েছে বলেই কি এমন ঠাট্টা!

এমন সময়ে শামসুদ্দীন এসে ঢুকেই আমাকে কনগ্রাচুলেশন বলে বুকে জড়িয়ে ধরল। আমি এবার কঠিন স্বরে বললাম, তুইও ঠাট্টা শুরু করে দিলি আমার সাথে! শামসুদ্দীন অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, তুই আমার চিঠি পাসনি? তুই যে সেকেন্ড স্ট্যান্ড করেছিস তা জানিস না?

আমি বললাম, তুই তো লিখেছিস, আমি ফেল করেছি। এই বলে পকেট থেকে পোস্টকার্ডখানা বের করে শামসুদ্দীনের হাতে দিয়ে বললাম– পড়ে দেখ, কি লিখেছিস।

শামসুদ্দীন গড় গড় করে পড়ে চলল, ডিয়ার গফুর, আই এ্যাম সরি টু ইনফর্ম ইউ দ্যাট ইউ হ্যাভ ফেইলড টু অকোপাই দ্য টপমোস্ট পজিশন ইন দ্য হাই মাদ্রাসা একজামিনেশন অব দিস ইয়ার....

আমি ফরিদপুর থেকে বাড়ী ফিরবার আগেই গ্রামে পৌঁছে গিয়েছিল আমার রেজাল্টের খবর। বেলগাছি স্টেশনে নেমেই তা বুঝতে পারলাম। যেমন গ্রামে, তেমনি বাড়ীতেও সবাই মহাআনন্দিত। আমি হাই মাদ্রাসা পরীক্ষায় বাংলা ও আসামের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছি, একথার অর্থ হল, আমার আইএ পড়তে টুইশন ফি লাগবে না। উপরন্তু প্রতিমাসে ১৬ টাকা স্কলারশীপ পাব। সব চাইতে বড় কথা, পড়ার খরচের জন্য আর বাড়ীর উপর নির্ভর করতে হবে না।

আইএ পড়ব। কিন্তু কোথায় কোন্ কলেজে পড়ব, এ বিষয়ে পরামর্শ করতেই ছুটলাম পাবনা জেলার তালিমনগর মাদ্রাসায়। মওলানা রইসউদ্দীন আহমদ আমার হাই মাদ্রাসার রেজাল্ট জেনে খুবই খুশি। খুশি সেখানকার পরিচিত অন্য সবাই।

www.pathagar.com

মওলানা সাহেবের পরামর্শের আলোকেই শেষ পর্যন্ত সাব্যস্ত হল হুগলী অথবা ঢাকার ইসলামিক কলেজে আইএ পড়ব। হুগলীতে থাকেন আবদুল ওহাব মামা– যিনি আমার জুনিয়র মাদ্রাসার বন্ধু আবুল হোসেনের মামা হিসাবে আমাদেরও মামা। তাঁর কাছে গিয়ে একবার পৌঁছতে পারলে বাকী সবকিছু তিনিই করবেন। ঢাকার জন্য মওলানা সাহেব চিঠি লিখে দিলেন তাঁর ছোট ভগ্নীপতি আবদুর রহমান সাহেবকে। জনাব আবদুর রহমান তখন ঢাকায় চাকরি করেন। আমার নিরাভরণ গ্রাম্য জীবনধারার দিকে ইঙ্গিত করে সুরসিক মওলানা সাহেব একটু টিপ্পনিও কাটলেন– এতদিন যাই হোক, এবার বড় শহরে যাচ্ছ, কাঁথাকে প্রমোশন দিয়ে আবার হুগলী, ঢাকা নিয়ে যেও না।

আইএ পড়ব কোনো গভর্নমেন্ট ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে– এ চিন্তার বশবর্তী হয়েই হুগলী বা ঢাকার মধ্যে চয়েস সীমাবদ্ধ রেখেছিলাম। হুগলী ও ঢাকা ছাড়া বাংলাদেশে আর একটি মাত্র গভর্নমেন্ট ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ছিল চট্টগ্রামে। কিন্তু সে তো অনেক দূরে। হুগলী আর ঢাকার প্রতি আমার আকর্ষণের আর একটি কারণ অবশ্য ছিল রাজনৈতিক। হুগলী ছিল কলিকাতার খুব নিকটে। হুগলীতে থাকলে অবিভক্ত বঙ্গের রাজধানী কলিকাতার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা সহজ হবে। কলিকাতার পরই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের দ্বিতীয় বৃহত্তম কেন্দ্রবিন্দু ছিল ঢাকা। এ কারণেই ঢাকা ছিল আমার অন্যতম চয়েস। হুগলী ও ঢাকা দু'টি কলেজেরই যথেষ্ট সুনাম ছিল বাইরে।

কলিকাতার কাছাকাছি থাকার আশায় হুগলীতেই গেলাম প্রথম। গোয়ালন্দ-শিয়ালদা রেলপথের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রেলস্টেশন নৈহাটি। নৈহাটির সামান্য পশ্চিমেই গঙ্গা, ভাগিরথী বা হুগলী নদী। নদীর ঠিক পশ্চিম পাড় ঘেঁষেই হুগলী শহর। নৌকায় নদী পাড়ি দিয়ে হুগলী শহরে যখন পৌঁছালাম তখন বিকাল। মানুষের কাছে জিজ্ঞাসা করতে করতে এক সময় ওহাব মামার হোস্টেলেও পৌঁছে গেলাম। কিন্তু ওহাব মামা নেই। অগত্যা তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। অবশেষে একসময় তিনি ফিরলেন। আমাকে দেখে দারুণ খুশি। আরও খুশি হলেন আমার রেজাল্টের কথা জেনে। হোস্টেলে তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের সাথে পরিচয় করে দিলেন ভাগিনা বলে।

ওহাব মামা তখন সারাদিন ঘোরেন চাকরির ধান্ধায়। পরদিনও একটা চাকরির ইন্টারভিউ দিতে তাঁর কলিকাতা যাবার কথা। জিজ্ঞেস করলেন, আমি তাঁর সঙ্গে কলিকাতা যেতে চাই কিনা? যদিও আমি লম্বা জার্নি করে কিছুটা হয়রান হয়ে পড়েছিলাম তবুও কলিকাতা দেখার এ সুযোগ হারাতে রাজি ছিলাম না। তাছাড়া একগাদা অপরিচিতের মধ্যে সারাটা দিন কাটানোর বদলে মামার সাথে কলিকাতা

www.pathagar.com

ভ্রমণের সুযোগকে আমার কাছে সুবর্ণ সুযোগই মনে হল।

প্রথম কলিকাতা দর্শন

পরদিন ভোরবেলা নাকেমুখে সংক্ষিপ্ত নাস্তা সেরে মামার সাথে রওনা হলাম হুগলী রেল স্টেশনের উদ্দেশে। ট্রেনে যথেষ্ট ভিড়। আমার কাছ থেকে টিকেট হারিয়ে যেতে পারে সম্ভবত এই আশংকায় মামা আমার টিকেটও নিজের কাছেই রেখে দিলেন। ট্রেনের মধ্যে মামা বারবার আমাকে বুঝিয়ে দিলেন, উনি রাইটার্স বিল্ডিংয়ের ভেতরে যেয়ে যতক্ষণ ইন্টারভিউ দেন, আমি ততক্ষণ যেন ঐ বিল্ডিংয়ের গেটের কাছেই থাকি। মুহূর্তের তরেও যেন এদিক-ওদিক না যাই। তাহলে বিশাল কলিকাতা মহানগরীতে আমি হারিয়ে যেতে পারি।

কিন্তু না, আমাকে বিশাল কলিকাতা মহানগরীতে হারিয়ে যেতে হল না। কলিকাতার পশ্চিম প্রবেশপথ হাওড়া স্টেশনেই আমি জনারণ্যে হারিয়ে গেলাম। মামার কথামত হাওড়া স্টেশনের ভিড়ের মধ্যে সব সময় তাঁর জামার খুঁট ধরে ধরে এগুচ্ছিলাম। হাওড়া রেল স্টেশনে অনেকগুলো প্লাটফর্ম আছে এবং সেখান থেকে ভারতবর্ষের পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, মধ্য সব অঞ্চলে ট্রেনে যাওয়ার অনেক লাইন আছে, সে কথা ভূগোল পড়তে গিয়ে আগেই জেনেছিলাম। কিন্তু প্লাটফর্মে যে লোকের এমন ভিড় হতে পারে, এটা ছিল আমার কাছে একেবারে অকল্পনীয়। অনবরত একটার পর একটা গাড়ী আসছে বা ছেড়ে যাচ্ছে, আর হাজার হাজার লোক ট্রেন থেকে নামছে আর উঠছে। বর্ষাকালে ভরা পদ্মায় নদীর প্রবল স্রোত দেখেছি, সে স্রোত যা কিছু সামনে পায়, ঠেলে নিয়ে যায়। পদ্মার প্রবল জলস্রোতের মতই হাওড়া স্টেশনের প্রবল জনস্রোত। কখন যে সেই জনস্রোতের ধাক্কায় মামা আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন, টেরও পেলাম না। যখন টের পেলাম, দেখি আমার হাতের মধ্যে মামার জামার খুঁট নেই, এমনকি মামাও সামনে নেই। নেই তো নেই, কোথাও নেই। পলকে যেন একটা জলজ্যান্ত মানুষ উধাও হয়ে চলে গেল আমার দৃষ্টিসীমার বাইরে। আর দৃষ্টিসীমারই ব্রা দোষ কি। আমি তখনও যথেষ্ট বেঁটে ছিলাম বলে ভিড়ের কোথায় শুরু কোথায় শেষ, তাও বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

জনস্রোতের ধাক্কায়ই সামনে এগুতে এগুতে এক সময় প্লাটফর্ম থেকে বেরোবার গেটের কাছাকাছি এসে পড়লাম। গেট দেখেই আরেক দফা ভয়ে সারা শরীর হিম হয়ে গেল। আমার কাছে তো টিকেট নেই, গেট পার হব কি করে? অনেক কষ্টে গেট থেকে সামান্য দূরে প্লাটফর্মের দেয়াল ঘেঁষে একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে খুঁজতে লাগলাম, মামা গেট দিয়ে বের হতে আসেন কিনা। কিন্তু নাহ, দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকাই সার হল। এত লোক গেট দিয়ে পার হল, কিন্তু মামার দেখা নেই। এবার

www.pathagar.com

সত্যি ভয়ে আমার মুখ সাদা হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত কি বিদেশ-বিভূঁইয়ে আমাকে টিকেট চেকারের কাছে নাজেহাল হতে হবে?

এর মধ্যে লক্ষ্য করলাম, গেটের ডিউটিরত কর্মচারীরা প্যাসেঞ্জারদের টিকেট নিয়ে নিয়ে ছেড়ে দিলেও মাঝে মাঝে এক একদল লোককে বিনা টিকেটেই ছেড়ে দিচ্ছে। এদের বেশভূষা দেখে মনে হল, এরা তীর্থযাত্রী হবে। কোন তীর্থস্থান থেকে হয়ত ফিরে আসছে বা যাচ্ছে। এরা কিছুক্ষণ ধরে একপাশে জমা হচ্ছে, তারপর এক ধাক্কায় এরা গেট পার হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ ভরসা করে এদের একটা দলের মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়লাম এবং যথাসময়ে এদের সাথে এক ধাক্কায় গেট পারও হয়ে গেলাম। আমার বুকের উপর থেকে যেন একটা ভারী পাথর সরে গেল।

এরপর রাইটার্স বিল্ডিংয়ে যাবার পালা। মানুষের কাছে জিজ্ঞাসা করে করে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে যাওয়ার উদ্দেশে একটা ট্রামে উঠলাম এবং লোকদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে করতে একসময় রাইটার্স বিল্ডিংয়ে পৌঁছেও গেলাম। বলাবাহুল্য, হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রামে এবং ট্রাম থেকে রাইটার্স বিল্ডিংয়ের গেট পর্যন্ত কোথাও মাতৃভাষা বাংলা উচ্চারণের মওকা পেলাম না। চারদিকের সকলেই কথা বলছে হিন্দীতে, উর্দুতে। আমিও বাংলা মিশ্রিত ভাঙ্গা উর্দুতে কোন রকমে আমার কাজ চালিয়ে নেয়ার চেষ্টা করলাম।

একটানা কয়েক ঘন্টা রাইটার্স বিল্ডিংয়ের গেটে মামার জন্য অপেক্ষা করতে করতে হতাশা, ক্ষুধা, ক্রোধ আর ক্লান্তিতে আমার যখন চরম বিপর্যস্ত অবস্থা, তখন ভেতর থেকে বের হয়ে এলেন ওহাব মামা। বললেন, খুব ক্ষিদে লেগেছে নিশ্চয়ই। চল, আগে কিছু খেয়ে নিই, এই বলে নিয়ে গেলেন একটা হোটেলে। খাবার পর কিছুক্ষণ এদিক-সেদিক ঘোরাঘুরি করে মামার সাথে আবার হুগলী ফিরে এলাম। বলাই বাহুল্য, কলিকাতা মহানগরীতে আমার এই প্রথম সফর-অভিজ্ঞতা মোটেই আনন্দদায়ক হয়নি।

কলিকাতার মত আমার হুগলীর অভিজ্ঞতাও মোটেই আনন্দদায়ক হলো না। হুগলী বলতেই দানবীর হাজী মুহম্মদ মহসিনের স্মৃতি-বিজড়িত একটি প্রাণ-প্রাচুর্যময় স্থানের ছবি আমার তরুণ মনের কোণে ভেসে উঠত। হুগলীতে হাজী মহসিনের স্মৃতি-বিজড়িত ইমামবাড়া, মহসিন কলেজ প্রভৃতি ঠিকই আছে। প্রথম সুযোগেই ইমামবাড়া, ইমামবাড়ার সুউচ্চ মিনারের বিখ্যাত ঘড়ি প্রভৃতি দেখে নিয়েছিলাম। কিন্তু আমার মত একজন তরুণ, যার অতীত কেটেছে গ্রামে অথবা আধা-গ্রাম, আধা-শহর ফরিদপুরে, তার কাছে হুগলীকে কেবলই ইট-পাথরের একটা কাঠ-খোট্টা প্রাণহীন শহর বলে মনে হতে লাগল। প্রথম দৃষ্টিতে কলিকাতাকে আমার মনে হয়েছিল ইট-পাথরের দালানকোঠা আর অতিব্যস্ত

www.pathagar.com

প্রাণহীন মানুষের একটি শহর বলে। আর হুগলীকে মনে হল যেন কলিকাতারই একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। কেন এমনটি মনে হয়েছিল তা হয়ত বুঝিয়ে বলতে পারব না। তবে হুগলী শহরে ক'দিন ঘোরাঘুরি করেও হাওয়া খাওয়া যায়– এমন কোন প্রশস্ত মাঠ দেখেছি বলে মনে পড়ে না। হুগলী শহরে খোলা নীল আসমানটি পর্যন্ত দেখবার জো নেই। এদিক-সেদিকের অগুণতি কল-কারখানার চোঙা থেকে অনবরত নির্গত হচ্ছে ধোঁয়া। আর এই ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় হুগলীর আকাশ অষ্টপ্রহর আচ্ছন্ন থাকে। শুনলাম, কল-কারখানার এই অতিরিক্ত ধূম্র উদ্গীরণের কারণে হুগলীতে পীত-জ্বরের প্রকোপ খুব বেশী।

হুগলীতে এককালে পড়েছেন পাকিস্তান আন্দোলনের অন্যতম ছাত্রনেতা শাহ আজিজুর রহমান। শুনেছিলাম, তিনি তখনও প্রায়ই হুগলীতে থাকতেন। শাহ আজিজ সম্পর্কে শুনেছিলাম, তিনি ছাত্র হিসাবে যেমন ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী, তেমনি বাংলা, ইংরেজী, উর্দু, আরবীতে তুখোড় বক্তৃতা দিতে পারতেন। হুগলীতে অবশ্য শাহ সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি, তাঁর সাথে আমার পরিচয় হয় পরবর্তীকালে ঢাকায়। হুগলীতে আমার পরিচয় হয় নিউ স্কীম লাইনের অপর দুই কৃতী ছাত্রের সাথে। এদের একজন মফিজুল্লাহ কবীর, অপরজন কাজী দীন মুহম্মদ। পরবর্তীকালে মফিজুল্লাহ কবীর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রফেসর ও প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর হন। ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ও বাংলা একাডেমীর পরিচালক হওয়া ছাড়াও একজন ভাষাবিদ, সাহিত্যিক এবং গবেষক হিসেবে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। হুগলী ও ঢাকার মধ্যে কোন্ কলেজে পড়তে পারি, সে বিষয়ে তাদের মতামত চেয়েছিলাম। কিন্তু তারাও কেউ হুগলীর সপক্ষে তেমন সুস্পষ্ট মতামত দিলেন না।

হুগলী সম্পর্কে আমার মন চূড়ান্ত বিষিয়ে গিয়েছিল খাবারের অভিজ্ঞতা থেকে। দুর্ভিক্ষের বছর ১৯৪৩ সালে ফরিদপুরে পচা দুর্গন্ধযুক্ত চালের ভাত খাওয়ার দুঃখজনক অভিজ্ঞতা আমার ছিল। কিন্তু ১৯৪৩-এর পর সে অভিশাপের হাত থেকে রেহাই পাই। হুগলী কলেজ হোস্টেলে রেশন কার্ডের সরবরাহকৃত চালের ভাত শুধু পচা-দুর্গন্ধযুক্তই নয়, এর মধ্যে কংকরের উপস্থিতিও একটু অধিক পরিমাণেই। ভাত খাবার সময় একটু অসাবধান হলেই দাঁত হারাবার আশংকা। ভেবেছিলাম, যে ক'দিন হুগলীতে আছি, হোটেলে খেয়ে এই খাবার-হয়রানি থেকে রেহাই পাব। কিন্তু হোটেলেও একই অবস্থা। ফলে যা কোনোদিন করিনি, ভাতের বদলে হোটেলে যেয়ে তন্দুর রুটি খাওয়া শুরু করে দিলাম। আর সিদ্ধান্ত নিলাম, যত শীঘ্র সম্ভব, হুগলী ত্যাগ করতে হবে।

আগেই বাড়ী থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে বেরিয়েছিলাম, ভর্তি-পর্ব সমাধা না করে বাড়ী

www.pathagar.com

ফিরব না। হুগলী যখন থাকা হল না, তখন ঢাকার চেষ্টা করতে হবে। সুতরাং পুনরায় নৌকাযোগে নদী পাড়ি দিয়ে নৈহাটি রেল স্টেশনে উপস্থিত হলাম এবং সেখান থেকে সোজা ঢাকার টিকেট কেটে গোয়ালন্দগামী ট্রেনে চেপে বসলাম।

দিগন্তের বুক চিরে কলিকাতা মেল ছুটে চলেছে শিয়ালদা-গোয়ালন্দ রেলপথ ধরে। বাছা বাছা কয়েকটা বড় স্টেশন ছাড়া এ ট্রেন থামে না অন্য কোথাও। ট্রেন ছুটে চলছে ঝড়ের গতিতে। ঝড়ো গতিতে চলা ট্রেনের একটি কামরায় আমার মনের মধ্যেও তখন চলছে ঝড়। এতদিনে আমি দেশ-গাঁওয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চলেছি। তালিমনগর পড়ার সময় পদ্মা নদী মধ্যে থাকলেও বাড়ী থেকে তালিমনগরের দূরত্ব মোট আট মাইলের বেশী ছিল না। ফরিদপুরের দূরত্ব সাতাশ মাইল হলেও রেলপথে তিন ঘন্টার মধ্যেই বাড়ী আসা সম্ভব হত। কিন্তু এখন? বেলগাছি থেকে ট্রেনে গোয়ালন্দ, গোয়ালন্দ থেকে স্টীমারে চাঁদপুর হয়ে নারায়ণগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ থেকে ট্রেনে ঢাকা প্রায় দেড়শ' মাইল পথ অতিক্রম করতে হবে। সুতরাং ইচ্ছা করলেই যখন তখন বাড়ী আসার কথা কল্পনা করাও আর সম্ভব নয়। এর অর্থ, বাড়ীর সাথে সম্পর্ক একরূপ ছিন্ন করে ফেলা।

বাড়ীর সাথে, মা-বাবা, ভাই-বোন, আপনজনদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হবার কথা মনে হতেই মন হু হু করে কেঁদে উঠতে চাইল। এতদিন যেসব আপনজনদের কথা মনে উঠতেই তালিমনগর বা ফরিদপুর থেকে ছুটে যেতে পারতাম, তা এখন আর সম্ভব হবে না। এখন সারাবছরে দু'একটি বড় ছুটি ছাড়া আর বাড়ী আসা সম্ভব হবে না। সম্ভব হবে না শৈশব-কৈশোরের শতমধুময় স্মৃতিঘেরা গ্রামটিতে যখন-তখন ছুটে যাওয়া। স্নেহে-শাসনে-ভালবাসায় যারা এতদিন আমাকে জীবনে বড় হওয়ার পথে সাহায্য সহযোগিতা যুগিয়েছেন, তাদের কথা বারবার মনে পড়তে লাগলো। মনে পড়তে লাগল মক্তব ও মাদ্রাসার শিক্ষকদের কথা, যারা আমাকে নানাভাবে উচ্চ শিক্ষায় উৎসাহিত করেছেন। এ প্রসঙ্গেই বারবার মনে পড়তে লাগল আমাদের গাঁয়ের সেই অদ্ভুত চরিত্রের লোকটির কথা, যাকে গাঁয়ের লোকেরা 'পাগল' বলেই জানত, অথচ আমার উচ্চ শিক্ষার পেছনে তার ক্লান্তিহীন উৎসাহদানের কথা আমি কখনও ভুলতে পারব না।

নাম তার মমতাজ উদ্দীন মণ্ডল। কিন্তু এ পোশাকী নামে নয়, লোকে তাকে চিনত 'মন্তাজ পাগল' বলে। মক্তব পর্যন্ত লেখাপড়া করা ছিল। আব্বাকে ভাই ডাকতেন বলে আমরা তাকে চাচা ডাকতাম। সংসার করতেন না বলে কেউ কেউ তাকে দরবেশও ডাকত। রাস্তার পাশে গাছ লাগান, সেসব গাছের যত্ন নেয়া, ছোট ছেলেদের পড়াশোনায় উৎসাহ যোগান যেন ছিল তার বিধাতা প্রদত্ত অঘোষিত

www.pathagar.com

কর্তব্য। কেন যেন তার বিশ্বাস জন্মেছিল আমি উচ্চ শিক্ষিত হব। টাকা-পয়সার অভাবের কারণে হাই মাদ্রাসার (ম্যাট্রিক) পর আমার আব্বা যখন আমাকে আর না পড়ানোর কথা ভাবছিলেন, তখনও আমাকে ডেকে নিয়ে তিনি সাহস দিয়ে বলেছিলেন, কোন চিন্তা কর না, আল্লাহ একটা ব্যবস্থা করবেনই। কলেজে পড়তে ঢাকা যাবার পথে, তার কথাই এখন সত্য প্রমাণিত হওয়ায় বারবার সেই অখ্যাত অবজ্ঞাত গ্রাম্য সুহৃদের কথা আমার মনে পড়তে লাগল।

নানা কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে কলিকাতা মেল কুষ্টিয়া ছেড়ে গড়াই নদীর ব্রিজে প্রবেশ করেছে টেরই পাইনি। ব্রিজে ট্রেন চলার সময় বিকট ঘড় ঘড় আওয়াজে বুঝতে পারলাম আমি আমার নিজের জেলা ফরিদপুরে প্রবেশের পথে। ট্রেন এরপর কুমারখালীসহ কয়েকটি বড় স্টেশনে থামলেও আমার নিজ স্টেশন বেলগাছি থামল না। মেল গাড়ীর সিডিউল মোতাবেক গাড়ী থামল গিয়ে রাজবাড়ী। রাজবাড়ী পৌঁছার পরই শেষ স্টেশন গোয়ালন্দে ট্রেন থেকে নামার জন্য প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে।

প্রথম ঢাকা দর্শন

গোয়ালন্দ ঘাটে যখন ট্রেন গিয়ে পৌঁছলো, তখন রাত সাড়ে দশ-এগার হবে। ট্রেন স্টেশনে পৌঁছার পর যে দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য হল, তাকে একটা ছোট-খাট যুদ্ধক্ষেত্র বললে কিছুতেই অত্যুক্তি হবে না। সবাই সবার আগে নামতে, সবার আগে সামনে যেতে এবং সবার আগে স্টীমারে আরোহণ করতে যেন বাজি ধরেছে। অন্যান্যের-দেখাদেখি আমিও সে বাজিতে অংশ নিয়ে এক পর্যায়ে নারায়ণগঞ্জগামী স্টীমারে উঠে পড়লাম। কিন্তু শুধু আরোহণ করা তো নয়। ডেকে বিছানা পেতে চর দখলের মত জায়গা দখল করতে হবে। জুনিয়ার ও হাই মাদ্রাসা ফাইনাল পরীক্ষা দিতে ইতোপূর্বে দু'দু'বার আমাকে সিরাজগঞ্জ যেতে হয়েছিল। সুতরাং ডেকে কিভাবে চরদখলী কায়দায় চাদর পেতে জায়গা দখল করতে হয় সে কৌশল আগেই কিছুটা জানা ছিল। তবুও বিছানা পেতে ডেকে জায়গা করে নিতে যথেষ্ট বেগ পেতে হল। কষ্টে-সৃষ্টে যে শেষ পর্যন্ত ডেকে বিছানা পাততে পেরেছিলাম, এজন্য আল্লাহর দরবারে শোকর গুজারি করলাম।

রাত বারোটার দিকে স্টীমার ছাড়ল। সারারাত স্টীমারে কাটল আধা ঘুম, আধা জাগ্রত অবস্থায়। স্টীমার ভাগ্যকূল, তারপাশা, চাঁদপুর, মুন্সীগঞ্জ প্রভৃতি ঘাট হয়ে নারায়ণগঞ্জ পৌঁছল পরদিন দুপুর নাগাদ। রাতে স্টীমার চলার সময় নদীর ধারে দু'পাশের দৃশ্য দেখার চেষ্টা করিনি। দিনের বেলা বলে চাঁদপুর থেকে নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত নদীর দু'পাশের নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখার দুর্লভ সুযোগ পেয়েছিলাম। তবে সে মনোমুগ্ধকর দৃশ্য যতটা আনন্দদায়ক লাগার কথা ছিল, তা লাগতে পারেনি

www.pathagar.com

ক্ষুধা, অনিদ্রা ও ভ্রমণজনিত ক্লান্তির কারণে।

নারায়ণগঞ্জ ঘাটে স্টীমার হতে নেমে ট্রেনে যেতে হবে ঢাকায়। নারায়ণগঞ্জ স্টেশনে ভিড় ঠেলে বহু কষ্টে ঢাকাগামী অপেক্ষমাণ ট্রেনে উঠলাম। কিন্তু এ কেমন ট্রেন? আমরা ছোটকাল থেকে যেসব ট্রেনে চড়তে অভ্যস্ত এ ট্রেন তার তুলনায় বেশ ছোট। ব্রডগেজ লাইনের সাথে মিটারগেজ লাইনের ট্রেনের যে কত পার্থক্য তা দেখার সৌভাগ্য আমার এই প্রথম হল।

নারায়ণগঞ্জের পর তিনটি স্টেশন চাষাড়া, ফতুল্লা ও গেন্ডারিয়া বাদেই ঢাকা রেল স্টেশন। ঢাকা রেল স্টেশন মানে ফুলবাড়িয়া। জুলাইয়ের মৃদুবর্ষণস্নাত অপরাহ্নে ঢাকায় প্রথম সে পদার্পণের কথা আমার এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে। ঢাকা সম্পর্কে, ঢাকার ঘোড়ার গাড়ীর কোচোয়ানদের সম্পর্কে নানা ভীতিপ্রদ গল্প শুনেছি অনেকের কাছে। সে সব মনে রেখে ভয়ে ভয়ে অতি সাবধানেই নেমেছিলাম ট্রেন থেকে। কিন্তু না, আমার সে ধরনের কোন দুঃখজনক অভিজ্ঞতা হয়নি। ফুলবাড়িয়া থেকে ঘোড়ার গাড়ীতে লালবাগ শাহী মসজিদের সন্নিকটে মওলানা রইসউদ্দীনের দেয়া ঠিকানায় তার ছোট ভগ্নীপতি জনাব আবদুর রহমানের বাসায় পৌঁছতে আমার তেমন কোন অসুবিধাই হয়নি। এই আবদুর রহমান সাহেব সম্পর্কে আগেই বলেছি, মওলানা রইসউদ্দীনের এই নিকটাত্মীয় তালিমনগর মাদ্রাসায় কিছুদিন আমার শিক্ষক ছিলেন। তিনি আমার সম্পর্কে সবকিছু জেনে অত্যন্ত খুশী হলেন। যদিও তিনি ব্যস্ততার জন্য আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারলেন না, তবুও গভর্নমেন্ট ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ভর্তির ব্যাপারে আমার করণীয় সবকিছু ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন। সাথে সাথে কলেজের অবস্থান এবং প্রিন্সিপালের বাসার ঠিকানা জানিয়ে দিতেও ভুল করলেন না।

আবদুর রহমান সাহেবের পরামর্শ মোতাবেক প্রথমে পাটুয়াটুলীর কাছে সিম্পসন রোডে প্রিন্সিপাল সাহেবের বাসায় যেয়ে তার সাথে দেখা করলাম। পরে গেলাম কলেজে। ভর্তিপর্ব নির্বিঘ্নে সমাধা হয়ে গেল। আমি ভিক্টোরিয়া পার্কের পাশে অবস্থিত গভর্নমেন্ট ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের ছাত্র হয়ে গেলাম। কলেজে ভর্তি হতে যেয়েই আবিষ্কার করলাম ফরিদপুর ময়েজউদ্দীন হাই মাদ্রাসা থেকে আমার আগের বছরে বাংলা-আসামের মধ্যে সপ্তম স্থান অধিকার করে হাই মাদ্রাসা পাস করেন যে এনামুল হক, তিনি এখন এই কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। এনামুল হক আমার রেজাল্টের কথা জেনে দারুণ খুশী হলেন এবং নিজে উদ্যোগী হয়ে হোস্টেলে আমার জন্য সীটের ব্যবস্থা করে দিলেন। পরদিনই আবদুর রহমান সাহেবের বাসা থেকে বিছানাপত্র নিয়ে হোস্টেলে উঠে পড়লাম।

www.pathagar.com

প্যারাডাইস হোস্টেলে

হোস্টেলের নাম প্যারাডাইস হোস্টেল। ঢাকা গভর্নমেন্ট ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের তখন তিনটি হোস্টেল ছিল। একটি রোকনপুরে, একটি ইসলামপুরে নবাববাড়ীর সদর দরজার সাথের বিল্ডিংয়ে, আর তৃতীয়টি ছিল এই প্যারাডাইস হোস্টেল। ইসলামপুর রোড থেকে নবাববাড়ীর দেয়াল ঘেঁষে যে সড়কটি কোতোয়ালী থানার পাশ দিয়ে ওয়াইজঘাট হয়ে সদরঘাটে গিয়ে মিশেছে সেই আহসানউল্লাহ রোডের চার নম্বর বাড়ীতে অবস্থিত ছিল এই প্যারাডাইস হোস্টেল। ইসলামপুর রোডের হৈ-হুল্লা থেকে একটু দূরের এ হোস্টেলে পড়াশোনার জন্য চমৎকার পরিবেশ ছিল। তাছাড় এখানে কলেজের বাছা বাছা ছাত্রদেরই প্রধানত সীট দেয়া হত।

প্যারাডাইস হোস্টেলে ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৭ সাল– যে দু'বছর ছিলাম, তা নানা কারণে আমার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে। ১৯৪৫ সালে বাংলা ও আসামের মধ্যে হাই মাদ্রাসা পরীক্ষায় আমি দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছিলাম বলে মহসিন ফান্ডের প্রথম শ্রেণীর স্কলারশীপ পেয়েছিলাম। কলেজের টিউশন ফি, হোস্টেলের সীট রেন্ট মাফ। উপরন্তু প্রতিমাসে ১৬ টাকা বৃত্তি। হোস্টেলের মেস চার্জ মাসে মাত্র ৮ টাকা। এতেই একদিন অন্তর গোশত খেতাম। চার থেকে ছ'আনার মধ্যে সেকেন্ড ক্লাসে সিনেমা দেখা যেত। মাঝে মাঝে ইসলামপুরের মমতা রেস্টুরেন্টে মিষ্টি খেতাম। ২ আনায় বড়-সড় পুডিং। তাও এনামুল হকের কারণে প্রায়ই আমি পয়সা দিতে পারতাম না। প্যারাডাইস হোস্টেলে থাকতে শখ করে একবার একটা শেরোয়ানী তৈরী করেছিলাম, খরচ পড়েছিল পাঁচ সিকিরও কম। প্যারাডাইস হোস্টেলের জীবনে আমার আরেকটি বড় আনন্দের দিক ছিল গোসল। বুড়িগঙ্গা অতি নিকটে অবস্থিত ছিল বলে বর্ষাকালে তো বটেই, অন্যান্য মৌসুমেও মাঝে মধ্যেই বুড়িগঙ্গায় যেয়ে ডুবিয়ে সাঁতরিয়ে গোসল করতাম। তখনকার দিনে বুড়িগঙ্গা নদীর আজকের করুণ অবস্থা আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভবপর ছিল না।

প্যারাডাইস হোস্টেলে যাদের সাথে থেকেছি, তাদের মধ্যে এনামুল হকের কথা আগেই বলেছি। এনামুল হকের সহপাঠী মুহম্মদ আবু বকরও প্যারাডাইস হোস্টেলের অন্যতম বোর্ডার ছিলেন। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র মুহম্মদ আবু বকর দারিদ্র্য ও চরম প্রতিকূল পরিস্থিতির সাথে সংগ্রাম করেই ১৯৪৪ সালে হাই মাদ্রাসা পরীক্ষায় বাংলা ও আসামের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। আবু বকর শুধু ছাত্র হিসেবেই অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন না, শিল্প-সাহিত্য চর্চায়ও তার উৎসাহ ছিল সীমাহীন। কবিতা আবৃত্তিতে তাঁর ছিল যেমন উৎসাহ, তেমনি অসাধারণ

www.pathagar.com

পারঙ্গমতা। আবু বকর যখন ভরাট গলায় আবৃত্তি করতেন, ফররুখ আহমদের-

"আজকে তোমায় পাল ওঠাতেই হবে
ছেঁড়া পালে আজ জুড়তেই হবে তালি
ভাঙা মাস্তুল দেখে দিক করতালি
তবুও জাহাজ আজ ছোটাতেই হবে।"

অথবা আহসান হাবীবের-

"ঝরা পালকের ভস্মস্তূপে তবু বাঁধলাম নীড়,
তবু বারবার সবুজ পাতার স্বপ্নেরা করে ভিড়।"

তখন শত ব্যস্ততার মধ্যেও তার আবৃত্তি না শুনে উপায় থাকত না। প্রধানত আবু বকর ও এনামুল হকের উৎসাহে আমরা প্যারাডাইস হোস্টেলে "প্যারাডাইস লিটারারী সোসাইটি" নামে একটি সাহিত্য সংস্থা গঠন করেছিলাম। এই সোসাইটির পক্ষ থেকে আমরা বেশ কয়েকবার সাহিত্য সভা ও দেয়াল পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করি। দুঃখের বিষয়, আইএ ফাইনাল পরীক্ষার সময় আবুবকর প্রচণ্ড জন্ডিস রোগে আক্রান্ত হন এবং অসুস্থ শরীরে পরীক্ষা দেবার কারণে আশানুরূপ ফল থেকে বঞ্চিত হন। ১৯৪৬ সালে ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় বাংলা ও আসামে যিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন, মুহম্মদ আবু বকর, এনামুল হকদের ক্লাস ফ্রেন্ড হিসাবে তিনিও ছিলেন ঢাকা গভর্নমেন্ট ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের অন্যতম কৃতী ছাত্র। নাম তার মুহম্মদ আবদুল বারী। কলেজ জীবনেই তাকে দেখেছি যেমন বাংলায়, তেমনি ইংরেজী ও আরবীতে অসাধারণ বক্তৃতা দিতে। উল্লেখযোগ্য, এই আবদুল বারী সাহেবই পরবর্তীকালে ডঃ এম এ বারী হিসাবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর এবং বিশ্ববিদ্যালয় গ্রান্টস কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে এদেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

প্যারাডাইস হোস্টেলে পরবর্তী বছরে আমার এক ক্লাস নীচে ভর্তি হন বাকীবিল্লাহ খান ও মুহম্মদ ইব্রাহীম আখন্দ। মূলত ময়মনসিংহের বাসিন্দা হয়েও দীর্ঘদিন আসামে থাকার সুবাদে অহমিয়া ভাষা রপ্ত ছিল ইব্রাহীম আখন্দের। আমরা চেষ্টা করতাম তার কাছে অহমিয়া শিখতে। পরবর্তীকালে ইব্রাহীম আখন্দ রেডিও পাকিস্তানে যোগদান করে বেতার পরিচালক হিসাবে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। বাকীবিল্লাহ খান ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র। তখনকার নিয়ম অনুসারে মাদ্রাসা লাইনে টাইটেলে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট পাবার পরও তাকে আইএ-তে ভর্তি হতে হয়েছিল। ফলে আমার ক্লাসফ্রেন্ড নূরুল্লাহ খানের বড় ভাই হওয়া সত্ত্বেও তিনি আমাদের এক ক্লাস নীচে পড়তেন। বাকীবিল্লাহ খান ছাত্র বয়স থেকেই যেমন

www.pathagar.com

বাংলায়, তেমনি ইংরেজী, আরবী ও উর্দুতে চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারতেন। কর্মজীবনে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান থাকাকালে এই অসাধারণ গুণী ব্যক্তি অকাল মৃত্যুবরণ করেন।

প্যারাডাইস হোস্টেলে সে সময় অন্য যারা থেকেছেন- তাদের মধ্যে বিশেষভাবে মনে পড়ছে জনাব আবদুস সাত্তারের কথা। যিনি কুষ্টিয়ার পান্টি থেকে ১৯৪৪ সালে হাই মাদ্রাসা পাস করে এনামুল হক, আবুবকরদের ক্লাসফ্রেন্ড হন। নেতৃত্বের গুণাবলীসম্পন্ন এই আবদুস সাত্তার সাহেব সম্পর্কে পরবর্তীকালে কিছুই জানতে পারিনি। হোস্টেলে আমার নিজের ক্লাসফ্রেন্ডদের মধ্যে ছিলেন নওগাঁর মুহম্মদ শামসুদ্দীন, বাগেরহাটের ইব্রাহীম হোসেন, ময়মনসিংহ জেলার সিরাজুল ইসলাম এবং পাকুন্দিয়ার তাহের উদ্দিন তালুকদার ও মমতাজ উদ্দিন তালুকদার ভ্রাতৃদ্বয়। ক্লাসফ্রেন্ড না হয়েও ক্লাসফ্রেন্ডের মতই আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন চাঁদপুর থেকে আগত এম এ ওয়াদুদ। আমাদের মতই ১৯৪৫ সালের ম্যাট্রিকুলেট এই এম এ ওয়াদুদ ছাত্র ছিলেন ঢাকা কলেজের। বিশেষ ব্যবস্থায় আমাদের হোস্টেলে তিনি থাকতেন। পাকিস্তান আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী এই এম এ ওয়াদুদ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং তারও পরে দৈনিক ইত্তেফাক-এর জেনারেল ম্যানেজার হিসাবে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর অসাধারণ মানবিক গুণসম্পন্ন এই এম এ ওয়াদুদ রাজনীতি করতে গিয়ে নিজের শরীর-স্বাস্থ্যের দিকে খুম কম নজরই দিতে পারতেন। ফলে তিনি অচিরেই পেপটিক আলসারে আক্রান্ত হন এবং বাংলাদেশ আমলে অকাল মৃত্যুবরণ করেন।

ঢাকা গভর্নমেন্ট ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে আমার অন্যান্য ক্লাসফ্রেন্ডদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দু'জন ছিলেন এম এ ওয়াদুদ ভূঁইয়া ও নূরুল ইসলাম পাটোয়ারী। ভূঁইয়া পরবর্তীকালে আইন ব্যবসায় যোগ দেন। পাটোয়ারী আমার মতই ইন্টারমিডিয়েটে যেমন অপশনাল সাবজেক্ট হিসেবে ইংরেজী নেন, তেমনি ১৯৪৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়েও বাংলা অনার্সে ভর্তি হন এবং আরও পরবর্তীকালে সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নেন। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের ক্লাসফ্রেন্ডদের মধ্যে নূরুল ইসলাম পাটোয়ারীই একমাত্র ব্যক্তি, যার সাথে আমৃত্যু আমার সম্পর্ক ছিল।

কলেজে আমার সম্ভবত দু'ক্লাস নীচে হাই মাদ্রাসা সেকশনে পড়ত একটি ছোটখাট ছেলে। কলেজের এত ছাত্রের ভিড়ে তার দিকে আগে আমার তেমন নজর পড়েনি। কিন্তু কলেজের পাশে অবস্থিত ভিক্টোরিয়া পার্কে এক জনসমাবেশে তার একটা বক্তৃতা শুনে আমি চমৎকৃত হয়ে যাই। এত ছোট একটা ছেলের এমন

www.pathagar.com

তুখোড় বক্তৃতা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। এই ছেলে ছিল এ কে এম মুসলেহউদ্দীন– আজকের বাংলাদেশের অন্যতম খ্যাতিমান কবি ও কথা সাহিত্যিক আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দীন।

ঢাকা গভর্নমেন্ট ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে আমরা যাদের শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলাম, তাদের মধ্যে ছিলেন প্রিন্সিপ্যাল আবদুল হাকিম, ভাইস প্রিন্সিপ্যাল (পরে প্রিন্সিপ্যাল) শেখ শরফুদ্দীন, প্রফেসর (পরে ভাইস প্রিন্সিপ্যাল) হাফেজ আবদুল হাফিজ, প্রফেসর সৈয়দ মঈনুল আহসান (তিনি ট্রান্সফার হয়ে চলে গেলে প্রফেসর কাজী আকরাম হোসেন), প্রফেসর মুহম্মদ ইয়াসিন, প্রফেসর আবদুল জলিল, প্রফেসর আবদুস সাত্তার, জনাব এএইচকে আবদুল হাই, জনাব আবদুর রশিদ, জনাব হাফিজউদ্দীন আহমেদ প্রমুখ। প্রিন্সিপ্যাল আবদুল হাকিম সাহেব আমাদের কোন ক্লাস নিয়েছেন বলে মনে পড়ে না। তিনি অল্পদিন পরেই রিটায়ার বা ট্রান্সফার হয়ে আমাদের ছেড়ে চলে যান। এরপরই প্রিন্সিপাল হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন পূর্বতন ভাইস প্রিন্সিপ্যাল শেখ শরফুদ্দীন। শরফুদ্দীন সাহেব আমাদের 'মাকামা' এবং 'বালাগাত' পড়াতেন। তিনি এমনিতে চেহারা সুরতে স্যুট-কোট পরিহিত আধুনিক মনে হলেও আমাদের আরবীর সঠিক উচ্চারণ শিখাতে যথেষ্ট তৎপর ছিলেন। যদিও তিনি শিক্ষক হিসেবে ভাল ছিলেন, প্রিন্সিপ্যাল হিসেবে তার মাত্রাতিরিক্ত নিয়মতান্ত্রিকতায় আমরা মাঝে মধ্যেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠতাম। ফলে তিনি সজ্জন হয়েও ছাত্রদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারেননি।

কলেজের অধ্যাপকমণ্ডলীর মধ্যে নিঃসন্দেহে সব চাইতে জনপ্রিয় ছিলেন ইংরেজীর প্রফেসর সৈয়দ মঈনুল আহসান। সুদর্শন ব্যক্তিত্বশালী এই স্যার অভিজাত বংশের সন্তান হলেও তার মধ্যে অহমিকার লেশমাত্র ছিল না। কোমলে-কঠোরে, আদর্শবাদী এই শিক্ষকের মুখে সবসময় হাসি লেগেই থাকত। এমনিতে অমায়িক অথচ নীতির প্রশ্নে কঠোর এই স্যারকে ছাত্ররা যেমন অন্তরের অন্তস্থল থেকে শ্রদ্ধা করত, তিনিও তেমনি ছাত্রদের যে কোন অসুবিধায় সাহায্য করতে সদা উন্মুখ থাকতেন। তিনি থাকতেন, নাজিমুদ্দিন রোডের 'হাসিনা মঞ্জিলে' পারিবারিক বাসভবনে। ছাত্রদের জন্য তার দরজা সদা অবারিত থাকত। আমার স্পষ্ট মনে আছে, একবার ছাত্রদের কি একটা অসুবিধা নিয়ে তার বাসভবনে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তিনি তখন শেভ করছিলেন। শেভিং অসম্পূর্ণ রেখেই তিনি ছুটে এসেছিলেন ব্যাপারটা অত্যন্ত জরুরী কিনা, তা জানতে।

আমরা কলেজে থাকতেই এই জনপ্রিয় প্রফেসর বদলি হয়ে যান। তার বিদায় সংবর্ধনা উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ছাত্ররা যেভাবে ডুকরে ডুকরে কেঁদেছিল

www.pathagar.com

তাতেই বুঝা যায় ছাত্ররা তাকে কত গভীরভাবে শ্রদ্ধা করত, ভালবাসত।

প্রফেসর সৈয়দ মঈনুল আহসান বদলি হয়ে গেলে তার স্থানে ইংরেজীর প্রফেসর হয়ে আসেন কাজী আকরম হোসেন। শিক্ষক হিসাবে কাজী আকরম হোসেন, সৈয়দ মঈনুল আহসানের মত জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারেননি। কিন্তু আমাদের সান্ত্বনা ছিল, আমরা কাজী আকরম হোসেনের মত একজন সুসাহিত্যিক এবং ঐতিহাসিকের ছাত্র হয়ে তার সান্নিধ্যে যাবার সুযোগ লাভ করেছিলাম। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কাজী আকরম হোসেন পেশাগত জীবনে ইংরেজী সাহিত্যের প্রফেসর হলেও তিনি ছিলেন বিখ্যাত 'ইসলামের ইতিহাস' গ্রন্থের প্রণেতা। কাজী আকরম হোসেনের এই ইতিহাস গ্রন্থ সে সময় হাই মাদ্রাসায় পাঠ্য ছিল। বাংলা ভাষায় ইতিহাসের মত নীরস বিষয়ে এ ধরনের সুখপাঠ্য গ্রন্থ খুব কমই রচিত হয়েছে। ইতোপূর্বে মাসিক মোহাম্মদীতে 'ইতিকথা বুক ডিপো'র ইতিহাস বিষয়ক বইয়ের বিজ্ঞাপনে যেসব ঐতিহাসিকের নাম পড়তাম, তাদেরই একজনের ছাত্র হতে পারাটা আমাদের জন্য কম গর্বের ব্যাপার ছিল না।

১৫০ মোগলটুলী

ঢাকা তখনকার (অবিভক্ত) বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী হলেও পত্র-পত্রিকা প্রকাশনার ক্ষেত্রে প্রাদেশিক রাজধানী কলিকাতারই ছিল মুখ্য ভূমিকা। মুসলমানদের পত্র-পত্রিকার বেলায়ও এটাই ছিল কঠিন বাস্তবতা। কলিকাতা থেকেই প্রকাশিত হত মুসলিম বাংলার জন-মানুষের মুখপত্র দৈনিক 'আজাদ' এবং আজাদ প্রকাশনা গ্রুপের সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী' ও মাসিক 'মোহাম্মদী'। তাছাড়া মাসিক 'সওগাত'ও প্রকাশিত হত কলিকাতা থেকে। তখনও সাপ্তাহিক 'বেগম' বা দৈনিক 'ইত্তেহাদ' প্রকাশিত হয়নি। দু'টি পত্রিকার প্রকাশনা শুরু হয় ১৯৪৭ সালের প্রথম দিকে। তবে মুসলিম লীগের মুখপত্র হিসেবে প্রকাশ পাচ্ছিল সাপ্তাহিক 'মিল্লাত'। এই পত্রিকাখানি প্রকাশিত হতো প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিমের সম্পাদনায়। সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছিলেন কাজী মোহাম্মদ ইদরিস।

এসব পত্রিকা ও সাময়িকীতে সাধারণভাবে মুসলিম জাগরণ এবং বিশেষভাবে পাকিস্তান আন্দোলনের মর্মবাণীর উপর বিশ্লেষণধর্মী, উদ্দীপনাময়ী রচনাদি প্রকাশিত হতো। আমরা পাকিস্তান আন্দোলনের তরুণ কর্মীরা সেসব পাঠ করে নতুন করে আন্দোলনে উদ্দীপ্ত হতাম। তবে আমরা যারা প্যারাডাইস হোস্টেলে থাকতাম, তারা শুধু কলিকাতা থেকে আসা এসব পত্র-পত্রিকা এবং পাকিস্তান আন্দোলন সম্পর্কিত বিভিন্ন পুস্তক-পুস্তিকা পড়েই সন্তুষ্ট হতাম না, এর আদর্শ জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারের লক্ষ্যে নিজেরা সদরঘাটের মোড়ে দাঁড়িয়ে

www.pathagar.com

হকারদের মত এগুলো বিক্রিও করতাম। এ উপলক্ষেই আমাদের পরিচয় ঘটে ১৫০, মোগলটুলীস্থ মুসলিম লীগ কর্মী শিবিরের সাথে। ১৯৪৩ সালে জনাব আবুল হাশিম বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। নির্বাচিত হয়েই তিনি মুসলিম লীগকে গণসংগঠনে পরিণত করার দিকে বিশেষ নজর দেন। কলিকাতা অবিভক্ত বঙ্গের প্রাদেশিক রাজধানী হওয়ায় লীগের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডও এতদিন কলিকাতাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছিল। এতে করে প্রদেশের পূর্বাঞ্চলের বিশাল ভূ-ভাগে মুসলিম লীগের আন্দোলন সম্প্রসারিত করার ব্যাপারে অসুবিধা হচ্ছিল। এই প্রেক্ষাপটেই প্রদেশের পূর্বাঞ্চলে লীগের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড জোরদার করার লক্ষ্যে ঢাকার চকবাজার সংলগ্ন ১৫০, মোগলটুলিতে স্থাপন করা হয় মুসলিম লীগ কর্মী শিবির। টাঙ্গাইলের উদীয়মান জননেতা জনাব শামসুল হক এই কর্মী শিবিরের মূল নেতা মনোনীত হন এবং অফিসের সার্বক্ষণিক দায়িত্ব অর্পিত হয় ঢাকার জনাব কমরুদ্দীন আহমদের ওপর। এই কর্মী শিবিরের সাথে আর যারা জড়িত ছিলেন, তারা হচ্ছেন খন্দকার মোশতাক আহমদ, শামসুদ্দীন আহমদ, তাজউদ্দীন আহমদ, শওকত আলী প্রমুখ।

কর্মী শিবিরে কলিকাতা বা মফস্বল থেকে আগত মুসলিম লীগের নেতা ও কর্মীদের জন্য থাকার যেমন বন্দোবস্ত ছিল, তেমনি বিক্রয় ও বিতরণের জন্য সাপ্তাহিক মিল্লাতসহ মুসলিম লীগ ও পাকিস্তান আন্দোলন সম্পর্কিত বিভিন্ন পুস্তক-পুস্তিকা, পত্র-পত্রিকা ও প্রচারপত্র সর্বদা মজুত রাখা হতো। আমরা বিভিন্ন সময়ে ১৫০, মোগলটুলীর এই কর্মী শিবিরে যেতাম সাপ্তাহিক মিল্লাতসহ বিভিন্ন পুস্তক-পুস্তিকা ও প্রচারপত্র সংগ্রহের জন্য। এই সুবাদেই আমার পরিচয় হয় শামসুল হক, কমরুদ্দীন আহমদ, তাজউদ্দীন আহমদ, শওকত আলী প্রমুখের সঙ্গে। বিশেষত ১৫০ মোগলটুলী গেলে তাজউদ্দিন আহমদ ও শওকত আলীর সঙ্গে দেখা হতো না,এমন ব্যাপার খুব কমই ঘটত।

রায়টকালীন ঢাকা

ইসলামপুর এলাকায় অবস্থিত আমাদের হোস্টেল থেকে ভিক্টোরিয়া পার্কের পাশে আমাদের কলেজে যেতে আমরা সাধারণত, পটুয়াটুলী, সদরঘাট হয়ে যেতাম। এর চাইতে সংক্ষিপ্ততর পথ অবশ্য একটা ছিল শাঁখারী পট্টি হয়ে। কিন্তু ঢাকার পরিস্থিতি যখন স্বাভাবিক ও শান্তিপূর্ণ থাকতো, তখনও সে পথ দিয়ে মুসলমানরা সাধারণত যেতে সাহস করত না। শাঁখারী পট্টি ছিল দুর্ধর্ষ হিন্দুদের দুর্গের মত। ফলে ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত দীর্ঘ দু'বছরে দু'চার দিনের বেশী সে পথে কলেজে যেতে সাহস হয়নি আমাদের।

সাতচল্লিশ সালের আগে ঢাকা শহরে দু'একবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হতে

www.pathagar.com

দেখেছি। পাঁচচল্লিশের আগেও মাঝে মধ্যে ঢাকায় দাঙ্গা হত বলে শুনেছি। বিশেষত, হিন্দু মহাসভা নেতা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ঢাকায় এলে তারপরের দিন ঢাকায় সাধারণত, রায়ট লাগতই। রায়ট লাগলে ঢাকা শহরের মানচিত্র এক নতুন রূপ ধারণ করত। তখন সারা ঢাকা শহর ছোট-বড় অসংখ্য হিন্দু ও মুসলিম অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ত। হিন্দু এলাকায় মুসলমানদের এবং মুসলমান এলাকায় হিন্দুদের চলাচল বন্ধ হয়ে যেত। শাঁখারী পট্টি আর ইসলামপুর এলাকার সংযোগস্থলে একটা পুলিশ ফাঁড়ি ছিল। শাঁখারীপট্টি, তাঁতীবাজার, পটুয়াটুলী, সদরঘাট, শ্যামবাজার, ফরাসগঞ্জ, বাংলাবাজার, লক্ষ্মীবাজার, সূত্রাপুর, নবাবপুর, ঠাঁটারীবাজার, ওয়ারী এসব এলাকা ছিল হিন্দু এলাকা। পক্ষান্তরে শাঁখারী পট্টির সামনের পুলিশ ফাঁড়ি ও কোতোয়ালী থানা থেকে শুরু করে আহসান মঞ্জিলসহ সমগ্র ইসলামপুর, আশেক লেন, জিন্দাবাহার, বাবুবাজার, আরমানিটোলা, নয়াবাজার, মালিটোলা, বংশাল, নাজিরাবাজার, আগাসাদেক রোড, আগামসিহ লেন, কায়েতটুলী, নওয়াব কাটরা, হোসেনী দালান, নাজিমুদ্দিন রোড, বখশীবাজার, বেগম বাজার, মৌলভীবাজার, চকবাজার, লালবাগ প্রভৃতি এলাকা ছিল মুসলিম এলাকা। মাঝে মাঝে পকেট যে ছিল না, তা নয়। যেমন মিটফোর্ড এলাকা ছিল মুসলিম-বেষ্টিত একটি হিন্দু এলাকা। আবার রায়সাহেব বাজার, রোকনপুর, কলতাবাজার এলাকা ছিল হিন্দু-পরিবেষ্টিত একটি মুসলিম এলাকা। আমাদের কলেজের একদিকে হিন্দু প্রধান লক্ষ্মীবাজার, সদর ঘাট ও শাঁখারী পট্টি, অপরদিকে একমাত্র মুসলিম প্রধান এলাকা ছিল রায় সাহেব বাজার, কলতাবাজার, রোকনপুর এলাকা। রায়ট শুরু হলে ইসলামপুর থেকে কলেজে যেতে শাঁখারীপট্টির সংক্ষিপ্ত রাস্তার কথা তো মনেই উঠত না, এমনকি পটুয়াটুলী, সদরঘাট হয়ে কলেজে যাওয়ার কথাও কল্পনা করতে পারতাম না। তখন আমরা লায়ন সিনেমা সংলগ্ন আশেক লেন হয়ে নয়াবাজার ঘুরে ইংলিশ রোডের একাংশ দিয়ে নয়াবাজার, মালিটোলা, কলতাবাজারের সংযোগকারী একটা জঙ্গলঘেরা ডোবার পাশ দিয়ে অতি কষ্টে কলেজে যাতায়াত করতাম। তখন এই ডোবায় কলাগাছ, বনজঙ্গল কেটে অস্থায়ী সংযোগ পথ তৈরী করা হত। এপথ অবশ্য আমরা খুবই ভয়ে ভয়ে অতিক্রম করতাম। কারণ এ পথটি তাঁতীবাজারের হিন্দু দাঙ্গাবাজদের নাগালের মধ্যে অবস্থিত ছিল। আর রায়টের ব্যাপারে কলতাবাজারের মুসলমানদের মত তাঁতীবাজারের হিন্দু দাঙ্গাবাজদেরও একটা খ্যাতি ছিল।

তবে ঢাকার রায়টের ব্যাপারে একটা বৈশিষ্ট্যের কথা আমি এখানে উল্লেখ না করে পারছি না। মুসলমানদের মধ্যে যারা অশিক্ষিত, গরীব তারাই সাধারণত রায়টে অংশ নিত। মুসলমানদের শিক্ষিত খুব কম লোকই দাঙ্গায় অংশ নিত।

www.pathagar.com

কিন্তু হিন্দুদের বেলায় দেখা যেত, হিন্দু শিক্ষিত ভদ্রলোকরা রায়টে প্রত্যক্ষ অংশ নিত। একবার তাঁতীবাজার এলাকায় রায়ট শুরু হয়েছে শুনে আমরা কয়েক বন্ধু প্যারাডাইস হোস্টেল থেকে আশেক লেন হয়ে নয়াবাজারের কাছে গিয়েছিলাম রায়ট সম্পর্কে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা লাভ করতে। দেখলাম, তাঁতীবাজারের দোতলা, তেতলা দালানের ছাদ থেকে ধুতি-শার্ট পরা বহু হিন্দু ভদ্রলোক বন্দুক হাতে 'এ্যাকশনে' রয়েছে। পক্ষান্তরে সিরাজউদ্দৌলা পার্কের দিক থেকে আদুল গায়ে লুঙ্গি পরা গরীব মুসলমানরা তাদের মোকাবেলা করতে এগিয়ে যাচ্ছে ইট-পাটকেল সম্বল করে। আর ইট-পাটকেল ভেঙ্গে ঝাঁকা ভরে যারা যোগান দিচ্ছে তারাও তাদেরই মত গরীব ঢাকাইয়া মেয়েরা। আমরা শার্ট-পাজামা পরে ভিড় করে এই দৃশ্য দেখছি, দেখে ইট-পাটকেল যোগানরত কয়েকটি ঢাকাইয়া মেয়ে আমাদের অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করতে লাগল 'জঙ্গে' আমরা অংশ নিচ্ছি না বলে। আরও অপদস্থ হবার ভয়ে আমরা সেখান থেকে সরে এলাম।

রায়ট খুব সিরিয়াস পর্যায় চলে গেলে আমরা নয়াবাজার, মালিটোলা, কলতাবাজার হয়েও কলেজে যেতে পারতাম না। তখন আহসান উল্লাহ রোডের মাথায় ইসলামপুর রোডের একটা চায়ের দোকানে সারা দিন আড্ডা দেয়া ছাড়া আমাদের কাজ থাকত না। এসব দোকানে দেশের খবরাখবরসহ শহরের দাঙ্গা পরিস্থিতির সর্বশেষ টাটকা খবর পাওয়া যেত।

এই চায়ের দোকানে আড্ডা দিতে যেয়েই আমি এক পর্যায়ে চা পানে দারুণভাবে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ি। ফলে স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরে এলেও অন্তত প্রতিভোরে ঐ দোকানে এক কাপ চা না খেয়ে আমি স্বস্তি বোধ করতাম না। জীবনে আমি কখনও ধূমপানের নেশা করিনি। ফরিদপুরে টেপাখোলা মওলানা আফতাবউদ্দিনের বাসায় জায়গীর থাকতে একবার কিছুদিন পান খেতে নিদারুণভাবে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। ভাত খেয়েই হেঁটে মাদ্রাসার উদ্দেশ্যে রওনা হতাম। পথে টেপাখোলা বাজারের মোড়ে একটা পানের দোকানের এক খিলি মিষ্টি পান না খেলে যেন কিছুতেই ভাল লাগত না। ইসলামপুরের চায়ের দোকানে আমাকে যে চায়ের নেশা পেয়ে বসেছিল সে চায়েও থাকত ঘন দুধের পুরু সর। সে চায়ে একই সাথে আমার চা খাওয়া এবং ক্রমাগত জ্বালে ঘন হওয়া দুধের সর খাওয়া হয়ে যেত।

পাঁচচল্লিশের ঢাকা শহর

পাঁচচল্লিশের জুলাইয়ে আমি যখন প্রথম ঢাকা আসি, তখন ঢাকা শহরের আয়তন আজকের তুলনায় ছিল অনেক, অনেক ছোট। ঢাকা শহর তখন সীমাবদ্ধ ছিল বর্তমানে ঢাকার যে অংশ পুরানা ঢাকা বলে পরিচিত সেই এলাকার মধ্যে।

www.pathagar.com

বুড়ীগঙ্গা নদীর পাড় দিয়ে গেন্ডারিয়া, পোস্তাগোলা থেকে নবাবগঞ্জ-হাজারীবাগ পর্যন্ত ছিল এর দৈর্ঘ্য। আর প্রস্থে সে শহরের সীমানা ছিল মোটামুটি বুড়িগঙ্গা নদী থেকে গেন্ডারিয়া-তেজগাঁওর মধ্যকার অধুনালুপ্ত রেলপথ পর্যন্ত। সেই রেলপথ গেন্ডারিয়া হতে হাটখোলা, ফুলবাড়িয়া (তদানীন্তন ঢাকা রেল স্টেশন), পলাশী, হাতিরপুল, কাওরানবাজার হয়ে তেজগাঁও রেল স্টেশনে যেয়ে মিলিত হয়েছিল। রেল লাইনের বাইরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সন্নিহিত একটি এলাকা শহরের অন্তর্ভুক্ত ছিল বটে, তবে তাতে ইউনিভার্সিটির হলগুলো ছাড়া জনবসতি ছিল নিতান্তই অনুল্লেখযোগ্য। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ এবং 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশ সৃষ্টির প্রেক্ষাপটে নির্মিত ভবনসমূহেরও অনেকগুলোই তখন যথাযথভাবে ব্যবহৃত হত না।

প্রশাসনিক কাঠামোতে আমাদের দেশে বিভাগীয় সদর কখনই তেমন গুরুত্ব পায়নি বলে ঢাকা শহর তখন প্রশাসনিক দৃষ্টিতে চট্টগ্রাম, রাজশাহী বা বর্ধমানের মত কার্যত একটি জেলা শহর রূপেই বিবেচিত হত। এসব সত্ত্বেও মোগল আমলে নির্মিত এককালের সুবে বাংলা এবং ১৯০৫-১৯১১ সালের 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশের প্রাদেশিক রাজধানী হবার কারণে মুসলমানদের চোখে অবশ্য ঢাকা সব সময়ই বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিল। বিশেষ করে, বঙ্গভঙ্গ রদের পর প্রধানত নওয়াব সলিমুল্লাহ, সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, এ কে ফজলুল হক প্রমুখ তদানীন্তন মুসলিম নেতাদের প্রচেষ্টাতেই ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ব্যাপারটিও মুসলমান সমাজে মোটেই কম গৌরবের বিষয় ছিল না। মোটের ওপর, বাংলাদেশের প্রায় সকল শহরই যখন ছিল শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য সব ব্যাপারে হিন্দু প্রভাবাধীন, তখন ঢাকাই ছিল একমাত্র শহর যেখানে শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য সব ব্যাপারেই মুসলমানরা অনেকটা অগ্রসর ছিল, এ কারণেও আমরা যারা বহিরাগত, তাদের চোখে ঢাকার ছিল একটি বিশেষ মর্যাদা।

আগেই বলেছি, সে সময়কার ঢাকা শহর ছিল প্রধানত, আজকের পুরানা ঢাকা। ফলে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড তো বটেই, এমনকি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি কর্মকান্ডও তখন আবর্তিত হত প্রধানত পুরানা ঢাকাকে কেন্দ্র করেই। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও এসডিও অফিস, জেলা জজ কোর্ট, জেলা বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি এ ধরনের সকল সরকারী অফিসই পুরানা ঢাকাতে অবস্থিত ছিল। ঢাকা তথা ফুলবাড়িয়া রেল স্টেশনের পাশেই ছিল ঢাকা কলেজ। ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, জগন্নাথ কলেজ ও সলিমুল্লাহ কলেজও ছিল পুরানা ঢাকায়। সদরঘাটের নিকটে ছিল সদর পোস্ট অফিস। ঢাকায় তখনকার সাতটি সিনেমা হলের ৬টি বেগম বাজারের নিকটস্থ 'তাজমহল' সিনেমা, আশেক লেনের 'লায়ন' সিনেমা,

www.pathagar.com

সদরঘাটের 'রূপমহল', কোর্ট এলাকার 'মুকুল', বংশাল নবাবপুর রোডের সংযোগস্থলের 'মানসী', আরমানিটোলার 'নিউ পিকচার্স' ছিল পুরানা ঢাকায়। শুধুমাত্র 'ব্রিটানিয়া টকিজ' নামের একটা ছোট্ট সিনেমা হল ছিল বর্তমানে যেখানে গুলিস্তান, তার অনতিদূরে। বাংলা বা উর্দু সিনেমার প্রয়োজন পুরানা ঢাকার হলগুলো থেকেই মিটান সম্ভব হত। কখনও ইংরেজী ছবি দেখার প্রয়োজন বোধ করলে আমরা ব্রিটেনিয়া টকিজ-এ আসতাম।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বোর্ডের করুণ অবস্থা

আর একটি কারণে কখনও সখনও আমাদের নতুন ঢাকা এলাকায় আসতে হত। ঢাকা বোর্ড অব ইন্টারমিডিয়েট এন্ড সেকেন্ডারী এডুকেশন তথা ঢাকা বোর্ডের অফিস তখন ছিল সেগুনবাগিচায়। (বোর্ডের অফিস পরবর্তীকালে পুরানা ঢাকার ঢাকেশ্বরী রোডে এবং আরও পরে বখশী বাজার এলাকা বর্তমান জায়গায় স্থানান্তরিত হয়)। আমাদের কলেজসহ ঢাকা শহরের সকল কলেজই তখন ছিল ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত এবং ঢাকা বোর্ডের অধীন। আগেই বলেছি, ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্কুল ও কলেজ ছাড়া বাংলা ও আসামের সমস্ত হাই মাদ্রাসা ও ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজও ছিল ঢাকা বোর্ডের আওতাধীন। সমগ্র বাংলাদেশের বাদবাকী সকল হাই স্কুল ও কলেজই ছিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন। উনিশ শ' সাতচল্লিশ পর্যন্ত বাংলাদেশের সমস্ত কলেজ এভাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন থাকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কার্যত, এফিলিয়েশনের এখতিয়ারবিহীন শুধুমাত্র একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবেই সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরই কেবল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার এ ঠুঁটো জগন্নাথের দশা থেকে মুক্তি পায় এবং এদেশের কলেজ ও হাই স্কুলসমূহ যথাক্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বোর্ডের আওতাধীনে আসে।

আগেই বলেছি, আমরা সাতচল্লিশের আগ পর্যন্ত কোন বিশেষ প্রয়োজন বা বিশেষ উপলক্ষ ছাড়া নতুন ঢাকা তথা রমনা অঞ্চলে আসতাম না। পুরানা ঢাকা তখন শুধু ব্যবসা-বাণিজ্য বা প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু নয়, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেরও কেন্দ্রবিন্দু রূপে বিবেচিত হত। পুরানা পল্টন তো নয়ই, আরমানিটোলা ময়দানও তখন রাজনৈতিক জনসভার কাজে ব্যবহৃত হত না। রাজনৈতিক জনসভার জন্য তখন তিনটি ভেন্যু ছিল ঃ মুসলমানদের জন্য নয়াবাজার সংলগ্ন সিরাজউদ্দৌলাহ পার্ক। হিন্দুদের জন্য সদরঘাট সংলগ্ন করোনেশন পার্ক এবং হিন্দু-মুসলিম মিলিত প্রোগ্রামের জন্য ভিক্টোরিয়া পার্ক। ভিক্টোরিয়া পার্ক তখন পর্যন্ত বাহাদুর শাহ পার্কে রূপান্তরিত হয়নি। ভিক্টোরিয়া পার্কের এই রূপান্তর পর্ব সূচিত হয় পাকিস্তান আমলে– ১৯৫৭ সালে ১৮৫৭-এর সিপাহী বিপ্লবের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে।

www.pathagar.com

১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হবার পর উপমহাদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠী অকল্পনীয় দ্রুত গতিতে স্বতন্ত্র আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। লাহোর প্রস্তাবের কোথাও পাকিস্তান শব্দ যেমন ছিল না, তেমনি প্রস্তাবিত মুসলিম-অধ্যুষিত রাষ্ট্রসমূহে শুধুমাত্র মুসলিমরা বসবাস করবেন এমন কথাও কোথাও ছিল না। লাহোর প্রস্তাবের দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফে বরং স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ ছিল যে, প্রস্তাবিত মুসলিম ও অমুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্রসমূহের প্রত্যেকটিতে সংখ্যালঘুদের সকল প্রকার মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। লাহোর প্রস্তাবের মধ্যেই যে সাম্প্রদায়িক সংঘাতপীড়িত উপমহাদেশের স্বাধীনতার প্রকৃত ও বাস্তব পথনির্দেশ নিহিত ছিল তা বুঝতে পেরেছিলেন উপমহাদেশের সকল অগ্রসর সংগ্রামী। এভাবেই লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর একদিকে যেমন মুসলিম নবজাগরণের নয়া জোয়ার শুরু হয়, তেমনি বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামীরাও এর মধ্যে খুঁজে পান স্বাধীনতার বাস্তব ভিত্তি।

মুকুল ফৌজ আন্দোলন

লাহোর প্রস্তাব পাস হওয়ার অল্পদিন পরই কাজী নজরুল ইসলাম স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে দৈনিক 'আজাদ'-এ ছোটদের জন্য একটি পাতা খোলার প্রস্তাব দেন এবং এই পাতাকে কেন্দ্র করে মুসলমান শিশু-কিশোরদের মধ্যে নবজাগরণের ঢেউ ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে একটি মুসলিম শিশু-কিশোর সংগঠন গড়ে তোলার পরামর্শ দেন। এ নিয়ে আজাদ কর্তৃপক্ষের সাথে বিস্তারিত আলোচনার পর নজরুলের দেয়া প্রস্তাব মোতাবেক দৈনিক 'আজাদ'-এর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর দিনে ১৯৪০ সালের ৩১ অক্টোবর দৈনিক আজাদের 'মুকুলের মাহফিল' নামক পাতা প্রকাশিত হয় এবং নজরুলের প্রস্তাবিত মুসলিম শিশু-কিশোর সংগঠন মুকুল ফৌজ-এর যাত্রা শুরু হয়। নজরুলের প্রস্তাবক্রমেই মুকুলের মাহফিলের পরিচালকের নাম দেয়া হয় 'বাগবান'। আজাদ পত্রিকায় কর্মরত বিশিষ্ট সাংবাদিক মোহাম্মদ মোদাব্বের বাগবান হিসাবে মনোনীত হন। মুকুলের মাহফিল পাতা উদ্বোধন উপলক্ষে নজরুলের একটি কবিতাও ঐ দিন দৈনিক আজাদ-এর উল্লেখিত পাতায় প্রকাশিত হয়। (দ্রষ্টব্য ঃ সাংবাদিকের রোজনামচা ঃ মোহাম্মদ মোদাব্বের; পৃঃ ১১২)।

লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হবার পর একদিকে যেমন সাম্প্রদায়িক হিন্দু নেতৃবৃন্দ লীগ ও জিন্নাহর বিরুদ্ধে বিদ্বেষের হলাহল উদ্গীরণে নতুন করে কোমর বেঁধে লেগে যান, তেমনি উদার ও বিপ্লবী নেতাদের মধ্যেও মুসলমানদের দাবী-দাওয়ার ন্যায্যতা সম্বন্ধে নতুন চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়। এ ব্যাপারে যিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে বিতাড়িত করার প্রয়োজনে হিন্দু-মুসলিম মিলিত প্রয়াসের গুরুত্ব সর্বাধিক সর্বপ্রথম অনুধাবন করেন তিনি ছিলেন কংগ্রেসের অগ্রসর চিন্তার নেতা সুভাষ চন্দ্র বসু।

www.pathagar.com

নওয়াব সলিমুল্লাহ

www.pathagar.com

নবাব আব্দুল লতিফ

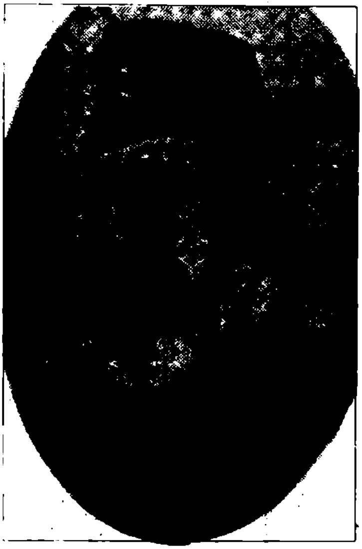

মাওলানা মোহাম্মদ আলী

স্যার আজিজুল হক

সৈয়দ নওয়াব আলী

www.pathagar.com

কায়েদ আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ

www.pathagar.com

মহাকবি ইকবাল

লিয়াকত আলী খাঁ

খাজা নাজিমুদ্দীন

তমিজুদ্দীন খাঁ

www.pathagar.com

শেরেবাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক

www.pathagar.com

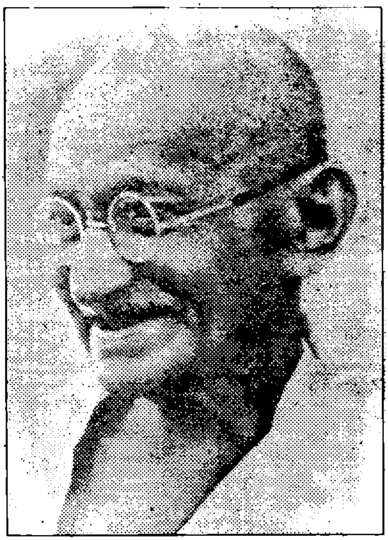

মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধী

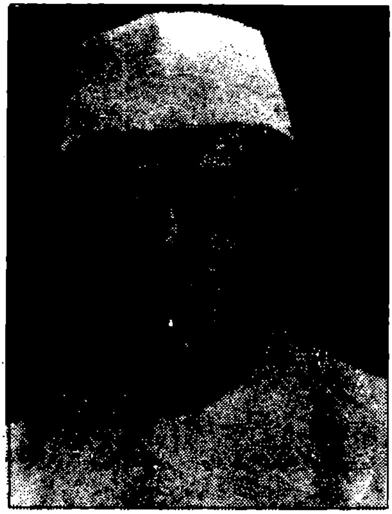

জওহরলাল নেহেরু

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী

www.pathagar.com

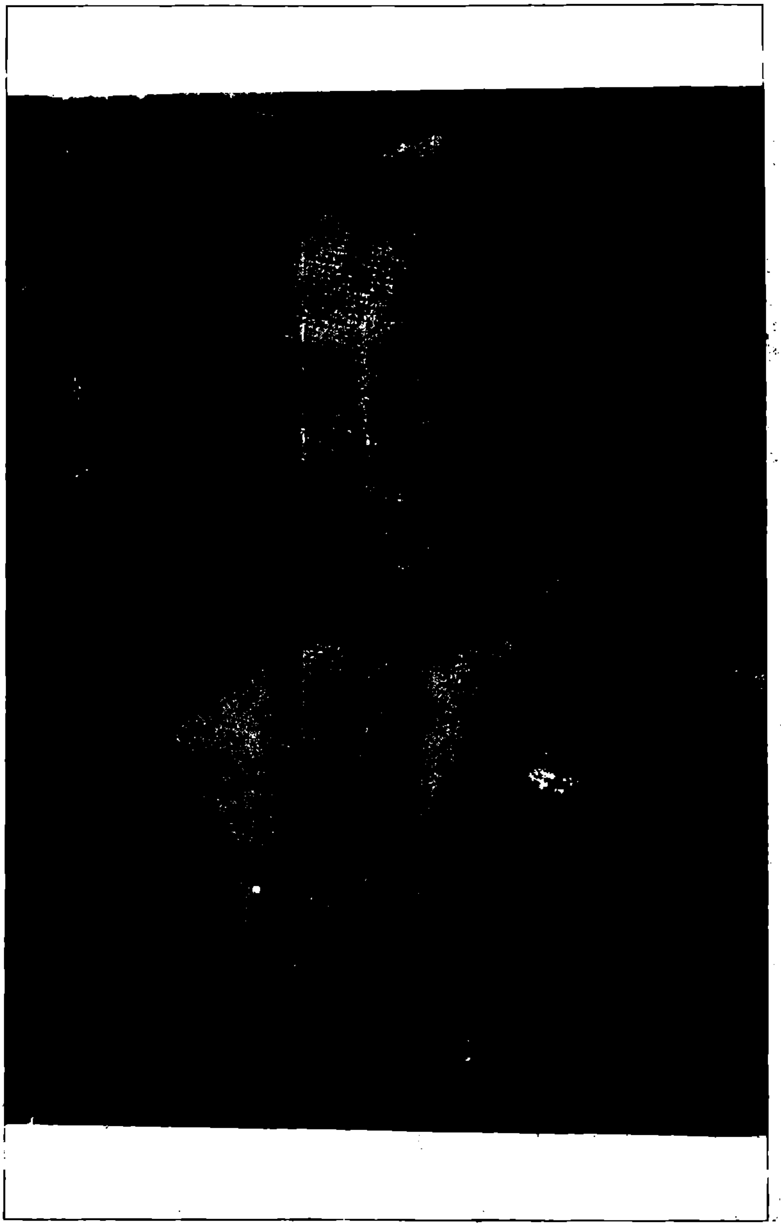

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

www.pathagar.com

হাবিবুল্লাহ্ বাহার চৌধুরী

ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া)

চৌধুরী মোয়াজ্জম হোসেন (লাল মিয়া)

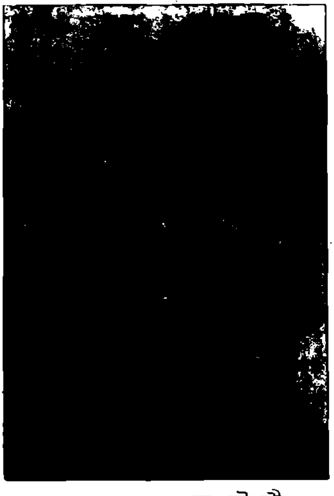

ফজলুল কাদের চৌধুরী

www.pathagar.com

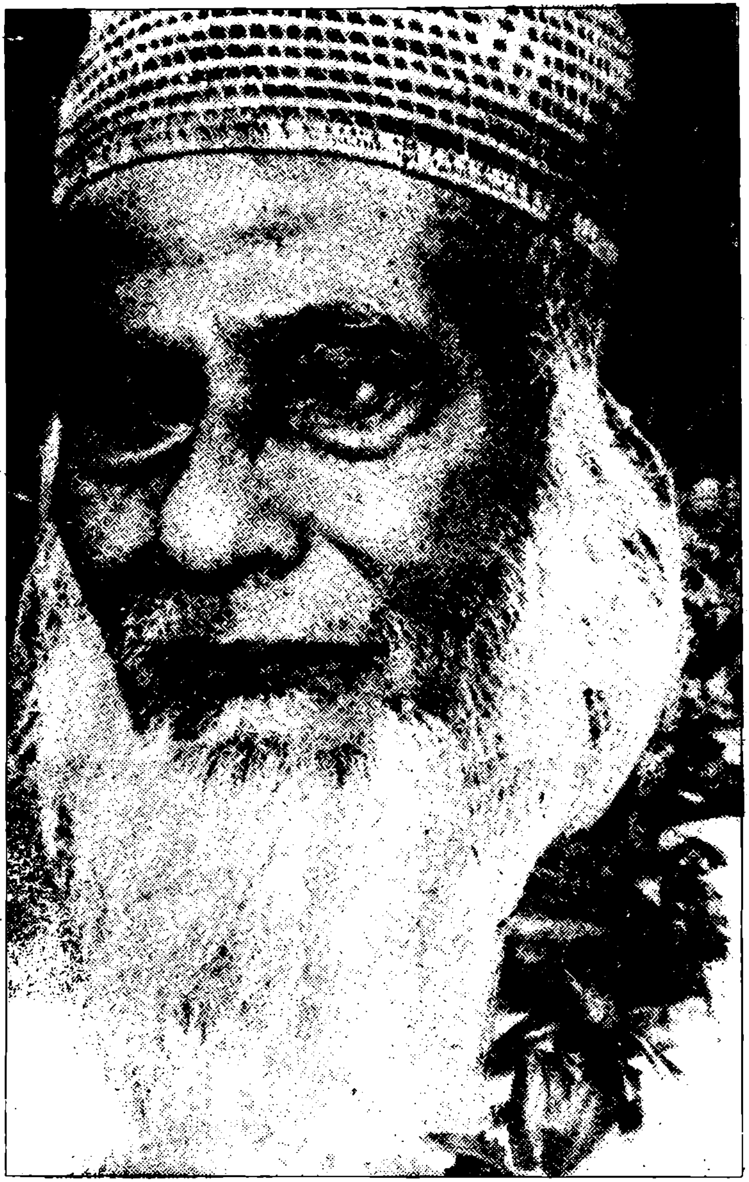

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

www.pathagar.com

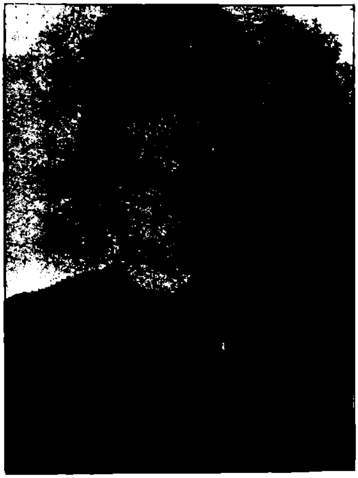

সামসুল হক

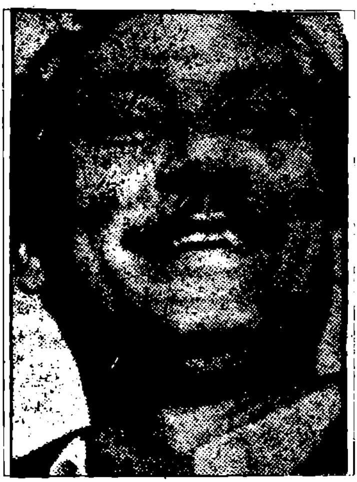

শেখ মুজিবুর রহমান

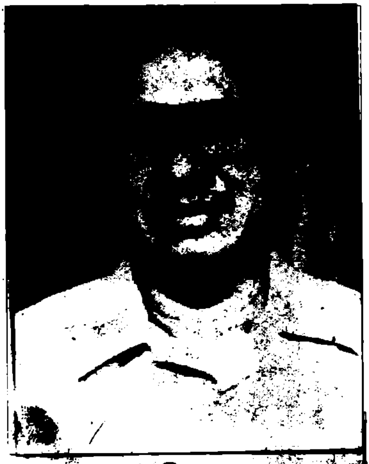

তাজউদ্দীন আহমদ

[illegible] আহমেদ

www.pathagar.com

সুভাষ চন্দ্র বসু

মানবেন্দ্র নাথ রায়

কমরেড মুজাফফর আহমদ

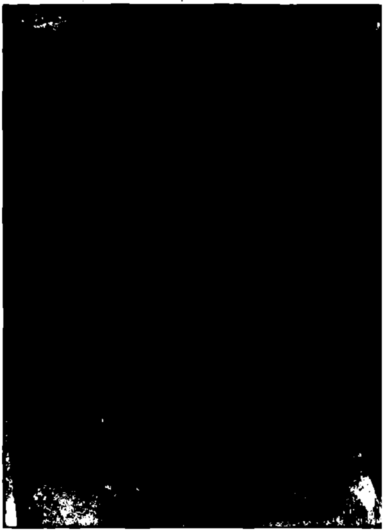

হুমায়ুন কবীর

www.pathagar.com

১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ প্রস্তাবকে যখন হিন্দু সংবাদপত্রসহ হিন্দু সাম্প্রদায়িক মহল 'পাকিস্তান প্রস্তাব' বলে ধিক্কার জানাচ্ছিল, সে সময় সুভাষ চন্দ্র বসু কলিকাতায় মুসলিম লীগের স্থানীয় নেতাদের সাথে কংগ্রেসের একটি চুক্তি সম্পাদনে সফল হন। ১৯৪০ সালের এপ্রিলে সম্পাদিত এই চুক্তির পর কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। লীগ-কংগ্রেস সমঝোতার ভিত্তিতে এই নির্বাচনে ভোটারদের মধ্যে বিরাট সাড়া পড়ে যায় এবং নির্বাচনে সমঝোতা প্যানেলের প্রার্থীগণ বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। সুভাষ বসুর প্রস্তাবে মুসলিম লীগের আবদুর রহমান সিদ্দিকী মেয়র নির্বাচিত হন।

জিন্নাহর সঙ্গে সুভাষ বসুর সাক্ষাৎকার

এরপর সুভাষ বসু লাহোর প্রস্তাব নিয়ে জিন্নাহর সাথে কথা বলেন। আবুল মনসুর আহমদের অনুরোধে জিন্নাহর সাথে কথা বলতে যাওয়ার পথে তিনি গান্ধীর সাথেও দেখা করেন। সুভাষ বসু জিন্নাহর সাথে কথা বলে জিন্নাহ প্রদত্ত লাহোর প্রস্তাবের ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হন। জিন্নাহর অনুরোধেই তিনি অতঃপর জওহরলাল নেহরুর সাথে দেখা করেন। কারণ কারও সাথে ব্যক্তিগতভাবে নয়, কংগ্রেসের সাথে সমঝোতার উপরই তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি জানতেন, গান্ধী-নেহরুর সম্মতি ছাড়া কংগ্রেসের সাথে এ সমঝোতা সম্ভব নয়। নেহরু নীতিগতভাবে সুভাষের সাথে একমত হয়েও তাকে জানান যে, গান্ধীজীর মতের বিরুদ্ধে কোন কাজ করতে তিনি রাজি নন। গান্ধীজী যে লাহোর প্রস্তাবে রাজি নন তা সুভাষ ইতোমধ্যেই জেনে ফেলেছেন। এভাবেই সর্বভারতীয় পর্যায়ে হিন্দু-মুসলিম মিলিত নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সুভাষের হতাশা চরমে পৌঁছে। [দ্রষ্টব্য : আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর– আবুল মনসুর আহমদ, তৃতীয় মুদ্রণ, ঢাকা ১৯৭৫, পৃঃ ১৯৬-২০৫]

মুসলিম লীগ হাই কমান্ডের সাথে যোগাযোগ ছাড়াও এ সময় সুভাষ চন্দ্র বসু মুসলিম লীগের তরুণ নেতা-কর্মীদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলেন। এ সময় বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার ওপর কলংক লেপনকারী হলওয়েল মনুমেন্টের অপসারণ নিয়ে কলিকাতার আবদুল ওয়াসেক, নূরুল হুদা, আনোয়ার হোসেন প্রমুখের নেতৃত্বে মুসলিম ছাত্র সমাজ প্রবল আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন। সুভাষ চন্দ্র বসু এই আন্দোলনের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থন ঘোষণা করলেন। তিনি প্রাদেশিক কংগ্রেস ও ফরওয়ার্ড ব্লককেও এ আন্দোলনে শামিল করতে সমর্থ হন। আন্দোলনকে জাতীয় রূপ দেবার লক্ষ্যে ৩ জুলাইকে 'সিরাজ স্মৃতি দিবস' রূপে পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হল। ১ জুলাই ১৯৪০ সালে কলিকাতা আলবার্ট হলে তরুণ মুসলিম জননেতা চৌধুরী মোয়াজ্জম হোসেন (লাল মিয়া)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত

www.pathagar.com

জনসভায় সুভাষ বসু ঘোষণা দিলেন, ৩ জুলাই হলওয়েল মনুমেন্ট ভাঙ্গার আন্দোলনে তিনি স্বয়ং কুড়াল হাতে নিয়ে নেতৃত্ব দেবেন। সরকার আতঙ্কিত হয়ে ২ জুলাই দিবাগত রাতেই সুভাষ বসুকে ভারত রক্ষা আইনে গ্রেফতার করে প্রেসিডেন্সি জেলে আটক করে।

সুভাষ বসুর গ্রেফতারে আন্দোলন দমে গেল না। হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের দাবীর সাথে এবার যুক্ত হল সুভাষ বসুর মুক্তি দাবী। কলিকাতার মেয়র আবদুর রহমান সিদ্দিকীসহ মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ জোর আওয়াজ তুললেন সুভাষ বসুর মুক্তির দাবীতে। সুভাষ বসুর এ গ্রেফতার হয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে। ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন প্রাদেশিক সরকারের এতে কোন হাত ছিল না। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে দরবার শুরু করেন। অবশেষে ১৯৪০ সালের ডিসেম্বরে সুভাষ চন্দ্র বসুকে মুক্তি দেয়া হয়। কিন্তু তাঁকে নিজ গৃহে অন্তরীণ রাখা হয়। এই অন্তরীণ অবস্থায় থাকা কালেই পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে ১৯৪১ সালের ২৪ জানুয়ারী সুভাষ চন্দ্র বসু পালিয়ে যেতে সমর্থ হন।

সুভাষ চন্দ্র বসু বৃটিশ পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে কিভাবে জার্মানী হয়ে জাপানে উপনীত হন এবং জাপান সরকার ও প্রবাসী ভারতীয়দের সহযোগিতায় হিন্দু-মুসলিম লড়াকু স্বাধীনতা যোদ্ধাদের সমবায়ে 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' ও স্বাধীন প্রবাসী সরকার গঠন করেন, সে বিস্তারিত বিবরণীতে যাওয়ার অবকাশ এখানে নেই। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানের যথেষ্ট আগেই প্রথমে ইউরোপে, পরে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অক্ষশক্তির বিপর্যয় দেখা দেয়। এই বিপর্যয় শুরু হবার আগে এক পর্যায়ে জাপানী বাহিনীর সহযোগিতায় 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' উত্তর-পূর্ব ভারতের আসাম প্রদেশের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে মুক্ত করে নিতে সমর্থ হয়। কিন্তু ইতোমধ্যে ইউরোপে জার্মান ও ইতালী বাহিনীর বিপর্যয় শুরু হওয়ার ফলে জাপানী বাহিনীর বার্মা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে পশ্চাদপসরণের পালা শুরু হয়। ফলে সুভাষ চন্দ্র বসুও আজাদ হিন্দ ফৌজকে অভিযান বন্ধ করতে নির্দেশ দিতে বাধ্য হন।

বিভিন্ন রণাঙ্গনে বিপর্যয়ের মোকাবিলা করেও জাপান যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু ১৯৪৫ সালের ৬ এবং ৯ আগস্ট তারিখে মিত্র শক্তির নয়া মোড়ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আণবিক বোমার আক্রমণ চালিয়ে এক লহমায় দু'টি শহরের ধ্বংসলীলা সম্পন্ন করে দেয়, তারপর জাপানের আর যুদ্ধ চালিয়ে যাবার সাহস অবশিষ্ট থাকে না। ১৪ আগস্ট জাপানের রাজা আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন এবং ২৮ আগস্ট টোকিও উপসাগরে অবস্থিত মার্কিন রণতরী 'মিশৌরীতে' আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরিত হয়।

www.pathagar.com

কথায় বলে, নাথিং সাকসিডস লাইক সাকসেস। যে মিত্রশক্তির বর্বর আক্রমণে জাপানের দু'টি শহরের লাখ লাখ নিরস্ত্র নর-নারী-শিশু-বৃদ্ধ নিহত, আহত ও চিরতরে পঙ্গু হয়ে গেল, সেই নরপশুরাই যুদ্ধে বিজয়ী হবার সুবাদে এবার বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হল বিজিতদের কল্পিত অপরাধের। যুদ্ধাবসানে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণের অপরাধে আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দী কমান্ডার ও যোদ্ধাদেরও বিচারের সম্মুখীন হতে হল একইভাবে। তবে বৃটিশ রাজ এ বিচারকর্ম যতটা সহজ ভেবেছিল ততটাই তা কঠিন প্রমাণিত হল বাস্তব ক্ষেত্রে। কারণ সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা, যমুনা, মেঘনা দিয়ে এতদিনে গড়িয়ে গেছে প্রচুর পানি। সে সব প্রসঙ্গে পরে আসছি।

১৯৪৫ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত আমি যখন ঢাকা শহরের ইসলামপুর এলাকার প্যারাডাইস হোস্টেলে থেকে আইএ পড়তাম, তখন নতুন ঢাকা এলাকায় খুব কমই আসতাম। আগেই বলেছি, নতুন ঢাকা তখন ছিল প্রধানত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সীমাবদ্ধ। বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন বিশেষ অনুষ্ঠান হলে সেখানে আসতে চেষ্টা করতাম। এমনি এক অনুষ্ঠানে ১৯৪৫ কি ১৯৪৬ সালে একবার এসেছিলাম মুসলিম হলে। মুসলিম হল বলতে শুধু তখন কেন, এরপরও বহুদিন ধরে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলকেই বুঝানো হত। উল্লেখিত অনুষ্ঠানে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ হচ্ছিল। ডায়াসে সলিমুল্লাহ হলের হল ছাত্র সংসদের সভাপতি তদানীন্তন প্রভোস্ট ডক্টর সৈয়দ মোয়াজ্জম হোসেন (পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর) উপস্থিত ছিলেন, এটুকু বেশ মনে আছে। তবে আর কে উপস্থিত ছিলেন তা এ মুহূর্তে মনে পড়ছে না। ডায়াস থেকে এক্সট্রা কারিকুলার কার্যক্রমের বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রতিযোগিতায় যেসব ছাত্র প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন তাদের নাম ঘোষণা করা হচ্ছিল। আর তারা এসে প্রধান অতিথির হাত থেকে পুরস্কার নিয়ে যাচ্ছিলেন।

একজন অসাধারণ মেধাবী ছাত্র

এই পুরস্কার বিতরণকালে একটা বিষয়ে অবাক হয়ে যাই। অবাক হবার মত ব্যাপারই বটে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র প্রায় প্রতিটি বিষয়েই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। বাংলা রচনা, বাংলা ডিবেট, বাংলা বক্তৃতা, বাংলা উপস্থিত বক্তৃতা, ইংরেজী রচনা, ইংরেজী বক্তৃতা, ইংরেজী ডিবেট, ইংরেজী উপস্থিত বক্তৃতা– সব প্রতিযোগিতায়ই যদি একজন প্রতিযোগী প্রথম স্থান অধিকার করেন, তা চমকে দেবার ব্যাপারই বটে। শুধু উল্লেখিত সব বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকারই নয়, সর্বাধিক আইটেমে প্রথম স্থান অধিকারের জন্য একটি বিশেষ পুরস্কারও লাভ করলেন তিনি। পাতলা ছিপছিপে চেহারা, চোখে চশমা, মাথায়

www.pathagar.com

তুর্কী টুপি, শেরোয়ানী ও চোস্ত পাজামা পরিহিত এ প্রতিযোগী একবার পুরস্কার গ্রহণ করে হলের মধ্যে তার সীটে আসন গ্রহণ করতে না করতেই পুনরায় তার নাম ঘোষিত হচ্ছিল আরেক বিষয়ে পুরস্কার গ্রহণের জন্য। সাথে সাথে দর্শকদের মধ্য থেকে বিপুল করতালির মাধ্যমে অভিনন্দন জানানো হচ্ছিল পুরস্কার গ্রহণের জন্য বারবার ডায়াসে উঠতে নামতে ক্লান্ত হয়ে পড়া এ কৃতী ছাত্রকে। এই মেধাবী কৃতী ছাত্র ছিলেন সৈয়দ আলী আশরাফ।

সৈয়দ আলী আশরাফ শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের একস্ট্রা কারিকুলার কর্মকাণ্ডেই কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেননি, ছাত্র হিসাবেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৫ সালে তিনি ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৪৬ সালে তিনি একই বিষয়ে কৃতিত্বের সাথে এমএ পাস করেন এবং ১৯৪৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী বিভাগে লেকচারার হিসেবে যোগ দেন। সেই যে ১৯৪৭ সালে তিনি শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নেন, এরপর আমৃত্যু তিনি শিক্ষকতার মধ্যেই নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। এই শিক্ষকতা উপলক্ষেই তিনি ১৯৫২ সালে বৃটেনের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজীতে বিএ অনার্স পাস করেন এবং ১৯৬৪ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন। এই সময়টুকু ছাড়া তিনি তার বাকী জীবন শিক্ষকতা ও শিক্ষা-চিন্তায়ই অতিবাহিত করেন। ১৯৫৫-৫৬ সালে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী বিভাগের প্রধান হিসাবে কাজ করেন। এরপর ১৯৫৬ থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত তিনি একটানা করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ১৯৭৪ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত সৌদি আরবের কিং আবদুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের প্রফেসর ও প্রধান হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এ ছাড়াও সৈয়দ আলী আশরাফ ১৯৭১ সালে আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে, ১৯৭৪ সালে কানাডার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ১৯৮২ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে কাজ করেন।

দীর্ঘদিন বিদেশে বিভিন্ন নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা কর্মে ব্যাপৃত থাকলেও তাঁর মন যে সব সময় পড়েছিল স্বদেশের চিন্তায়, তার প্রমাণ মেলে সারাজীবনের সঞ্চিত অর্থবিত্ত ও অভিজ্ঞতা দিয়ে ঢাকায় 'তাঁর দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়' গড়ে তোলার ঘটনা থেকে। সৈয়দ আলী আশরাফ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চল্লিশের দশকের মেধাবী ছাত্রী বেগম আসিয়াকে সহধর্মিনীরূপে গ্রহণ করেন। তাদের সন্তানাদি নেই। সৈয়দ আলী আশরাফ ১৯৯৮ সালের ৬ আগস্ট ইন্তেকালের বেশ আগেই তাঁর সমস্ত সম্পত্তি 'আশরাফ চ্যারিটেবল ট্রাস্ট'কে দান করে যান।

www.pathagar.com

সৈয়দ আলী আশরাফ শিক্ষকতার পাশাপাশি সাহিত্য চর্চায়ও ব্রতী ছিলেন আজীবন। তিনি শুধু একজন প্রথম শ্রেণীর কবিই ছিলেন না, একজন বড় মাপের সাহিত্য সমালোচক ও মননশীল গদ্য লেখকও ছিলেন। কাব্য এবং বাংলা-ইংরেজী গদ্য মিলে তার গ্রন্থ সংখ্যা ছিল ত্রিশেরও বেশী। এরপরও যদি প্রশ্ন করা যায়, জীবনে সৈয়দ আলী আশরাফের সবচাইতে বড় কীর্তি কি, নিঃসন্দেহে উত্তর হবে ঃ ইসলামী শিক্ষা আন্দোলন। সারা জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, ধর্মীয় মূল্যবোধ বিবর্জিত পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব থেকে মুসলিম বিশ্বের শিক্ষা ব্যবস্থাকে মুক্ত না করা পর্যন্ত মুসলিম বিশ্ব শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করে সেই স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তুলতে পারবে না। শিক্ষা সংস্কার নিয়ে তিনি আজীবন গবেষণা করেছেন। অসংখ্য আন্তর্জাতিক শিক্ষা সেমিনার-সম্মেলনে মুসলিম বিশ্বের নেতৃস্থানীয় মনীষীদের সাথে চিন্তার আদান-প্রদান করেছেন এবং অবশেষে সেই মূল্যবান অভিজ্ঞতাকে সম্বল করেই গড়ে তুলেছিলেন দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়। এই নিরিখে তাঁর প্রতিষ্ঠিত দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় একটি বিশ্ববিদ্যালয় মাত্র নয়, একটি শিক্ষা আন্দোলনের মডেল বা সূতিকাগারও বটে।

পাঁচচল্লিশ কি ছয়চল্লিশ সালে মুসলিম হলে সৈয়দ আলী আশরাফকে যখন প্রথম দেখি, তখন বিভিন্ন একস্ট্রা কারিকুলার ইভেন্টে তার অসাধারণ কৃতিত্ব থেকেই তার অসামান্য মেধার বিষয় আঁচ করতে পেরেছিলাম। কিন্তু তিনি যে একজন দক্ষ সংগঠকও তা তখন জানতে পারিনি। ১৯৪৩ সালের দিকে ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ নামে পাকিস্তান আন্দোলনের পরিপোষক যে সাংস্কৃতিক সংস্থা গঠিত হয়, তার সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে সৈয়দ সাজ্জাদ হোসাইন, সৈয়দ আলী আহসান ও সৈয়দ আলী আশরাফ। ১৯৪৪-৪৫ সালে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সম্পাদক এবং ১৯৪৫-১৯৪৭ মেয়াদে এর সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৭ সালে শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার পর তিনি সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিলেও আদর্শের তাগিদে শেষ জীবনে তিনি পুনরায় সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন। বৃটেনের কেম্ব্রিজে ইসলামী একাডেমী, ১৯৮০-৮২ সালে ওআইসি কর্তৃক মক্কা শরীফে প্রতিষ্ঠিত 'ওয়ার্ল্ড সেন্টার ফর ইসলামিক এডুকেশন'-এর প্রথম পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন এবং বাংলাদেশে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা– ভাইস চ্যান্সেলর এবং দারুল ইহসান ট্রাস্ট ও আশরাফ চ্যারিটেবল ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন থেকে তার এ প্রবণতার প্রমাণ মেলে। তবে এর পেছনেও তার আদর্শিক তাগিদটাই যে বড় ছিল, তা সুস্পষ্ট। প্রথম যৌবনে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের সাথে তিনি নিজেকে

www.pathagar.com

জড়িত করেছিলেন স্বজাতির রাজনৈতিক স্বাধীনতা কামনায়। সারাজীবনের অধ্যয়ন ও দেশ-বিদেশে ব্যাপক সফর থেকে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা থেকে শেষ জীবনে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, রাজনৈতিক স্বাধীনতা সার্থক করতে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা অর্জনের কোন বিকল্প নেই। এই উদ্দেশ্যেই তিনি তার দেহ-মন-প্রাণ সবটুকু তিনি সঁপে দিয়েছিলেন ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে শিক্ষা সংস্কার আন্দোলনে।

সৈয়দ আলী আশরাফ জীবনের প্রথম পর্যায়ে স্বজাতির স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন প্রধানত রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে। কিন্তু জীবনের দীর্ঘ ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা থেকে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, স্রষ্টার উদ্দেশে নিজেকে পূর্ণভাবে সমর্পিত না করা পর্যন্ত জীবনের আদর্শিক সার্থকতা লাভ করা সম্ভব নয়। এই উপলব্ধিই তাঁকে আধ্যাত্মিক সাধনার পথে নিয়ে যায়। ফলে তার জীবনদৃষ্টি, জীবনবোধ ও জীবনাচরণে আসে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন। পাকিস্তান আমলে দীর্ঘদিন দেশের বাইরে কাটানোর পর বাংলাদেশ আমলে একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী শিক্ষা সেমিনার উপলক্ষে ঢাকায় তাঁকে প্রথম যেদিন দেখি, সেদিন তাঁর মধ্যকার এই পরিবর্তন আঁচ করতে না পারলেও পরবর্তীকালে তাঁর এই পরিবর্তনের দিকটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আশির দশকে আমি যখন ইসলামিক ফাউন্ডেশনে কর্মরত, তখন তার কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশনা উপলক্ষে তার সাথে যোগাযোগ হয়। তখনও তিনি বেশীরভাগ সময় বিদেশে কাটাতেন। নব্বুইয়ের দশকে ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য চলে আসার পর তার সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণ চিন্তায় তিনি কতটা বিভোর ছিলেন, তা উপলব্ধি করার সুযোগ পাই তখন। তাঁর সাথে মিশতে গিয়ে বুঝতে পারি, তিনি শুধু স্বদেশ, স্বজাতির চিন্তায়ই বিভোর নন, আল্লাহ প্রেমের সাধনায়ও তিনি গভীরভাবে নিমগ্ন।

সৈয়দ আলী আশরাফের সাথে আমার শেষবারের মত দেখা হয় ১৯৯৮ সালের ৬ জুলাই চট্টগ্রামে। চট্টগ্রামের বিখ্যাত আধ্যাত্মিক সাধক হযরত মওলানা আবদুল জব্বার (রহঃ) প্রতিষ্ঠিত বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্সে গুনীজন সংবর্ধনা উপলক্ষে। ঐ অনুষ্ঠানে ডঃ সৈয়দ আলী আশরাফসহ অন্য কয়েকজন গুণীজনের সাথে আমিও সংবর্ধিত হই। রাতে এক বাড়ীতেই ডঃ সৈয়দ আলী আশরাফ ও আমি অবস্থান করি। বহুদিন থেকেই তিনি নিয়মিত তাহাজ্জুদ গুজার। আল্লাহয় নিবেদিত আধ্যাত্মিক সাধক হলে কোন ব্যক্তি হাজারো সমস্যার মধ্যেও কত প্রশান্ত হৃদয়ের অধিকারী হতে পারেন, তার এক অনন্য দৃষ্টান্ত দেখেছিলাম তাঁর মধ্যে। চট্টগ্রামে তাঁর সাথে তাঁর স্বপ্নের ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনের সম্ভাবনা নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলাপ হয়েছিল। মুসলিম বিশ্বের শাসকদের কাছ থেকে এ ব্যাপারে তেমন সাড়া

www.pathagar.com

পাচ্ছিলেন না বলে তাঁর মনে বেশ বেদনাবোধ ছিল। তবুও মিশনের চূড়ান্ত সাফল্য সম্পর্কে তাঁর প্রত্যয় ছিল সুগভীর।

৮ জুলাই তাকে বিদেশ চলে যেতে হবে বলে ৭ জুলাই ভোরেই তিনি চট্টগ্রামে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসেন। শুনেছি আগস্টের ১৭ তারিখে তাঁর দেশে ফেরার কথা ছিল। তখন কে জানত, ১৭ তারিখের আগেই তাঁর ডাক পড়বে পরম আরাধ্যের দরবারে এবং তাঁর দেশে ফেরার নির্দিষ্ট তারিখের সাত দিন আগেই তিনি লাশ হয়ে ফিরে আসবেন ঢাকায়!

শহীদ নজীর

পাকিস্তান আন্দোলনে বাংলার কতো জানা-অজানা তরুণ যে আত্মাহুতি দিতে এগিয়ে এসেছিল তাদের ক'জনের খবরই বা আমরা রাখি। যাদের নাম একদিন সারাদেশে মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হতো, তাদের অনেকেই এখন বিস্মৃতির অন্তরালে হারিয়ে গেছে। বিস্মৃতির অন্তরালে হারিয়ে যাওয়া এমনি একটি নাম শহীদ নজীর আহমদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনপ্রিয় ছাত্রনেতা নজীর আহমদের জন্ম নোয়াখালী জেলার ফেনী মহকুমায়। নজীর আহমদ ছিলেন মেধাবী একজন ছাত্র, প্রচারবিমুখ একজন আত্মনিবেদিত সংস্কৃতিকর্মী। পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের সাথে সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট নজীর আহমদ ঢাকা থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক 'পাকিস্তান' নামক পত্রিকার সম্পাদনা করতেন। এই পত্রিকায় পাকিস্তান আন্দোলন সম্পর্কে বিশিষ্ট সুধীজনদের রচনাদি নিয়মিত প্রকাশিত হতো। নজীর আহমদ একজন অমায়িক-আদর্শবাদী তরুণ হিসেবে হিন্দু-মুসলমান সকল মহলেই অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। নিজে কখনও পদ বা স্বার্থের পেছনে ছুটতেন না বলে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলিম ছাত্র সমাজের অঘোষিত নেতা ছিলেন। ১৯৪৩ সালের প্রথমদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অনুষ্ঠানে আপত্তিকর একটি আইটেম সংযোজনের জন্য হিন্দু ছাত্রদের জিদকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল মহলে নজীর আহমদ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন বলে তিনি এ বিষয়ে হিন্দু-মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যার সুরাহা করতে পারবেন– এই ভরসায় হিন্দু ছাত্রদের সাথে দেখা করতে যান। কিন্তু বুকভরা যে বিশ্বাস নিয়ে তিনি হিন্দু ছাত্রদের সাথে কথা বলতে যান, তারা সে বিশ্বাসের মর্যাদা দিতে পারেনি। শান্তিকামী নজীরকে নিজেদের আওতার মধ্যে পেয়ে হিন্দু ছাত্ররা তার পিঠে ছুরিকাঘাত করে বসে। আঘাত সুপরিকল্পিত ও কঠিন ছিল বিধায় ডাক্তাররা শত চেষ্টা করেও নজীরকে বাঁচাতে ব্যর্থ হন। এভাবেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র ক্যাম্পাস প্রথম রক্তাক্ত হয় শহীদ নজীরের রক্তে। নজীর আহমদ শাহাদৎ বরণ করেন ১৯৪৩ সালের ২

www.pathagar.com

ফেব্রুয়ারী। শহীদ নজীর ছাত্র-শিক্ষকদের মাঝে কত জনপ্রিয় ছিলেন তার প্রমাণ মেলে তাঁর মৃত্যুতে প্রকাশিত দু'টি স্মরণিকায়। এতে যাদের কবিতা ও অন্যান্য রচনাদি প্রকাশিত হয়েছিল তাদের মধ্যে ছিলেন কবি জসিমউদ্‌দীন, সৈয়দ সাজ্জাদ হোসাইন, সৈয়দ আলী আহসান, কাজী নাজমুল হক এবং আরও অনেকে। ১৯৪৪ সাল থেকে বহুদিন পর্যন্ত প্রতিবছর দোসরা ফেব্রুয়ারী ভাব-গম্ভীর পরিবেশে 'শহীদ নজীর দিবস' প্রতিপালিত হতো। ঢাকা শহরের নাজিরাবাজার এলাকায় শহীদ নজীরের স্মৃতি রক্ষার্থে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একটি উন্নতমানের পাঠাগার, যার নাম ছিল 'শহীদ নজীর লাইব্রেরী'। ১৯৪৫ সালে আমি যখন ঢাকায় আসি, তখন ১৫০ নম্বর মোগলটুলীর পরই পাকিস্তান আন্দোলনের দ্বিতীয় প্রাণকেন্দ্র ছিল নাজিরাবাজারে অবস্থিত এই শহীদ নজীর লাইব্রেরী।

সিলেটের শহীদ আলকাস

শহীদ নজীরের মত পাকিস্তান আন্দোলনের আর এক তরুণ শহীদ ছিলেন সিলেটের শহীদ আলকাস। সিলেট তখন ছিল আসামের অন্তর্গত। হয়তো সে কারণেই এই বীর শহীদের নাম বাংলার পত্রিকা পাঠক সমাজের কাছে ততোটা পরিচিতি পায়নি। অথচ আজাদী পাগল এই তরুণ আলকাসই সেই দোর্দণ্ড প্রতাপশালী সাম্রাজ্যবাদী শাসনামলে বৃটিশের ইউনিয়ন জ্যাক পতাকা নামিয়ে মুসলিম লীগের স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলনের দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন। আজাদী পাগল আলকাস যে পুলিশ ফাঁড়ির বৃটিশ পতাকা নামানোর দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন, তার অবস্থান ছিল সিলেট শহরের সারদা লাইব্রেরীর কাছে সুরমা নদীর তীরে। পুলিশ ফাঁড়ি ভবনের শীর্ষ থেকে বৃটিশ পতাকা নামানোর চেষ্টার অপরাধে আসামের তদানীন্তন সরকারের পুলিশ গুলীবর্ষণে ঝাঁঝরা করে দেয় আলকাসের দেহ। গুলীবর্ষণের আগে পুলিশ হুঁশিয়ার করে দিয়েছিল আলকাসকে। কিন্তু আলকাস সে হুঁশিয়ারিতে ভ্রুক্ষেপ না করে গোলামির প্রতীক বৃটিশ পতাকা অপসারণ করে শহীদ হওয়াকেই শ্রেয় বিবেচনা করেছিল।

উল্লেখযোগ্য যে, শহীদ আলকাসের বৃটিশ পতাকা নামানোর এ ঘটনার সময় আসামে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল গোপীনাথ বরদলুইয়ের কংগ্রেস সরকার। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন বসন্ত কুমার দাশ (পরবর্তীকালে পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রী)। যে কংগ্রেস বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামের দাবীদার, তাদের শাসনামলেই এভাবে বৃটিশ ইউনিয়ন জ্যাক নামানোর অপরাধে আত্মাহুতি দিতে হলো বিপ্লবী তরুণ শহীদ আলকাসকে।

আসামে পাকিস্তান আন্দোলন

বাংলার মত আসামেও পাকিস্তান আন্দোলন খুব জোরদার হয়ে উঠেছিল। আসামে এই আন্দোলন জোরদার হবার পেছনে যেসব কারণ ছিল, তার কিছু

www.pathagar.com

ভৌগোলিক, কিন্তু ঐতিহাসিক। আসামের জনগোষ্ঠী প্রধানত তিনভাগে বিভক্ত–হিন্দু, মুসলমান ও উপজাতি। এই উপজাতিদের বেশীরভাগ অনার্য ও মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীভুক্ত, যার কারণে তারা আর্য-অধ্যুষিত ব্যাহ্মণ্যবাদী ভারতীয় জনসমাজ থেকে সবসময়ই নিজেদেরকে পৃথক মনে করতো। হিন্দু সমাজের জাতিভেদ প্রথা যেমন তাদের সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-আচরণের সঙ্গে সঙ্গতিশীল ছিল না, তেমনি পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের তারা দীর্ঘদিন ধরেই সৎ প্রতিবেশী ও আপনজন মনে করতো। এই আপন মনে করার পেছনেও ছিল এক ঐতিহাসিক-অর্থনৈতিক পটভূমি।

স্মরণাতীতকাল থেকে আসামের অধিকাংশ এলাকা ছিল পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ এক বিশাল অনাবাদী ভূখণ্ড। আসামের অধিকাংশ এলাকা পাহাড়-জঙ্গলে পরিবৃত থাকার কারণে এর জনসংখ্যা যেমন ছিল অত্যন্ত কম, তেমনি কৃষি-শিল্প সব দিক দিয়েই ছিল অঞ্চলটি অনুন্নত। অথচ আসামের যেমন ছিল অঢেল অনাবাদী উর্বর ভূমি, তেমনি প্রচুর খনিজ সম্পদ থাকার কারণে আসামের শিল্প সম্ভাবনাও ছিল অপরিসীম। ইংরেজরা এ অঞ্চলে তাদের আধিপত্য বিস্তারের পর নজর রেখেছে শুধু খনিজ সম্পদের দিকে। তারা খনিজ সম্পদকে কেন্দ্র করে শিল্প প্রতিষ্ঠার কথা যেমন ভাবেনি, তেমনি গুরুত্ব দেয়নি বিশাল বন-জঙ্গল সাফ করে উর্বর জমিতে কৃষি ফলন বৃদ্ধির ব্যাপারে। ফলে বৃটিশ আমলে পূর্ববঙ্গের মত আসামও রয়ে যায় অনুন্নত।

রঙ্গাল খেদা

এ কারণে ১৯০৫ সালে যখন পূর্ববঙ্গ ও আসাম এই দুই অনুন্নত এলাকা নিয়ে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠিত হয়, আসামবাসী উন্নয়নের সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিল তার মধ্যে। কিন্তু মাত্র ছয় বছরের মাথায় তাদের সে আশা ধূলিসাৎ হয়ে যায়। বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের এই বঞ্চনা ও অবহেলার পটভূমিতে আসামের শ্বাপদসঙ্কুল ঘন বন-জঙ্গল পরিষ্কার করে সে এলাকায় কৃষি আবাদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করে উত্তর ও পূর্ববঙ্গের রংপুর, বগুড়া, পাবনা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চল থেকে যাওয়া হাজার হাজার ভূমিহীন কৃষক। বাঘ, ভালুক, হাতি, শূকর, অজগর প্রভৃতি হিংস্র বন্য পশু ও সরীসৃপের সাথে লড়াই করে লক্ষ লক্ষ একর জমি উদ্ধার করে বাঙালী ভূমিহীন কৃষকরা আসামের বিরাট অনাবাদী এলাকাকে মনুষ্য বাস উপযোগী ভূ-ভাগে পরিণত করায় এসব বহিরাগতদের ঐ এলাকার আদি অধিবাসীরা তাদের আপনজনই মনে করতো। আসামের কৃষি উন্নয়নে বাঙালী কৃষকদের অবদানের পটভূমি ছিল সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক। কারণ তাতে ভূমিহীন এই কৃষকরা যেমন বেঁচে থাকার একটা অবলম্বন পাচ্ছিল, তেমনি এর ফলে তারা

www.pathagar.com

আসামের কৃষি উন্নয়নেও রাখছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান। কিন্তু যেহেতু এই কৃষকদের বেশীরভাগ ছিল মুসলমান, তাই কংগ্রেসের হিন্দু নেতৃত্ব এর মধ্যে তাদের কায়েমী স্বার্থ হাসিলের পথে অন্তরায় আবিষ্কার করে এই দরিদ্র কৃষকদের বিরুদ্ধে ইংরেজ শাসকদের যোগসাজশে হীন চক্রান্তে মেতে উঠে। এই চক্রান্তই ছিল কুখ্যাত লাইন প্রথা।

লাইন প্রথার কবলে বাঙ্গালী কৃষক

আসামে তখনও বিরাট এলাকা অনাবাদী এবং ঘন বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ। হঠাৎ হুকুম জারি হলো আসাম থেকে বাঙালীদের উৎখাত করতে হবে। বাঙালী উৎখাতের নামে আসলে উৎখাত শুরু হলো সেসব দরিদ্র কৃষকদের, যারা বছরের পর বছর ধরে গায়ের রক্ত পানি করে বন-জঙ্গলে পূর্ণ বিশাল অনাবাদী এলাকায় সোনার ফসল ফলাচ্ছিলো। অতীতের একটি বছরকে সীমারেখা হিসেবে বেঁধে দিয়ে সেই সময়ের পরে যারা আসামে গেছে, তাদের অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে এলাকা ত্যাগ করতে বলা হলো। কিন্তু যারা অতীতে সরকারের অনুমোদনক্রমে আসামে এসে বছরের পর বছর ধরে জঙ্গলের হিংস্র বাঘ-ভালুকের সাথে সংগ্রাম করে আসামের বিশাল অনাবাদী এলাকা আবাদ করে সোনার ফসল ফলাচ্ছে, তারা তাদের আবাদ করা জমিজিরাত ফেলে যাবে কোথায়? তারা তো আসামকেই তাদের স্বদেশ হিসেবে গ্রহণ করেছে। ভারতবর্ষের এক প্রদেশের বাসিন্দার অন্য প্রদেশে বসতি স্থাপনের বিরুদ্ধে যখন কোন নিষেধাজ্ঞা নেই, তখন বাংলার প্রতিবেশী আসামে বাঙালী কৃষকদের বসতি স্থাপন অবৈধ হবে কেন?

এই অন্যায় নিষেধাজ্ঞা এবং উৎখাত অভিযানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো বাঙালী কৃষকরা। আর তাদের বিপদের দিনে পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সাহস যোগাতে এগিয়ে এলেন বাংলা থেকে আগত কৃষক-শ্রমিকের নয়নমণি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। লাইন প্রথার কৃষক উৎখাত অভিযান সবচাইতে নির্মম আকার ধারণ করে ১৯৪৫ সালে আসামের তেজপুর জেলার মঙ্গলদই এলাকায়। সেখানে অনিচ্ছুক কৃষকদের উচ্ছেদ করার লক্ষ্যে হাতি চালিয়ে তাদের বাড়ী-ঘর, শস্যক্ষেত তছনছ করে দেয়া হলো এবং সবশেষে তাদের বাড়ী-ঘরে আগুন লাগিয়ে সব পুড়িয়ে ফেলা হলো। কুখ্যাত লাইন প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনের ডাক দিলেন মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। শুরু হলো লাইন প্রথা বিরোধী আন্দোলন। দরিদ্র কৃষকদের অস্তিত্ব রক্ষার এ আন্দোলনে কায়েদে আজমের নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ সমর্থন ঘোষণা করল।

একজন বিপ্লবী মওলানা

মওলানা ভাসানী লাইন প্রথার বীভৎস রূপের প্রতি বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণের

www.pathagar.com

জন্য লাইন প্রথার বাঙালী উৎখাত অভিযানে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা তেজপুরের মঙ্গলদইতে কৃষক সম্মেলন আহবান করলেন। সে সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার জন্য আমন্ত্রিত হলেন মুসলিম জনগণের মুখপত্র দৈনিক 'আজাদ'-এর সম্পাদক জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীন। সম্মেলনের আগে ও পরে লাইন প্রথার নামে যে নির্মম কৃষক উৎখাত অভিযান চালানো হয় তার সচিত্র প্রতিবেদন আজাদ-এ প্রকাশিত হলে আসামের কংগ্রেস সরকারের অমানবিক কর্মকাণ্ডের প্রতি সর্বত্র নিন্দার ঝড় শুরু হয়।

কংগ্রেস বাহ্যত হিন্দু-মুসলমান সকলের মিলিত প্রতিষ্ঠান হলেও প্রকৃত প্রস্তাবে যে এটি ছিল সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন হিন্দুদের একটি প্রতিষ্ঠান, তা আসামে যেমন কুখ্যাত লাইন প্রথার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, তেমনি প্রমাণিত হয় বাংলায়ও জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ প্রশ্নে। কংগ্রেসকে মুক্তিকামী মানুষের সংগঠন বলে দাবী করা হলেও বাংলাদেশে অধিকাংশ জমিদার হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত এবং অধিকাংশ প্রজা মুসলমান হওয়ার কারণে বাংলাদেশে কংগ্রেস সব সময়ই জমিদারী উচ্ছেদের বিরোধিতা করে এসেছে। এর বিপরীতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের মেনিফেস্টোতে বিনা খেসারতে জমিদারী উচ্ছেদের স্বপক্ষে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় দাবী জানানো হয়। বাংলাদেশে এটাও মুসলিম লীগের বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জনের একটা বড় কারণ ছিল। ভারতবর্ষের, বিশেষ করে বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যে মুসলিম লীগের অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভের এ বিষয়টি রেডিক্যাল হিন্দু নেতৃবৃন্দ অনুধাবন করতে পারলেও গান্ধী-নেহরু-প্যাটেলের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস কখনও এ বাস্তবতা মেনে নিতে রাজি হননি। কংগ্রেস নেতা গান্ধী পুরনো অভ্যাসবশত তখনও দাবী করে চলেছেন, কংগ্রেসই ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমান জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন। কংগ্রেসের এ দাবীর বিপরীতে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ দাবী করেছিল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ যথাক্রমে ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি স্থানীয় রাজনৈতিক সংগঠন।

এ পরস্পর বিরোধী দাবীর মীমাংসা কিভাবে হবে? এই মীমাংসার প্রয়োজনেই অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৫-৪৬ সালের ঐতিহাসিক সাধারণ নির্বাচন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং নিখিল ভারত মুসলিম লীগ উভয় সংগঠনই যথাযোগ্য গুরুত্ব সহকারে চ্যালেঞ্জের মনোভাব নিয়ে এই সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে।

সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগ যে বিজয়ী হবে সে আলামত আগেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। মুসলিম জনগণের কাছে কংগ্রেসের প্রকৃত চেহারা উদ্‌ঘাটিত হওয়ায় তার ধোঁকাবাজির আর বিন্দুমাত্র সুযোগ ছিল না। কংগ্রেস নিপীড়িত জনগণের মুক্তি এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতার কথা মুখে বললেও তার অতীত ইতিহাস প্রমাণ করে,

www.pathagar.com

নিপীড়িত মানুষদের মুক্তি ও স্বাধীনতা নয়, কংগ্রেস যেনতেন প্রকারে হিন্দুদের রাজত্ব কায়েম করতেই অধিক আগ্রহী। বিশেষ করে কংগ্রেসের রাজনীতিতে গান্ধী-নেহরু-প্যাটেল জুটির নেতৃত্ব পাকাপোক্ত হয়ে উঠার পর কংগ্রেসের মধ্যে উদারনৈতিক গ্রুপের প্রভাব দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে হিন্দু-মুসলিম সমঝোতার প্রশ্ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। এই বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিয়েই ১৯২৩ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস বেঙ্গল প্যাকট চুক্তি স্বাক্ষর করে দীর্ঘ অবহেলিত মুসলমানদের প্রতি কিঞ্চিৎ হলেও ইনসাফ নিশ্চিত করতে প্রয়াসী হন। কিন্তু কংগ্রেসের কট্টরপন্থী হিন্দু নেতাদের কারণে কয়েক বছরের মধ্যেই এ সুন্দর প্রয়াসটি ভণ্ডুল হয়ে যায়। বেঙ্গল প্যাক্টকে ভণ্ডুল করে দেয়া না হলে এবং বাংলাদেশে হিন্দু জমিদার মহাজনদের শোষণ-অত্যাচারে মুসলমান কৃষক প্রজাদের জীবন ওষ্ঠাগত হয়ে না উঠলে অন্তত বাংলাদেশে পাকিস্তান আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠত কি-না সন্দেহ।

বৃটিশ শাসনে বাংলার মুসলমান যতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে উপমহাদেশের অন্য কোন জনগোষ্ঠীকেই ততটা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়নি। বাংলাদেশেই দীর্ঘতম কাল ধরে বৃটিশ শাসন চালু ছিল। ধুরন্ধর ইংরেজরা মুসলমান শাসকদের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছিল বলে মুসলমানদের তারা আগাগোড়া ভয় করে এসেছে। মুসলমানরাও কখনও সহজভাবে ইংরেজ শাসন মেনে নিতে পারেনি। পলাশীর পর প্রথম একশ' বছর তো মুসলমানরা ইংরেজ শাসন উৎখাতের জন্য সশস্ত্র সংগ্রামই চালিয়ে এসেছে। এ সময়েই ঘটে তিতুমীর-শরীয়তুল্লাহ-দুদু মিয়াদের আবির্ভাব। সিপাহী বিপ্লবের ব্যর্থতার পরই প্রথম বাংলার নবাব আবদুল লতিফ ও উত্তর ভারতের স্যার সৈয়দ আহমদ খান প্রমুখের উদ্যোগে মুসলিম নেতৃত্বের একাংশ হিন্দুদের দেখাদেখি ইংরেজের সাথে সহযোগিতার পথে অগ্রসর হয়ে মুসলমানদের শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রসর করে তোলার প্রয়াস পান। সহযোগিতার এ যুগেই ১৯০৫ সালে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিকে বিভক্ত করে ঢাকায় রাজধানীসহ 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' নামে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ সৃষ্টি করা হলে দীর্ঘদিন ধরে ইংরেজের আশীর্বাদভোগী হিন্দুদের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। তারা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলে। অবশেষে ছয় বছরের মাথায় তাদের পুরাতন সুহৃদ ইংরেজ বঙ্গভঙ্গ রহিত করে দিলে পূর্ববঙ্গ পুনরায় যে তিমিরে সেই তিমিরেই ফিরে যায়।

ঢাকাকেন্দ্রিক পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশ গঠিত হওয়া দীর্ঘ অবহেলিত পূর্ববঙ্গ ও আসামে উন্নতির যে সামান্য সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার পর সে সম্ভাবনা পুনরায় সুদূরপরাহত হয়ে যায়। কিন্তু এই ঘটনা বাংলার মুসলমানদের

www.pathagar.com

মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এতে মুসলিম-ইংরেজ স্বল্পকালীন সহযোগিতা যুগের অবসান হয় এবং মুসলমানদের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, নিয়মতান্ত্রিক পথে আন্দোলনের মাধ্যমেই তাদের ভাগ্য পরিবর্তনে এগিয়ে যেতে হবে। বঙ্গভঙ্গ রদের পর ক্ষুব্ধ মুসলমানদের শান্ত করার লক্ষ্যে বৃটিশ সরকার ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যে ওয়াদা করেন, সে পথেও বাধ সাধেন কলিকাতার হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা। তাদের মতে পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ মানুষ মুসলমান কৃষক, তাই তাদের উচ্চ শিক্ষার জন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন নেই। মুসলিম অধ্যুষিত পূর্ববঙ্গের প্রতি এই অবজ্ঞার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেই সেদিন ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছিল মুসলিম নেতৃবৃন্দকে।

বাঙালী মুসলমানদের প্রতি ইংরেজ ও তাদের সহযোগী হিন্দুদের অবজ্ঞা ও অবহেলার এখানেই শেষ ছিল না। সারা পৃথিবীতে পূর্ববঙ্গে সবচাইতে উৎকৃষ্ট ও সর্বাধিক পাট উৎপাদিত হলেও ইংরেজ আমলে পাটকল সবগুলোই স্থাপিত হয় ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীরে। বিশাল পূর্ববঙ্গে মাত্র তিনটি বস্ত্রকল ও দু'টি চিনি কল ছাড়া কোন শিল্প কারখানা ছিল না। পূর্ববঙ্গের পাট সম্পদে এভাবেই কলিকাতা ও সন্নিহিত এলাকা শিল্পায়িত হয় এবং পূর্ববঙ্গকে ব্যবহার করা হয় হিন্টারল্যান্ড হিসেবে।

শিল্প কারখানা থেকে বঞ্চিত পূর্ববঙ্গের জমিদার মহাজনদের সিংহভাগই হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ায় বাংলার মুসলমান সমগ্র প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও বৃটিশ আমলে কার্যত ছিল একটি ভুখানাঙ্গা জনগোষ্ঠী। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ মুখে অসাম্প্রদায়িকতার কথা বললেও জমিদারী উচ্ছেদে তাদের অনীহা এবং চাকরিতে মুসলমানদের ন্যায্য হিস্যার নিশ্চয়তাদানকারী বেঙ্গল প্যাক্টের প্রতি তাদের বৈরী মনোভাব বাস্তব ক্ষেত্রে প্রমাণ করেছিল তারা মুসলমানদের ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদাজনক অস্তিত্বের কথা কল্পনাও করতে পারেন না।

এই পটভূমিতেই ১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের মধ্যে বাংলার মুসলমান তাদের মুক্তি ও স্বাধীন অস্তিত্বের সম্ভাবনা খুঁজে পেয়েছিল। পক্ষান্তরে কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িক হিন্দু নেতৃত্ব চেয়েছিল, মুসলমানদের ন্যায্য দাবী-দাওয়া পাশ কাটিয়ে ছলেবলে-কৌশলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কব্জা করা। অপেক্ষাকৃত উদারচেতা নেতা সুভাষ চন্দ্র বসু কিভাবে দেশত্যাগের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত লীগ-কংগ্রেস তথা হিন্দু-মুসলমান সমঝোতার জন্য চেষ্টা চালান, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। তাঁর চেষ্টা যে ফলপ্রসূ হবার নয় সে ব্যাপারে তাঁর নিজেরও সংশয় ছিল। কারণ কংগ্রেসের ত্রিপুরী অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচিত হয়েও যে গান্ধী-নেহরু জুটির ষড়যন্ত্রে তিনি সভাপতির পদ থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন, সেই নেতৃত্বের

www.pathagar.com

কাছ থেকে হিন্দু-মুসলিম সমঝোতার ব্যাপারে কোন বাস্তব সহযোগিতা যে তিনি পাবেন না, সে ব্যাপারে তিনিও নিশ্চিত ছিলেন।

মুসলমানদের ন্যায্য অধিকার অস্বীকার করেই ১৯৪২ সালে কংগ্রেস হঠাৎ করে 'কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্টে'র ডাক দেয়। অহিংসার প্রবক্তা গান্ধীর আহূত এ আন্দোলন অচিরেই সহিংস রূপ গ্রহণ করে। দেশে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, মুসলমানদের দাবী-দাওয়া পাশ কাটিয়ে যাওয়ার ফলে এ আন্দোলন কিভাবে একদিন স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয়েছিল। মুসলমানরা উপমহাদেশে তাদের স্বাধীন ও মর্যাদাপূর্ণ অস্তিত্বের লড়াইয়ে একাত্ম হয়েছিল মুসলিম লীগের পতাকা তলে। কংগ্রেস এ বাস্তবতা অস্বীকার করতে চেষ্টা করলেও মুসলিম জনগোষ্ঠীর কাছে পাকিস্তান ছিল সূর্যের আলোর মতই বাস্তব সত্য এবং এ লক্ষ্য হাসিলে তারা যে কোন কোরবানীর জন্য সেদিন প্রস্তুত ছিল।

এই প্রেক্ষাপটেই ১৯৪৫-৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিজয় ছিল এক অনিবার্য বাস্তবতা। ১৯৪২ সালে বাংলাদেশে যখন শ্যামা-হক মন্ত্রীসভা ক্ষমতাসীন, তখনই এ বাস্তবতার প্রথম আলামত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সে সময় প্রদেশে দু'টি উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ কে ফজলুল হকের মত ব্যক্তিত্বশালী নেতার প্রভাবকে অস্বীকার করে দু'টি উপনির্বাচনেই মুসলিম লীগ প্রার্থী বিপুল ভোটে বিজয়ী হন। ১৯৪৩ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক পদে বিপ্লবী চিন্তাবিদ জনাব আবুল হাশিম নির্বাচিত হওয়ার পর মুসলিম লীগের সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও ব্যাপক ও জোরদার হয়।

ঐতিহাসিক নির্বাচন

উপমহাদেশের ভাগ্য নির্ধারণী ঐতিহাসিক এ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় দু'পর্বে। ১৯৪৫ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত হয় কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্বাচন, আর ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত হয় প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন। কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্বাচনে মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট ৩০টি আসনের মধ্যে ৩০টিই দখল করে মুসলিম লীগ। বাংলাদেশ থেকে নির্ধারিত ৬ আসনে যে ৬ জন মুসলিম লীগ প্রার্থী বিজয়ী হন তাদের মধ্যে ছিলেন জনাব রফিউদ্দীন আহমদ সিদ্দিকী (চট্টগ্রাম বিভাগ), মৌলভী তমিজউদ্দীন খাঁ (ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলা), হাজী মোহাম্মদ ইসমাইল (ফরিদপুর ও বরিশাল জেলা) ও জনাব আবদুর রহমান সিদ্দিকী (প্রেসিডেন্সী বিভাগ)। লীগের জনপ্রিয়তা তখন এতটাই তুঙ্গে যে, মৌলভী তমিজউদ্দীন খাঁর বাড়ী ফরিদপুর হওয়া সত্ত্বেও ঢাকা-ময়মনসিংহ সীটে টাঙ্গাইলের আবদুল হালিম গজনবীকে তিনি বিপুল ভোটে পরাজিত করতে সক্ষম হন।

www.pathagar.com

কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্বাচনের চাইতে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন ছিল নিঃসন্দেহে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এই নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতেই নির্ধারিত হয় অতঃপর কোন্ প্রদেশ কারা শাসন করবে। কেন্দ্রীয় পরিষদের মত প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনেও মুসলিম লীগ প্রার্থীরা নিরংকুশ বিজয় লাভ করে। প্রাদেশিক পরিষদের ১১৯টি মুসলিম আসনের মধ্যে ১১৩টিতেই বঙ্গীয় লীগ প্রার্থীরা বিজয়ী হয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি স্থানীয় সংগঠন হিসাবে দাবী করলেও বাংলাদেশে কংগ্রেস একটি মুসলিম আসনও পায়নি। কংগ্রেস মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য ফজলুল হকের দলের উপরই শেষ পর্যন্ত নির্ভর করতে বাধ্য হয়। কিন্তু বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ সেদিন মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবীর পেছনে এমন মজবুতভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল যে, এ কে ফজলুল হকের মত জনপ্রিয় ব্যক্তিও এ লড়াইয়ে সুবিধা করে উঠতে পারেননি। ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তার সুবাদে তিনি নিজে দু'টি আসনে জয়লাভ করলেও অন্যান্য সীটে তাঁর মাত্র তিনজন নমিনি জয়লাভ করেন। এরা ছিলেন সৈয়দ মুহম্মদ আফজাল, খোদা বখশ ও মওলানা শামসুল হুদা। ফজলুল হক তাঁর ২টির একটি সীটে রিজাইন দিলে উপনির্বাচনে সে সীটে লীগ প্রার্থী জয়যুক্ত হয়। নির্বাচনে লীগ প্রার্থী ইউসুফ আলী চৌধুরী পরাজিত হন মুসলিম লীগ সমর্থক চৌধুরী শামসুদ্দিন আহমদের কাছে। বিজয়ী প্রার্থী মুসলিম লীগে যোগ দেন। পরবর্তীকালে স্বয়ং ফজলুল হক ও সৈয়দ মুহম্মদ আফজল মুসলিম লীগে যোগ দেন। ফলে বাংলাদেশে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনেও মুসলিম লীগের বিজয় নিরংকুশ হয়ে দাঁড়ায়।

গফরগাঁ কনফারেন্স

নির্বাচনে মুসলিম লীগের নিরংকুশ বিজয় সূচিত হওয়ার পরও মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে বিজয়ী যে একমাত্র প্রার্থী মুসলিম লীগে যোগদানের কথা চিন্তা করেননি তিনি ছিলেন ময়মনসিংহের গফরগাঁও থানার পাঁচবাগ নিবাসী মওলানা শামসুল হুদা। সেখানে মুসলিম লীগের প্রার্থী ছিলেন জনাব গিয়াসুদ্দিন পাঠান। মওলানা শামসুল হুদার বিপুল প্রভাবের কথা চিন্তা করে পাঠান সাহেবকে জয়ী করার উদ্দেশে গফরগাঁয় মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে একটি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে ১২ জানুয়ারী তারিখেই এই সম্মেলন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর পরই নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খানের স্থান। সেই লিয়াকত আলী খান ছাড়াও প্রাদেশিক চীফ মিনিস্টার খাজা নাজিমুদ্দিন, মন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরওয়ার্দী, প্রাদেশিক লীগের

www.pathagar.com

সাধারণ সম্পাদক জনাব আবুল হাশিম, জনাব হবীবুল্লাহ বাহার, জনাব আবুল মনসুর আহমদ, জনাব নূরুল আমীন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এই সম্মেলনের বেশ কয়েকদিন আগেই ঢাকা থেকে সম্মেলনের প্রাথমিক কার্যাদি সম্পন্ন করার উদ্দেশে ঢাকার মুসলিম লীগ কর্মী শিবিরের পক্ষ থেকে জনাব শামসুল হকের নেতৃত্বে একদল ভলান্টিয়ার পাঠানো হয়। ঐ ভলান্টিয়ার দলে আমিও অন্তর্ভূক্ত ছিলাম।

গফরগাঁও সম্মেলনের কথা সম্ভবত আমি সারা জীবনে কখনও ভুলতে পারব না। ঐ সম্মেলনে ভলান্টিয়ার হিসেবে আমার সাথে আর যেসব অন্তরঙ্গ বন্ধু যোগ দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন এনামুল হক, এম এ ওয়াদুদ প্রমুখ। সম্মেলনের দুই কি এক দিন আগে সম্মেলন সম্পর্কে প্রচার চালানোর জন্য জনাব শামসুল হকের নেতৃত্বে আমরা জনা পঁচিশেক কর্মীর একটি ভলান্টিয়ার দল গিয়েছিলাম হোসেনপুর। হোসেনপুর অত্র এলাকার গুরুত্বপূর্ণ একটি বাজার। আমাদের প্রত্যেকের হাতে থাকল মুসলিম লীগের এক একটা পতাকা। পতাকার সাথের লাঠি একটু বড়ই ছিল। আত্মরক্ষার্থে ব্যবহারের জন্যই এমনটি করা হয়েছিল কি-না জানি না। তবে হোসেনপুরের উদ্দেশে আমাদের রওনা হবার সময় স্থানীয় নেতা জনাব গিয়াসুদ্দিন পাঠান পরিহাস করে পতাকার জন্য শক্ত ডান্ডা বহনের কথা বলছিলেন। এই পরিহাসের পেছনে কোন্ বাস্তবতা থাকতে পারে– তা আমরা কল্পনাও করতে পারিনি। যথারীতি মুসলিম লীগ কনফারেন্সের শ্লোগান দিতে দিতে আমরা এক সময় হোসেনপুর গিয়ে পৌঁছলাম। হোসেনপুর ঐদিন ছিল সাপ্তাহিক হাটবার। সমগ্র বাজার এলাকাটি হাটে আসা লোকে গমগম করছিল। আমাদের ২৫ জনের ক্ষুদ্র দলটি নিয়ে আমরা শ্লোগান দিতে দিতে বাজারের মধ্য দিয়ে এগোতে এগোতে বাজারের এক কোণায় গিয়ে পৌঁছলাম। সেখানে কয়েকটি ফাঁকা গরুর গাড়ী রাখা ছিল। আমাদের একজন ভলান্টিয়ার একটা গরুর গাড়ীতে উঠে চোঙার সাহায্যে উপস্থিত জনতার উদ্দেশে কিছু বলবার চেষ্টা করার সাথে সাথেই প্রথমে হাটের দু'একজন লোক, পরে অনেকে একসঙ্গে আপত্তি করে উঠল। বক্তা গরুর গাড়ীর উপর থেকে নেমে আসলেও উত্তেজনা ক্রমেই বেড়ে চলল। আমাদের পক্ষ থেকে যতই শান্তভাবে প্রতিবাদকারীদের বুঝানোর চেষ্টা চলতে লাগল, এক শ্রেণীর লোকের উস্কানিমূলক কথাবার্তা ততই বেড়ে চলল এবং এক সময় তারা আমাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে বসল।

আমরা তখনও বুঝে উঠতে পারিনি যে, আক্রমণটা ছিল পূর্ব পরিকল্পিত এবং আমাদের একজন লোক গরুর গাড়ীর উপর না উঠলেও আক্রমণ এক পর্যায়ে আসতই। কারণ অচিরেই প্রতিবাদীদের পক্ষ থেকে প্রশ্ন তোলা হল আমরা কোন্ সাহসে হোসেনপুরে মুসলিম লীগের সভার প্রচার করতে এসেছি? আমরা কি জানি

www.pathagar.com

না, এটা মওলানা শামসুল হুদার এলাকা?

বাংলাদেশের বহু অঞ্চলে আমরা মুসলিম লীগের প্রচার উপলক্ষে গেছি। কিন্তু এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন কোথাও হইনি। হোসেনপুরের ব্যাপারটা যে ছিল পূর্ব পরিকল্পিত তা'ও বুঝে উঠতে পারিনি। যখন বুঝতে পারলাম তখন সারা হাটের হাজার হাজার মানুষ আমাদের পঁচিশটি কর্মীর দিকে ধাবমান। ভাগ্যিস জায়গাটা ছিল হাটের এক প্রান্তে। ভয়ে আতঙ্কে কেউ কেউ ইতোমধ্যেই সরে পড়তে শুরু করেছিল। শামসুল হক সাহেবও আমাদের দ্রুত হাট এলাকা ত্যাগ করে সরে পড়তে নির্দেশ দিলেন।

সরে তো পড়ব, কিন্তু কোথায় যাব? কি করে যাব? সারা হাট যেখানে ধাবমান কয়েকটি ছেলের পেছনে, সেখানে সরে পড়া কতখানি সম্ভব? বিশেষ করে আমাদের অনেকেরই হাতে যখন রয়েছে মুসলিম লীগের পতাকা। তাকিয়ে দেখলাম অনেকে পতাকা ফেলেই যার যার মত পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। আমাকেও কে যেন একই বুদ্ধি দিল। একবার ভাবলাম, তাই করি। পরক্ষণেই কি ভেবে ডান্ডার মাথা থেকে পতাকা খুলে পকেটে পুরে পলায়নপরদের দলে যোগ দিলাম।

হোসেনপুরের হাটের নিকট দিয়েই প্রবাহিত পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদী। জানুয়ারীর শীতে যে নদীর এখন শীর্ণ, শান্ত অবস্থা। সেই শান্ত নদীর পাশ দিয়ে পায়ে হাঁটা পথে অশান্ত বিশাল একদল মারমুখো লোকের তাড়া খেয়ে আমরা জান নিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছি। পেছন থেকে লাঠিটা, ঢিলটা এসে পড়ছে গায়ে-পিঠে। কিন্তু সে আঘাত এখন তুচ্ছ। এখন শুধু মওলানা শামসুল হুদার ক্ষিপ্ত অনুসারীদের কবল থেকে জান বাঁচাবার পালা। মাঝে মাঝে যতবারই পেছন ফিরে তাকাবার চেষ্টা করেছি, ততবারই মনে হয়েছে হোসেনপুরের সারাটা হাটের লোক যেন ভেঙ্গে পড়েছে আমাদের পেছনে। সুতরাং দৌড়, দৌড় এবং আরও দৌড়।

কিন্তু এভাবে বিরতিহীন দৌড়, আর কাঁহাতক সম্ভব? অন্যদের বেলায় কি হয়েছিল জানি না, তবে একটানা দৌড়াতে দৌড়াতে এক সময় আমার গলা একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। দৌড়ান তো দূরের কথা– মনে হল, দাঁড়িয়ে থাকাই আর সম্ভব হচ্ছে না আমার পক্ষে। একটু পানি পেলে আবার দৌড়ানোর ক্ষমতা ফিরে পেতাম। কিন্তু পানি পাব কোথায়? ব্রহ্মপুত্রের তলদেশে যথেষ্ট পানি আছে বটে কিন্তু অনেক খানি কাদা পার হয়ে সে পানি পর্যন্ত পৌঁছতে হবে। কাদায় একবার আটকে গেলে সেই কাদায়ই আমার কবর রচিত হতে পারে পেছনের মারমুখোদের কল্যাণে। প্রাণ নিয়ে দৌড়াচ্ছি আর ভাবছি এসব কথা। কিন্তু আর তো দেরি করা চলে না। একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং অবিলম্বেই। হঠাৎ দেখতে

www.pathagar.com

পেলাম, মাঠের দিক থেকে আসা একটা ক্ষুদ্র নালা নদীতে গিয়ে পড়েছে, আর সেই নালা দিয়ে বয়ে যাচ্ছে কর্দমাক্ত পানির ক্ষীণ একটা ধারা। অগত্যা ঐ কর্দমাক্ত পানিই এক আঁজলা খেয়ে আবার দৌড়ান শুরু করলাম।

দৌড়াই আর পিছন ফিরে তাকাই। অনেকক্ষণ দৌড়ানোর পর দেখতে পেলাম, সেই মারমুখো লোকেরা আমাদের পেছনে আর তাড়া করে আসছে না। এতক্ষণে মনে হল বেশ হয়রান, বেশ ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়েছি। পথের উপরেই বসে পড়লাম। ক্রমে আরও কিছু সঙ্গী এসে পাশে বসে পড়ল। শুনলাম, আমাদের সরে যাবার নির্দেশ দেয়ার পরও শামসুল হক সাহেব কিছুক্ষণ ছিলেন হোসেনপুর হাটে। তাঁকে বেদম প্রহার করা হয়েছে। মেরে ফেলারই চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু কতিপয় স্থানীয় লোকের হস্তক্ষেপের ফলে তিনি প্রাণে বেঁচে গেছেন। তবে তাঁকে এমনভাবে প্রহার করা হয়েছে যে, তাঁর উঠে দাঁড়ানোর বা হাঁটার কোন শক্তি অবশিষ্ট নেই। শুনে মনটা আবার খারাপ হয়ে গেল। অনেক পরে দেখলাম, সত্যিই দু'জন লোকের কাঁধে ভর করে অতিকষ্টে খোঁড়াতে খোঁড়াতে হেঁটে আসছেন জনাব শামসুল হক। মাথায় জিন্নাহ টুপি ধুলি-মলিন, পরনের খদ্দরের শেরোয়ানী ও পাজামা প্রহারে প্রহারে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। শামসুল হক সাহেবের এ করুণ অবস্থা দেখে চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে আসতে চাইল। ততক্ষণে সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ক্লান্তিতে সবাই আমরা অবসন্ন। যত শীঘ্র পারা যায় গফরগাঁও সম্মেলন ক্যাম্পে ফিরতে হবে। কিন্তু গফরগাঁও প্রত্যাবর্তন যত সহজ ভেবেছিলাম, বাস্তবে তা তত সহজ ছিল না। ব্রহ্মপুত্র নদীতে কিছুদূর পরপরই নদী পারাপারের খেয়া ঘাট। কিন্তু কোন খেয়া নৌকাই আমাদের পার করতে রাজি হল না। মাঝিরা বলল, মওলানা শামসুল হুদার নিষেধ আছে। তারা আরও বাড়তি খবর শোনাল, সম্মেলনের দিন ঢাল, সড়কি, রামদা, বল্লম সজ্জিত হাজার হাজার লোক নদী পার করা হবে গফরগাঁর সম্মেলনে আক্রমণ চালাতে। সব খেয়া ঘাটে একই জবাব পেয়ে আমরা যখন গফরগাঁ ফেরার ব্যাপারে একেবারে নিরাশ হয়ে পড়ছিলাম, তখন এক জেলে নৌকার মাঝিকে করুণভাবে মিনতি জানাতে তার মন গলল। সে কয়েক দফায় আমাদের নদী পার করে দিল। তখন রাত প্রায় বারটা। আমরা তাকে টাকা দিতে চাইলাম, সে নিল না। অনেক অনুরোধে কয়েকটা বিড়ি নিল মাত্র।

গফরগাঁয় যখন পৌছলাম, তখন রাতের শেষ প্রহর। আমাদের উপর আক্রমণের খবর আগেই ক্যাম্পে পৌছে গিয়েছিল। সারারাত আমাদের সাথীরা জেগে থেকে শুনেছে নানা গুজব। আর আল্লাহর কাছে মোনাজাত করেছে আমাদের নিরাপত্তা কামনায়। হোসেনপুরে আমিসহ আরও কয়েকজন নিহত হয়েছি এমন

www.pathagar.com

গুজবও পৌঁছেছিল গফরগাঁও। পরবর্তীকালে পাকিস্তান আমলে ছাত্রলীগের সেক্রেটারী হয়েছিলেন যে এম এ ওয়াদুদ, যিনি আমার প্যারাডাইস হোস্টেলের অন্যতম বন্ধু ছিলেন, তিনি গফরগাঁ কনফারেন্সে গিয়েছিলেন সে কথা আগেই বলেছি। তিনিও শুনেছিলেন, আমি মারা গেছি। আমাকে জীবিত ফিরতে দেখে ওয়াদুদ আমাকে জড়িয়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন।

হোসেনপুরে আমাদের অনেকের যে নিহত হওয়ার গুজব রটেছিল, তার কারণও ছিল। হোসেনপুর হাটের নৃশংস হামলা থেকে পালাতে গিয়ে আমাদের দু'তিনজন কর্মী মওলানা শামসুল হুদার লোকদের হাতে ধরা পড়ে। তাদের বিভিন্ন বাড়ীতে আটক করে রাখা হয় এবং পরদিন তাদের হত্যা করা হবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়। এই কর্মীরা বুদ্ধি খাটিয়ে আটকাবস্থা থেকে পালিয়ে আসতে না পারলে তাদের নিহত হওয়া ছিল অবধারিত।

মওলানা শামসুল হুদা তাঁর অনুসারীদের যে রাজনৈতিক দলের ব্যানারে সংগঠিত করেছিলেন, তার নাম ছিল 'ইমরাত পার্টি'। তার দলের কর্মীদের উজ্জীবিত রাখার লক্ষ্যে উত্তেজক ভাষায় যখন-তখন হ্যান্ডবিল ছাপার ব্যবস্থা ছিল। মওলানা সাহেবের নিজস্ব প্রেস থেকে। গফরগাঁর কনফারেন্স উপলক্ষেও এরূপ বেশ কিছু হ্যান্ডবিল প্রকাশ করা হয়েছিল। গফরগাঁও মুসলিম লীগ কনফারেন্সে আক্রমণের ব্যাপারে 'ইমরাত পার্টির' হুমকি যে ফাঁকা বুলি ছিল না তা টের পাওয়া গেল কনফারেন্স শুরু হওয়ার আগেই। মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের বহনকারী সকল ট্রেনে আক্রমণ চালান হল। বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে বড় বড় মিছিল করে আমাদের যেসব লোকজনের সভায় আসার কথা ছিল তাদের পথেই আটকে দিল ইমরাত পার্টির সশস্ত্র লোকেরা। এতদসত্ত্বেও গফরগাঁও কনফারেন্সের জন্য নির্দিষ্ট ময়দানে প্রচুর লোক সমাগম হয়েছিল। তবে, কনফারেন্স শুরু হবার আগেই ইমরাত পার্টির হাজার হাজার সমর্থক ঢাল, তলোয়ার, সড়কি, নেজা, বল্লম প্রভৃতি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে কনফারেন্স স্থল ঘিরে ফেলে এবং লাফিয়ে লাফিয়ে উস্কানিমূলক শ্লোগান দিতে থাকে। আমাদের প্রতি নির্দেশ ছিল, ওদের কোন উস্কানিমূলক কথা বা কাজে আমরা উত্তেজিত না হয়ে যেন ধৈর্য্য সহকারে শান্তি-শৃংখলা রক্ষা করি। আমরা সবাই ছিলাম নিরস্ত্র। ওরা যদি ইচ্ছা করত তা হলে আমাদের অনেককেই অতি সহজে খুন-জখম করে দিতে পারত। ভাগ্যিস তারা উত্তেজনামূলক শ্লোগান সহকারে নর্তন-কুর্দন করে ভীতি প্রদর্শন করলেও ওরকম কিছু করেনি। তবে তাদের অবিশ্রান্ত গোলমালে কোন বক্তাই তাঁর বক্তৃতা ভাল ভাবে সমাপ্ত করতে পারেননি।

www.pathagar.com

বাগ্মী আবুল হাশিম

সন্ধ্যার পর বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালেন প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবুল হাশিম। আবুল হাশিম বক্তৃতা করতে উঠে অন্যান্য বক্তার মত প্রথমেই মুসলিম লীগের আদর্শ ব্যাখ্যা করতে না গিয়ে মওলানা শামসুল হুদার ইসলামী আদর্শপ্রীতির এবং নিপীড়িত জনগণের কল্যাণে তাঁর সংগ্রামের প্রশংসা করলেন। ইমারত পার্টির যেসব লোক এতক্ষণ ধরে কনফারেন্সের বিভিন্ন নেতার বক্তৃতায় হৈ-চৈ করে বাধা সৃষ্টি করেছিল, তারা তো অবাক। হাশিম সাহেবের যাদুকরী বক্তৃতার প্রভাবে তারা তাদের হাতের অস্ত্র মাটিতে রেখে যে যার জায়গায় অবাক বিস্ময়ে বক্তৃতা শুনতে বসে গেল। পিনপতন নীরবতার মধ্য দিয়ে এরপর আবুল হাশিম আজকের দুনিয়াতে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে খিলাফতে রাশেদার মূল্যবোধের আলোকে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ার লক্ষ্যে মওলানা সাহেবের পরামর্শ ও নির্দেশনা কামনা করলেন। এভাবে একবার শ্রোতাদের মন জয় করার পর তিনি যখন মওলানা সাহেবের কিছু কিছু ভুলের কথা অতীব শ্রদ্ধার সাথে ব্যাখ্যা করলেন, তখনও জনতা মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁর বক্তৃতা শুনেই চলেছে। এমনকি, এক পর্যায়ে আয়োজকদের পক্ষ হতে তার বক্তৃতার নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে যাওয়াতে যখন বক্তৃতা সংক্ষিপ্ত করার নোটিশ দেয়া হল, ইমরাত পার্টির সমর্থকদের দাবীতে তাঁর বক্তৃতার সময় বাড়িয়ে দিতে হল।

গফরগাঁও কনফারেন্সের তারিখ ছিল ১৯৪৬ সালের ১২ জানুয়ারী, এ কথা আগেই বলেছি। বহু আগ থেকে দুরারোগ্য চক্ষুরোগে ভুগে জনাব আবুল হাশিম তখন প্রায়ান্ধ। এই প্রায়ান্ধ নেতা যে একজন বিপ্লবী ইসলামী চিন্তাবিদ, তা বুঝেছিলাম ফরিদপুরে ১৯৪৪ সালে মুসলিম লীগের একটি প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশ নিতে যেয়েই। কিন্তু তিনি যে একজন অসাধারণ বাগ্মীও, তা গফরগাঁ সম্মেলনে না গেলে বুঝতাম না।

আবুল হাশিমের যাদুকরী বাগ্মিতার মাধ্যমে প্রায় ভণ্ডুল হয়ে যাওয়া গফরগাঁ কনফারেন্সের সাফল্য নিশ্চিত হয় বটে, কিন্তু লীগ প্রার্থী গিয়াসুদ্দীন পাঠানের পরাজয় ঠেকানো যায়নি। অনেকের ধারণা, জেলা মুসলিম লীগ রাজনীতিতে গিয়াসুদ্দীন পাঠানকে নূরুল আমীন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বিবেচনা করতেন এবং তিনি প্রচ্ছন্নভাবে নির্বাচনে গিয়াসুদ্দীন পাঠানের বিপক্ষে কাজ করেন বলেই পাঠান সাহেব পরাজিত হন। কিন্তু এ ছিল পরিস্থিতির অতি সরলীকৃত ব্যাখ্যা।

মওলানা শামসুল হুদার বিজয় নানা কারণেই ছিল অনিবার্য। এলাকার হিন্দু মহাজন ও জমিদারের শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে মুসলমান প্রজাদের পক্ষ হয়ে একটানা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মওলানা সাহেব এলাকার সাধারণ মুসলমানদের মন

www.pathagar.com

জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর সাথে মাটির মানুষদের সম্পর্ক ছিল নিবিড়। পক্ষান্তরে লীগ প্রার্থী পাঠান সাহেব ছিলেন শহরকেন্দ্রিক রাজনীতিক।

মওলানা সাহেবের অবশ্য মুসলিম লীগ সম্পর্কে নানা রকম অদ্ভুত বক্তব্যও ছিল। এগুলো জানা যায় আমাদের একজন কর্মীর সাথে তারপর এক একান্ত সাক্ষাৎকারে। তিনি তাঁর পার্টির নামকরণে যে 'ইমারত' শব্দ ব্যবহার করেন, তার সপক্ষে তাঁর বক্তব্য ছিল খিলাফতের যুগ শেষ হয়ে গেছে, ইসলামকে এখন ইমারতের (আমীর থেকে ইমারত) মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তিনি কথায় কথায় পাকিস্তানকে ফাঁকিস্তান এবং কায়েদে আজমকে কাফেরে আজম বলতেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনি নিজে একজন মওলানা হওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় পরিষদ নির্বাচনে মৌলভী তমিজউদ্দিন খাঁর মত একজন ধর্মপরায়ণ-পরহেজগার প্রার্থীর বিরুদ্ধে ধর্মের সাথে সংশ্রবহীন স্যার আবদুল হালিম গজনবীকে সমর্থন করলেন কি করে? নির্দ্বিধায় তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, লাইলীকে দেখতে হলে মজনুর চোখ দিয়েই দেখতে হবে।

১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে আমি গফরগাঁও ছাড়াও ঢাকা ও ফরিদপুরের দু'টি নির্বাচনী এলাকায় কাজ করেছিলাম। ঢাকার নির্বাচনী এলাকায় আমাদের প্রার্থী ছিলেন এটিএম মজহারুল হক। তাঁর এলাকায় কাজ করতে গিয়েও আমরা একদিন এক বাজারে বিরোধী পক্ষের আক্রমণের শিকার হয়েছিলাম। তবে এখানে মুসলিম লীগ বিরোধী প্রার্থীর গণভিত্তি শক্তিশালী ছিল না বলে নির্বাচনে লীগ প্রার্থী জনাব মজহারুল হকই বিজয়ী হন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, এই মজহারুল হকের সন্তান জনাব ওয়াহিদুল হক বাংলাদেশ আমলে ইংরেজী ডেইলী পিপল-এ আমার অন্যতম সহকর্মী ছিলেন।

ফরিদপুরে আমি কাজ করেছিলাম তদানীন্তন মাদারীপুর মহকুমার শিবচর থানা এলাকায়। এখানে আমাদের প্রার্থী ছিলেন ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া)। তাঁর নিজের সীট ছিল ফরিদপুর সদর। সেখানে নমিনেশন দেয়া হয়েছিল গোয়ালন্দ মহকুমার পাংশা থানার খান বাহাদুর ইউসুফ হোসেন চৌধুরীকে। ফরিদপুর সদরে লীগের ভাল কাজ ছিল বিধায় ইউসুফ হোসেন চৌধুরী নির্বাচনে অনায়াসে বিজয়ী হন। গোয়ালন্দ মহকুমায় লীগ প্রার্থী আহমদ আলী মৃধা বিজয়ী হন। এ ছাড়া ফরিদপুর জেলার অন্য সকল মুসলিম আসনেই মুসলিম লীগ প্রার্থীরা বিজয়ী হন। নিজের এলাকার বাইরে শিবচরে ইউসুফ আলী চৌধুরীর প্রার্থী হওয়াটা ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। তবুও যে, তাঁকে সেখানে নমিনেশন দেয়া হয় তার পেছনে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব দায়ী ছিল বলে অনেকের ধারণা। প্রাদেশিক লীগে তখন নেতৃত্বে ছিলেন সোহরাওয়ার্দী-হাশিম গ্রুপ। ইউসুফ আলী চৌধুরী ছিলেন

www.pathagar.com

নাজিমুদ্দিন গ্রুপের সমর্থক। যতদূর মনে পড়ে, লুৎফর রহমান নামক একজন সিনিয়র লীগ কর্মীর নেতৃত্বে আমরা ঢাকা থেকে শিবচর গিয়েছিলাম। এই নির্বাচনী প্রচারকার্যে ইউসুফ আলী চৌধুরীসহ আড়িয়াল খাঁ নদী পার হওয়ার সময় আমাদের নৌকা ডুবিয়ে দেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা চালানো হয়। শিবচরে একটা জনসভার কথা বেশ মনে পড়ে। সভায় ফারায়েজী আন্দোলনখ্যাত হাজী শরীয়তুল্লাহর অধস্তন পুরুষ পীর বাদশা মিয়া ছিলেন প্রধান বক্তা। তিনি তাঁর আবেগময়ী বক্তৃতায় ভোটের মাধ্যমে জনগণকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য এগিয়ে আসতে উদাত্ত আহবান জানান। ফারায়েজী আন্দোলনের প্রবর্তক হাজী শরীয়তুল্লাহ বৃটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষকে দারুল হরব ঘোষণা করে এদেশে ঈদ ও জুমা'র নামাজ পড়তেন না। পীর বাদশা মিয়া তাঁর বক্তৃতায় সে প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বললেন, "আমি সেই দিনের অপেক্ষায় আছি, যখন বেদীন নাসারা ইংরেজ শাসনের অবসান হয়ে ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবে এবং পুনরায় ঈদ ও জুমা'র নামাজ আদায় করতে পারব।"

শিবচরের এ সীটে মুসলিম লীগের অফিসিয়াল প্রার্থী পরাজিত হলেও যিনি জয়ী হন, সেই চৌধুরী শামসুদ্দিন আহমেদ ওরফে বাদশা মিয়াও ছিলেন মুসলিম লীগেরই সোহরাওয়ার্দী-হাশিম গ্রুপের লোক। তিনি নির্বাচনের পরপরই লীগ পার্লামেন্টারী দলে যোগ দেন এবং পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেন।

আমরা যারা বৃহত্তর ফরিদপুরের লোক ছিলাম শুধু তাদেরই নয়, ঢাকাসহ সমগ্র পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে তদানীন্তন প্রাদেশিক রাজধানী কলিকাতার যোগাযোগের প্রধান অবলম্বনই ছিল নারায়ণগঞ্জ-চাঁদপুর-গোয়ালন্দ নদীপথ। এই নদী পথে বিরাট বিরাট স্টীমার চলাচল করত। গোয়ালন্দ থেকে শুধু চাঁদপুর-নারায়ণগঞ্জই নয়, পদ্মা-গঙ্গা হয়ে বিহারের পাটনা পর্যন্ত এবং যমুনা-ব্রহ্মপুত্র হয়ে আসামের গৌহাটি পর্যন্ত স্টীমার যাতায়াত করত। এই সুবাদেই গোটা প্রদেশের যোগাযোগ ক্ষেত্রে গোয়ালন্দ এক অনন্য স্থান দখল করেছিল। গোয়ালন্দে প্রদেশের দু'টি প্রধান নদী পদ্মা ও যমুনার স্রোতধারা মিলিত হবার ফলে প্রতিবছর এবং কোন বছরে একাধিকবার প্রবল ভাঙ্গনের কবলে পড়ত গোয়ালন্দ ঘাট। ফলে ঘাট এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় স্থানান্তরিত হওয়া ছিল নিয়মিত ঘটনা। আমার নিজের জীবনে গোয়ালন্দ ঘাট যে কতবার পরিবর্তিত হতে দেখেছি তার শুমার করা সম্ভব নয়। কখনও রাজবাড়ী থেকে ৮, ১০, ১২ মাইল দূরে আবার কখনও রাজবাড়ী থেকে মাত্র ২/৩ মাইলের মধ্যে গোয়ালন্দ ঘাটের অবস্থান দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে।

গোয়ালন্দ ঘাটের এই সদা পরিবর্তনশীলতার কারণে গোয়ালন্দ ঘাটে কখনও পাকা দালান নির্মাণ সম্ভব হয়নি। এর পার্শ্ববর্তী এলাকার উন্নয়নের কোন ব্যবস্থাও

www.pathagar.com

কখনও হয়নি। বর্তমানে যেটি রাজবাড়ী জেলা, এই সেদিন পর্যন্ত সেটি ছিল গোয়ালন্দ মহকুমা। কিন্তু পদ্মার ভাঙ্গনের কারণে গোয়ালন্দ মহকুমার সদর সবসময়ই ছিল রাজবাড়ীতে। এতসব সত্ত্বেও একদা এই গোয়ালন্দের একটা আভিজাত্যও ছিল। এককালে ফরিদপুর জেলা তিনটি বস্তুর জন্য বিখ্যাত ছিল। ছড়া কেটে বলা হত ঃ ইলিশ, তরমুজ, খেজুর গুড়– তিনে মিলে ফরিদপুর। এই তিনটির প্রথম দু'টির জন্যই খ্যাতি ছিল গোয়ালন্দের। গোয়ালন্দের বিস্তীর্ণ চরাঞ্চলে বিশাল আকৃতির সুস্বাদু তরমুজ জন্মাত তখন। আর গোয়ালন্দের কাছে পদ্মার ইলিশ মাছের যে খ্যাতি তার রেশ তো এখনও সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যায়নি। যমুনা বা মেঘনার ইলিশকেও গোয়ালন্দের তথা পদ্মার ইলিশ প্রমাণিত করার জন্য মৎস্য বিক্রেতাদের প্রচেষ্টা এখনও থাকে লক্ষণীয়।

কিন্তু সেকালের গোয়ালন্দের এ খ্যাতির পাশাপাশি তার কুখ্যাতিও একেবারে কম ছিল না। এ ব্যাপারেও ছড়া কেটেই বলা হত ঃ যার হয় কপাল মন্দ, সে-ই যায় গোয়ালন্দ। এই কুখ্যাতির একটি কারণ না-কি ছিল গোয়ালন্দের হোটেল। বিহার ও আসাম থেকে আসা স্টীমারের কথা বাদ দিলেও ঢাকা-কলিকাতা বা চট্টগ্রাম-কলিকাতার মধ্যে যাতায়াতের ক্ষেত্রে গোয়ালন্দ ছিল একটি অপরিহার্য স্টেশন। তখন সড়ক যোগাযোগ গড়ে ওঠেনি বললেই চলে। প্রতিদিন রেলে-স্টীমারে যে হাজার হাজার যাত্রী এখানে আসত, তাদের দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হত স্টীমার বা ট্রেনযোগে পরবর্তী গন্তব্যস্থলে রওনা হওয়ার জন্য। ফলে যাত্রীদের হোটেলে খাওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকত না। তখন হোটেলে খাওয়া ছিল পেট চুক্তি। অর্থাৎ তরকারি একটি বাটিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ দেয়া হলেও একাধিকবার সুরুয়া নেয়া যেত এবং ডালের পরিমাণ নির্দিষ্ট ছিল না। আর ভাত? যার পেটে যতটা ধরে তাই খেতে পারত। যাত্রীদের সব সময় উৎকণ্ঠা থাকত খাবার কারণে তারা ট্রেন বা স্টীমার মিস করে কি-না। এই উৎকণ্ঠার সুযোগ নিয়ে অনেক হোটেলঅলাই মিছামিছি গাড়ী বা স্টীমার কুক দিয়েছে অর্থাৎ ছেড়ে যাবার উপক্রম হয়েছে– এরকম ভয় দেখাত। ফলে অভিজ্ঞ যাত্রী ছাড়া অন্যরা ভয়ে তাড়াতাড়ি খানা শেষ করে টাকা-পয়সা বুঝে দিয়ে পড়ি-মরি করে দৌড় দিত ট্রেন বা স্টীমারের উদ্দেশ্যে। গোয়ালন্দ ঘাটের আরেকটি দুর্নাম ছিল, সেখানকার কুলিদের দুর্ব্যবহারকে কেন্দ্র করে। কুলিরা গোয়ালন্দে স্টীমার বা ট্রেন এসে থামার সাথে সাথে হুড়মুড় করে ছুটে গিয়ে একেক প্যাসেঞ্জারের মালের সামনে গিয়ে একেকজন দাঁড়াত। দরাদরিতে না বনলেও স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র যেত না। কুলিদের মধ্যে কড়া ঐক্য থাকার কারণে এক কুলি যে মালের সামনে দাঁড়াত, সেখানে অন্য কোন কুলি যেত না। ফলে অনেক সময়ই প্যাসেঞ্জার কুলিকে বাধ্য হয়ে অতিরিক্ত ভাড়া দিত।

www.pathagar.com

গোয়ালন্দ ঘাটের কুলি সমাচার

কুলিদের জন্য রেট নির্দিষ্ট করা ছিল, কিন্তু নির্দিষ্ট হারে তারা খুব কম ক্ষেত্রেই ভাড়া গ্রহণ করত। যুক্তি দেখাত সংশ্লিষ্ট মাল অনেক বেশী ভারী। অন্যদের মত আমিও বহুবার এভাবে তাদের বাড়াবাড়ির শিকার হয়েছি। একবার অবশ্য কুলীদের কিছুটা উচিত শিক্ষা দিয়েছিলাম আমি।

সামার ভ্যাকেশন বা কোন বড় ছুটি উপলক্ষে ঢাকা থেকে বাড়ী যাচ্ছি। আমার সাথে ছিল একটি ট্রাংক। ট্রাংকে অল্প কিছু বই ও কাপড়চোপড় ছাড়া বেশী কিছু ছিল না। কিন্তু ট্রাংক হালকা হলে কি হবে, ট্রাংক তো আর কোন প্যাসেঞ্জার নিজে বহন করে না, সাধারণত আমিও করি না। অনেকে সুটকেস বা ব্যাগও কুলীর মাথায় চাপিয়ে স্টীমার থেকে নামে। আমি অবশ্য সুটকেস বা ব্যাগ থাকলে সাধারণত, কুলী নিতাম না। কিন্তু ট্রাংকের ক্ষেত্রে অন্যান্যের মত আমিও কুলীর সাহায্যই নিতাম।

গোয়ালন্দ ঘাটে স্টীমার ভালভাবে ভিড়ার আগেই কুলীদের লম্ফঝম্ফ, দাপাদাপি, দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়ে গেল। আমার ট্রাংকের সামনেও এক কুলী এসে অবস্থান গ্রহণ করল এবং রেটের চাইতে অনেক বেশী ভাড়া হেঁকে বসল। আমি বললাম, আমার ট্রাংকে বেশী কিছু নেই, অত ভাড়া আমি দেব না। কিন্তু কে শোনে কার কথা? যে সব কুলী তখনও কোন 'মোট' পায়নি, তাদের কাউকে ডাকতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমার ট্রাংকের সামনে দাঁড়ান কুলিটির চোখের দিকে তাকিয়ে তারাও কেউ আর এদিকে এগোতে সাহস করল না। আমি তাদের সতর্ক করে দিয়ে বললাম, আমি তোমাদের এক মিনিট সময় দিলাম, এর মধ্যে নির্দিষ্ট রেটে 'মোট' নিতে রাজি না হলে ট্রাংক আমি নিজে বহন করব। তোমাদের কাউকে দেব না। এ সতর্ক বাণী তারা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে উড়িয়ে দিল। কারণ, কোন ভদ্রলোক কখনও ট্রাংক বহন করতে পারে না, তা তারা জানে। এক মিনিট, দু'মিনিট প্রায় পাঁচ মিনিট চলে গেল। কুলী গ্যাট হয়েই দাঁড়িয়ে থাকল আমার ট্রাংকের সামনে। এরপর ভিড় কিছু কমে আসলে আমি যখন নিজে ট্রাংক মাথায় তুলে রওনা দিলাম, তখন কুলী নির্দিষ্ট রেটে 'মোট' বহনের অনুমতি প্রার্থনা করল, এরপরও আমি যখন তাকে দিলাম না, সে আরও কমে ট্রাংক নিতে বারবার অনুরোধ জানাতে লাগল। কিন্তু আমি আমার সংকল্পে অটল। ছোটকালে মাঠ থেকে ধানের বোঝা মাথায় টানা বা পাটের বোঝা মাথায় নিয়ে হাটে যাওয়া যার নিয়মিত অভ্যাস ছিল, সেই কৃষক সন্তান যেন আমার মধ্যে জাগ্রত হয়ে উঠেছিল। আমি অনায়াসে ভদ্রতার সকল মেকী খোলস ছিঁড়ে ফেলে ট্রাংক মাথায় নিয়ে স্টীমার ঘাটের অদূরে অপেক্ষমাণ ট্রেনে উঠে পড়লাম।

www.pathagar.com

বাল্যকালে বইয়ে পড়েছিলাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্তৃক ট্রেনের এক তথাকথিত ভদ্রলোক প্যাসেঞ্জারের 'মোট' বহনের গল্প। তারও আগে ছোটকালে আব্বা-আম্মার কাছে জেনেছিলাম, আমাদের প্রিয় নবীজীর (সাঃ) জীবনে শ্রমের মর্যাদা দানের অনন্য সব ঘটনাবলী। যে নবীজী তাঁর জীবনে জুতা সেলাই থেকে শুরু করে মেষ পালন, মাটি কাটা, খেজুর বাগানে পানি সিঞ্চন, এমনকি অপরের মলমূত্র পরিষ্কার করা পর্যন্ত কোন কাজেই কখনও লজ্জাবোধ করেননি, তাঁর উম্মত হয়ে আমরা দৈহিক শ্রমকে যে হেয় চক্ষে দেখি, সে ব্যাপারে আমার ক্ষোভ ছিল আবাল্য। যখনই সুযোগ পেয়েছি, জীবনে এ ক্ষোভের প্রশমন ঘটিয়েছি কোন দৈহিক শ্রমমূলক সামাজিক কাজে সক্রিয় অংশ নিয়ে।

এই একই মনোভাবের বশবর্তী হয়ে ষাটের দশকে আমি যোগ দিয়েছিলাম ওয়ার্ক ক্যাম্প মুভমেন্ট তথা কর্মশিবির আন্দোলনে। বাংলাদেশে এই কর্মশিবির আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ছিলেন শাজাহানপুর নিবাসী মরহুম লেঃ (অবঃ) আবদুল গফুর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকল্যাণে এমএ অধ্যয়ন কালে আজকের গাজীপুর জেলার সালনায় তিন মাইল দীর্ঘ রাস্তা নির্মাণ, চট্টগ্রামে ইউথ অয়েলফেয়ার অফিসার থাকাকালে ইকবাল পার্ক ও আজিমনগর হাই স্কুলের খেলার মাঠ সংস্কার এবং ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজে সমাজকল্যাণে অধ্যাপনাকালে মধুখালি হাই স্কুলের খেলার মাঠ তৈরী ও রাজেন্দ্র কলেজ ক্যাম্পাসের অন্তর্গত পুকুর থেকে কচুরিপানা পরিষ্কারকরণ উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন কর্ম শিবিরে অংশগ্রহণের স্মৃতি আমার জীবনে আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে।

প্রফেসর মনসুর উদ্দিন

গোয়ালন্দ, চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জের নদীপথে স্টীমারে যাতায়াতকালেই একবার আমার অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ ঘটে 'হারামনি'খ্যাত বিশিষ্ট লোক বিজ্ঞানী প্রফেসর মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন সাহেবের সঙ্গে। প্রফেসর মনসুর উদ্দিন সাহেবের গ্রামের বাড়ী পাবনা জেলার সুজানগর থানার অন্তর্গত নাজিরগঞ্জ ও সাগরকান্দির মাঝামাঝি একটি গ্রামে। যতদূর মনে পড়ে গ্রামের নাম মুরারিপুর। যখন ছোটকালে তালিমনগর মাদ্রাসায় পড়তাম, মাঝে মাঝে তার বাড়ীর সামনের রাস্তা দিয়ে যাতায়াতকালে তার বাড়ীর সামনে গাছের ছায়ায় বাঁশের বাখারির তৈরী বেঞ্চে বসে বিশ্রাম করেছি। তালিমনগর মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মওলানা রইসউদ্দিন ছিলেন তার বিশেষ বন্ধু।

প্রফেসর মনসুর উদ্দিনের বাড়ীর পাশ দিয়ে যাতায়াত করলেও তালিমনগর মাদ্রাসায় অধ্যয়নকালে আমি তাকে চিনতাম না। তার সাথে কবে প্রথম দেখা হয় এবং কিভাবে, তা আমি বলতে পারব না। তবে গোয়ালন্দ-চাঁদপুর-নারায়ণগঞ্জ

www.pathagar.com

স্টীমারে যাতায়াতকালে যে তাঁর সাথে একাধিকবার দেখা হয় তা বেশ মনে পড়ে। অন্যান্য সময়ের মত সেবারও আমি স্টীমারের দোতলার ডেকে শয্যা পেতেছি। পেশাব-পায়খানা বা কি উপলক্ষে যেন নীচতলায় নেমে ইঞ্জিনের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ নজর পড়ল সংক্ষিপ্ত বিছানায় উপবিষ্ট প্রফেসর মনসুর উদ্দিনের ওপর। একটু অবাক হলাম। তার মত একজন নামকরা ব্যক্তি মধ্যম শ্রেণী (ইন্টার ক্লাস) বা দ্বিতীয় শ্রেণীতে তো নয়ই, তৃতীয় শ্রেণীরও দোতলার ডেকে না গিয়ে নীচতলায় বিছানা পাতার কারণ সত্যই আমার কাছে দুর্বোধ্য লাগছিল। তিনি আমার বিস্ময়ভাব টের পেয়েই হয়ত ব্যাখ্যা দেয়া শুরু করলেন। তিনি যা বললেন, তার সারমর্ম এই যে, নীচে থাকলে ঘাটে স্টীমার লাগার সাথে সাথে ত্বরিত নেমে যাওয়ার সুবিধা হয়। তাছাড়া তৃতীয় শ্রেণীর প্যাসেঞ্জারের খাবার পানির কল, পায়খানা সবই নীচে। কিন্তু এরপর সবশেষে তিনি নীচে আসন নেয়ার (আসলে, বিছানা পাতার) যে কারণ বললেন, আমার কাছে সেটাই সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ মনে হল।

স্টীমারের খালাসিরা নীচে থাকে। ওদের রান্নাবাড়ার ব্যবস্থা আছে। ওদের কাছে একটা পাতিলে খিচুড়ির জন্য ডাল, চাল, মরিচ, পিঁয়াজ, লবণ মিশিয়ে দিলে কয়েক মিনিটের মধ্যে ওরা ওটা সিদ্ধ করে দিতে পারে। এ জন্য ওদেরকে চার-পাঁচ আনা পয়সা দিলেই এভাবে গরম খানা খাওয়া সম্ভব। আমি সাধারণত বাড়ীর থেকে আনা চিড়া-মুড়ি বা স্টীমারের চায়ের দোকান থেকে কেনা রুটি-বিস্কুট খেয়ে অর্ধভুক্ত অবস্থায় স্টীমারে নদী পথে চলাফেরা করতাম। কচিত কখনও বেশী টাকা খরচ করে স্টীমারের হোটেলে ভাত খেতাম। প্রফেসর মনসুর উদ্দিন সাহেব হোটেলে অগ্নিমূল্যে খাওয়া অথবা বিস্কুট, চিড়া-মুড়ি খেয়ে ক্ষুধায় কষ্ট পাবার তুলনায় তাঁর ব্যবস্থা যে অনেক ভাল তা শুধু মুখেই বললেন না, আমাকে তাদের সাথে আহারে অংশগ্রহণ করিয়ে বাস্তবেও বুঝিয়ে দিলেন। প্রফেসর সাহেবের সাথে ফড়িং নামের ছেলেসহ তার দু'ছেলে ছিল। আমরা চারজন আসুদা করে গরম খিচুড়ি খেয়েও ভিক্ষুকদের দান করার মত কিছু খিচুড়ি পাতিলে রয়েই গেল।

প্রফেসর মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন আজীবন শুধু গ্রাম বাংলার লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য চর্চাই করেননি, গ্রাম্য জীবনের সরলতা তার জীবনের অস্থিমজ্জায় মিশে গিয়েছিল। কি কারণে জানি না তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। আমি তার ছেলের বয়সী হওয়া সত্ত্বেও তিনি আমাকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করতেন। পাকিস্তান আমলে আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স পরীক্ষা বাদ দিয়ে তমদ্দুন মজলিশের ভাষা আন্দোলনসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সার্বক্ষণিক কর্মী হিসেবে আত্মনিয়োগ করেছি, সে সময় একদিন তিনি আমাদের গ্রামের বাড়ীতে গিয়ে হাজির। হঠাৎ তিনি এভাবে আমাদের বাড়ী এসে হাজির হবেন, তা ছিল আমার

www.pathagar.com

কল্পনারও বাইরে। আমাদের বাড়ীতে গোসল, খাওয়া-দাওয়া ও বিশ্রাম শেষে তিনি আব্বার সাথে একান্তে কথা বলে চলে যান। তিনি চলে যাবার পর শুনেছিলাম, তিনি তার কোন নিকটাত্মীয়ার সাথে আমার বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলেন। আব্বারও এ প্রস্তাবে সায় ছিল। কিন্তু আমি তখন ডিগ্রী না নিয়ে, চাকরি না করে এবং বিয়ে না করে সমাজসেবায় জীবন উৎসর্গ করার সংকল্পে 'অটল' ছিলাম বলে এসব প্রয়াস ভন্ডুল হয়ে যায়।

বিজ্ঞান গবেষক আকবর আলী

সম্ভবত ১৯৪৬ সালের কথা। প্যারাডাইস হোস্টেলে আছি। হঠাৎ একদিন প্রফেসর মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন একজন ভদ্রলোককে নিয়ে আমার হোস্টেলে হাজির। ভদ্রলোকের হাতে বিশাল সাইজের একখানি প্রাচীন আরবী গ্রন্থ। গ্রন্থখানি মধ্যযুগের জনৈক আরব বৈজ্ঞানিকের রচিত। আমি ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসের ছাত্র। এই প্রাচীন আরবী গ্রন্থের পাঠোদ্ধারে হয়ত সহায়তা করতে পারব– এই বিশ্বাসেই প্রফেসর সাহেব ভদ্রলোককে সাথে নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু অচিরে তাঁর বিশ্বাস অমূলক প্রমাণিত হল। যদিও তখন আমরা বিশেষত প্যারাডাইস হোস্টেলের ছাত্ররা আরবী ভাষায় লেখা ও কথা বলা যথেষ্ট রপ্ত করেছিলাম, কিন্তু আমাদের আরবী জ্ঞান সীমাবদ্ধ ছিল প্রধানত কোরআন, হাদীস, ফিকা, উসূল এবং ভাসাভাসা আরবী সাহিত্য চর্চার মধ্যে। বিজ্ঞান সম্পর্কিত আরবী গ্রন্থ আমাদের কাছে ছিল ল্যাটিন বা সংস্কৃতের মতোই দুর্বোধ্য।

প্রফেসর সাহেবের মিশন ব্যর্থ হলেও এই সুবাদেই আমি পরিচিত হয়েছিলাম এমন এক ব্যক্তির সাথে, যাঁর কথা ছোটকাল থেকে আব্বার মুখে বহুবার শুনে এসেছি। মনসুর উদ্দিন সাহেবই পরিচয় করে দিয়েছিলেন তার সেদিনের সাথী বিশিষ্ট বিজ্ঞান গবেষক এম আকবর আলীর সাথে।

পদ্মা নদীর দক্ষিণ তীরে তদানীন্তন গোয়ালন্দ মহকুমার পাংশা ও রাজবাড়ী থানা। উত্তরে পাবনা সদর মহকুমার সুজানগর থানা। এই সুজানগর থানার সাতবাড়িয়ার কাছে একটি গ্রামে বিজ্ঞান গবেষক এম আকবর আলীর জন্ম। বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে যখন কোন গ্রামে একজন ম্যাট্রিক পাস লোক পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার বিবেচিত হত, সে সময় এক বাড়ীতে তিন ভাইয়েরই এমএ পাস করার নামডাক ছড়িয়ে পড়েছিল আমাদের এলাকায়ও। গ্রামের লোকদের কাছে এম এ-এমএসসি'র পার্থক্য স্পষ্ট ছিল না। আসলে আকবর আলী সাহেবরা তিন ভাইয়ের মাত্র একজন ছিলেন এমএ, আকবর আলীসহ বাকী দু'ভাই ছিলেন এমএসসি। এম আকবর আলী ছিলেন মেজো ভাই। বড় ভাই এম আবিদ আলী ছিলেন এমএবিটি। যতদূর সম্ভব তিনি আরবীতে এমএ ডিগ্রী লাভ করেন। ইসলাম

www.pathagar.com

সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থের লেখক আবিদ আলী শিক্ষা বিভাগে সরকারী চাকরি করতেন। সর্বশেষ তিনি কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে চেয়ারম্যান অথবা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পদ থেকে রিটায়ার করেন। এম আকবর আলীর ছোট ভাই প্রফেসর এম আবদুল জব্বার ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ও প্রফেসর হিসেবে কাজ করা ছাড়াও জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে একাধিক গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন। বড় ও ছোট উভয় ভাইই বর্তমানে পরলোকগত।

বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান নিয়ে আজীবন গবেষণা চালিয়েছেন এম আকবর আলী এমএসসি। তাঁর সারা জীবনের এ সাধনারই ফসল হিসেবে জাতি উপহার পেয়েছে 'বিজ্ঞানে মুসলমানের দান' শীর্ষক বার-তের খণ্ডের বিশাল গ্রন্থ সিরিজ। এম আকবর আলীও সারা জীবন চাকরি করেছেন। তবে সরকারী শিক্ষা বিভাগ, কোন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়। তিনি চাকরি করেছেন ইনকাম ট্যাক্স বিভাগে, যার সাথে বিজ্ঞান গবেষণার কোন সম্পর্কই ছিল না। কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ে সাধনা করতে চাইলে তার পেশাগত দায়িত্ব যে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না, তার এক বড় উদাহরণ এম আকবর আলী।

মুসলমানরা এককালে বিজ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে জগতে নেতৃত্ব দিয়েছে এ বক্তৃতা আমরা অনেকেই দিয়ে থাকি, কিন্তু এম আকবর আলী সেই মধ্যযুগের আরবীতে রচিত মুসলমান বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞান গ্রন্থসমূহ ঘেঁটে ঘেঁটে বাংলা ভাষায় হাজার হাজার পৃষ্ঠার গ্রন্থের মারফত সেগুলো পরিবেশন করে বাংলা ভাষাকে যেভাবে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন, তার তুলনা হয় না। বাংলা ভাষায় মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদান সর্বস্তরে তুলে ধরার ক্ষেত্রে এম আকবর আলী যে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন তার অনুরূপ কাজ মুসলিম বিশ্বের আর কোন দেশে অন্য কোন ভাষায় কেউ করেছেন কি-না সে বিষয়ে আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে। জাতির এমন একজন নীরব সাধককে আমরা যথাযথ মর্যাদা দিয়েছি বলে আমরা দাবী করতে পারি না। নতুন প্রজন্মের কাছেও তিনি অদ্যাবধি রয়ে গেছেন প্রায় অজানা একটি নাম।

কলিকাতার 'মাসিক মোহাম্মদী'তে প্রায়ই তখন প্রকাশিত হত এম আকবর আলীর রচিত বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থের নাম। এসব বই পড়েই আমরা সেদিন পরিচিত হয়েছিলাম বিভিন্ন মুসলিম বিজ্ঞানীদের নামের সাথে। 'মাসিক মোহাম্মদী'তে তখন নিয়মিত প্রকাশিত হত বিভিন্ন বিষয়ে মুসলিম লেখক ও সাহিত্যিকদের রচিত বিভিন্ন বইয়ের বিজ্ঞাপন। এই সুবাদেই জানতে পেরেছিলাম 'ইতিকথা বুক ডিপো' নামক প্রকাশনা সংস্থার পক্ষ থেকে প্রকাশিত ডক্টর এম আবদুল কাদের, কাজী আকরাম হোসেন প্রমুখ লেখকের রচিত ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থাদির নাম। বিশেষ করে এম আবদুল কাদেরের রচিত গ্রন্থসমূহের মাধ্যমেই

www.pathagar.com

বিভিন্ন দেশে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস, ইসলামের প্রচার এবং মুসলিম বিরোধী ক্রুসেডের ইতিহাসের সাথে আমরা পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করি।

মোটের ওপর দৈনিক আজাদ, সাপ্তাহিক মোহাম্মদী, সাপ্তাহিক মিল্লাত প্রভৃতি পত্রিকার ঈদ সংখ্যা এবং মাসিক মোহাম্মদী, মাসিক সওগাত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত বইয়ের বিজ্ঞাপন দেখলেই স্পষ্ট হয়ে উঠত দেশের মুসলমান কবি-সাহিত্যিক-গবেষকরা তখন নবজাগরণের সৃষ্টিযজ্ঞে কিভাবে মেতে উঠেছেন। কলিকাতা থেকে আগত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাদি পড়ে উৎসাহ উদ্দীপনার জোয়ারে আমরা পাকিস্তান আন্দোলনের তরুণেরা যখন ভেসে চলছিলাম, ঠিক সে সময়েই আমার হাতে অনেকটা নাটকীয়ভাবে এসে পড়ল আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একখানি কাব্যগ্রন্থ।

একখানি সাড়া জাগানো কাব্যগ্রন্থ

বাড়ী থেকে ঢাকা ফিরছিলাম। গোয়ালন্দ ঘাটে যখন ট্রেন এসে থামল, তখন রাত দশটার মত হবে। যথারীতি স্টীমারের ডেকে শয্যা পাতার পর চেনাজানা লোকের সন্ধানে কিছুক্ষণ পায়চারী করতেই দেখা হয়ে গেল কলেজে আমার এক ক্লাস উপরে পাঠরত মেধাবী ছাত্র মুহম্মদ আবুবকরের সাথে। তিনি বিছানা পেতেছেন ডেকে আমার অদূরে। আশ্বস্ত হলাম কথা বলার জন্য একজন সাথী পেয়ে। তিনি দাওয়াত দিয়ে গেলেন কিছুক্ষণ পর আমাকে নীচে নিয়ে যাবেন কী একটা সুন্দর জিনিস দেখাতে। খাওয়া-দাওয়া ও আনুষঙ্গিক কাজ সেরে আধা ঘন্টার মধ্যে আববুকর এলেন আমাকে নীচে নিয়ে যেতে।

হেমন্তের জ্যোৎস্নাস্নাত রাত। মৃদু মৃদু শীত পড়েছে। উভয়ের গায়েই চাদর। বর্ষার পানি নেমে যাওয়ায় গোয়ালন্দ ঘাটের এখানে সেখানে অল্প-স্বল্প পানি। কোথাও কোথাও অল্প পানিতে পুরাতন অর্ধভগ্ন পরিত্যক্ত নৌকা। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে বিজলী বাতি মাথায় কাঠের খুঁটির সারি। উপরে বিজলী বাতি জ্বলছে, নীচে একটি পরিত্যক্ত নৌকায় আমাকে নিয়ে উঠে গলুইয়ে গিয়ে আবুবকর বসলেন, তার পর সাত রাজার মানিকের মতই নাটকীয়ভাবে তাঁর চাদরের ভেতর থেকে বের করে আমার হাতে তুলে দিলেন একখানি বই। তুলোট কাগজের মলাটে জ্বল জ্বল করছে নাম ঃ 'সাত সাগরের মাঝি'। ফররুখ আহমদ রচিত যে কাব্যের বিজ্ঞাপন দেখেছি এতদিন পত্র-পত্রিকায় তা এভাবে আমার হাতে এসে পড়বে- এ ছিল আমার কল্পনাতীত।

আমার বিস্ময়ভাব কেটে উঠতে না উঠতেই আবুবকর হাত থেকে বইখানি ফেরত নিলেন। তারপর...।

অদূরে পদ্মা-যমুনার মিলিত বিশাল স্রোতরাশি কলকল শব্দে বয়ে চলেছে।

www.pathagar.com

সামনে আবুবকর তার ভরাট গলায় আবৃত্তি করে চলেছেন 'সাত সাগরের মাঝি'র একটার পর একটা কবিতা। আমি শুধু মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে আছি আবুবকরের আবৃত্তিরত মুখের দিকে। যে রেনেসাঁর জোয়ার সেদিন ভাসিয়ে নিয়ে চলেছিল মুসলিম বাংলার সমগ্র সত্তাকে, তাই যেন বাণীবদ্ধ রূপ লাভ করেছে 'সাত সাগরের মাঝি'র প্রতিটি কবিতার ছত্রে ছত্রে। ফররুখ আহমদের অনেক কবিতা বিচ্ছিন্নভাবে আগেও পড়বার সুযোগ হয়েছে মাসিক মোহাম্মদী ও সওগাতে এবং বিভিন্ন পত্রিকার ঈদ সংখ্যায়। কিন্তু সেদিন হেমন্তের জ্যোৎস্নালোকিত রাতে গোয়ালন্দ ঘাটের বিশেষ আবহে আবুবকরের দরাজকণ্ঠে ফররুখের কবিতা আবৃত্তি শোনার যে স্মৃতি তা যেন কখনোই মুছে যাবার নয়।

'তরুণ মুসলিমের ভূমিকা'

এমনি আরেক লেখকের একটি রচনাও সে সময় আমার মনে অসম্ভব প্রেরণা যুগিয়েছিল। কথাশিল্পী হিসেবেই এতদিন জেনেছি শাহেদ আলীকে। মাসিক সওগাত ও মোহাম্মদীতে অনেক দিন ধরেই পড়ে এসেছি তার গল্প। তার গল্পে পেতাম গ্রাম-বাংলার গণজীবনের সোঁদা মাটির গন্ধ, যা আর কোন গল্প লেখকের গল্পেই অমন করে পাইনি। সেই গল্পকার শাহেদ আলী যে রাজনৈতিক রচনায়ও সিদ্ধহস্ত তা ছিল আমার কল্পনারও বাইরে। রচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল মাসিক মোহাম্মদীতে। শিরোনাম 'তরুণ মুসলিমের ভূমিকা'। পাকিস্তান আন্দোলনকে তিনি একটি গণবিপ্লব বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর একে তুলনা করেছেন অর্কেস্টা বা সমবেত যন্ত্রসঙ্গীতের সঙ্গে। অর্কেস্ট্রায় যেমন অনেক শিল্পীর বিভিন্নমুখী ভূমিকা পালনের প্রয়োজন হয়, তেমনি পাকিস্তান বিপ্লব সফল করে তুলতে তরুণ সমাজের বিভিন্ন অংশকে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করতে হবে বলে জানালেন তিনি। বিশেষ করে বললেন, এ বিশাল বিপ্লবে যেমন রাজনৈতিক কর্মীদের কাজ করতে হবে, তেমনি স্ব স্ব ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হবে ছাত্র ও তরুণদের। গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হবে কবি-সাহিত্যিকদের, এমনকি গ্রাম-বাংলার দিক-দিগন্তরে ছড়িয়ে থাকা গায়ক শিল্পীদের। 'তরুণ মুসলিমের ভূমিকা' যতবারই পড়ি, ততবারই মুগ্ধ হই। নতুন করে অনুপ্রাণিত হই পাকিস্তান আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে।

দ্বিতীয় কলিকাতা সফর

ফররুখ আহমদ, শাহেদ আলী প্রমুখের লেখা পড়ে যতই মুগ্ধ হই, ততই তাদের দেখার একটা উদগ্র বাসনা সৃষ্টি হতে থাকে মনের মধ্যে। ১৯৪৬ সালে দ্বিতীয়বার যখন কলিকাতা যাই, তখন মনের মধ্যে এরকম একটি সুপ্ত বাসনাও পাশাপাশি কাজ করছিল। আমার এ দ্বিতীয় কলিকাতা সফরে সঙ্গী এবং গাইড

www.pathagar.com

ছিলেন পূর্ব কথিত এনামুল হক– যিনি বাংলাদেশ আমলে বাংলাদেশ সম্প্রচার কর্তৃপক্ষের মহাপরিচালক হয়েছিলেন। বলাবাহুল্য প্রথমবারের মত আমার এ দ্বিতীয়বারের কলিকাতা সফরের অভিজ্ঞতাও সুখদায়ক হয়নি।

কলিকাতায় উঠেছিলাম কলুটোলা এলাকার একটা প্রাইভেট মেসে। নিম্ন আয়ের লোকদের মেস। এনামুল হক সাহেবের চেনাজানা লোক একজন থাকতেন ঐ মেসে। সেই সুবাদেই আমাদের সেখানে উঠা। সময়টা ছিল গ্রীষ্মকাল– এপ্রিল বা মে মাস হবে। গরম পড়ছে। কিন্তু সারাদিন রোদে শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে রাতে মেসে এসে যে একটু শান্তিতে ঘুমাবো, তার উপায় ছিল না। ভ্যাপসা গরমে সারারাতই প্রায় ঘামতে হতো, তদুপরি ছিল মশার উপদ্রব। বোঝার উপর শাকের আঁটির মতই এসবের সাথে যুক্ত হয়েছিল ছারপোকার কামড়। মশা বা গরমের সাথে আমার ইতোপূর্বেও পরিচয় ছিল, কিন্তু কলিকাতায় সেই মেসে ছারপোকার যে জ্বালাতন, তা ছিল একেবারেই সহ্যের বাইরে। মশার কামড়ের আগে তবু তো সতর্ক হওয়ার সুযোগ থাকতো মশককুলের ভনভনানির সুবাদে (বর্তমানে অবশ্য মশাও নীরব আক্রমণে অভ্যস্ত), কিন্তু ছারপোকাদের চোরাগোপ্তা আক্রমণে আমি নিতান্তই অসহায়বোধ করতাম।

সেবার দিন পাঁচেকের মত কলিকাতায় ছিলাম। একটা রাতও আমি শান্তিতে ঘুমাতে পারিনি। অথচ মেসের অন্যান্য লোকেরা, এমনকি এনামুল হকও গরম, মশা ও ছারপোকার উপদ্রব সত্ত্বেও ঠিকঠাকই ঘুমাতে পারতেন। মশা ও গরম তাড়াতে অবশ্য হাতপাখার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু তার সংখ্যা এত কম যে, পালা করে সে হাতপাখা ব্যবহার করতে হতো। তাছাড়া হাতপাখা দিয়ে তো আর ছারপোকা তাড়ানো সম্ভবপর ছিল না। কলিকাতায় ছাপোষা গরীব কেরানীদের এসব মেসে শুধু ঘুমের সমস্যাই নয়, গোসলের সমস্যাও ছিল প্রকট। কলে পানি আসতো ভোর রাতে। ফলে কাক-ডাকা ভোরে ঘুম থেকে উঠে তড়িঘড়ি করে পায়খানা-পেশাব সেরে সংক্ষিপ্ত গোসল সেরে নিতে লাইন দিতে হতো আমাদের। রাতে ঘুম না হওয়ায় আমি প্রায়ই সকাল নয়টার দিকে চলে যেতাম নাখোদা মসজিদে। খাদেমদের বলে কয়ে মসজিদের দোতলায় জোহরের নামাজের আজানের আগ পর্যন্ত ঘুমিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করেছিলাম।

কলিকাতায় আমার এ সফরের অভিজ্ঞতা যে পুরোটাই দুঃখজনক হয়েছিল, তা নয়। কলিকাতায় যেয়ে সিনেমা দেখার শখ ছিল বহুদিনের। সে আশা পূরণ করেছিলাম। কী একটা বাংলা ছবি দেখেছিলাম, এখন নাম মনে নেই। তবে দুঃখের বিষয়, সিনেমা দেখতে গিয়েও হলে ভ্যাপসা গরমের ফলে ঘামে নেয়ে উঠতে হয়েছিল। অবশ্য এর ক্ষতিপূরণ হয়ে যায় একদিন নামকরা 'মেট্রো' হলে

www.pathagar.com

সিনেমা দেখে। ঢাকায় তখন পাঁচ-ছয়টা সিনেমা হল থাকলেও কোন এয়ারকন্ডিশনড হল ছিল না। কলিকাতা শহরেও শুধু মেট্রো ও লাইটহাউস ছিল এয়ারকন্ডিশনড। টিকিট করে হলে প্রবেশ করতেই মনে হল– যেন এক ভিন্ন জগতে প্রবেশ করলাম। ভরা গ্রীষ্মকালে শীতের মিষ্টি আমেজে মহানন্দে তিন ঘন্টা একটা ইংরেজী বই দেখলাম। শো শেষে হল থেকে বের হতেই মনে হলো– পুনরায় যেন হাবিয়া দোজখে ফিরে এলাম।

কলিকাতায় গিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা অফিস দেখবো এরকম উদ্দেশ্য আগেই ছিলো। পত্র-পত্রিকা বলতে অবশ্য আজাদ, মোহাম্মদী, সওগাত, মিল্লাত প্রভৃতি যেসব পত্রিকা মুসলিম নবজাগরণের পুরোভাগে ছিল, সেগুলিই ছিল আমাদের লক্ষ্য। সওগাত অফিসে গিয়েছিলাম কি-না মনে নেই, তবে আজাদ ও মিল্লাত অফিসে যে গিয়েছিলাম তা বেশ মনে আছে। কলিকাতার ৮৬/এ, লোয়ার সার্কুলার রোডে আজাদ পত্রিকার অফিস। এটা বছরের পর বছর ধরে পড়তে পড়তে মুখস্ত হয়ে গিয়েছিলো। খুঁজতে খুঁজতে একসময় ঠিকই আজাদ অফিস পেয়ে গেলাম। কি যে আনন্দ লাগলো। এই সেই 'আজাদ' পত্রিকা, যা দীর্ঘদিন ধরে মুসলিম বাংলার আশা-আকাংখা ও স্বপ্নের একটি স্বতন্ত্র জগৎ নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছে।

'আজাদ' অফিসে সেদিন কি একটা আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। আমি, এনামুল হক নীরবে সভার এক প্রান্তে আসন নিলাম। আমরা সময়াভাবে বেশীক্ষণ সেখানে থাকতে পারিনি। যতক্ষণ ছিলাম দেখলাম, এক ব্যক্তি সভায় মুখ্য আলোচকের ভূমিকা পালন করছিলেন। তিনি শুধু নিজে সারগর্ভ আলোচনাই করছিলেন না, 'পাকিস্তান' সম্বন্ধে বিভিন্ন শ্রোতার বিভিন্ন প্রশ্নের চমৎকার জবাবও দিয়ে যাচ্ছিলেন। জনৈক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলাম, তিনিই ছিলেন খ্যাতনামা সাংবাদিক মুজীবর রহমান খাঁ। মুজীবর রহমান খাঁর 'পাকিস্তান' শীর্ষক বিখ্যাত গ্রন্থের সঙ্গে আগেই আমার পরিচয় হয়েছিল। 'পাকিস্তান' গ্রন্থের প্রণেতাকে স্বচক্ষে দেখতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করলাম।

সাপ্তাহিক 'মিল্লাত' অফিস ছিল ৩৭, রিপন স্ট্রীটে। ঘুরতে ঘুরতে সেখানেও গিয়েছিলাম কিছুক্ষণের জন্য। মিল্লাত অফিসে দেখলাম এক ভদ্রলোক বেশ কয়েক ব্যক্তির সঙ্গে গভীর আলোচনায় রত। ভদ্রলোকের গায়ে কালো শেরোয়ানী। মুখে অল্প দাড়ি। অনবরত পান চিবোচ্ছেন আর কথা বলছেন। বড়ো বড়ো দু'টি চোখ থেকে যেন আলোর দীপ্তি ঠিকড়ে বেরোচ্ছে। অফিসের জনৈক কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, ইনিই কবি ফররুখ আহমদ।

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম বাংলার মুসলিম জাগরণের প্রথম সার্থক তূর্যবাদক। কিন্তু যে নজরুলের উদ্দীপনাময়ী কবিতা ও গান মুসলিম বাংলাকে

www.pathagar.com

নবজাগরণের প্রেরণায় উদ্দীপ্ত করে পাকিস্তান আন্দোলনের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিল, পাকিস্তান আন্দোলনের গতিলাভের ঐতিহাসিক মুহূর্তে সেই কবি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে চিরতরে তাঁর বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন। আমাদের সৌভাগ্যই বলতে হবে– আমাদের জাতীয় জাগরণের এ মহান কাণ্ডারী সেদিন বাকরুদ্ধ হলেও তাঁর অগণিত ভক্ত-অনুসারী কবি-সাহিত্যিকদের অনেকেই সেদিন জাতীয় জাগরণে নজরুলের আরদ্ধ দায়িত্ব পালনে নবতর প্রেরণায় এগিয়ে আসেন। প্রবীণ ও নবীন এ সব কবি-সাহিত্যিকরা বাংলা সাহিত্যে মুসলিম জাগরনের ধারাকে নব নব সৃষ্টিতে সমৃদ্ধ করে তোলেন। তবে মুসলিম বাংলার বিপ্লবী নওজোয়ানরা সেদিন যে কবিকে বাংলা কাব্যে মুসলিম জাগরণের একটি নতুনতর স্বতন্ত্র ধারা নির্মাণের কারণে 'দ্বিতীয় নজরুল' বিবেচনা করত তিনি কবি ফররুখ আহমদ।

ফররুখ আহমদের 'সাত সাগরের মাঝি'তে কোথাও পাকিস্তান শব্দের প্রত্যক্ষ উল্লেখ না থাকলেও নবজাগরণের যে জোয়ার সেদিন মুসলিম বাংলাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলছিল তার বলিষ্ঠতম প্রতিফলন ঘটেছিল এ কাব্যগ্রন্থে। পাকিস্তান আন্দোলনকে নিয়ে প্রত্যক্ষভাবেও ফররুখ রচনা করেন অনেক সার্থক কবিতা ও গান। এসব কবিতা ও গানের কয়েকটি প্রকাশিত হয় ফররুখ আহমদের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থে। ফররুখ আহমদের এ গ্রন্থ 'আজাদ করো পাকিস্তান' প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ কিংবা ১৯৪৬ সালে 'মৃত্তিকা গ্রন্থনী বিভাগ, ৮/বি, তারকদত্ত রোড, বালিগঞ্জ, কলিকাতা থেকে। 'মৃত্তিকা গ্রন্থনী বিভাগ' নামক এই ব্যতিক্রমী প্রকাশনা সংস্থার সাথে যুক্ত ছিলেন ঔপন্যাসিক কাজী আফসার উদ্দীন আহমদ, এস এম বজলুল হক, কাজী শামসুল ইসলাম, ছোট গল্পকার মবিনউদ্দিন আহমদ প্রমুখ সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসেবীবৃন্দ।

পাকিস্তান আন্দোলনের উৎসাহী সমর্থক এই তরুণ সংস্কৃতিসেবী গোষ্ঠী 'মৃত্তিকা' নামের একটি ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকাও বের করতেন। ব্যতিক্রমী প্রকাশনা সংস্থার এ সাহিত্য পত্রিকা বিষয়বস্তু নির্বাচনেও ছিল ব্যতিক্রমী। কথা সাহিত্যিকদের কবিতা এবং কবিদের গল্প প্রকাশ করে এই পত্রিকা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এই পত্রিকায় কথাশিল্পী শাহেদ আলী ও শওকত ওসমানের কবিতা এবং কবি ফররুখ আহমদের গল্প পাঠের সৌভাগ্য হয় আমার।

ফররুখ আহমদের 'আজাদ করো পাকিস্তান' শীর্ষক কাব্যগ্রন্থ ছাড়াও ত্রিশের দশকের শেষ ভাগে কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও কবি ইকবালের মধ্যে উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাসমূহে স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে যে ঐতিহাসিক পত্রবিনিময় হয়, তা নিয়ে

www.pathagar.com

'পাকিস্তানের ঐতিহাসিক পটভূমি' নামের একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করে মৃত্তিকা গ্রন্থনী বিভাগ। মৃত্তিকা গ্রন্থনী বিভাগের মূল পরিকল্পক ছিলেন কাজী আফসার উদ্দীন আহমদ। কাজী আফসার উদ্দীন আহমদের 'চর-ভাঙ্গা-চর' নামে একখানি উপন্যাস এ সময়ে দীর্ঘদিন ধরে মাসিক 'মোহাম্মদী'তে প্রকাশিত হয়। মাসিক 'মোহাম্মদী'তে অদ্বৈত মল্ল বর্মণের উপন্যাস 'তিতাস একটি নদীর নাম'ও বহুদিন ধরে সিরিয়ালাইজড হয়। প্রায় একই সময়ে শওকত ওসমানের বিখ্যাত উপন্যাস 'বনি আদম' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় মাসিক 'সওগাত'-এ। শেষোক্ত উপন্যাসে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ মুসলিম সমাজের জীবন সংগ্রামের অনবদ্য চিত্র ফুটে ওঠে। প্রথমোক্ত উপন্যাস দু'টিতে যথাক্রমে পূর্ববাংলার কৃষক ও জেলে জীবনের সার্থক প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যায়।

পাকিস্তান আন্দোলন যতই এগিয়ে যাচ্ছিল ততই আমাদের কবি-সাহিত্যিকদের সৃষ্টিকর্মে আমাদের গণজীবনের চিত্র এবং গণমানুষের আশা-আকাংখার ব্যাপকতর প্রতিফলন ঘটে চলছিল। পাকিস্তান আন্দোলন যে শুধু মুসলমানদের মুক্তিই চায় না, হিন্দু সমাজের অবহেলিত নিম্নবর্ণের মানুষদের মুক্তিও যে পাকিস্তান দাবীর অন্যতম লক্ষ্য, এ ধারণা সবার মধ্যে ক্রমেই দৃঢ় হচ্ছিল। এমনকি বামপন্থীদের অনেকের মধ্যেও এ ধারণা দৃঢ় হয় যে, ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্ণবাদ কন্টকিত অখণ্ড ভারতের চাইতে ইসলামের সাম্য-ভ্রাতৃত্বের আদর্শের প্রভাবে পাকিস্তান রাষ্ট্রেই শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা সহজতর হবে। এমনি একজন বামপন্থী লেখক তালেবুর রহমান। কলিকাতার পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির বিভিন্ন আলোচনা সভায় নিয়মিত যোগদানকারী এই তালেবুর রহমান পাকিস্তান আন্দোলনের উপর দু'খানি গবেষণাধর্মী গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এগুলোর নাম 'পাকিস্তানবাদের ক্রমবিকাশ' ও 'সর্বহারাদের পাকিস্তান'। নাম থেকেই স্পষ্ট যে, লেখক উপমহাদেশের পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জনগণের মুক্তি সংগ্রামের একটি পর্যায়ে নির্যাতিত-নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর মুক্তির স্বার্থেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবুল হাশিম প্রদত্ত ইসলামের বৈপ্লবিক ব্যাখ্যাও তাদের এ ধারণা সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছিল। মুজীবুর রহমান খাঁ ও তালেবুর রহমান ছাড়াও আরও অনেকে সে সময় পাকিস্তান আন্দোলনের উপর পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করেছিলেন। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, মুজীবুর রহমান খাঁ প্রনীত 'পাকিস্তান' গ্রন্থই সে সময় বাংলা ভাষায় পাকিস্তান আন্দোলন সম্পর্কে সবচাইতে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হত। মুজীবুর রহমান খাঁর 'পাকিস্তান' গ্রন্থের পরেই যে গ্রন্থটি বাংলায় সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করে সেটি ছিল হবীবুল্লাহ বাহারের 'পাকিস্তান' গ্রন্থ।

www.pathagar.com

হবীবুল্লাহ বাহার ও শামসুন্নাহার মাহমুদ ছিলেন কবি নজরুল ইসলামের স্নেহধন্য দুই ভাই-বোন এবং নোয়াখালীর বিখ্যাত মুসলিম শিক্ষাবিদ খান বাহাদুর আবদুল আজিজের দৌহিত্র-দৌহিত্রী। শামসুন্নাহার মাহমুদ ছিলেন একাধারে শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক ও সমাজসেবী। তখনকার দিনে বাংলাদেশে মুসলিম নারী জাগরণে বেগম রোকেয়ার পরই তাঁকে স্থান দেয়া হত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মহিলা ছাত্রী হলের নামকরণে রোকেয়া হলের পরই যে শামসুন্নাহারের নামে হল স্থাপিত হয় তার তাৎপর্য এখানে। হবীবুল্লাহ বাহার একাধারে সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ ও খেলোয়াড় ছাড়াও ছিলেন একজন প্রকাশক ও সাংবাদিক। তার প্রতিষ্ঠিত 'বুলবুল পাবলিশিং হাউস' থেকে তাঁর, শামসুন্নাহার মাহমুদের এবং মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী প্রমুখ সাহিত্যিকের বেশ কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এছাড়া তিনি দীর্ঘদিন ধরে 'বুলবুল' নামের একটি উন্নতমানের সাহিত্য পত্রিকাও প্রকাশ করেন। বিভাগ পূর্বকালে 'দৈনিক আজাদ'-এ তিনিই প্রথম 'শেফাউলমুলক' ছদ্মনামে 'হিং ও হালিম' শীর্ষক আরবী-উর্দু-ফার্সী মিশানো বাংলায় একটি সরেস কলাম লিখে আমাদের সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এক নয়া মাত্রা সংযোজন করেন।

হবীবুল্লাহ বাহার পাকিস্তান আন্দোলনকালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রচার সম্পাদক ছিলেন এবং এক পর্যায়ে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন। পাকিস্তান আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে সিলেটে যে গণভোট অনুষ্ঠিত হয় সে গণভোটেও জনাব বাহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

'বুলবুল পাবলিশিং হাউস'-এর মত আরও দু'টি প্রকাশনা সংস্থাও সে সময় মুসলিম সাহিত্যিকদের পুস্তকাদি প্রকাশে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে। একটি ছিল মোহাম্মদী বুক এজেন্সী, অপরটি মখদুমী এন্ড আহসান উল্লাহ লাইব্রেরী। ৮৬/এ, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতায় 'আজাদ' অফিসে অবস্থিত মোহাম্মদী বুক এজেন্সী 'আজাদ' প্রকাশনা গ্রুপের অন্যতম সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবেই পরিচিত ছিল। এই সংস্থার পক্ষ থেকেই প্রকাশিত হয় মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর বিখ্যাত 'মোস্তফা চরিত', 'তাফসীরুল কোরআন', 'সমস্যা ও সমাধান' প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ। এসব গবেষণাধর্মী গ্রন্থ যুক্তিবাদী আধুনিক মুসলিম সমাজে যথেষ্ট উৎসাহ সৃষ্টি করতে সক্ষম হলেও মুসলিম সমাজের ধর্মীয় আকিদার প্রশ্নে সে সময় যথেষ্ট বিতর্কও সৃষ্টি করে। এসব গ্রন্থ ক্লাসিকধর্মী সাহিত্য রচনা হিসেবে বিদগ্ধ মহলে যতটা আদৃত হয়, ততটা বৃহত্তর জনসমাজে ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা লাভ করতে পারেনি। ধর্মীয় তাত্ত্বিক হিসাবে মওলানা আকরম খাঁর গ্রহণযোগ্যতা সীমাবদ্ধ থাকলেও দৈনিক আজাদ এবং সাপ্তাহিক ও মাসিক মোহাম্মদী মারফত

www.pathagar.com

বাংলার মুসলিম জাগরণে ঐতিহাসিক অবদানের জন্য তাকে সর্বমহলে কৃতজ্ঞতার সাথে যুগ যুগ ধরে স্মরণ রাখবে। বাংলাদেশে পাকিস্তান আন্দোলনের ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টির পেছনেও দৈনিক আজাদ-এর বিরাট ভূমিকা অস্বীকার করা আর ইতিহাসকে অস্বীকার করা একই কথা।

মখদুমী এন্ড আহসান উল্লাহ লাইব্রেরী ছিল যতদূর মনে পড়ে মখদুমী লাইব্রেরী ও আহসান উল্লাহ বুক হাউস নামের দু'টি প্রকাশনা সংস্থার মিলিত সত্তার নাম। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও আধ্যাত্মিক সাধক খান বাহাদুর আহসান উল্লাহ এবং বিশিষ্ট সাহিত্যসেবক মোহাম্মদ কাসেম ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা। এই প্রকাশনা সংস্থা থেকে ইসলামের ধর্ম, ঐতিহ্য, ইতিহাস সম্পর্কিত এবং পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত বেশ কতগুলো বই প্রকাশিত হয়। পাকিস্তান কায়েমের আগেই ঢাকা শহরের ইসলামপুর ও মিটফোর্ড রোডের সংযোগস্থল বাবুবাজার পুলের উপর প্রতিষ্ঠিত এই মখদুমী এন্ড আহসান উল্লাহ লাইব্রেরী ছিল সাহিত্যামোদী তরুণদের একটি প্রিয় স্থান। সুসাহিত্যিক মোহাম্মদ কাসেম নিজে বসতেন লাইব্রেরীতে। সুযোগ পেলেই হোস্টেল থেকে এই অমায়িক সাহিত্য সেবীর সান্নিধ্যে নতুন বইয়ের সন্ধান নিতে চলে যেতাম আমি। পাকিস্তান আমলেও বহুদিন এ লাইব্রেরীটি সগৌরবে টিকে ছিল। মোহাম্মদ কাসেমের বাসা ছিল আরমানিটোলা ময়দানের পাশেই। সেখানেও গেছি বহুবার। তাঁর সন্তান ডঃ আবদুল কাইয়ুম সম্প্রতি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন।

কলিকাতা, ঢাকা এবং অন্যান্য শহর থেকে পাকিস্তান আন্দোলনের উপর আরও ছোট বড় অনেক বই-ই তখন বেরিয়েছিল। এসবের মধ্যে ছিল চৌধুরী শামসুর রহমানের 'হোয়াই পাকিস্তান?' নামক ইংরেজী বই, পুস্তিকাকারে প্রকাশিত শহীদ সোহরাওয়ার্দীর একটি বক্তৃতার বাংলা তরজমা (এ মুহূর্তে নাম মনে আসছে না), মোমেনশাহীর নূরুল হোসেন খন্দকার রচিত 'লীগ ও পাকিস্তান', নঈমুদ্দিন আহমদের 'পাকিস্তান ও অখণ্ড হিন্দুস্থান'। শেষোক্ত গ্রন্থের লেখক পাকিস্তান আমলে আওয়ামী লীগের সহযোগী প্রতিষ্ঠান পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাতা কনভেনর ছিলেন। যতদূর মনে পড়ে ১৯৪৬ সালের এ সময়েই আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক জনাব শামসুল হক 'ইসলাম দ্য অনলি সলুশন' নামের একখানি ইংরেজী বই লেখেন।

সিলেট তখন আসাম প্রদেশের অন্তর্গত। আসামের বিশেষ সমস্যা ছিল লাইন প্রথা। এই লাইন প্রথার কবলে পড়ে অসংখ্য বাঙ্গালী কৃষক আসাম সরকারের হাতে চরম নিগৃহীত হয়। তারা সবাই পাকিস্তান আন্দোলনে যোগ দেয়। স্বাভাবিকভাবেই আসামে লাইন প্রথা বিরোধী আন্দোলন আর পাকিস্তান আন্দোলন

www.pathagar.com

সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই সূত্রেই সে সময় সিলেট হযরত শাহজালাল (রহঃ)-এর দরগার মোতোয়াল্লী সরে কওম এ জেড আবদুল্লাহ লেখেন 'লাইন প্রথার পটভূমি' নামের বই। আসামে পাকিস্তান আন্দোলন সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত অথচ চমৎকার গ্রন্থ আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব মাহমুদ আলী কর্তৃক পাকিস্তান আমলে রচিত 'রিসার্জেন্ট আসাম' শীর্ষক ইংরেজী গ্রন্থ।

পাকিস্তান আমলে জনাব মাহমুদ আলী সিলেট থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'নও বেলাল' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা এবং বামপন্থী যুব সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে যথাক্রমে সাংবাদিকতা ও রাজনীতি অঙ্গনে খ্যাতি অর্জন করেন। সিলেট থেকে কথাশিল্পী শাহেদ আলীর সম্পাদনায় 'প্রভাতী' নামের একখানি পাক্ষিক পত্রিকা বিভাগ-পূর্বকালে প্রকাশিত হতো, সে কথা আগেই বলেছি। এ পত্রিকায় পাকিস্তান আন্দোলন সম্পর্কে মূল্যবান রচনাদি প্রকাশিত হতো।

পাকিস্তান আন্দোলনের শেষদিকে ১৯৪৭ সালের ১৭ মার্চ কলিকাতা থেকে 'ইত্তেহাদ' নামে আরেকখানি বাংলা দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক-সাংবাদিক-রাজনীতিক আবুল মনসুর আহমদ। আবুল মনসুর আহমদ আগেই ব্যঙ্গ রসাত্মক গ্রন্থ 'আয়না' লিখে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিতে রচিত তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থের নাম ছিল 'ফুড কনফারেন্স'। মুসলিম সমাজের নেতৃত্বের একাংশের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রতারণার বিরুদ্ধে এ দু'টি গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে বিচ্ছুরিত হয়েছিল তীব্র কষাঘাত।

অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল রাজনীতির একনিষ্ঠ ভক্ত আবুল মনসুর আহমদ এককালে কংগ্রেস ও কৃষক প্রজা পার্টির অন্যতম নেতা ছিলেন। কংগ্রেসের মুসলিমবিরোধী সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে হতাশ হয়ে এ কে ফজলুল হক , মওলানা আকরম খাঁ, মৌলভী তমিজউদ্দিন খাঁ প্রমুখের ন্যায় তিনিও মুসলিম লীগে যোগ দিয়ে পাকিস্তান আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। পাকিস্তান আন্দোলনের শেষদিকে তিনি কিছুদিন বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রচার সম্পাদক হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন।

দৈনিক 'ইত্তেহাদ' পত্রিকার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন চল্লিশের দশকের অন্যতম বিশিষ্ট কবি আহসান হাবীব। মহাযুদ্ধোত্তর সমাজ জীবনের ধূসর হতাশা তাঁর কবিতায় সার্থক রূপলাভ করে। এমনিতে আহসান হাবীব একজন অরাজনৈতিক কবি হিসেবে পরিচিতি লাভ করলেও পাকিস্তান আন্দোলনের সেই উত্তাল সময়ের আহবানে তিনিও সাড়া না দিয়ে পারেননি। তিনি কপটতা ও অসঙ্গতির বিরুদ্ধে বেশ কিছু সার্থক শ্লেষাত্মক কবিতা রচনা করেন। শুধু তাই নয়, ছোটদের জন্য

www.pathagar.com

কাজী নজরুল ইসলাম

www.pathagar.com

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি কায়কোবাদ

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী

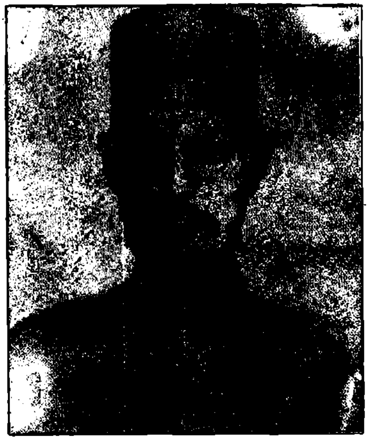

নজিবুর রহমান সাহিত্য রত্ন

www.pathagar.com

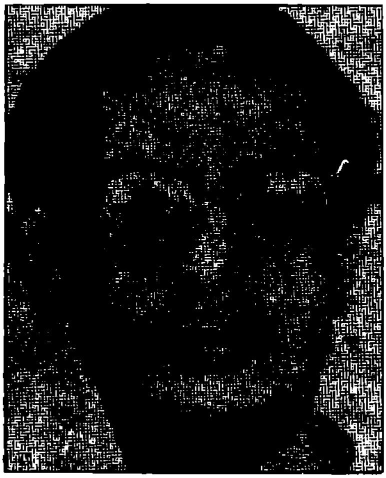

ফররুখ আহমদ

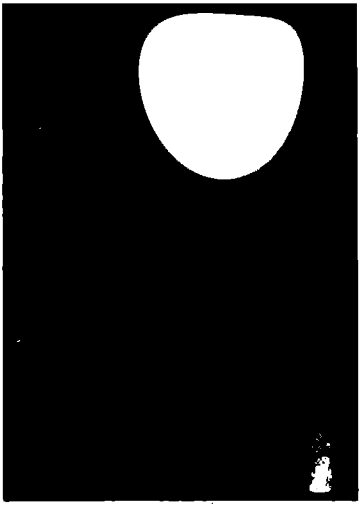

কবি গোলাম মোস্তফা

মুনশী মেহেরউল্লাহ

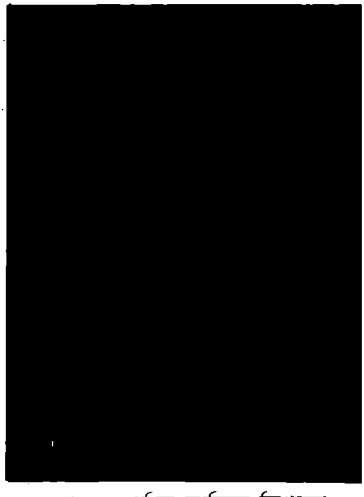

আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ

www.pathagar.com

এস. ওয়াজেদ আলী

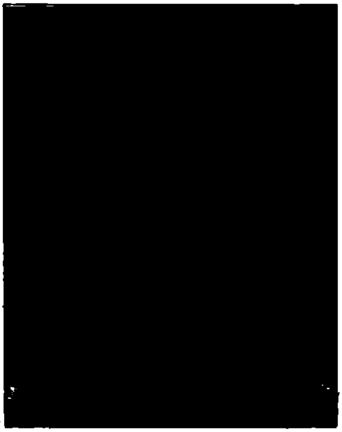

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ

সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

www.pathagar.com

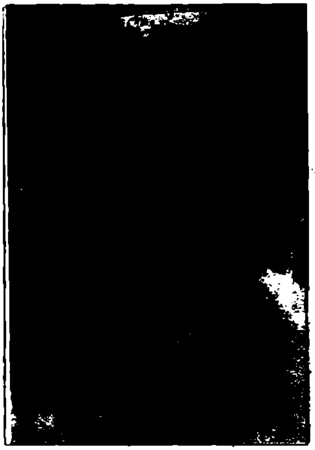

সুফী মোতাহার হোসেন

কাজী আবদুল ওদুদ

কাজী মোতাহার হোসেন

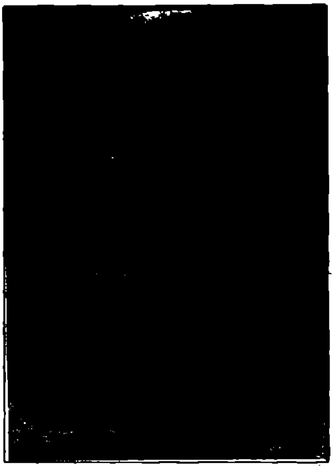

ডঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী

www.pathagar.com

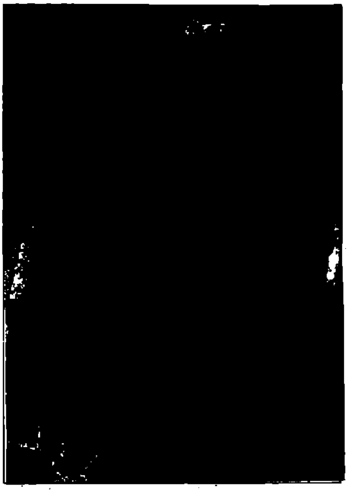

শেখ ফজলুল করিম সাহিত্য বিশারদ

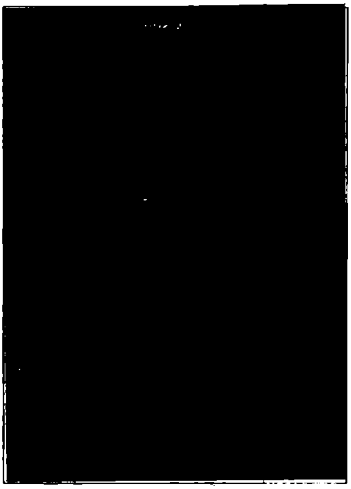

আকবর উদ্দীন

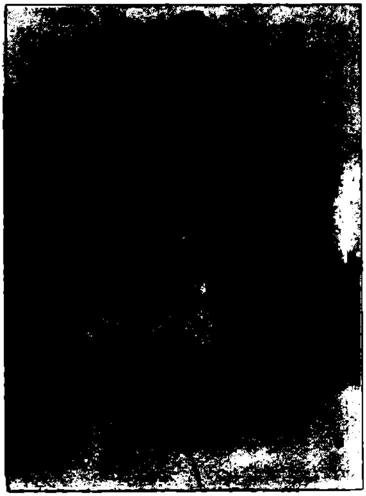

মাওলানা মুস্তাফিজুর রহমান

আবুল হাসিম

www.pathagar.com

শামসুন্নাহার মাহমুদ

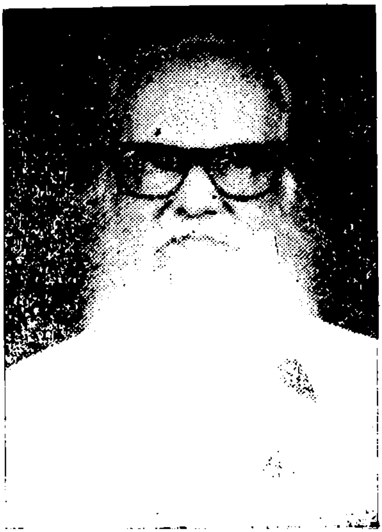

আবুল কাশেম

কবি তালিম হোসেন

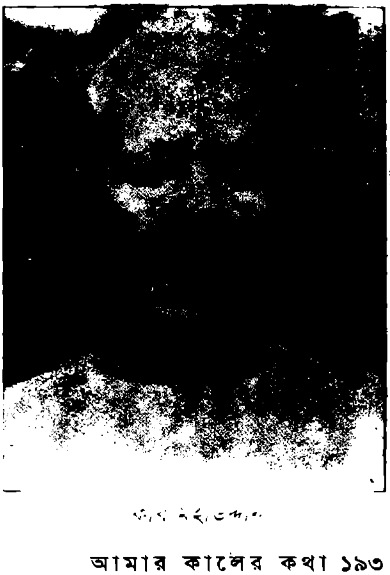

[illegible]

www.pathagar.com

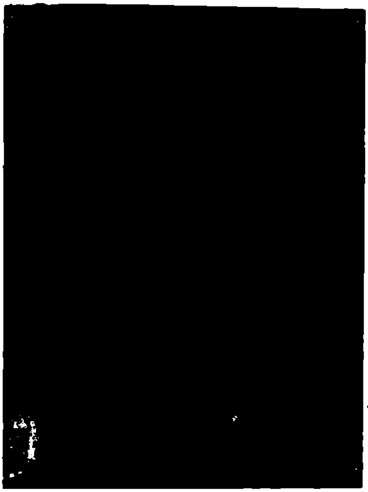

কবি শাহাদাৎ হোসেন

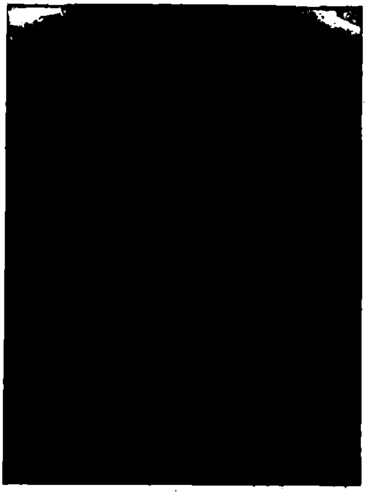

কাজী ইমদাদুল হক

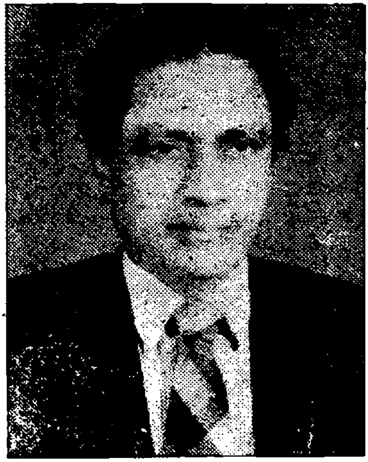

কাজী গোলাম মাহবুব

এম. আকবর

www.pathagar.com

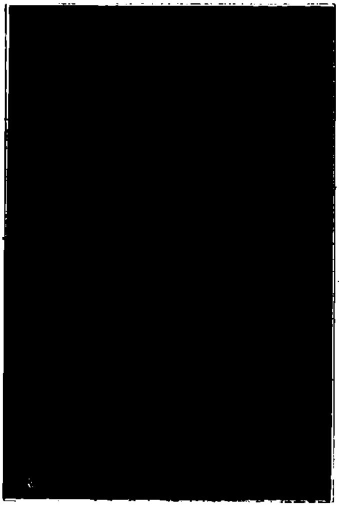

কবি আবদুল কাদির

মওলবী মুজীবুর রহমান

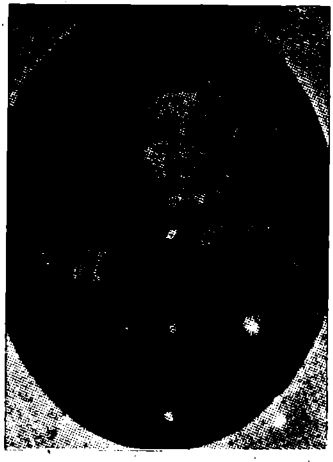

মীর মশাররফ হোসেন

ডঃ সাজ্জাদ হোসাইন

www.pathagar.com

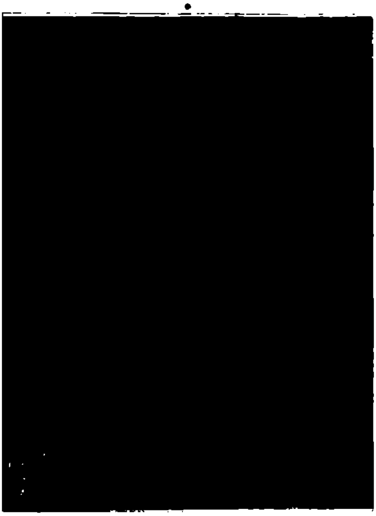

কবি জসীম উদ্দীন

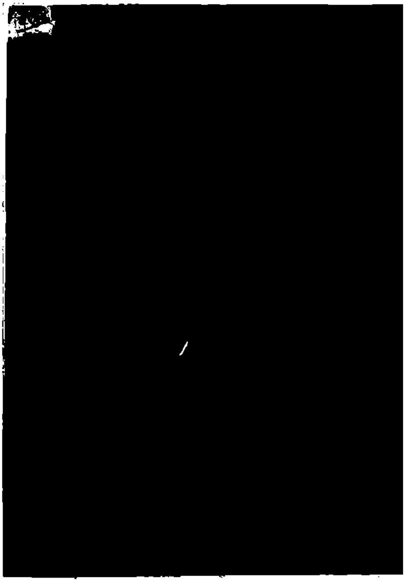

আবুল ফজল

শামসুদ্দিন আহমেদ

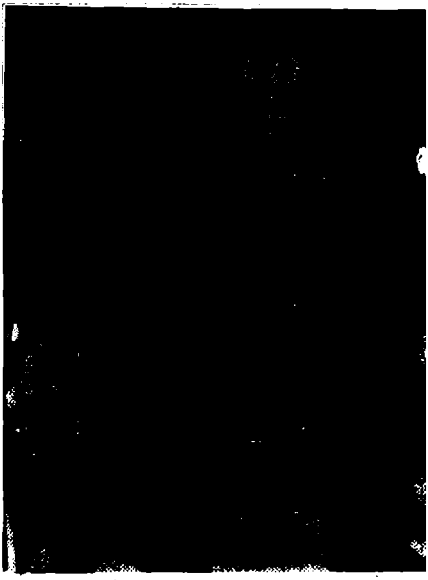

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন

www.pathagar.com

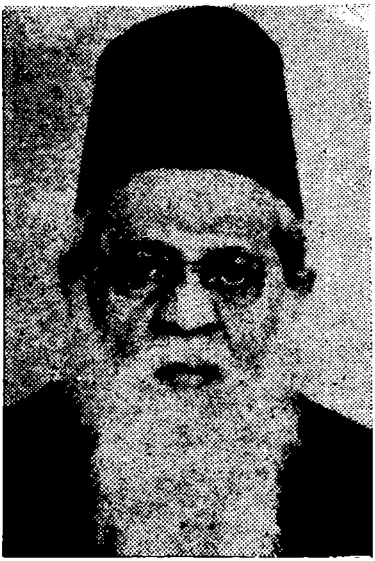

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

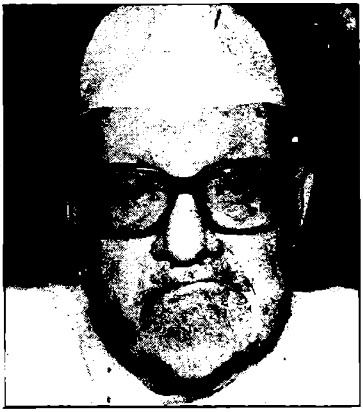

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ

শওকত ওসমান

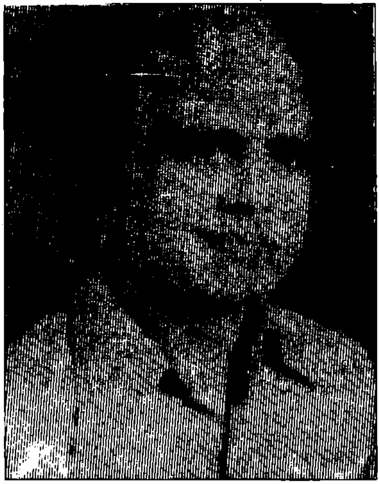

শাহেদ আলী

www.pathagar.com

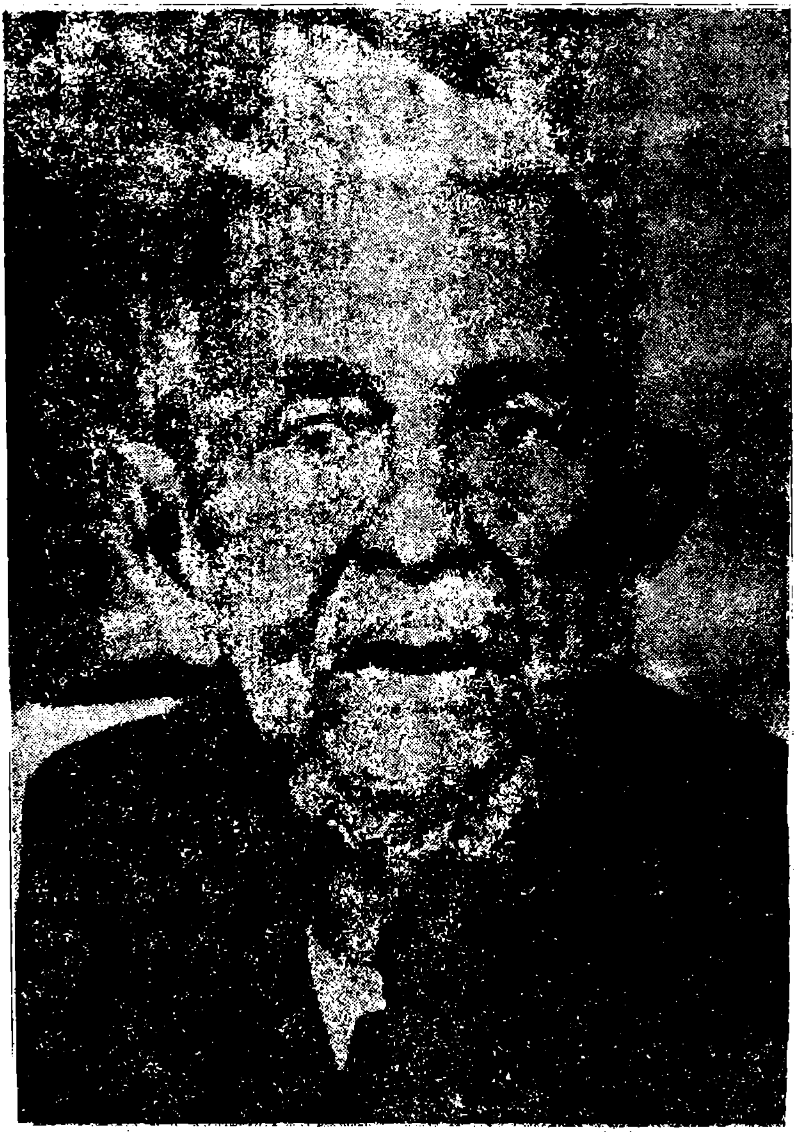

মওলানা আকরম খাঁ

www.pathagar.com

প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ

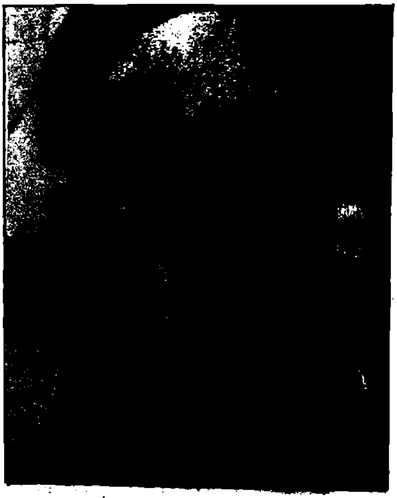

আবুল মনসুর আহমদ

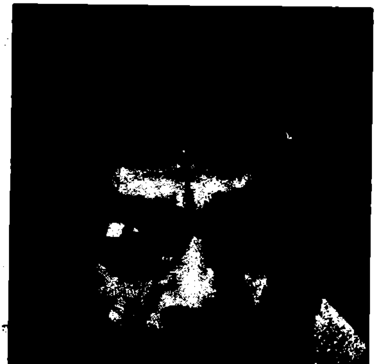

জহুর হোসেন চৌধুরী

www.pathagar.com

মুজীবর রহমান খাঁ

আবুল কালাম সামসুদ্দিন

মাহবুব-উল-আলম

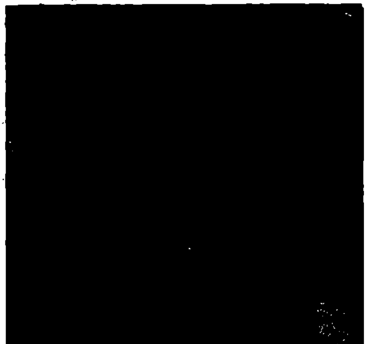

মোহাম্মদ মোদাব্বের

www.pathagar.com

সৈয়দ আলী আহসান

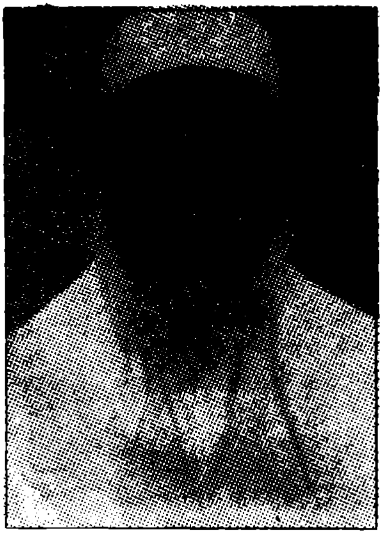

সৈয়দ আলী আশরাফ

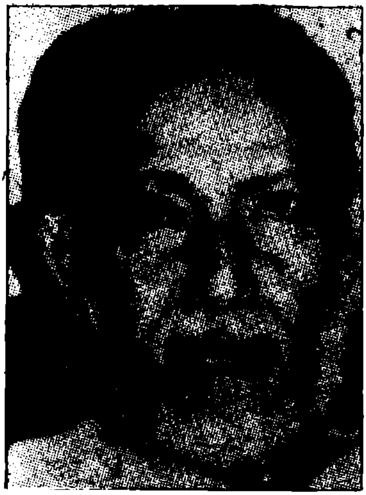

মীর্জা গোলাম হাফিজ

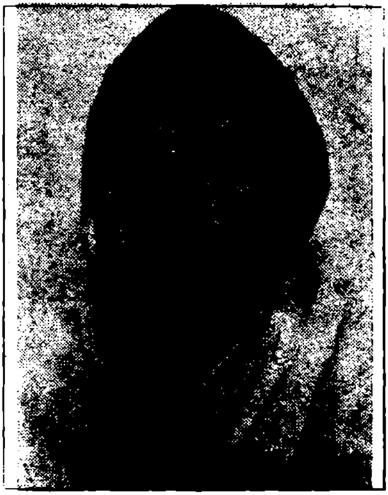

কবি সুফিয়া কামাল

www.pathagar.com

সিকান্দর আবু জাফর

সরদার ফজলুল করীম

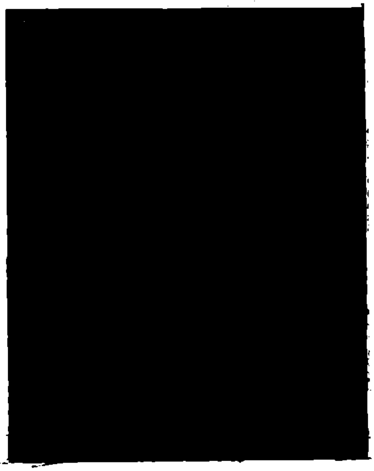

আব্বাস উদ্দীন

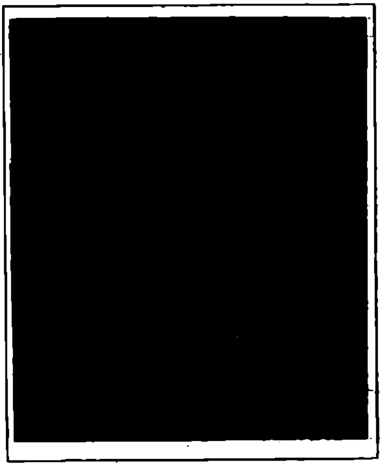

আবদুল আলিম

www.pathagar.com

পাকিস্তান আন্দোলনের ওপর তিনি 'ইবনে বতুতা' ছদ্মনামে রচনা করেন অনুপম শিশুতোষ গ্রন্থ 'ছোটদের পাকিস্তান'। জাতির মুক্তি ও কল্যাণের জন্য 'পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠা কেন একান্ত প্রয়োজন, সে বিষয়ে শিশু-কিশোরদের উপযোগী এমন সুন্দর বই তখন আর একখানিও ছিল না। অবশ্য দৈনিক 'আজাদ'-এর ছোটদের পাতা 'মুকুলের মাহ্ফিল'-এ প্রতি সপ্তাহে 'বাগবানের সাজি' নামে মাহফিলের পরিচালকের যে বক্তব্য প্রকাশ পেতো তাতে এবং ঐ পাতায় প্রবীণ-নবীন অন্যান্য লেখকদের রচনাতেও পাকিস্তান আন্দোলন সম্পর্কিত আলোচনা স্থান লাভ করতো। তবে এ বিষয়ে এরকম একখানি পূর্ণাঙ্গ শিশুতোষ গ্রন্থের গুরুত্বই ছিল আলাদা।

দৈনিক 'আজাদ'-এর ছোটদের পাতা 'মুকুলের মাহ্ফিল' সেকালের মুসলিম শিশু-কিশোর-তরুণদের মধ্যে লেখক সৃষ্টির ব্যাপারেও পালন করেছিল ঐতিহাসিক ভূমিকা। বাংলা সাহিত্য অঙ্গনে পরবর্তীকালে যারা খ্যাতিমান সাহিত্যিক হিসেবে সুপরিচিত হন, তাদের অনেকেরই লেখালেখির হাতেখড়ি হয় দৈনিক 'আজাদ'-এর এই 'মুকুলের মাহফিল' পাতায়।

কিন্তু না, শুধু লেখালেখির জগতেই নয়, সমাজের শিক্ষা, রাজনীতি, সংস্কৃতি, প্রশাসন প্রভৃতি ক্ষেত্রে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে যারা নেতৃত্ব দান করেন, তাদের অনেকের সুপ্ত প্রতিভার স্ফূরণ ঘটানোর ব্যাপারেও মুকুলের মাহফিলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 'মুকুল ফৌজ' পালন করে ঐতিহাসিক ভূমিকা। এই 'মুকুল ফৌজ'-এর পরিচালক ছিলেন শিল্পী কামরুল হাসান। কামরুল হাসান শুধু একজন প্রতিভাবান শিল্পীই ছিলেন না, একজন ব্যায়ামবিদ ও সফল সংগঠক হিসাবেও তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। মুকুলের মাহফিলের বাগবান মোহাম্মদ মোদাব্বের ও মুকুল ফৌজের পরিচালক কামরুল হাসানের তত্ত্বাবধানে বাংলার বিভিন্ন শহরে, গ্রামে-গঞ্জে মুসলমান শিশু-কিশোররা মুকুল ফৌজের মাধ্যমে সংঘবদ্ধ হয়। মুকুল ফৌজের কর্মসূচীর মধ্যে ছিল নিয়মিত শরীর চর্চা ও কুচকাওয়াজ, পাঠাগার গড়ে পাঠাভ্যাস বাড়িয়ে জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়া, জ্ঞানের পরিধি প্রসার করা এবং শিশু-কিশোরের মধ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের আগামী দিনের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, সেকালের মুসলিম শিশু-কিশোরদের একমাত্র সংগঠন 'মুকুল ফৌজ' জাতির প্রতি তাদের এ গুরুদায়িত্ব পালনে ঐতিহাসিক সাফল্যের পরিচয় দেয়।

পরবর্তীকালে শিল্পী হিসেবে যথেষ্ট নাম করলেও কামরুল হাসান বিভাগ-পূর্বকালে শিল্পী হিসেবে প্রায় অপরিচিতই ছিলেন। শিল্পীর তুলনায় মুকুল ফৌজের পরিচালক হিসেবে পাকিস্তান আন্দোলনে কিশোরদের অন্যতম সংগঠক রূপেই কামরুল হাসান অধিক পরিচিত ছিলেন। সেই সূত্রেই পাকিস্তান আন্দোলনের

www.pathagar.com

নিবেদিতপ্রাণ কবি ফররুখ আহমদের সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাদের সে সম্পর্ক কত নিবিড় ও হৃদ্যতাপূর্ণ ছিল, তার প্রমাণ মেলে আশির দশকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত শাহাবুদ্দিন আহমদ সম্পাদিত 'ফররুখ আহমদ ব্যক্তি ও কবি' শীর্ষক গ্রন্থে ফররুখকে নিয়ে কামরুল হাসানের লেখা থেকে।

কার্টুনিস্ট 'দোপেয়াজা'

কামরুল হাসান তো ননই, এমনকি বিখ্যাত শিল্পী জয়নুল আবেদীনও পঞ্চাশের মন্বন্তর উপলক্ষে অঙ্কিত তাঁর বিখ্যাত চিত্রের আগে শিল্পী হিসাবে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেননি, যদিও শিল্পবোদ্ধাদের মধ্যে এ ধারণা দ্রুত দৃঢ় হচ্ছিল যে, জয়নুল আবেদীন একদিন বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী হিসেবে আমাদের জাতির জন্য গৌরব বয়ে আনবেন। মুসলমান শিল্পীদের মধ্যে চল্লিশের দশকের আগ থেকেই যিনি ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন, তিনি কাজী আবুল কাসেম। তাঁর অঙ্কিত প্রচ্ছদ মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে কাজী আবুল কাসেমই ছিলেন বাংলাদেশে মুসলিম অংকন শিল্পীদের পথিকৃৎ। তাঁর অংকিত চিত্রে মুসলিম ক্যালিওগ্রাফিক ঐতিহ্যের যেমন একটি ছাপ লক্ষণীয়, তেমনি হিন্দু-মুসলমান সংবাদপত্রের মধ্যে কার্টুন যুদ্ধেও তিনিই ছিলেন মুসলমানদের' প্রধান সেনাপতি। পাকিস্তান আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠলে হিন্দুদের বিভিন্ন সংবাদপত্রে মুসলমানদের পাকিস্তান দাবীর বিরুদ্ধে নিবন্ধ, সংবাদ প্রতিবেদন প্রভৃতির পাশাপাশি ব্যঙ্গচিত্র তথা কার্টুনের মাধ্যমেও আক্রমণ পরিচালনা শুরু হয়। হিন্দু পত্রিকাসমূহের একাধিক কার্টুনিস্টের কার্টুনের জবাব দিতে হতো একা কাজী আবুল কাসেমকে। সেকালের হিন্দু কার্টুনিস্টদের মধ্যে একজন খুবই নাম করেছিলেন। তাঁর আসল নাম মনে নেই, তবে ছদ্মনাম ছিল 'কাফী খাঁ'। কাজী আবুল কাসেমেরও কার্টুনিস্ট হিসেবে ছদ্মনাম ছিলো 'দোপেয়াজা'। এই 'দোপেয়াজা' নামে তিনি শুধু পাকিস্তান আন্দোলনকালেই নয়, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ভাষা আন্দোলনকালেও বহু অনবদ্য কার্টুন আমাদের উপহার দেন। আমাদের সৌভাগ্য, আমাদের এই প্রবীণতম শিল্পী অদ্যাবধি জীবিত রয়েছেন।

শুধু অঙ্কনশিল্পী নয়, পাকিস্তান আন্দোলনে সঙ্গীত শিল্পীদেরও ছিল অসামান্য অবদান। বাংলায় মুসলিম জাগরণে অমর কণ্ঠশিল্পী আব্বাস উদ্দীন আহমদের ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা আগেই বলেছি। নজরুল ইসলাম, গোলাম মোস্তফার ইসলামী ভাবধারার গান এবং জসীম উদ্‌দীনের পল্লীসঙ্গীতের পাশাপাশি গোলাম মোস্তফার রচিত পাকিস্তান বিষয়ক বেশকিছু গানও সে সময় গীত হত মুসলিম লীগের বিভিন্ন জনসভা ও সাংস্কৃতিক জলসায়। এসব গানে আব্বাস উদ্দীন আহমদ

www.pathagar.com

ছাড়াও কণ্ঠ দিতেন খ্যাত-অখ্যাত বিভিন্ন সঙ্গীত শিল্পীরা। এদের মধ্যে ছিলেন ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরু, বেদারউদ্দীন আহমদ, নূরউদ্দীন আহমদ (ফরিদপুর), লায়লা আর্জুমান্দ বানু, আবদুল হালিম চৌধুরী এবং আরও অনেকে।

সে সময় পাকিস্তান নিয়ে গোলাম মোস্তফা ছাড়াও আরও কয়েকজন কবি ও গীতিকার রচনা করেন বেশ কিছু অনবদ্য গান। এসব গীতিকারের মধ্যে ছিলেন জসীম উদ্‌দীন, ফররুখ আহমদ, তালিম হোসেন, নাজীর আহমদ, সাঈদ সিদ্দিকী প্রমুখ। গোলাম মোস্তফা সেই ১৯৪৫-৪৬ সালেই বাংলা ভাষায় রচনা করেছিলেন 'পাকিস্তানের জাতীয় সঙ্গীত' শীর্ষক একখানি গান। বাংলা ১৩৫২ সালের চৈত্র সংখ্যা মাসিক মোহাম্মদীতে প্রকাশিত এই গানের বাণী ছিল নিম্নরূপ ঃ

"পাকিস্তান, পাকিস্তান, খোশ আমদেদ পাকিস্তান
বাজাও ডঙ্কা, নাহি রে শংকা– ওরে মুসলিম নওজোয়ান॥
টুটিয়া দীর্ঘদিনের নিদ
এসেছে মোদের খুশীর ঈদ
মাশরেকে আর মাগরেবে উড়াও আল হেলাল নিশান॥
শীতের শেষে এল আবার
গুল-বাগিচায় নওবাহার
বুলবুল ওই গাহিছে শোন তাজা-ব-তাজার নতুন গান॥
আবার সবার চোখে চোখে
কাবার স্বপন আনিল কে?
দিকে দিকে জ্বলে লাল-মশাল– ওই জাগে মুসলিম জাহান॥
ওরে মুসলিম চলরে জোর
হয়েছে যে তোর রাত্রি ভোর
নও বেলালের কণ্ঠে আজ ওই শোন ফজরের আজান॥"

তবে এ গানের চাইতে গোলাম মোস্তফার একটি ভাটিয়ালী গান সে সময় অনেক বেশী জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। 'পাকিস্তানের ভাটিয়ালী সঙ্গীত' শিরোনামে মাসিক 'মোহাম্মদী'র ফাল্গুন, ১৩৫২ সংখ্যায় প্রকাশিত এ গানখানি ছিল নিম্নরূপ ঃ

"ঝির-ঝির-ঝির-ঝির পূবান বাতাসে ধাও
ওরে আমার ময়ূর পঙ্খী নাও॥
পাকিস্তানের পাক-মুলুকে আমায় লৈয়া যাও
ওরে আমার ময়ূর পঙ্খী নাও॥
সেই না দ্যাশে যাবার তরে
পরাণডা মোর কাইন্দ্যা মরে

www.pathagar.com

খুব সুরত সেই দ্যাশের ছবি
আমারে দেখাও–
ওরে আমার ময়ূর পঙ্খী নাও॥
পাকিস্তানের রোজ বিহানে
আজান দেয় বুলবুল
হিম-শিশিরে অজু করে
নামাজ পড়ে সব ফুল।
দরিয়া পারে সোনার দ্বীপে
সেই যে পাকিস্তান শরীফে
আল্লা-নবীর নামে আজি
দাওরে, পাড়ি, দাও–
ওরে আমার ময়ূর পঙ্খী নাও॥"

গোলাম মোস্তফার আরেকটি গানও সেকালে খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। গানটির প্রথম দুই লাইন ছিল নিম্নরূপ ঃ

"সকল দেশের চেয়ে পিয়ারা
দুনিয়াতে ভাই সে কোন স্থান,
সে পাকিস্তান, সে পাকিস্তান, সে পাকিস্তান।"

কবি ফররুখ আহমদের কয়েকটি গানও এ সময় খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। ফররুখ আহমদের দ্বিতীয় প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'আজাদ করো পাকিস্তান'-এ এর যে সব গান স্থান পেয়েছিল তার মধ্যে ছিল– 'সামনে চল', 'ওড়াও ঝাণ্ডা', 'আজাদ করো পাকিস্তান', 'কায়েদে আজম জিন্দাবাদ' প্রভৃতি। প্রথম গানটির প্রথম ছত্রগুলো ছিল নিম্নরূপ ঃ

"সামনে চল, সামনে চল।
তৌহিদেরি সাস্ত্রী দল
আসুক ডর আসুক ভয়
আসুক হিম দুঃসময়
আসুক দুখ পাষাণ বুক
মৃত্যুবাধা ঝড় বাদল।।"

তবে ফররুখ আহমদের যে গানটি এ সময় সব চাইতে বেশী জনপ্রিয়তা পেয়েছিল তার প্রথম দু'টি ছত্র ছিল নিম্নরূপ ঃ "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান/ কবুল মোদের জান পরাণ।" গানটি নিয়ে তখন দেশে বিশেষ করে সাহিত্য সাংবাদিক মহলে বেশ তুলকালাম সৃষ্টি হয়েছিল একটি দুঃখজনক ঘটনার প্রেক্ষিতে। এই

www.pathagar.com

গানটি ফররুখ আহমদের রচিত হওয়া সত্ত্বেও এর রচয়িতা হিসাবে দৈনিক আজাদ-এ নাম ছাপা হয়েছিল মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর।

কবি তালিম হোসেন পাকিস্তান আন্দোলন উপলক্ষে রচনা করেন একাধিক অনবদ্য কবিতা ও গান। তালিম হোসেনের রচিত এমনি একটি জনপ্রিয় গানের প্রথম দু'টি কলি ছিল নিম্নরূপ ঃ

"দিল আজাদীর দেশ পাকিস্তান
কদম কদম চল জঙ্গী জোয়ান।"

কবির আরেকখানি জনপ্রিয় গানের শুরু ছিল এভাবে ঃ

"পাকিস্তান আজাদ, পাকিস্তান আজাদ।
চলো সেই দেশে, মুজাহিদ বেশে
দৃপ্ত প্রাণের সাধ।"

নজরুল-জসীম উদ্‌দীনের বিভিন্ন গান ছাড়াও গোলাম মোস্তফা, ফররুখ আহমদ ও তালিম হোসেনের এসব গান আমরা নিজেরাও উৎসাহের আতিশয্যে সমবেত কণ্ঠে গাইতে চেষ্টা করতাম।

শুধু শিল্পীরা নয়, মুসলিম কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবীদেরও প্রায় সকলেই তখন পাকিস্তান আন্দোলনের সরব বা নীরব সমর্থক ছিলেন এবং সকলেই পাকিস্তান অর্জনের মধ্য দিয়েই স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন। সে সময় মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের কারা পাকিস্তান আন্দোলন সমর্থন করেন, তার চাইতে কে কে পাকিস্তান আন্দোলন সমর্থন করেননি, সেই স্বল্পসংখ্যক ব্যতিক্রমীদের তালিকা নিরূপণ করা বরং সহজ। কারণ, মুসলিম বাংলা সাহিত্যের প্রবীণতম জীবিত কবি কায়কোবাদ থেকে শুরু করে তরুণ প্রজন্মের কথাশিল্পী শাহেদ আলী বা কবি তালিম হোসেন পর্যন্ত সকলেই এই দাবীর সাথে গভীরভাবে একাত্ম হয়ে উঠেছিলেন। যে কোন দেশের কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবীরা যে জাতির বিবেকের ভূমিকা পালন করে থাকেন, তার জীবন্ত প্রমাণ ছিল সেদিনকার শিল্পী-সাহিত্যিকদের এই ঐতিহাসিক ভূমিকা।

পাকিস্তান সংগ্রামের সাংস্কৃতিক পটভূমি

বাংলাদেশে মুসলিম কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের সে সময় ঢাকা ও কলিকাতায় যথাক্রমে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ এবং পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি নামের দু'টি সাংস্কৃতিক সংস্থা ছিল, সে কথা আগেই উল্লেখ করেছি। কলিকাতা তখন অবিভক্ত বাংলার প্রাদেশিক রাজধানী থাকার সুবাদে স্বাভাবিকভাবেই কলিকাতাকেন্দ্রিক পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির ভূমিকা ছিল তুলনামূলকভাবে অধিকতর ব্যাপক ও বলিষ্ঠ। কলিকাতা রাজধানী থাকার সুবাদে

www.pathagar.com

অবশ্য বেশ আগে থেকেই সেখানে মুসলিম রাজনীতিকদের পাশাপাশি মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের কর্মকাণ্ডের একটি স্বতন্ত্র ধারা সক্রিয় ছিল। এককালে কলিকাতায় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি নামে মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের একটি সংস্থা ছিল। এই সংস্থার পক্ষ থেকে বের হত বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা। এ ছাড়াও তখন কলিকাতা থেকে বের হত আল এসলাম ও সওগাত নামের আরও দু'টি সাহিত্য পত্রিকা। এসব সংস্থা ও পত্রিকা অফিসে প্রায়ই মুসলমান কবি-সাহিত্যিকদের আসর বসত। তাদের পক্ষ থেকে মাঝে মাঝে অনুষ্ঠিত হত "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলন"। এসব সভা সম্মেলনে মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা এবং চিন্তার আদান-প্রদান সম্ভব হত।

মওলানা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী সম্পাদিত 'আল এসলাম' পুরোপুরি সাহিত্য পত্রিকা ছিল না। এতে প্রধানত মওলানা ইসলামাবাদী, মওলানা আকরম খাঁ, মওলানা আবদুল্লাহিল বাকী, মওলানা আবদুল্লাহিল কাফী, মওলভী নজীর আহমদ চৌধুরী প্রমুখের ধর্ম সম্পর্কিত রচনাদি প্রকাশিত হলেও এতে কায়কোবাদ, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী, শেখ ফজলুল করিম, সৈয়দ এমদাদ আলী, মোজাম্মেল হক, শাহাদৎ হোসেন, গোলাম মোস্তফা, কাজী ইমদাদুল হক, শেখ হাবিবুর রহমান সাহিত্যরত্ন, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, আবদুল গফুর সিদ্দিকী, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী, আকবর উদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ প্রমুখের কবিতা বা সাহিত্য সম্পর্কিত রচনাদিও প্রকাশিত হত।

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা ও সওগাত ছিল পুরোপুরি সাহিত্য পত্রিকা। এ দু'টি পত্রিকায় উল্লেখিত সাহিত্যিকরা তো লিখতেনই, তদুপরি কাজী আবদুল ওদুদ, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, একরামুদ্দীন, গোলাম কাসেম, ডাঃ লুৎফর রহমান প্রমুখের লেখাও প্রকাশিত হত। পরবর্তীকালে যিনি বিদ্রোহী কবি হিসেবে বাংলা কাব্য জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেন, সেই নজরুলও এ দু'টি সাহিত্য পত্রিকার মাধ্যমেই বাঙালী সাহিত্যামোদী মহলে প্রাথমিক পরিচিতি লাভ করেন। তবে, তিনি তখন লিখতেন হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম নামে করাচী ক্যান্টনমেন্ট থেকে। পরবর্তীকালে নজরুল যখন সেনাবাহিনী ছেড়ে কলিকাতায় চলে আসেন, তখন তিনি ওঠেন বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি কার্যালয়েই। নজরুলকে কেন্দ্র করে সেদিন বাংলার মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে যে একটা নব জাগরণের জোয়ার সৃষ্টি হয়, চল্লিশের দশকের সূচনায় নজরুল দুরারোগ্য রোগে বাকশক্তি হারানোর পরও সে ধারা অব্যাহত থাকে।

www.pathagar.com

বাঙালী মুসলমানদের পরিচালিত অন্যান্য সাহিত্য পত্রিকা স্বল্পায়ু হলেও মাসিক সওগাত দীর্ঘদিন সুনামের সাথে তার প্রকাশনা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়। প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সাথে জড়িত না থাকলেও মাসিক সওগাত বাঙালী মুসলমানের সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক জাগরণের ক্ষেত্রে যে অবদান রাখে, তা এক কথায় অনন্য। সওগাত হাউসের পক্ষ থেকে পরবর্তীকালে 'সাপ্তাহিক বেগম' প্রকাশিত হয়। 'বেগম' মুসলিম নারী জাগরণের ক্ষেত্রে যেমন ঐতিহাসিক অবদান রাখে, তেমনি মুসলিম মহিলাদের মধ্যে সাহিত্যিক সৃষ্টিতেও পালন করে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা।

ত্রিশের দশকের 'মাসিক সওগাত'-এর সাথে যোগ দেয় আরেকটি দীর্ঘায়ু মুসলিম সাহিত্য পত্রিকা। এটি মাসিক মোহাম্মদী। মাসিক মোহাম্মদী অফিস থেকেই প্রকাশিত হয় মুসলিম জাগরণের ঐতিহ্যবাহী মুখপত্র দৈনিক আজাদ এবং সাপ্তাহিক মোহাম্মদী। এসব পত্র-পত্রিকার মারফত মুসলিম সাহিত্যিকরা যেমন তাদের সাহিত্যে প্রতিভা বিকাশের অমূল্য সুযোগ লাভ করেন, তেমনি এসব পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার সুবাদে তারা সাহিত্য আন্দোলনে নিজস্ব ধারা সৃষ্টিতেও সক্ষম হন। এই সাহিত্য আন্দোলনের লক্ষেই মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের উদ্যোগে বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত হত মুসলিম সাহিত্য সম্মেলন।

সাহিত্য পত্রিকা, সাহিত্য সম্মেলন প্রভৃতির মাধ্যমে মুসলমান কবি-সাহিত্যিকদের সাহিত্য আন্দোলনে নিজস্ব স্বতন্ত্র ধারা নির্মাণের এসব চেষ্টার পেছনে কতকগুলো ঐতিহাসিক কারণও ছিল। ১৯৪০ সালের আগে মুসলমানরা অখণ্ড ভারতেই তাদের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার রক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কংগ্রেস নেতা, খেলাফত আন্দোলন-খ্যাত মওলানা মোহাম্মদ আলীর ভাষায় যে প্রচেষ্টা ছিল- 'ফ্রি ইসলাম ইন ফ্রি ইন্ডিয়া', তথা 'স্বাধীন ভারতে স্বাধীন ইসলাম'-এর দাবী। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনকালে সূর্যসেন প্রমুখ কংগ্রেস নেতা-কর্মীরা আন্দোলনকে যেভাবে কালীমূর্তিমুখী করে তোলে, এবং ঔপন্যাসিক বঙ্কিম চন্দ্রের উপন্যাসে যেভাবে মুসলিমবিদ্বেষ ছড়ানো হয়, তা মুসলিম যুবসমাজের মনে প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এই কট্টর, হিন্দু সাম্প্রদায়িক সাহিত্যিক বঙ্কিম চন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' গানকে কংগ্রেস ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে নির্বাচন করে। এই গানটির একাংশে ছিল হিন্দু দেবী দুর্গাস্তবঃ

"ত্বংহি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
নমানি তাং-
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি

www.pathagar.com

তোমারি প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।।"

মুসলমানদের প্রবল আপত্তির মুখেও কংগ্রেস এই গানটিকে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত করার জিদ বজায় রাখে। শুধু তাই নয়, বিখ্যাত হিন্দু নাট্যশিল্পী অহীন্দ্র চৌধুরী মুসলমানদের আপত্তি অগ্রাহ্য করে কলিকাতায় মঞ্চস্থ করলেন বঙ্কিমের সাম্প্রদায়িক উপন্যাস 'আনন্দমঠ'-এর নাট্যরূপ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামে মুসলিম ছাত্রদের আপত্তি অগ্রাহ্য করে হিন্দু দেবী সরস্বতীর বাহন 'শ্রীপদ্ম' চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। শিক্ষা-সংস্কৃতি ক্ষেত্রের এসব দুঃখজনক ঘটনার সাথে যুক্ত হয়েছিল বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনকালে স্বয়ং রবীন্দ্র নাথের কট্টর মুসলিম-বিদ্বেষী মারাঠা নেতা শিবাজীর বন্দনামূলক কবিতা রচনা ও অন্যান্য কার্যক্রম।

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধানকল্পে গোল টেবিল বৈঠকে যে সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ দেয়া হয়, তাতে দীর্ঘ-অবহেলিত পশ্চাৎপদ মুসলিম সমাজের কয়েকটা দাবী মেনে নেয়ার কিছুটা চেষ্টা ছিল। গোল টেবিল বৈঠকে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে গৃহীত এতটুকু সোপারেশও কট্টরপন্থী হিন্দুদের বরদাশত হল না। কট্টর সাম্প্রদায়িক দল হিন্দু মহাসভা এর বিরুদ্ধে দেশময় তুলকালাম আন্দোলন সৃষ্টি করে বসলো। কলিকাতা টাউন হলে হিন্দু মহাসভা কর্তৃক আহূত প্রতিবাদসভায় সভাপতিত্ব করলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সভাপতির ভাষণে তিনি শুধু এই রোয়েদাদকে মুসলিম লীগের দাবীর প্রতি নতি স্বীকার বলেই ক্ষান্ত হলেন না, মুসলমানদেরকে সাম্প্রদায়িক বলে আখ্যায়িত করতেও দ্বিধা করলেন না। (দ্রষ্টব্য ঃ অতীত দিনের স্মৃতি ঃ আবুল কালাম শামসুদ্দীন, দ্বিতীয় সংস্করণ ঢাকা ১৯৮৫ পৃঃ ১৪৩।)

বঙ্কিমচন্দ্র, অহীন্দ্র চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ সবাই যখন মুসলিম বিদ্বেষের একই মোহনায় মিলিত, তখন মুসলমান শিল্পী-সাহিত্যিকদের জন্য নিজেদের অস্তিত্বের লড়াইয়ের খাতিরেই স্বতন্ত্র সাহিত্য-সংস্কৃতি ধারার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। এই আন্দোলনেরই অন্যতম মাধ্যম ছিল বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলন।

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলন

যতদূর জানা যায়, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সমিতির উদ্যোগে এই সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রখ্যাত সাহিত্যিক-সাংবাদিক আবুল কালাম শামসুদ্দীনের মতে এ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেই কলিকাতায় প্রথম ও দ্বিতীয় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ

www.pathagar.com

দুটি সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে কোরআন শরীফের অনুবাদক তসলিম উদ্দিন আহমদ ও ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। তৃতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯১৬ সালে চট্টগ্রামে। এর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ এবং সভাপতি ছিলেন মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ। চতুর্থ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সম্ভবতঃ ১৯২১ কি ১৯২২ সালে বশির হাটে। এতে সভাপতিত্ব করেন মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন সৈয়দ মোকররম আলী।

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলন-এর পালা আগে থেকে শুরু হলেও বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলিম রাজনৈতিক ধারার পোলারাইজেশন যতই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল, ততই সাহিত্য সম্মেলনের চারিত্র ও কার্যক্রমও বলিষ্ঠ রূপ পরিগ্রহ করছিল। বিশের দশকে হিন্দু সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকদের চক্রান্তে বেঙ্গল প্যাক্ট ভণ্ডুল হয়ে গেলে হিন্দু-মুসলিম মিলিত রাজনীতির ধারা প্রচণ্ড আঘাত পায়। এই পটভূমিতেই নজরুল লেখেন বিখ্যাত কবিতা 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার'। সেই নিরিখেই ১৯৩২ সালের ২৫, ২৬ ও ২৭শে ডিসেম্বরে কলিকাতার এলবার্ট হলে অনুষ্ঠিত 'পঞ্চম বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলন' বিশেষ গুরুত্ব ও তাৎপর্য লাভ করে। এই সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ। আবুল কালাম শামসুদ্দিন ও কবি আবদুল কাদিরকে অভ্যর্থনা সমিতির যুগ্ম সম্পাদক এবং খালেকদাদ চৌধুরী ও এম নাসির আলীকে সহকারী সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। এই সম্মেলনে একজন মূল সভাপতি ছাড়াও সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান এই চারটি শাখার জন্য চারজন সভাপতি নির্বাচিত হন। মূল সভাপতি ছিলেন কবি কায়কোবাদ। চার শাখা অধিবেশনের চার সভাপতি ছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ (সাহিত্য), অধ্যাপক জহুরুল ইসলাম (ইতিহাস), অধ্যাপক কাজেমুদ্দিন আহমদ (দর্শন) ও ডক্টর কুদরত-এ-খুদা (বিজ্ঞান)। সম্মেলনের প্রাক্কালে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ অসুস্থ হয়ে পড়ায় মধুপুর চলে যেতে বাধ্য হলে সৈয়দ এমদাদ আলীকে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত করা হয়।

পঞ্চম 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলন' বাংলার, বিশেষ করে কলিকাতার মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। ২৫ ডিসেম্বর (১৯৩২) কলিকাতার এলবার্ট হলে তিনদিনব্যাপী এ সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে সভামঞ্চে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি সৈয়দ এমদাদ আলী, মূল সভাপতি কবি কায়কোবাদ, চার শাখা সভাপতি কাজী আবদুল ওদুদ, অধ্যাপক জহুরুল ইসলাম, অধ্যাপক কাজেমুদ্দিন আহমদ ও ডক্টর কুদরত-এ-খুদা ছাড়াও

www.pathagar.com

সম্মেলনের সঙ্গীত-জলসা পরিচালক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম।

উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হয়েছিল কাজী নজরুল ইসলাম ও কবি শাহাদৎ হোসেনের দু'টি উদ্দীপনাময়ী কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে। সম্মেলনে শান্তি-শৃংখলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন প্রখ্যাত ছাত্রনেতা আবদুল ওয়াসেকের নেতৃত্বে একদল মুসলিম তরুণ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। অভ্যর্থনা সমিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাহিত্যিকবৃন্দ এবং মূল সভাপতি ও শাখা-সভাপতিগণ ছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত প্রচুর সংখ্যক মুসলিম কবি-সাহিত্যিক এই সম্মেলনে যোগদান করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, কবি মঈনুদ্দীন, সাংবাদিক মুজীবর রহমান খাঁ, সৈয়দ মোতাহার হোসেন চৌধুরী, কবি মহিউদ্দীন, আবুল হোসেন এমএ, এম-এল, কবি ফজলুর রহমান এবং আরও অনেকে। বেশ কিছু হিন্দু কবি-সাহিত্যিকও সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে পরিষদের সম্পাদক নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত এবং 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'যুগান্তর', 'বসুমতী', 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' প্রভৃতি পত্রিকার অনেক সাংবাদিকও এ সম্মেলনে যোগ দেন। সম্মেলনের শুরুতে মূল সভাপতি কবি কায়কোবাদকে মাল্যভূষিত করা হলে কায়কোবাদ নিজের গলা থেকে সে মালা খুলে পাশে দণ্ডায়মান বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের গলায় পরিয়ে দেন। সম্মেলন শেষে কাজী নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে সঙ্গীত জলসা অনুষ্ঠিত হয়। অনেক রাত পর্যন্ত জলসা চলে। মোটের উপর এ সম্মেলন মুসলিম সাহিত্যিক মহলে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। সম্মেলনে পঠিত অভিভাষণসমূহ মাসিক 'মোহাম্মদী'-র ১৩৩৯ সালের মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

"ষষ্ঠ বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলন" অনুষ্ঠিত হয় ১৯৩৮ সালে কলিকাতা মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন স্যার আজিজুল হক। সম্পাদক আয়নুল হক খাঁ। মূল সভাপতি ছিলেন আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ। অন্যান্য শাখা-সভাপতিবৃন্দ ছিলেন এস ওয়াজেদ আলী (সাহিত্য), মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (সংস্কৃতি), কবি শাহাদৎ হোসেন (কাব্য), মোহাম্মদ হেদায়েতুল্লাহ (কথা সাহিত্য), কাজী মোতাহার হোসেন (মনন-সাহিত্য) এবং কবি গোলাম মোস্তফা (সঙ্গীত)। এ সম্মেলনও মুসলিম সাহিত্যিকদের মধ্যে যথেষ্ট উদ্দীপনা সঞ্চার করে। তিন দিনব্যাপী এ সম্মেলন শেষেও একটি সঙ্গীত-জলসা অনুষ্ঠিত হয়। কবি গোলাম মোস্তফার নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত এ জলসায় কবি নিজের লেখা কয়েকটি গান শুনিয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। এছাড়া বহু তরুণ মুসলিম কণ্ঠশিল্পীও এ অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন।

www.pathagar.com

১৯৪১ সালের ডিসেম্বরের শেষ দিকে অনুষ্ঠিত হয় "সপ্তম বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলন" কলিকাতার ইসলামিয়া কলেজ হলে। নানা কারণে এ সম্মেলন ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ইতিমধ্যে জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে পোলারাইজেশন একটি সুস্পষ্ট রূপ লাভ করেছে। অখণ্ড ভারতের কাঠামোর মধ্যে উপমহাদেশের মুসলমানদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষার সব আশা-আকাংখা ধূলিসাৎ হবার পটভূমিতে ১৯৪০ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ঐতিহাসিক লাহোর অধিবেশনে তারা স্বতন্ত্র আবাস ভূমি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পশ্চাৎপদ মুসলিম জনগণ যেমন লাহোর প্রস্তাবের মধ্যে লাভ করেলি নিরাপোষ সংগ্রামে এগিয়ে যাবার একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, তেমনি মুসলমান শিল্পী-সাহিত্যিকরাও এর মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন তাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার আন্দোলনে এগিয়ে যাবার অফুরান প্রেরণা।

সাহিত্য-সংস্কৃতি মহলে এই নতুন প্রতীতি সৃষ্টির ফলে ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত সপ্তম বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনকে আর তার পূর্বতন ক্ষুদ্রতর সাংগঠনিক খোলসে আটকিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির চাইতেও বৃহত্তর আঙ্গিকে এই সম্মেলন অনুষ্ঠানের আয়োজন চলে। এই সম্মেলনের জন্য যে শক্তিশালী অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয় তাতে দৈনিক 'আজাদ'-এর প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট মনীষী মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সভাপতি, 'বুলবুল' সম্পাদক সুসাহিত্যিক হবীবুল্লাহ্ বাহার সম্পাদক এবং বিশজন প্রবীণ-নবীন সাহিত্যিক সদস্য নির্বাচিত হন।

সপ্তম বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনে মূল সভাপতি ছিলেন সৈয়দ এমদাদ আলী। অন্যান্য শাখার সভাপতিবৃন্দ ছিলেন মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ (সাহিত্য), কবি গোলাম মোস্তফা (কাব্য), মাহবুব-উল-আলম (কথা সাহিত্য), ডক্টর আব্দুল গফুর সিদ্দিকী (পুঁথি সাহিত্য), কাজী আকরম হোসেন (ইতিহাস), আবুল কালাম শামসুদ্দীন (সাংবাদিকতা) ও ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরু (সঙ্গীত)। সম্মেলন শেষে যথারীতি সঙ্গীত-জলসার আয়োজন ছিল। ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরুর নেতৃত্বে পরিচালিত এ জলসায় ওস্তাদজীসহ বহু সঙ্গীত-শিল্পী গভীর রাত পর্যন্ত গান পরিবেশন করে শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখেন। বলাই বাহুল্য, এ সম্মেলন মুসলিম শিল্পী-সাহিত্যিক মহলে নব উদ্দীপনার জোয়ার সৃষ্টি করে।

সপ্তম বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠানকালেই এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, জাতীয় জীবনের নতুন পর্যায়ে মুসলমানদের সাহিত্য-সংস্কৃতি আন্দোলনের জন্য পুরাতন সাংগঠনিক কাঠামো আর পর্যাপ্ত প্রমাণিত হচ্ছে না। মুসলিম সমাজকে নতুন পরিস্থিতিতে সাহিত্য-সংস্কৃতি আন্দোলনে এগিয়ে নিতে প্রয়োজন নবতর

www.pathagar.com

সাংগঠনিক প্রয়াস। এই প্রতীতি থেকেই কলিকাতা ও ঢাকায় লাহোর প্রস্তাবের মর্মবাণী বাস্তবায়নে জন্ম নেয় যথাক্রমে পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি ও পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ। লাহোর প্রস্তাবে যদিও কোথাও 'পাকিস্তান' শব্দ ছিল না। তথাপি লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে যে আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল, তা এ প্রস্তাবের সমর্থক ও বিরোধী সবার কাছেই পাকিস্তান আন্দোলন নামে পরিচিতি লাভ করেছিল। মুসলিম জনগণের মত মুসলিম শিল্পী-সাহিত্যিকদেরও প্রায় সবাই এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সেদিন।

পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি প্রতিষ্ঠা

কলিকাতায় পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৪২ সালের ৩০ আগস্ট তারিখে দৈনিক 'আজাদ' অফিসে অনুষ্ঠিত সাহিত্যিক ও ছাত্রদের এক ঘরোয়া সভায়। এ সংস্থার মধ্যমণি ছিলেন দৈনিক 'আজাদ'-এর সম্পাদক বিশিষ্ট সাহিত্যিক-সাংবাদিক আবুল কালাম শামসুদ্দীন ও দৈনিক 'আজাদ'-এর সহকারী সম্পাদক সাহিত্যিক-সাংবাদিক মুজীবুর রহমান খাঁ। এই পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন নিম্নোক্ত সুধীবর্গ ঃ (এক) আবুল কালাম শামসুদ্দীন, (দুই) হবীবুল্লাহ বাহার, (তিন) মুজীবুর রহমান খাঁ (কনভেজর), (চার) সৈয়দ সাদেকুর রহমান, (পাঁচ) মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ, (ছয়) মোহাম্মদ মোদাব্বের, (সাত) আব্দুল হাই, (আট) জহুর হোসেন চৌধুরী, (নয়) আনোয়ার হোসেন, (দশ) ডাঃ ফজলুল করিম খাঁ, (এগার) মোশাররফ হোসেন।

এই 'সোসাইটি'র মূল নীতি ছিল নিম্নরূপ ঃ

(১) জাতীয় রেনেসাঁর উদ্বোধক পাকিস্তানবাদের সাহিত্যিক রূপায়ণ।

(২) পাকিস্তানবাদ-সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক ও মননমূলক বক্তৃতা (talk), বিতর্কিকা (debete), বৈঠকী, রচনা পাঠ, তথ্যানুসন্ধান ও সংগ্রহ, গবেষণা ও আলোচনা, পুস্তক ও পুস্তিকা প্রচার প্রভৃতি কাজের আয়োজন ও তাতে উৎসাহ দান।

(৩) সাহিত্যিক, সাহিত্যামোদী, বিশেষভাবে মহিলা ও ছাত্রদের মধ্যে পাকিস্তান ভাবধারার সম্প্রসারণ।

(৪) জাতীয় তমদ্দুনের উন্মোচক ও সহায়ক আন্দোলনের সাথে academic যোগ সংরক্ষণ।

(৫) সাহিত্যে হিন্দু ও মুসলমানের আন্তর্জাতিক সম্প্রীতিমূলক আবেদনের রূপায়ন।

(৬) সাহিত্যে পাকিস্তানবাদ বিরোধী সর্বপ্রকার প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারা, ফ্যাসিবাদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে মনোভাব সৃষ্টি।

www.pathagar.com

পাকিস্তান আন্দোলনের ভিত্তিরূপী লাহোর প্রস্তাবে যেমন সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষার ব্যাপার বিশেষ তাগিদ ছিল, তেমনি পাকিস্তানবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির মূলনীতিতে হিন্দু-মুসলিম উভয় জাতির মধ্যে সম্প্রীতিমূলক সাহিত্য সৃষ্টির ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয়। পাকিস্তান আন্দোলনের ভিত্তিতে সাম্প্রদায়িক চেতনা কাজ করেছিল বলে যারা প্রচার চালায়, তাদের মিথ্যাচার এতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এতে আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, যারা সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তারা সবাই ছিলেন আধুনিক বৈজ্ঞানিক মননশীল চিন্তাধারার অধিকারী, তাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতার কোন নামগন্ধও ছিল না। বরং তারা ছিলেন ধর্মীয় মূল্যবোধ ও ইসলামের বৈপ্লবিক ঐতিহ্যের আলোকে আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার পক্ষপাতী।

পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির সূচিত এ সাহিত্য-সংস্কৃতি আন্দোলন সোসাইটির এগারজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। অল্পদিনের মধ্যেই এতে যোগ দেন বিখ্যাত সাহিত্যিক-সাংবাদিক আবুল মনসুর আহমদ, তালেবুর রহমান, কবি ফররুখ আহমদ, সাংবাদিক কাজী মোহাম্মদ ইদরিসসহ কলিকাতায় অবস্থানরত প্রায় সকল মুসলমান শিল্পী-সাহিত্যিক। যারা মফস্বলে থাকতেন তারাও অনেকে আন্দোলনের প্রতি তাদের সমর্থন জ্ঞাপন করে যোগাযোগ করেন। অল্পদিনের মধ্যে ঢাকায়ও একই চিন্তাধারায় এবং একই লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ। এই সংসদ-এর সভাপতি সাধারণ সম্পাদক ও সহ-সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে সৈয়দ সাজ্জাদ হোসাইন, সৈয়দ আলী আহসান ও সৈয়দ আলী আশরাফ। পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি ও পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ পরিচালিত সাহিত্য-সংস্কৃতি আন্দোলন আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে রেনেসাঁ আন্দোলন তথা জাতীয় নবজাগরণের আন্দোলন হিসেবে খ্যাত হয়ে আছে।

পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এ সোসাইটির উদ্যোগে কলিকাতার ইসলামিয়া কলেজ হলে অনুষ্ঠিত হয়েছিল রেনেসাঁ সম্মেলনের তিন দিনব্যাপী অধিবেশন। এখানে লক্ষ্যযোগ্য যে, লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হবার পর মুসলমানরা নিজেদেরকে আর একটি সম্প্রদায় মাত্র মনে না করে, লাহোর প্রস্তাবে প্রস্তাবিত স্বাধীন রাষ্ট্রের জাতি-রাষ্ট্রের মূল নিয়ামক বলে বিবেচনা শুরু করে। এই চিন্তাধারার প্রভাব পড়ে পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির সম্মেলনের নামকরণেও : বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলন-এর স্থলে পূর্ব পাকিস্তানের রেনেসাঁ সম্মেলন। আরেকটা ব্যাপারও এ ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। পাকিস্তান আন্দোলনের সমর্থক হলেও এদের সংস্থার নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি বা পূর্ব

www.pathagar.com

পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ। তখন পর্যন্তও পাকিস্তান আন্দোলন বলতে বুঝা হত লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়নের আন্দোলনকে। এই লাহোর প্রস্তাবে পূর্ব পাকিস্তানের একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র হবারই কথা ছিল।

বিশিষ্ট সাহিত্যিক-সাংবাদিক আবুল কালাম শামসুদ্দীনের লেখা থেকে জানা যায়, রেনেসাঁ সোসাইটির নিয়মিত কর্মকাণ্ডের কথা। প্রতি সপ্তাহে রেনেসাঁ সোসাইটির বৈঠক বসত। আজাদ অফিসে বা কোন সদস্যের বাড়ীতে বসত এসব বৈঠক। নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কিত বিষয়ে প্রবন্ধ পঠিত ও আলোচিত হত। বৈঠকে আলোচিত অধিকাংশ প্রবন্ধই মাসিক মোহাম্মদীতে প্রকাশিত হত। এসব বৈঠকের খবর দৈনিক আজাদ-এ প্রকাশিত হত বলে প্রথম থেকেই মুসলিম তরুণরা দলে দলে এসব আলোচনা সভায় যোগদান করত। মাঝে মাঝে মফস্বল থেকে রেনেসাঁ সোসাইটির শাখা গঠনের সংবাদও আসত।

আবুল কালাম শামসুদ্দীনের লেখা থেকেই জানা যায়, রেনেসাঁ সোসাইটির কার্যক্রম প্রগতিশীল হিন্দু মহলেও যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চার করে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কমিউনিস্ট ও রেডিক্যাল হিউম্যানিস্ট নেতা এম এন রায় (মানবেন্দ্র নাথ রায়) এ সময়ে কলিকাতায় অবস্থান করছিলেন। তিনি একদিন খবর পাঠান, তিনি রেনেসাঁ সোসাইটির সদস্যদের সাথে পরিচিত হতে চান। আবুল কালাম শামসুদ্দীনের ভাষায়– "আমরা সাগ্রহে তাঁকে আমাদের এক বৈঠকে দাওয়াত করে পাঠালাম। তিনি তাঁর স্ত্রী ও সেক্রেটারী মিসেস এলেন রায়কে নিয়ে আমাদের বৈঠকে এলেন। সঙ্গে এলেন মিঃ রজনী মুখার্জী, মিসেস আরতি মুখার্জী, মিঃ রায়ের আরও কয়েকজন ভক্ত ও অনুসারী। মিঃ রায় আমাদের বৈঠকে 'পাকিস্তান ও গণতন্ত্র' শীর্ষক যে ভাষণ দিলেন তা ছিল নানা তত্ত্ব ও তথ্যে মূল্যবান। তিনি ভারতীয় মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের অনিবার্যতার কথা বললেন।" [দ্রষ্টব্য ঃ 'অতীত দিনের স্মৃতি', দ্বিতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫, পৃঃ ১৮৮]

শুধু এম এন রায় বা রজনী মুখার্জীই নন, কমিউনিস্ট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অনেকেই পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির সভায় আসতেন। এদের মধ্যে ছিলেন বঙ্কিম মুখার্জী, সোমনাথ লাহিড়ী, গোপাল হালদার, অনিল কাঞ্চিলাল প্রমুখ। এঁরা জানান, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিও মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার স্বীকার করেন। রেনেসাঁ সোসাইটির এক সভায় গোপাল হালদার পাকিস্তান দাবী সম্পর্কে একটি প্রবন্ধও পাঠ করেন। [দ্রষ্টব্য ঃ প্রাগুক্ত]

'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' ঢাকা

কলিকাতায় যে সময় পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি গঠিত হয় তার প্রায় সমসাময়িককালেই ঢাকায় প্রায় একই চিন্তাধারায় গঠিত হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান

www.pathagar.com

সাহিত্য সংসদ। কলিকাতা তখন রাজধানী নগরী থাকায় কলিকাতার সাহিত্য-সংস্কৃতি আন্দোলনের যে দীর্ঘ ঐতিহ্য ছিল ঢাকার তা ছিল না, একথা অনস্বীকার্য। কলিকাতার বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র মত কোন সাহিত্য সংস্থা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আগে ছিল কি-না, তা এখনও অনাবিষ্কৃতই রয়ে গেছে। তবে ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কয়েক বছরের মধ্যে এখানে যে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' নামক সাহিত্য সংস্থা গড়ে ওঠে, তাকে এক হিসাবে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ-এর পূর্বসূরি বলা যায়। এই সাহিত্য সমাজ-এর পক্ষ থেকে 'শিখা' নামের যে মননশীল পত্রিকা প্রকাশিত হত তা নানা কারণে আমাদের সাংস্কৃতিক মননশীলতার ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে রয়েছে।

'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এবং এই সংস্থার মুখপত্র 'শিখা' প্রধানত 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের উদ্‌গাতা হিসাবে পরিচিতি লাভ করলেও এই সংস্থার নামকরণ থেকেই বুঝা যায়, এ যুগের কোন কোন বিশেষ মানসিকতার মুসলমান সাহিত্যিকের মত এই সাহিত্য সমাজ-এর নেতৃবৃন্দের কেউই মুসলমান সমাজে জন্মগ্রহণ করার জন্য খেদোক্তি করেননি বা 'মালাউন' হয়ে জন্মগ্রহণের জন্য আকুতিও প্রকাশ করেননি। তারা বরং তাদের দৃষ্টিতে মুসলমান সমাজের মধ্যে যেসব দুর্বলতা আছে যেসব থেকে মুসলিম সমাজকে সংশোধন করে মুসলমানদের উন্নত ও সমৃদ্ধ করার জন্যই আন্তরিকতার সাথে প্রয়াস চালিয়ে যান। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর নেতৃবৃন্দের চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করলে এ সত্যটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর প্রতিষ্ঠা হয় ঢাকায় ১৯২৬ সালে। প্রথম বছর এই 'সাহিত্য সমাজ'-এর কর্মী সংসদে ছিলেন সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের এ এফ এম আবদুল হক, ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের (বর্তমান ঢাকা কলেজের) এ জেড নূর আহমদ, আনোয়ার হোসেন, আবদুল কাদির ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল হোসেন। সেই হিসাবে বলা যায়, এরাই ছিলেন এই সংস্থার ফাউন্ডার মেম্বার বা প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।

এদের মধ্যে প্রথমোক্ত দু'জনই ছিলেন ইসলামী জীবন ব্যবস্থার দ্ব্যর্থহীন সমর্থক। জনাব এ এফ এম আবদুল হক পূর্ব পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা বিভাগে ডিপিআই হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন। বাংলাদেশ আমলে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রথম মহাপরিচালক হিসাবে এবং মহাপরিচালকের পদ থেকে অবসর গ্রহণের পর ফাউন্ডেশনের ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্পের প্রধান হিসাবে ইসলামী জ্ঞান সাধনায় তিনি শেষ জীবন কাটান। এ জেড নূর আহমদের কর্মজীবন অতিবাহিত হয় প্রধানত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী বিভাগে। তিনি সাহিত্য সাধনার মাধ্যমে আগাগোড়া ইসলামী ঐতিহ্য ও ভাবধারারই জয়গান গেয়ে

www.pathagar.com

গেছেন।

ছান্দসিক কবি, প্রাবন্ধিক ও গবেষক আবদুল কাদির 'সাহিত্য সমাজ'-এর অন্যতম উদ্যোক্তা ও সংগঠক ছিলেন। প্রথম যৌবনে তাঁর ধর্ম সম্পর্কিত চিন্তাধারায় কিছুটা অস্থিরতার ভাব দেখা গেলেও পরবর্তীকালে তাঁর মধ্যে যে বাস্তবতার উপলব্ধি জাগে তার ফলশ্রুতিতে তিনি মুসলিম সাহিত্য-সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের সাধনায়ই সারা জীবন অতিবাহিত করেন। পার্টিশনের বেশ আগে তিনি রেজাউল করিমের সঙ্গে যৌথভাবে 'কাব্য মালঞ্চ' নামে মুসলমান কবিদের যে কবিতা সংকলন প্রকাশ করেন তার মাধ্যমেই আমরা মধ্যযুগের বিপুল সংখ্যক অজানা মুসলমান কবিদের রচনার সাথে পরিচিত হই। 'কাব্য মালঞ্চ' দিয়ে তিনি মুসলিম সাহিত্য সাধকদের সৃষ্টি সম্ভার উদ্ধারের যে কাজ শুরু করেন, জীবন সায়াহ্নে তার ইতি টানেন 'নজরুল রচনাবলী' সংকলন ও সম্পাদনার মত দুরূহ দায়িত্ব পালন করে। পাকিস্তান আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে অধিকাংশ মুসলমান কবি-সাহিত্যিকের মত তিনিও পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন এবং এর ধারাবাহিকতায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে সরকারী কর্মচারী হিসাবে তিনি পাকিস্তানে অপশন দান করেন। পাকিস্তান আমলে দীর্ঘদিন তিনি পাকিস্তান সরকারের 'মাহে নও' নামক বাংলা সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক এবং বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের প্রকাশনা কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করেন।

অধ্যাপক আবুল হোসেন এম এ এমএল-কে অনেকেই 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' ও 'শিখা' গোষ্ঠীর মূল চিন্তানায়ক বিবেচনা করেন। 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের কান্ডারী আবুল হোসেন কি ইসলামের বাইরে বা বিরুদ্ধে কোন মতবাদ প্রচার করেছেন? আবুল হোসেন তো শুধু একশ্রেণীর মুসলমানের পরকালসর্বস্ব ও অন্ধ ধর্মীয় গোঁড়ামির সমালোচনা করে জীবনের পূর্ণাঙ্গ মুক্তির কথাই প্রচার করেন। 'মুক্তির কথা' শীর্ষক এক প্রবন্ধে আবুল হোসেন বলেন ঃ

"মুক্তি অর্থে আমরা এই বুঝি যে, মানুষ চলিষ্ণু জীব আর চলার পথে যেটা বিঘ্ন বা বন্ধন সেটার অতিক্রমই হচ্ছে মুক্তি– সে বিঘ্ন ছোটই হোক আর বড়ই হোক।...আত্মার মুক্তির আগে দেহের মুক্তি চাই। দেহের মুক্তি হচ্ছে– তৃপ্তিপূর্ণ আহার ও শ্রমপুষ্ট স্বাস্থ্য। তা হলেই আত্মার মুক্তি সহজ হয়। ইসলাম এ জন্যই দেহের মুক্তির (হাসানাতু দুনিয়া) উপর সর্বাগ্রে জোর দিয়েছিল।" (সওগাত, ১৩৩৬)

তৎকালীন হিন্দু মুসলিম পরিস্থিতির বাস্তবতা বিবেচনায় মুসলমান রাজনীতিবিদরা পশ্চাৎপদ সম্প্রদায় হিসাবে চাকরিতে মুসলমানদের জন্য বিশেষ কোটা দাবী করতেন। পরিস্থিতির বাস্তবতা বিবেচনায় দেশবন্ধু সি আর দাস প্রমুখ প্রগতিশীল হিন্দু নেতারাও এ দাবীর যথার্থতা মেনে নিয়েছিলেন। 'বেঙ্গল প্যাক্ট'

www.pathagar.com

তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। ভারতে, বাংলাদেশে এখনও বিভিন্ন অনুন্নত জনগোষ্ঠীর জন্য চাকরিতে কোটা প্রথা চালু রয়েছে। আবুল হোসেন এই কোটা প্রথার কঠোর বিরোধী ছিলেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চাকে জাতীয় উন্নতির জন্য অপরিহার্য বিবেচনা করে তিনি আশা করতেন, মুসলমানরা কোটার মাধ্যমে নয়, নিজেরা শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যোগ্যতা অর্জন করেই চাকরিতে তাদের প্রাপ্য স্থান অধিকার করুক। তাছাড়া মুসলমানরা শুধু চাকরির লক্ষ্যে কেন লেখাপড়া করবে, এটাও ছিল তাঁর এক বড় প্রশ্ন। এ বিষয়ে 'শতকরা পঁয়তাল্লিশ' শীর্ষক বিখ্যাত রচনায় তিনি বলেন ঃ

"আমরা কি শিক্ষাক্ষেত্রে যাব শুধু চাকরির যোগ্যতা অর্জন করতে? আমাদের নেতারাও কি আমাদের কেবলমাত্র সেই যোগ্যতা দেখেই সন্তুষ্ট থাকবেন? আমরা বিশ্বজগতের জ্ঞানের উৎসবে আমাদের বাতিটি জ্বালাব না? সকলে ছুটে আসছে জ্ঞানবাতির দেয়ালি উৎসবে নিজ নিজ বাতি নিয়ে। কিন্তু কৈ মুসলমানকে তো দেখছি না?... হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন যে মন জ্ঞানমার্জিত নয়, সেটা আত্মাহীন শুধু দুর্বল শরীরের মত।... হযরত মোহাম্মদের (সাঃ) আদর্শ কি আমাদের কোন কাজে লাগবে না? ... আজ আমাদের সব ফেলে জ্ঞানচর্চার জন্য প্রাণ বিসর্জন করতে হবে। সেই আদর্শ পুরুষের অন্তরের আদর্শকে জীবন্ত করে তুলতে হবে। আমরা জ্ঞানী হব এই হবে আমাদের একমাত্র আদর্শ। শুধু জ্ঞান অর্জন কর, জ্ঞান চর্চা কর; মুসলমান। তুমি আবার জয়যুক্ত হবে।" [দ্রষ্টব্য ঃ 'শতকরা পঁয়তাল্লিশ', আবুল হোসেন, সওগাত ঃ আষাঢ় ১৩৩৩]

আবুল হোসেনের এসব বক্তব্যের মধ্যে নিশ্চয়ই ইসলামবিরোধিতা ছিল না। তিনি তো জ্ঞান সাধনায় ইসলামের মহানবীর আদর্শ অনুসরণ করে এগিয়ে যেতেই আকুল আবেদন জানিয়েছিলেন মুসলমানদের প্রতি। চাকরিতে পশ্চাৎপদ মুসলমানদের কোটা সংরক্ষণের বিরোধিতার মূলেও ছিল তাঁর জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে মুসলমানদের উন্নতি দেখার গভীর আকুতি। তাছাড়া 'বিশ্বজগতের জ্ঞানের উৎসবে' তিনি যে আমাদের বাতিটি জ্বালানোর তাগিদ অনুভব করেছেন এর মধ্যে মুসলমানদের সাথে তার সহজাত একাত্মতাবোধই তো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মুসলিম সাহিত্য সমাজ-এর সাথে এক পর্যায়ে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি কলিকাতার বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির সঙ্গেও দীর্ঘদিন সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তবে তাঁর গবেষণা ও সাধনা কখনও কোন বিশেষ সংস্থার চিন্তা কাঠামোতে আটকে পড়েনি। তাছাড়া আমাদের ভাষা ও সাহিত্য জগতের এ মহান সাধকের জীবনাদর্শের মূল ভিত্তি আগাগোড়াই ছিল ইসলাম। তাঁর বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় অসংখ্য রচনা থেকে ইসলাম ও পাকিস্তান সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি

www.pathagar.com

অনুধাবন করা কারও পক্ষেই কষ্ট হবার কথা নয়।

ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা হিসাবে পরিচিত। পেশাগতভাবে তিনি বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানের একজন ছাত্র হিসাবে তাঁর রচনায় বিজ্ঞানের প্রভাব পড়লেও তিনি স্রষ্টা ও ধর্মের প্রতি আগাগোড়াই গভীর বিশ্বাসী ছিলেন। জীবনের এক পর্যায়ে তিনি 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' সূচিত বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের প্রতি যথেষ্ট আকর্ষণবোধ করেন, এ কথা যেমন সত্য, তেমনি সত্য এই যে, তদানীন্তন সমাজে মুসলমানদের উচ্চতর শিক্ষার প্রতি হিন্দু মনীষীদের দৃষ্টিভঙ্গী কেমন ছিল, তার তিক্ত অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখের সংস্পর্শে এসে। সেকালে মুসলিম সমাজের চলমান বাস্তবতার তাগিদে তিনি ঊনিশ শ' সাতচল্লিশের আগেই পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদে যোগ দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে Inevitability of Pakistan নামের বিখ্যাত রচনায় তিনি কেন তখন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল সে পটভূমি চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেন।

বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা অধ্যাপক আবুল ফজল উদার মননশীলতার অধিকারী হলেও মুসলিম সমাজে ইসলামের গুরুত্বকে তিনি কখনও অস্বীকার করেননি। পাকিস্তান আন্দোলনকালে অধিকাংশ মুসলমান শিল্পী-সাহিত্যিকদের মত তিনিও পাকিস্তান আন্দোলনের সাথে একাত্ম হয়ে ওঠেন এবং পরবর্তীকালে তিনি পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতার জীবন-কে ভিত্তি করে 'কায়েদে আজম' শীর্ষক একখানি নাটক রচনা করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বাস্তব অনিবার্যতা সম্পর্কে তিনি বাংলাদেশ আমলেও তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করে গেছেন। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর একশ্রেণীর অতিউৎসাহী লোক 'মাদ্রাসা শিক্ষা' বন্ধ করে দেয়ার প্রস্তাব উত্থাপন করলে তিনি তার প্রবল বিরোধিতা করেন।

'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত না হলেও সাহিত্যিক কাজী আবদুল ওদুদকে সাহিত্য সমাজ ও 'শিখা' গোষ্ঠীর অন্যতম চিন্তানায়ক বিবেচনা করা হয়। কাজী আবদুল ওদুদ কর্ম-জীবনে সরকারী শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'মীর পরিবার', 'নদীবক্ষে' শীর্ষক তার দু'টি উপন্যাসে বাঙ্গালী মুসলিম সমাজের সার্থক চিত্রন লক্ষ্য করা যায়। তবে, তার প্রধান পরিচয় কথাসাহিত্যিক হিসাবে নয়, একজন মননশীল গদ্য লেখক হিসাবে। তিনি মুসলমান সমাজের পশ্চাৎপদতার মূল কারণ হিসাবে তাদের অন্ধ যুক্তিহীন গোঁড়ামিকে সনাক্ত করেন এবং মুসলিম সমাজকে এই অন্ধ সম্মোহনের অচলায়তন থেকে মুক্ত করতে সারাজীবন কলমযুদ্ধ চালান। এ ব্যাপারে তাঁকে অনেকেই ইসলামের ইতিহাসের মুতাজিলাপন্থীদের অনুসারী গণ্য করেছেন।

www.pathagar.com

কাজী আবদুল ওদুদ তাঁর জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে হযরত মোহাম্মদ (দঃ), গ্যেটে রবীন্দ্রনাথ ও রামমোহনের দ্বারা প্রভাবিত হলেও তিনি যে রামমোহনের মধ্যেই মুক্তবুদ্ধির চর্চা, স্বদেশপ্রেম ও মানবপ্রেমের সর্বোচ্চ আদর্শ খুঁজে পেয়েছিলেন, তা স্পষ্ট। তিনি রামমোহনের মধ্যে স্ব-সম্প্রদায়ের প্রতীক উপাসনার প্রতি তাঁর যে বিতৃষ্ণা, এর মূলে কোরআনের শিক্ষার প্রভাব খুঁজে পেয়েছিলেন। এমনকি তাঁর মতে, 'খ্রীস্টান সমাজের ত্রিত্ববাদ যীশুর রক্তে পাপীর পরিত্রাণ, এ সমস্তের প্রতি তাঁর যে বিরূপতা অথচ যীশুখৃস্টের প্রতি তার যে গভীর শ্রদ্ধা, এ সমস্তেরই মূলে রয়েছে কোরআনের শিক্ষা।'

কিন্তু যে মহাগ্রন্থ কোরআন একজন অমুসলিম মনীষীর মধ্যেও এতখানি কল্যাণকর প্রভাব বিস্তার করেছিল, তাকে স্রষ্টার অবতারিত অবিকৃত ধর্মগ্রন্থ হিসাবে চিরন্তন সত্যের উৎস বলে স্বীকার করে নিতে কাজী আবদুল ওদুদের ছিল প্রবল অনীহা। তিনি রামমোহনকে পছন্দ করতেন। কারণ, রামমোহন হিন্দুর আদি ধর্মগ্রন্থ বেদের চিরন্তনতা মানেননি। রামমোহনের আদর্শে তিনিও কোরআনের চিরন্তনতা অস্বীকার করতে প্রয়াসী ছিলেন। কাজী আবদুল ওদুদের প্রথম স্ববিরোধিতা এখানে যে, যে কোরআনের প্রভাবে রামমোহনের মধ্যে হিন্দুর প্রতীক উপাসনার এবং খৃস্টীয় ত্রিত্ববাদের অসারতা সম্বন্ধে উপলব্ধি সৃষ্টি হয়, সে কোরআনের চিরন্তনতা নিয়েই তিনি সংশয়াপন্ন।

কাজী আবদুল ওদুদের দ্বিতীয় স্ববিরোধিতা হচ্ছে, রামমোহন রায়ের মত সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও শোষক নীলকরদের সমর্থকের মধ্যে তিনি স্বদেশপ্রেম ও মানবপ্রেমের আদর্শ খুঁজে পান। রামমোহন কোরআনের প্রভাবে বেদান্তের মধ্যে একেশ্বরবাদের সন্ধান পেয়ে, মূর্তিপূজার অসারতা উপলব্ধি করে, সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ করে এবং হিন্দু সমাজে আধুনিক চিন্তাধারার অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে হিন্দু সমাজের নয়া জাগৃতির পথ খুলে দিয়েছেন, এ জন্য হিন্দু সমাজ তাঁর কাছে ঋণী। কিন্তু একই সাথে তিনি সাম্রাজ্যবাদের সন্তুষ্টি সাধনের জন্য বাংলার গণমানুষের দুশমন নীল-কুঠিয়ালদের পক্ষ অবলম্বনের মাধ্যমে মানবতার বিরুদ্ধে চরম অপরাধের দায়েও দায়ী। সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও নীলকরদের এহেন অন্ধ সমর্থকের মধ্যে তিনি কি করে স্বদেশপ্রেম ও মানবপ্রেমের আদর্শ খুঁজে পান, তা সত্যিই দুর্বোধ্য।

একই সূত্রে নবাব আবদুল লতিফের দৃষ্টান্ত পর্যালোচনা অপ্রাসাঙ্গিক হবে না। বাঙ্গালী মুসলমান সমাজে আধুনিক শিক্ষার পথিকৃৎ নবাব আবদুল লতিফও ইংরেজ শাসকের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে মুসলমানদের উন্নতি বিধানে প্রয়াসী ছিলেন। তিনি রামমোহনের মত বিরাট 'মনীষী' ছিলেন না। বৃটিশ সরকারের অধীনে ডেপুটি

www.pathagar.com

ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি করলেও তিনি তার স্বাধীন বিবেককে কখনও বিসর্জন দেননি। ইংরেজ নীলকরের রক্তচক্ষুকে অগ্রাহ্য করে তিনি শোষিত নীলচাষীর পক্ষে রায় দিয়েছিলেন বলে তাঁকে শাস্তিমূলক বদলির সম্মুখীন হতে হয়। তবুও তিনি নতিস্বীকার করেননি। নীলচাষীদের ওপর নীলকরদের অত্যাচারের তদন্তের জন্য গঠিত নীল কমিশনের সামনেও তিনি অকুতোভয়ে নীলচাষীদের পক্ষে তাঁর জোরালো বক্তব্য দান করেন, যা রামমোহনদের মত 'মনীষী'দের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

ইসলামের মত সাম্য-ভ্রাতৃত্বের বিপ্লবী আদর্শের প্রশংসায় সমসাময়িককালের এম. এন. রায় প্রমুখ ভারতীয় হিন্দু মনীষীরা উচ্চকণ্ঠ হলেও কাজী আবদুল ওদুদ হযরত মোহাম্মদ (দঃ) ও কোরআনের তুলনায় রামমোহনের মধ্যে মানবতার আদর্শ খুঁজে পান। যে কাজী আবদুল ওদুদের জীবনের অন্যতম মিশন ছিল মুসলমান সমাজকে অন্ধ সম্মোহন থেকে মুক্তিদান, তিনি নিজেই বাংলার চাষীদের দুশমন রামমোহনের প্রতি অন্ধ সম্মোহনে ভুগতেন। ফলে, নিগৃহীত মুসলিম সমাজ তাকে কখনও সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি।

সেকালের উল্লেখযোগ্য মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে কাজী আবদুল ওদুদই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি, যিনি শেষ অবধিও পাকিস্তান ধারণাকে মেনে নিতে পারেননি। তবে সবকিছুর পরও তাঁর সততাকে ধন্যবাদ দিতে হয় এ কারণে যে, পাকিস্তানকে সমর্থন করেননি বলে তিনি পার্টিশনের সময় ভারতের পক্ষেই অপশন দিয়ে কলিকাতায়ই থেকে যান, যদিও তার সে জীবন তেমন সম্মানজনক ছিল না এবং যদিও তাঁর একমাত্র কন্যা ও জামাতা পাকিস্তানের পক্ষে অপশন দিয়ে ঢাকায়ই থেকে যান।

পাকিস্তান আন্দোলনের পরিপোষক রেনেসাঁ আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের চিন্তাধারার সঙ্গে একমাত্র কাজী আবদুল ওদুদ ছাড়া বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের অন্যান্য কারও মতপার্থক্যই শেষ পর্যন্ত বড় হয়ে দেখা দেয়নি। বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনে মুসলিম সমাজে প্রধানত মননশীলতার চর্চার ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং মুক্তবুদ্ধির চর্চার ক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে হিন্দুদের পর্যায়ে উন্নীত করার প্রয়াস চালানো হয়। বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের কেউ কেউ (যেমন কাজী আবদুল ওদুদ) হিন্দু-মুসলমান বিরোধের জন্য মুক্তবুদ্ধির চর্চার ক্ষেত্রে মুসলমানদের পশ্চাৎপদতাকে দায়ী করেন। কবি আবদুল কাদিরের উদ্দেশ্যে লিখিত এক পত্রে কাজী আবদুল ওদুদ বলেন, "হিন্দু-মুসলমান বিরোধের জন্য মোটের ওপর কোন পক্ষ বেশী দায়ী, এ কথার সোজাসুজি উত্তর দিতে হলে বলতে হয়, মুসলমান। হিন্দু উত্তম নয় বরং অধম, তার দুর্বলতার অবধি নেই, তবু হিন্দু

www.pathagar.com

আলোর পথে, জীবনের পথে পা বাড়াতে চেয়েছে, কিন্তু মুসলমান?" [দ্রষ্টব্য ঃ বুদ্ধির মুক্তি ও রেনেসাঁ আন্দোলন ঃ মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৮, পৃঃ ১০৮]

কাজী আবদুল ওদুদের এই একপেশে বক্তব্যের জবাব দিয়েছেন মুসলিম সাহিত্য সমাজ-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য কবি আবদুল কাদির। তিনি বলেন, "জনতার প্রাথমিক প্রয়োজন আহার, বস্ত্র, বাসস্থান ও শিক্ষার আলোক। তারপর আসছে তার জ্ঞান ও মননে সমৃদ্ধ হওয়ার সমস্যা। এ অবস্থায় আবদুল ওদুদ নির্দেশ করছেন কোন প্রশস্ত পথ? [কাজী আবদুল ওদুদ, পৃঃ ৪৩, [প্রাগুক্ত ঃ পৃঃ ১০৯]

কাজী আবদুল ওদুদের দৃষ্টিভঙ্গি যে কতটা বাস্তবতাবর্জিত, তার প্রমাণ মেলে সেকালের কোন কোন হিন্দুর লেখাতেও। 'হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা ও দেবমন্দির' শীর্ষক এক প্রবন্ধে মন্মথনাথ সরকার লিখেন ঃ "আজ এই যে, ভারতের প্রায় সর্বত্র হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও মন কষাকষি চলছে, এর জন্য প্রকৃতপক্ষে দায়ী কে, হিন্দু না মুসলমান? দোষ নিশ্চয় উভয়েরই আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখতে গেলে হিন্দুই বেশী দোষী।.... হিন্দু সমাজ মুসলমানকে যতটা অবজ্ঞার চোখে দেখে, মুসলমানগণ কখনই হিন্দুকে সেরূপ চোখে দেখে না বলেই বোধ হয়। [সওগাত, মাঘ ১৩৩৩]

বুদ্ধির মুক্তি ও রেনেসাঁ উভয় আন্দোলনই পরিচালিত হয় আধুনিক মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা। তবে প্রথমোক্ত আন্দোলনে মুক্তবুদ্ধির চর্চার ওপর যতটা জোর দেয়া হয়, অর্থনীতিসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে মুসলমানদের উন্নত করার ওপর তেমন জোর না দেয়ায় সমাজে এ আন্দোলন ততটা গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। পক্ষান্তরে রেনেসাঁ আন্দোলনে মুসলমানদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, এক কথায় সামগ্রিক মুক্তির ওপর গুরুত্ব আরোপ করাতে এ আন্দোলন দ্রুত মুসলিম সমাজে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ

পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি ও পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদে প্রায় একই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হলেও ঢাকাকেন্দ্রিক শেষোক্ত সংস্থাই প্রথমে বড় আকারের সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করে। এ সম্মেলনের নাম দেয়া হয় "পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ-এর প্রথম বার্ষিক অধিবেশন"। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হল মিলনায়তনে ১৯৪৩ সালে অনুষ্ঠিত। এ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন কবি কায়কোবাদ। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন সৈয়দ এমদাদ আলী। উদ্বোধনী ভাষণে কবি কায়কোবাদ স্মৃতি রোমন্থন করে বলেন, "আমি যেকালে প্রথম বাংলা

www.pathagar.com

ভাষা চর্চা আরম্ভ করি, সেকালে আমরা চারিজন ব্যতীত অন্য কোন মুসলমান লেখক ছিলেন না।... একজন কুষ্টিয়া লাহিনীপাড়ার মীর মশাররফ হোসেন ও অন্যজন পড়ানের পণ্ডিত রেয়াজউদ্দিন।.... ইহার কিছুকাল পর শান্তিপুরের মোজাম্মেল হক আসিয়া আমাদের সংগে মিলিত হন। ... সেকালে হিন্দু লেখকগণ আমাদিগকে বিশেষ ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, তাঁহারা বলিতেন, মুসলমানেরা বাংলা লিখিতে জানে না।... .... এখন আর সেদিন নাই, আমরা উল্লেখিত চারিজন মুসলমান সাহিত্যিক মুসলিম বংগভাষার সেই শৈশব সময় যে ভিত্তি স্থাপন করিয়া সাহিত্যের উদ্যান সৃজন করিয়াছিলাম, সেই ফল-ফুল শোভিত সাহিত্য উদ্যানে আজ আধুনিক বহু মুসলিম সাহিত্যিক নূতন নূতন সুগন্ধী ফুল ও ফলের বৃক্ষ রোপণ করিয়া উহার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিতেছে, তাহা দেখিলেও হৃদয়ে আনন্দের উদ্রেক হইয়া থাকে।"

উদ্বোধক ও অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছাড়াও সম্মেলনে সাহিত্য সংসদ-এর সভাপতি সৈয়দ সাজ্জাদ হোসাইন ও সম্পাদক সৈয়দ আলী আহসান ভাষণ দান করেন। সৈয়দ সাজ্জাদ হোসাইন তাঁর ভাষণে বাঙালী মুসলমানদের সাহিত্য প্রয়াসকে Celtic Revival-এর সঙ্গে তুলনা করে বলেন– "আমাদের মানসিক ক্লৈব্যের যুগ অতীত হয়ে গেছে, রাজনৈতিক জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে একটা সাহিত্যিক জাগরণ আসাও অবশ্যম্ভাবী।" সম্মেলনের মূল সভাপতি আবুল কালাম শামসুদ্দীন তাঁর ভাষণে বলেন– "কি বিষয়বস্তুতে, কি প্রকাশ ভঙ্গিতে, সাহিত্যে মুসলমানদের নিজত্বের প্রতিষ্ঠা কি করে সম্ভব হবে তা নির্ধারণে সাহিত্য সংসদের মনোযোগ দিতে হবে। মুসলমানের কৃষ্টি, মুসলমানের তমদ্দুন, মুসলমানের সমাজব্যবস্থা, মুসলমানের জীবনযাত্রা প্রণালী সাহিত্যে রূপায়িত করতে হবে এবং তাতেই হবে মুসলমানের সাহিত্য সাধনার সার্থকতা। অনুকরণ-অনুসরণে এ সম্ভব নয়।"

কলিকাতার দৈনিক আজাদ, সাপ্তাহিক মোহাম্মদী, মাসিক মোহাম্মদী, সওগাত প্রভৃতির মত ঢাকায় মুসলমানদের তেমন কোন সাময়িকী বা পত্র-পত্রিকা না থাকলেও ঐ সময়ে 'পাকিস্তান' নামের একটি পাক্ষিক পত্রিকা ঢাকা থেকে বের হত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ-এর কর্মী নজীর আহমদ ঐ পত্রিকার পরিচালক ছিলেন। সম্পাদক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক মজহারুল হক। পরবর্তীকালে এই নিবেদিতপ্রাণ কর্মী নজীর আহমদকে হিন্দু ছাত্ররা ছুরিকাঘাতে হত্যা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্তাক্ত সন্ত্রাসের সূত্রপাত ঘটায়। অধ্যাপক মজহারুল হক বাংলাদেশ আমলে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্রথম সভাপতি হিসেবে পরিণত বয়সে ইন্তেকাল করেন।

www.pathagar.com

পাক্ষিক 'পাকিস্তান' পত্রিকায় নিয়মিতভাবে মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ও পাকিস্তান দাবীর উপর উচ্চমানের রচনাদি প্রকাশিত হত। এমনকি যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তি নিজস্ব বিশ্বাস হিসাবে না হলেও অনিবার্য বাস্তবতা হিসেবে মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবীর প্রতি সমর্থন দান করেন, তাদের লেখাও এই 'পাকিস্তান' পত্রিকায় মাঝে মাঝে পুনর্মুদ্রিত বা প্রকাশিত হত। এই সুবাদেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়' শীর্ষক প্রবন্ধের অংশবিশেষ পুনর্মুদ্রিত হয় পাক্ষিক 'পাকিস্তান'-এর ২৬ জুন, ১৯৪৪ তারিখের সংখ্যায়।

রবীন্দ্রনাথ তার উক্ত রচনায় বলেন– "হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে একটি মতপার্থক্য আছে, তাহা ফাঁকি দিয়া উড়াইয়া দিবার জো নাই। প্রয়োজন সাধনের আগ্রহবশত সেই পার্থক্যকে যদি আমরা না মানি, তবে সেও আমাদের প্রয়োজনকে মানিবে না।... আমরা মুসলমানকে যখন আহবান করিয়াছি তাহাকে কাজ উদ্ধারের সহায় বলিয়া ডাকিয়াছি, আপন বলিয়া ডাকি নাই। যদি কখনো দেখি তাহাকে কাজের জন্য আর দরকার নাই, তবে তাহাকে অনাবশ্যক বলিয়া পিছনে ঠেলিতে আমাদের বাধিবে না।... আমাদের দেশে মুসলমান স্বতন্ত্র থাকিয়া নিজের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিতেছে। তাহা আমাদের পক্ষে যতই অপ্রিয় এবং তাহাতে আমাদের আপাতত যতই অসুবিধা হউক, একদিন পরস্পরের যথার্থ মিলন সাধনের পক্ষে ইহাই প্রকৃত উপায়।... যে কথা লইয়া এই প্রবন্ধের আলোচনা করিতেছি তা সত্যিকার স্বাতন্ত্র্য। সে স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত করা আত্মহত্যা করারই সমান।" [দ্রষ্টব্য ঃ পাকিস্তান আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য ঃ সম্পাদনা ঃ সরদার ফজলুল করিম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, মার্চ ১৯৬৮, পৃঃ ৯১-৯৩]

পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সম্মেলন

ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ-এর প্রথম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার এক বছর পরই কলিকাতায় পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সম্মেলন। ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে কলিকাতার ইসলামিয়া কলেজ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের জন্য যে অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয় তার সভাপতি ছিলেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন। সম্পাদক নির্বাচিত হন কাজী মোহাম্মদ ইদরিস, সহকারী সম্পাদক সৈয়দ সাদেকুর রহমান ও এম নাসির আলী বিকম। সম্মেলনের মূল সভাপতি নির্বাচিত হন আবুল মনসুর আহমদ। শাখা সভাপতিবৃন্দ ছিলেন ঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন (সাহিত্য), আবুল হাসানাত (ভাষা), মুজিবুর রহমান খাঁ (তমদ্দুন), অধ্যাপক আবদুস সাদেক (অর্থনীতি), অধ্যাপক আদমউদ্দিন আহমদ (পুঁথি সাহিত্য), অধ্যাপক সুশোভন সরকার (রাষ্ট্রনীতি), হবীবুল্লাহ বাহার (শিক্ষা), মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য (লোক

www.pathagar.com

সাহিত্য), আবদুল মওদুদ (ইতিহাস), বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ (শিশু সাহিত্য) ও ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরু (সঙ্গীত)

এই সম্মেলন তিনদিন ধরে চলে। প্রতিদিন দু'বার করে অধিবেশন বসত। উদ্বোধনী অধিবেশনে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই সভাক্ষেত্রে তিল ধারণের জায়গা ছিল না। সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, মূল সভাপতি ও শাখা সভাপতিবৃন্দ ছাড়াও বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত বিপুলসংখ্যক প্রবীণ ও তরুণ মুসলিম সাহিত্যিক ও সাহিত্যামোদী যোগ দেন। সম্মেলনে প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, খাজা শাহাবুদ্দীন, তমিজউদ্দিন খাঁ প্রমুখ মন্ত্রীবর্গ ছাড়াও এ কে ফজলুল হক, স্যার হাসান সোহরাওয়ার্দী, মওলানা আকরম খাঁ, নূরুল আমিন, আবদুর রহমান সিদ্দিকী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং প্রবীণ গবেষক ডঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী, কবি শাহাদাৎ হোসেন, কবি গোলাম মোস্তফা, এস ওয়াজেদ আলী, কবি আবুল হোসেন, কবি ফররুখ আহমদ, কবি আহসান হাবীব, আবু জাফর শামসুদ্দীন, তালেবুর রহমান, কবি তালিম হোসেন, মওলানা মুস্তাফিজুর রহমান, মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ (লালকোর্তা), কবি গোলাম কুদ্দুস প্রমুখ সাহিত্যিকবৃন্দ যোগ দেন। সম্মেলনে বহু হিন্দু সাহিত্যিক, সাংবাদিকও যোগ দেন। এঁদের মধ্যে কবি নরেন্দ্র দেব, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, কবি রাধারাণী দেবী, বঙ্কিম মুখার্জী, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। [দ্রষ্টব্য ঃ অতীত দিনের স্মৃতি; আবুল কালাম শামসুদ্দীন, ১৯৮৫, পৃঃ ১৯৮-১৯৯]

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের পর কামাল চৌধুরী রচিত এবং ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরু কর্তৃক সুর সংযোজিত 'পাকিস্তান, পাকিস্তান, আমাদের এই পাকভূমি' শীর্ষক উদ্বোধনী সঙ্গীতটি গেয়ে শোনানো হয়। ওস্তাদ খসরুর সঙ্গে এ সমবেত সঙ্গীত পরিবেশনে অংশগ্রহণ করেন বেদারউদ্দিন আহমদ, শেখ লুৎফর রহমান, মোশাররফ হোসেন প্রমুখ শিল্পী।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণে আবুল কালাম শামসুদ্দীন বলেন, "পূর্ব পাকিস্তান কথাটা শুনেই আপনারা নিশ্চয়ই বুঝেছেন ভারতের এই পূর্বাঞ্চলের সীমার একটা গুরুতর পরিবর্তন আমরা চাই। শুধু সীমার পরিবর্তনই নয়, সেই পরিবর্তিত অঞ্চলের পূর্ব আজাদীও আমাদের কাম্য।... আজাদী আমাদের জন্মগত অধিকার। এ অধিকার লাভের জন্য মানুষ দরকার হলে জীবনভর সংগ্রাম করে। আমরাও সংগ্রাম করে চলেছি।..... পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি আমাদের সাহিত্যে সুস্থতা ও স্বকীয়তা ফিরিয়ে আনতে চায়। তমদ্দুন, শিক্ষা, ইতিহাস, অর্থনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রেও পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের স্বকীয় বিশিষ্টতাকে খুঁজে

www.pathagar.com

বের করতে হবে, তাকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।" [দ্রষ্টব্য ঃ পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য, সরদার ফজলুল করিম সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ১৯৬৮, পৃঃ ১২৯-১৩৩]

মূল সভাপতির ভাষণে আবুল মনসুর আহমদ বলেন, পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি পূর্ব পাকিস্তানেরই রেনেসাঁ আনতে চায়। পূর্ব পাকিস্তান একটি ভৌগোলিক ইউনিট। সাহিত্যিকের চোখে বিপ্লবীর বিচারে মানুষ ছাড়া ভূগোলের আলাদা সত্তা নেই। তাই রেনেসাঁ সোসাইটি পূর্ব পাকিস্তান বলতে এই ইউনিটের বাসিন্দাদেরই বুঝে থাকে। সোসাইটি তাই ভূগোলের নয়, মানুষের রেনেসাঁ চায়। এখন প্রশ্ন ওঠে, রেনেসাঁ কাকে বলে? জাতির মরা হাড়ে জীবনের বিদ্যুৎ চমকানোকেই আমরা এক কথায় রেনেসাঁ বলে থাকি। রাষ্ট্রে-সমাজে, শিল্পে-সাহিত্যে, ব্যবসা-বাণিজ্যে এক কথায় জীবনের সকল স্তরে বিপ্লব আনার নাম রেনেসাঁ।" [প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪১-১৪২]

উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে কবি নরেন্দ্র দেব ও বঙ্কিম মুখার্জী উচ্ছ্বসিত ভাষায় সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের প্রশংসা করে মুসলমান সাহিত্যিকরা যে সাহিত্যে তাদের স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়ে তুলতে চাচ্ছেন তার ফলে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হবে বলে মত প্রকাশ করেন।

অধ্যাপক সুশোভন সরকার রাষ্ট্রনীতি শাখার সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, ভারত এক দেশ, এক জাতি, এ ধারণা ভুল– ভারত কয়েকটি জাতির একটি উপমহাদেশ। কাজেই এখানে মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের প্রশ্নটি একটি সত্যভিত্তিক ব্যাপার।

তমদ্দুন শাখার সভাপতি জনাব মুজীবুর রহমান খাঁ তাঁর ভাষণে বলেন, যারা ভারতীয় সংস্কৃতি এক ও অভিন্ন এরূপ অভিমত প্রকাশ করেন তারা ভ্রান্ত। ভারতীয় মুসলমানদের সংস্কৃতি ও ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতি সম্পূর্ণ আলাদা। এই সাংস্কৃতিক বিভিন্নতার অস্তিত্বই পাকিস্তান পরিকল্পনাকে বাস্তব ভিত্তিক করে তুলেছে। [দ্রষ্টব্য ঃ অতীত দিনের স্মৃতি, ১৯৮৫, পৃঃ ২০১]

শেষ দিন রাত আটটা থেকে ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরুর পরিচালনায় শুরু হয় সাংস্কৃতিক জলসা। সিলেট থেকে আগত জনৈক পুঁথিপাঠকের সুর করে পুঁথি পাঠের মাধ্যমে জলসা শুরু হয়। চট্টগ্রাম থেকে আগত জনৈক শিল্পী আলাওল থেকে পুঁথি পাঠ করে শোনান। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত শিল্পীরা জারি, সারি, মারফতী, ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া, গম্ভীরা প্রভৃতি গান পরিবেশন করেন। রাত ১২টা পর্যন্ত হল ভর্তি দর্শক-শ্রোতাগণ উপভোগ করেন এ অনুষ্ঠান। অনেকের মতেই এ ধরনের সম্মেলন ইতিপূর্বে আর কখনও দেখা যায়নি।

www.pathagar.com

ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ-এর প্রথম বার্ষিক অধিবেশন (১৯৪৩) এবং কলিকাতায় পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সম্মেলন (১৯৪৪)। উভয় সম্মেলনই মুসলিম শিল্পী-সাহিত্যিকদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। সম্মেলনে পঠিত বিভিন্ন ভাষণ ও প্রবন্ধ মাসিক মোহাম্মদীতে প্রকাশিত হওয়ার ফলে এবং দৈনিক আজাদ-এ এসব সম্মেলনের বিস্তারিত বিবরণী প্রকাশিত হওয়ায় যারা এসব সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে পারেননি তারাও এতে পঠিত ও আলোচিত বিষয়াদি সম্বন্ধে অবহিত হবার সুযোগ লাভ করেন।

পাকিস্তান আন্দোলনে শিল্পী-সাহিত্যিকদের ভূমিকা

মাসিক মোহাম্মদী ও মাসিক সওগাত-এ প্রকাশিত লেখা ছাড়াও দৈনিক আজাদ, সাপ্তাহিক মোহাম্মদী, সাপ্তাহিক মিল্লাত প্রভৃতি পত্রিকার ঈদ সংখ্যায়ও ভাল লেখা ছাপা হতো। যেগুলো আমাদের সে সময় মনের খোরাক যোগাতো। বিশেষ করে ফররুখ আহমদের উদ্দীপনাময়ী কবিতা আমাদের গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করতো। ফররুখ আহমদ ছাড়া আর যাদের কবিতা এ সময় আমাদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করতো তাদের মধ্যে ছিলেন শাহাদাৎ হোসেন, গোলাম মোস্তফা, জসীম উদ্‌দীন, বেনজীর আহমদ, বন্দে আলী মিয়া, কাদের নওয়াজ, মহিউদ্দীন, সৈয়দ আলী আহসান, আব্দুল কাদির, মতিউল ইসলাম, সৈয়দা মোতাহেরা বানু, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, সুফিয়া এম হোসেন (পরে কামাল), আহসান হাবীব, মঈনুদ্দিন, মুফাখখারুল ইসলাম, তালিম হোসেন, সৈয়দ আলী আশরাফ, হোসনে আরা, সিকান্দর আবু জাফর, শাহেদা খানম, আব্দুল হাই মাশরেকী প্রমুখ।

গোলাম মোস্তফা প্রমুখ কবিদের গানের কথা আগেই বলেছি। পাকিস্তান আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সমগ্র উপমহাদেশের মুসলিম জনগণের মধ্যে যে বিপুল সাড়া জাগে, তার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় কবি শাহাদাৎ হোসেনের এ সময়ের বহু কবিতায়। এমনি এক কবিতায় শাহাদাৎ হোসেন লিখেন ঃ

"বঙ্গ জলধি আরব সিন্ধু ভারত তীর্থ কূলে
মহামিলনের মহাসংগমে উল্লাসে আজি
দুলে।
পাহাড় তটিনী কলজয়গানে
পাঞ্জাব ছুটে যুগ আহবানে
দূর সীমান্ত ও জীরিস্তানে
বৈজয়ন্তী দুলে।

www.pathagar.com

....

তখতে তাউস ডাকে ইশারায়
দিল্লীর বুকে গুরু গরিমায়
যুগের মোগল আয় ফিরে আয়
পুণ্য বেদীর স্থলে।
নব-শাজাহান কে আছিস আয়!
নব-তেন তাজ কে গড়িবি আয়
কে আলমগীর নব-ফতোয়ায়
জাগিবি তীর্থ কূলে।
আয় আয় ওরে কাল বয়ে যায়
মহামিলনের নব ঈদগায়
ওই শোন কেরে ডেকে চলে যায়
কাণ্ডারী বেদীমূলে।"

[আহবান, মাসিক মোহাম্মদী ঃ ফাল্গুন ১৩৫২]

ফররুখ আহমদ অবশ্য শাহাদাৎ হোসেনের মত পাকিস্তান আন্দোলনের মাধ্যমে মোগল শান-সওকত ফিরে পাবার স্বপ্ন দেখেনি। তিনি পাকিস্তান আন্দোলনের মাধ্যমে স্বপ্ন দেখেন সিরাজাম মুনিরা নবী মোস্তফার (সাঃ) দেখানো পথে মানবতা পুনঃ প্রতিষ্ঠার, তিনি স্বপ্ন দেখেন প্রথম যুগের খলিফাদের আদলে ক্ষুধিত-বঞ্চিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার। তাই তাঁর আহবান ঃ

"হে নিশান ফের ইংগিত দাও মানবতার,
হে নিশান ফের ইংগিত দাও
মৃত যাত্রীকে পথ চলার

....

ক্ষুধিত মাটিতে সে নয় তাজমহল,
মানুষের মাঠে, বিরান মাটিতে
এবার ফলাবে তাজা ফসল,
এবার নিশান থামবে না তুমি
গড়তে শিলার তাজমহল
এবার তোমার যাত্রা যেখানে
ক্ষুধা বিশীর্ণ অশ্রুজল,

এবার তোমার যাত্রা সে পথে
যেথা ওমরের পায়ের ছাপ

www.pathagar.com

জং ধরে যেথা পড়ে আছে হায়
আলির হাতের জুলফিকার।
পিঠে বোঝা নিয়ে ক্ষুধিতের ধারে
চলে একটানা পথ তোমার;
দেখো সিরাজাম মুনিরা জ্বলছে
মুছে দিতে সব ফাঁকা প্রলাপ...।

[নিশান ঃ মোহাম্মদী, আশ্বিন ১৩৫১]

কবি মুফাখখারুল ইসলামের চোখে পাকিস্তান আন্দোলন ছিল বন্দী ইউসুফ নবীর (আঃ) আজাদী আর মজলুম ত্রাণের স্বপ্ন ঃ

"-আমে নওল পাকিস্তান।
বেগুনা বন্দী য়ুসুফের কাছে
আজাদীর ফরমান।।
সব রহস্য হইলো জাহির
শাহী খোয়াবের এই তো তাবীর ঃ
ভুখারীর তরে ফসল জমাও-
মজলুমে দাও ত্রাণ।।"

[তারানা-ই-পাকিস্তান ঃ মোহাম্মদী অগ্র-পৌষ ১৩৫১]

কবি রওশন ইজদানীর কাছে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আকুতি ছিল মুসলিম জাতির বহু শতাব্দীর সঞ্চিত স্বপ্নের বাস্তবায়ন। তাই পাকিস্তান সংগ্রামের মহানায়ককে তিনি তসলিম জানান "হিন্দের কুল মজলুম মুসলিম"-এর পক্ষ থেকে ঃ

"দুর্বার বেগে পদতলে দলি শত সীমারের
শির
বিজয় মুকুট লভিয়াছ তুমি সেপাহসালার
বীর!
তুমি-লওহে সালাম লও,
জিন্দেগানীর দারাজি লভিয়া তুমি রও জিতা
রও
তোমারি প্রিয় হিন্দের কুল মজলুম মুসলিম
তোমার চরনে ভেজে নিশিদিন লাখো কোটি
তসলিম।"

[কায়েদে আজম ঃ মোহাম্মদী, কার্তিক ১৯৫১]

ফররুখ আহমদ রচিত "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান" শীর্ষক গান সম্পর্কিত

www.pathagar.com

দুঃখজনক ঘটনার কথা আগেই উল্লেখ করেছি। একই রূপ ভাগ্য বরণ করেছিল ডঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকীর "পাকিস্তান-নামা" শীর্ষক পুঁথি কাব্যগ্রন্থ। আবুল কালাম শামসুদ্দীনের মতে, পাকিস্তান আন্দোলনের ভিত্তিতে লেখা এ গ্রন্থে পুঁথি কাব্য রচনার ক্ষেত্রে আব্দুল গফুর সিদ্দিকী অসামান্য দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন।

পাকিস্তান সংগ্রামকে কেন্দ্র করে প্রচুর সংখ্যক প্রবন্ধ, কবিতা ও গান রচিত হলেও এই আন্দোলনকে ভিত্তি করে কথা সাহিত্য রচিত হয়েছে খুবই কম। কথা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে মুসলমানরা আগা-গোড়াই হিন্দুদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে ছিল। মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদ সিন্ধু'র পর নজিবুর রহমান সাহিত্যরত্নের 'আনোয়ারা' উপন্যাসই সম্ভবত মুসলিম সমাজে সর্বাধিক পাঠকপ্রিয়তা লাভে ধন্য হয়। এ উপন্যাসে তদানীন্তন বাঙালী মুসলিম সমাজচিত্র সুন্দরভাবে উঠে এলেও শিল্পমানের নিরিখে এটি কতটা উত্তীর্ণ হয়েছিল সে সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে স্বাভাবিকভাবেই।

পাকিস্তান আন্দোলনের আগে বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে আর যারা গল্প বা উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে এগিয়ে আসেন, তাদের মধ্যে শান্তিপুরের মোজাম্মেল হক, শেখ হাবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মোহাম্মদ হেদায়েতুল্লাহ, কাজী নজরুল ইসলাম, কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী ইমদাদুল হক, এস ওয়াজেদ আলী, ইব্রাহীম খাঁ, আবুল মনসুর আহমদ, গোলাম মোস্তফা, আকবর উদ্দিন, মাহবুব-উল আলম প্রমুখের নাম উল্লেখের দাবী রাখে। এর মধ্যে শেখ হাবিবর রহমান সাহিত্যরত্নের 'আলমগীর' ছিল একখানি সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস। সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর উপন্যাস রচিত হয়েছিল প্রধানত বঙ্কিমচন্দ্রের মুসলিম বিদ্বেষী কতিপয় উপন্যাসের জবাব হিসাবে। কাজী ইমদাদুল হকের উপন্যাস আবদুল্লাহই ছিল সম্ভবত একমাত্র গ্রন্থ, যেখানে তদানীন্তন মুসলিম সমাজের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক চিত্র সার্থকভাবে প্রতিফলিত হয়। যদিও শৈল্পিক দৃষ্টিতে এটিও খুব উচ্চমানের ছিল না। রাজনীতিক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক আবুল মনসুর আহমদের খ্যাতি ছিল প্রধানত ব্যঙ্গরসাত্মক গল্পকার হিসেবে। সেই নিরিখে কাজী নজরুল ইসলামের 'মৃত্যুক্ষুধা'ই ছিল তখন পর্যন্ত একমাত্র উপন্যাস, যা রচিত হয় বৃটিশ পৃষ্ঠপোষিত মিশনারী কর্মকান্ড ও স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিতে।

পাকিস্তান আন্দোলনের সময় মাহবুব-উল আলমই ছিলেন একমাত্র প্রতিষ্ঠিত মুসলিম কথা-সাহিত্যিক। এ সময় বেশ কয়েকজন মুসলমান সাহিত্যিক কথা-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এগিয়ে আসেন। এরা হচ্ছেন ঃ আবুল ফজল, মোহাম্মদ কাসেম, সৈয়দ ওয়ালিউলাহ্, আবু রুশদ, শাহেদ আলী, শওকত ওসমান, মহিউদ্দীন, আবু

www.pathagar.com

জাফর শামসুদ্দীন, কাজী আফসার উদ্দিন আহমদ, মবিন উদ্দিন আহমদ, আব্দুল হাই মাশরেকী, শামসুদ্দিন আবুল কালাম প্রমুখ। এরা প্রায় সবাই পাকিস্তান আন্দোলনের সমর্থক হলেও তাদের গল্প-উপন্যাসে এরা প্রধানত মুসলিম সমাজের বিশেষ আর্থ-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত তুলে ধরতেই প্রয়াসী হন। এদের রচিত গল্প-উপন্যাসেই আমরা প্রথম চারপাশের সমাজ জীবনের প্রতিচ্ছায়া দেখতে পেয়ে আমরা দারুণ আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করতাম।

কথা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে মুসলমান পিছিয়ে থাকলেও নাটকে এ সময়ে অনেককেই এগিয়ে আসতে দেখা যায়। কথা-সাহিত্যের মত নাটকের ক্ষেত্রেও পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন উনিশ শতকের অমর মুসলিম সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেন। তবে একমাত্র কাজী নজরুল ইসলাম ব্যতীত অধিকাংশ মুসলিম নাট্যকারের সৃষ্টি-প্রয়াস ঐতিহাসিক নাটকে সীমাবদ্ধ ছিল। নজরুলের নাটক অবশ্য সামাজিক, লোককাহিনী, পৌরাণিক নানা বিচিত্র থিমে পরিপুষ্ট ছিল। শুধু নাটক নয়, চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও নজরুলের ভূমিকা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষেই ছিল অসাধারণ।

অন্যান্য যারা এ সময় নাটক রচনার ক্ষেত্রে এগিয়ে আসেন তাদের মধ্যে ছিলেন শাহাদাৎ হোসেন, আকবর উদ্দিন, ইব্রাহীম খাঁ। শাহাদাৎ হোসেন ও আকবর উদ্দিন উভয়ই ইসলামের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ও খ্যাতনামা বীরদের কীর্তিগাঁথা অবলম্বনে নাটক রচনা করেন। এসব নাটক কোথাও মঞ্চস্থ হয় কি-না জানা যায়নি, কিন্তু এগুলোতে মুসলমানরা যে তাদের গৌরবময় ইতিহাস সম্বন্ধে অবহিত হয়ে হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে প্রেরণা লাভ করতো, তা সুস্পষ্ট। সেই নিরিখে পাকিস্তান আন্দোলনের কর্মীদের এগুলো যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস যোগাতো।

ইব্রাহীম খাঁ অবশ্য এ ব্যাপারে ব্যতিক্রমী ভূমিকা পালন করেন। ইসলামের অতীতের কোন গৌরবময় অধ্যায় নিয়ে নয়, তিনি দু'খানি নাটক রচনা করেন আধুনিক তুরস্কের দুই স্থপতি কামাল পাশা ও আনোয়ার পাশা অবলম্বনে। মহাযুদ্ধে পরাজিত জার্মান-পক্ষ অবলম্বনকারী তুরস্কের সমগ্র ভূখণ্ড যখন বিজয়ীদের আশীর্বাদপুষ্ট প্রতিবেশী দেশ গ্রীস দখল করে নিতে উদ্যত হয়, তখন গ্রীকদের আগ্রাসন সফলভাবে প্রতিহত করার কারণে মুসলিম বিশ্ব তখন তুরস্কের এ সাফল্যে দারুণ অভিভূত হয়েছিল, যদিও কামাল পাশা কর্তৃক খিলাফতের অবলুপ্তি অনেকেই সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। সে সময় তুরস্কের কামাল পাশা ও আনোয়ার পাশা, মিশরের জাতীয়তাবাদী নেতা জগলুল পাশা, মরক্কোর রীফ নেতা গাজী আব্দুর করিম, পারস্যের রেজা শাহ পাহলভী, আফগানিস্তানের আমানুল্লাহ খান, আরব উপদ্বীপের ইবনে সউদ মুসলিম বিশ্বে কতখানি জনপ্রিয় ছিলেন তার প্রমাণ

www.pathagar.com

পাওয়া যায় নজরুলের একাধিক কবিতায়। কামাল পাশার ইউরোপীয় সেকুলারিজমের প্রভাবে ইসলামের ধর্মীয় ঐতিহ্যের পরিপন্থী বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে পরবর্তীকালে তার বিরুদ্ধে যত সমালোচনাই হোক, আধুনিক ইতিহাসে তুরস্কের হাতে আগ্রাসী গ্রীসের পরাজয়ের কারণে সে সময় বিশ্বে তুরস্ক মুসলিম নবজাগরণের অন্যতম অগ্রদূত হিসেবেই বিবেচিত হতো। ইকবাল নিজেও একদা তুর্কী বিপ্লবের বেশ প্রশংসা করেন। কায়েদে আজম পরোক্ষ প্রশংসার ভঙ্গীতে প্রায়ই বলতেন– কামাল পাশার মত আমার হাতে কোন সেনাবাহিনী নেই, আমার প্রধান হাতিয়ার শাণিত যুক্তি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে নজরুল ছাড়া মুসলমান শিল্পীদের আরও কেউ কেউ নাটক ও চলচ্চিত্রে অভিনয় ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট হন। তবে তারা অধিকাংশই নাম পাল্টিয়ে হিন্দু নামে তা করেন। এটা শুধু গান, নাটক, সিনেমা প্রভৃতি সম্বন্ধে বৃহত্তর মুসলিম সমাজের প্রতিকূল মনোভাবের কারণে কি-না তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। মুসলমানরা সাহিত্য জানে না, শিল্প বোঝে না, হিন্দুদের অনেকের মধ্যে এ ধরনের একটা মনোভাবও এ জন্য কিছুটা দায়ী হতে পারে।

পাকিস্তান আমলে নাটকের ক্ষেত্রে চমক সৃষ্টিকারী নূরুল মোমেন লেখালেখির জগতে পদচারণা শুরু করেন পাকিস্তান আন্দোলনকালেই। পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে অসংখ্য সামাজিক, ঐতিহাসিক, লোককাহিনীভিত্তিক নাটক উপহার দিয়ে যিনি আমাদের নাট্য-সাহিত্যকে বিপুলভাবে সমৃদ্ধ করেন, সেই আসকার ইবনে শাইখের প্রথম সামাজিক নাটক 'বিরোধ' রচিত হয় বিভাগ-পূর্ব আমলেই এবং এটি কবি আহসান হাবীবের ভূমিকাসহ প্রকাশিত হয় কলিকাতা থেকে।

আগেই বলেছি, বিভাগ-পূর্ব আমলে দৈনিক আজাদ, সাপ্তাহিক মোহাম্মদী, সাপ্তাহিক মিল্লাত প্রভৃতি পত্রিকার ঈদ সংখ্যায় প্রকাশিত বিভিন্ন রচনা আমাদের দারুণ অনুপ্রাণিত করতো। এ ধরনের ঈদ সংখ্যাতেই আকবর উদ্দীনের নাটক 'আজান' এবং ইব্রাহীম খাঁর নাটক 'কাফেলা' প্রকাশিত হয়। এ নাটক দু'টিই মুসলিম জাগরণের পটভূমিতে রচিত হওয়ায় আমাদের গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে। কাজী মোহাম্মদ ইদরিস কোন এক ঈদ সংখ্যায় লিখেছিলেন ঃ একটি প্রবন্ধ, যার শিরোনাম ছিল–" গান্ধী যদি মুসলমান হতেন, আর চার্চিল যদি ক্যাথলিক হতেন।" এই রচনায় সূক্ষ্মরসাত্মক ভঙ্গীতে আইরিশ রিভাইভ্যাল আন্দোলনের সঙ্গে পাকিস্তান আন্দোলনের সামঞ্জস্য তিনি চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তোলেন।

পাকিস্তান আন্দোলনে সাপ্তাহিক 'মিল্লাত' খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ঐ সময় দৈনিক 'আজাদ' অফিস থেকেও প্রকাশিত হত আরেকটি সাপ্তাহিক– সাপ্তাহিক মোহাম্মদী। সাপ্তাহিক মোহাম্মদীকে মনে করা হত দৈনিক আজাদ-এর

www.pathagar.com

সাপ্তাহিক সংস্করণ। মফস্বলের যেসব মুসলমানের 'আজাদ'-এর গ্রাহক হবার সামর্থ্য ছিল না, তারা সাপ্তাহিক মোহাম্মদী-এর গ্রাহক হত। সাপ্তাহিক মোহাম্মদী ছিল সংবাদ-প্রধান পত্রিকা, আর সাপ্তাহিক মিল্লাত ছিল মতামত-প্রধান (ভিউজ উইকলী) পত্রিকা– প্রাদেশিক মুসলিম লীগের মুখপত্র। সন্দ্বীপের বিখ্যাত লেখক মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ 'মিল্লাতে' নিয়মিত লিখতেন 'লালকোর্তা' ছদ্মনামে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, পাকিস্তান আমলে তাঁর রচিত 'ফাঁসির মঞ্চে' এবং 'আমাদের মুক্তি সংগ্রাম' শীর্ষক দু'খানি বইয়েই আমরা প্রথম জানতে পারি যে, বহুল প্রচারিত ক্ষুদিরাম, সূর্যসেন, প্রফুল্ল চাকীদের অনেক অনেক আগে মুসলমানরা স্বাধীনতার জন্য বিপ্লবী আন্দোলনে ও জেহাদ আন্দোলনে অংশগ্রহণ শুরু করে ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের ভিত কাঁপিয়ে তোলেন এবং সে সংগ্রামে বাঙালী মুসলমানদের ভূমিকাও ছিল অতিশয় গৌরবময়।

পাকিস্তান আন্দোলনের অন্যতম নেতা মৌলভী তমিজউদ্দিন খাঁর একটি সংক্ষিপ্ত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক জীবন ছিল, যা অনেকেরই জানা নেই। পাকিস্তান সংগ্রামকালে তিনি 'মদীনা' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন কলিকাতা থেকে। অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সমস্যার কারণে অবশ্য পত্রিকাখানি অল্পদিন পরই বন্ধ হয়ে যায়। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্র মৌলভী তমিজউদ্দীন খাঁ বাংলায় একখানি উপন্যাসও রচনা করেছিলেন।

পাকিস্তান আন্দোলনকালে কলিকাতা থেকে মুসলমানদের দু'খানি ইংরেজী দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হত : মর্নিং নিউজ এবং স্টার অব ইন্ডিয়া। প্রথমটির সম্পাদক ছিলেন আবদুর রহমান সিদ্দিকী। বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজী সাংবাদিকতার পথিকৃৎ ছিলেন 'দি মুসলমান' পত্রিকার সম্পাদক মৌলভী মুজিবর রহমান। তিনি বিপ্লবী চিন্তাধারার অধিকারী ছিলেন। প্রখ্যাত সাংবাদিক মোহাম্মদ মোদাব্বেরের রাজনৈতিক ও সাংবাদিক জীবনের সূচনা হয় তাঁর প্রেরণাতেই। পাকিস্তান আন্দোলনকালে কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হয় 'কমরেড' নামের একখানি ইংরেজী সাপ্তাহিক, যার সম্পাদক ছিলেন 'পাকিস্তান' গ্রন্থের রচয়িতা খ্যাতনামা সাংবাদিক মুজিবর রহমান খাঁ।

আগেই বলেছি, আবুল হাশিম সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'মিল্লাত' পাকিস্তান আন্দোলনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আবুল হাশিম সাহেব পাকিস্তান আন্দোলনকালে প্রায়শই সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড উপলক্ষে সারা প্রদেশব্যাপী ঝটিকা সফরে ব্যস্ত থাকতেন। তিনি কেমন অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন, সে কথা আগেই বলেছি। কিন্তু না, তিনি শুধু একজন উচ্চমানের বাগ্মীই ছিলেন না, লেখক হিসেবেও ছিলেন অসাধারণ। তিনি মাঝে মধ্যেই 'মিল্লাত'-এ লিখতেন। তাঁর এসব

www.pathagar.com

লেখায় ইসলামের যে বিপ্লবী রূপ প্রকাশ পেতো, তা শুধু মুসলিম লীগের কর্মীদেরই নয়, অন্যান্য রাজনৈতিক দলের প্রগতিশীল কর্মীদেরও বিশেষভাবে আকৃষ্ট করতো। তিনি ইসলামকে উপস্থাপিত করতেন একটি বিপ্লবী, সাম্যবাদী বিশ্বজনীন আদর্শ হিসাবে। একে তিনি বলতেন, ইসলামের রব্বানী বা বিশ্বপালনবাদী রূপ, যা তিনি পান যুক্তপ্রদেশের বিখ্যাত দার্শনিক আল্লামা আজাদ সোবহানীর কাছ থেকে।

বাংলাদেশে পাকিস্তান সংগ্রামের বৈশিষ্ট্য

আবুল হাশিম সাহেব পাকিস্তান আন্দোলনকালেই কঠিন চক্ষুরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রায়ান্ধ হয়ে যায়। অন্যের সাহায্য ছাড়া চলাফেরা করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হত না। এ অবস্থা নিয়েও তিনি পাকিস্তান আন্দোলন যাতে শ্লোগানসর্বস্ব সুবিধাবাদী আন্দোলনে পরিণত না হয় সে জন্য যেখানেই যেতেন, তরুণ ও ছাত্র-কর্মীদের সাথে নিয়মিত কোরআন ক্লাস এবং আদর্শিক ও রাজনৈতিক ক্লাস নিতেন। এসব ক্লাসে তিনি একদিকে যেমন ইসলামের দীর্ঘ অবহেলিত বিপ্লবী রূপ তুলে ধরতেন, তেমনি উপমহাদেশের ইতিহাসের বাস্তব পটভূমিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অপরিহার্যতা সকলকে বুঝিয়ে দিতেন। এসব বৈঠকে তদানীন্তন মুসলিম লীগের তরুণ নেতা ও কর্মীরা, বিশেষ করে মুসলিম লীগের সোহরাওয়ার্দী-হাশিম গ্রুপের কর্মীরা নিয়মিত যোগ দিতেন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ বাহ্যত একটি রাজনৈতিক দল হলেও নেতৃত্বের মধ্যে পার্থক্যের কারণে অনেকের অলক্ষ্যে এর অভ্যন্তরে একটা উপদলীয় সংঘাত কাজ করছিল। উপদল দু'টির একটির নেতৃত্বে ছিলেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম প্রমুখ। অপরটির নেতৃত্বে ছিলেন মওলানা আকরম খাঁ, খাজা নাজিমুদ্দিন প্রমুখ। শেষোক্ত গ্রুপে অন্যান্য নেতাদের মধ্যে ছিলেন খাজা শাহাবুদ্দীন, নূরুল আমিন, ফজলুর রহমান, ইউসুফ আলী চৌধুরী প্রমুখ এবং শাহ আজিজুর রহমান, আবু সালেক প্রমুখ ছাত্র নেতৃবৃন্দ। প্রথমোক্ত গ্রুপের অন্যান্য নেতাদের মধ্যে ছিলেন মওলানা রাগেব আহসান, আবুল মনসুর আহমদ, ডাঃ এ এম মালেক, মোহাম্মদ আলী (বগুড়া), শামসুল হক প্রমুখ এবং শেখ মুজিবর রহমান, খন্দকার মোশতাক আহমদ প্রমুখ ছাত্র নেতৃবৃন্দ। মুসলিম লীগের অধিকাংশ কর্মী তো বটেই, এমনকি অনেক নেতাও এই গ্রুপিং সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। অনেকে আবার জেনেও এ ব্যাপারে ইন্টারেস্ট নিতেন না। তবে এ গ্রুপিং যে ছিল এবং ছিল মারাত্মকভাবেই, তা আবুল হাশিমের আত্মজৈবনিক গ্রন্থ 'ইন রিট্রসপেকশন' (বাংলায়– 'আমার জীবন ও বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি') শীর্ষক গ্রন্থ পাঠ করলে প্রকটভাবে ধরা পড়ে। এ সংঘাতের আত্মঘাতী রূপ প্রকাশ পায় সাতচল্লিশের পূর্বাপর বহু রাজনৈতিক ঘটনার মধ্যে।

www.pathagar.com

এই আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণেই আবুল হাশিম পাকিস্তান আন্দোলনের তরুণ কর্মীদের মধ্যে যে আদর্শবাদী চেতনা সৃষ্টির চেষ্টা করেন, তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কারণ ইসলাম ও পাকিস্তান সম্পর্কে আবুল হাশিমের ব্যাখ্যা যত গুরুত্বপূর্ণই হোক, প্রতিপক্ষের কর্মীদের কাছে তিনি ছিলেন বিপক্ষীয় একজন নেতা মাত্র। আর তাঁর নিজপক্ষের কর্মীদের অনেকের কাছেও তাঁর আসল মূল্য ছিল একটি সুন্দর আদর্শের ব্যাখ্যাতা হিসাবে নয়, তাদের নিজস্ব উপদলীয় নেতা হিসাবে। তারা অনেকেই আবুল হাশিমের আদর্শিক ক্লাসে যোগ দিতেন উপদলীয় নেতার সম্মান রক্ষার্থে, আদর্শের পাঠ গ্রহণ করতে নয়। গভীর রাত পর্যন্ত আবুল হাশিম মহাঅভিনিবেশ সহকারে ক্লাস নিলেও অনেকেই তখন পেছনের দিকে গভীর নিদ্রায় মগ্ন থাকতেন। ক্লাস শেষ হয়ে গেলে তারা নেতার কাছে জানতে চাইতেন আদর্শের কোন পয়েন্টের বিস্তৃততর ব্যাখ্যা নয়– কি করতে হবে তার নির্দেশ।

আবুল হাশিম সাহেবের নিজ মুখে বলতে শুনেছি ঃ এসব আদর্শিক ক্লাসে গভীর অভিনিবেশ সহকারে যারা নোট নিতেন তাদের অন্যতম ছিলেন শামসুল হক। শেখ মুজিব ক্লাসের অধিকাংশ সময় পেছনে ঘুমিয়ে কাটাতেন, ক্লাস শেষে এসে আবুল হাশিমকে বলতেন, স্যার, অতসব তত্ত্বকথা আমার মাথায় ঢোকে না, আমাকে বলে দিন, কি করতে হবে? বলা বাহুল্য, সোহরাওয়ার্দী গ্রুপের দ্বিতীয় প্রধান নেতা হিসাবে আবুল হাশিমকে শেখ মুজিব খুবই মান্য ও শ্রদ্ধা করতেন এবং সোহরাওয়ার্দীর পর তাঁর নির্দেশ পালনে আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। প্রায়ান্ধ আবুল হাশিমের বহু সফরে শেখ মুজিব তাঁর ব্যক্তিগত সঙ্গী থাকতেন। শেখ সাহেব নিজে এ সম্পর্কে একাধিকবার আমাকে বলেছেন– আবুল হাশিম সাহেবের হাতের দাগ এখনও আমার কাঁধে রয়েছে। শেখ মুজিব রাজনীতিতে প্রবেশ করেন প্রধানত হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ভাবশিষ্য হিসাবে। নিজে ফরিদপুরের গোপালগঞ্জে জন্মগ্রহণ করলেও শেখ মুজিবের রাজনৈতিক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ কাটে কলিকাতায় শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সান্নিধ্যে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর জন্ম মেদেনীপুরের এক বিখ্যাত অভিজাত শিক্ষিত ও বুজর্গ পরিবারে। তাঁরও রাজনৈতিক জীবনের সবচাইতে গৌরবময় দিনগুলো কাটে কলিকাতায়। সোহরাওয়ার্দী নিজে ছিলেন একজন দক্ষ সংগঠক ও উচ্চ শিক্ষিত সংগ্রামী নেতা। শেখ মুজিবের মধ্যে সাংগঠনিক প্রতিভার স্বাক্ষর দেখতে পেয়ে তিনি তার প্রতি বিশেষ আগ্রহী হয়ে ওঠেন। কলিকাতায় শহীদ সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়েছিল খিদিরপুর ডক শ্রমিকদের দাবী-দাওয়ার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। এই শ্রমিকদের অধিকাংশই ছিল পূর্ববঙ্গীয় মুসলমান। খিদিরপুরের মুসলমান ডক শ্রমিকদের নিয়ে তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হলেও অল্পদিনের মধ্যে তিনি সমগ্র কলিকাতার পিছিয়ে পড়া সাধারণ মুসলমানদের নেতা হয়ে ওঠেন।

www.pathagar.com

বৃটিশ রাজত্বের সূচনাপর্বে সাম্রাজ্যবাদী উদ্যোগে গড়ে ওঠা কলিকাতা মহানগরীতে বৃটিশ শাসনামলে ইংরেজদের পরই যাদের সর্বাধিক প্রভাব ছিল তারা ইংরেজদের খয়েরখা হিন্দু বুদ্ধিজীবী আমলা বেনিয়া, মুৎসুদ্দি, উঠতি পুঁজিপতি ও জমিদার। এসব জমিদারের অধিকাংশের জমিদারী পূর্ববঙ্গে অবস্থিত হলেও তারা বাস করত কলিকাতায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কল্যাণে এসব জমিদারের জমিদারীতে কৃষক প্রজাদের ছিল করুণ অবস্থা। রামমোহন, দ্বারকানাথ প্রমুখ বৃটিশ দালালদের সমর্থনে সাহসী হয়ে শ্বেতাঙ্গ নীলকররা কিভাবে চাষীদের উপর খড়গ চালাত তার ইতিহাস এখন অনেকেই জানছেন। নীলকররা কিভাবে বাংলার চাষীদের নীল চাষে বাধ্য করত, দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকে তার করুণ চিত্র দেখতে পাওয়া যায়।

পূর্ববঙ্গে বিশ্বের সর্বাধিক সর্বোৎকৃষ্ট পাট উৎপন্ন হলেও দু'শ' বছরের বৃটিশ শাসনামলে সবগুলো পাটকল স্থাপিত হয় পশ্চিমবঙ্গে ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীরে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার মাধ্যমে। এভাবেই এককালের সমৃদ্ধ পূর্ববঙ্গ বৃটিশ শাসনে রিক্ত-নিঃস্ব জনপদে পরিণত হয় এবং পূর্ববঙ্গের পাট ও অন্যান্য সম্পদে গড়ে ওঠে কলিকাতা মহানগরী। একই কারণে অবিভক্ত বাংলা মুসলিম মেজরিটি প্রদেশ হওয়া সত্ত্বেও তার রাজধানী কলিকাতায় মুসলমানরা একটি দরিদ্র সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীই থেকে যায়।

মুসলমানরা তাদের এই অসহায়ত্ব কাটিয়ে উঠতে যত চেষ্টাই করেছে, সবক্ষেত্রেই তাদের সে প্রয়াসে বাধ সেধেছে এক শ্রেণীর সাম্প্রদায়িক হিন্দু। মুসলমানদের জাগরণী প্রচেষ্টায় বাধা এসেছে শুধু রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেই নয়, বাধা এসেছে এমনকি খেলাধুলার ক্ষেত্রেও। লাহোর প্রস্তাব পাস হবার আগেই ফুরফুরার পীর মওলানা আবুবকর সিদ্দিকীর (রঃ) আধ্যাত্মিক দিক-নির্দেশনা, ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও দৈনিক আজাদ-এর জাতি জাগানিয়া সাংবাদিকতার সাথে আব্বাসউদ্দিনের কণ্ঠে নজরুলের জাগরণী গানে যখন বাংলায় মুসলিম জাগরণের পাত্র প্রায় কানায় কানায় ভরে উঠেছিল, তখন তার সাথে একটি বাড়তি ধারা সংযোজন করেছিল মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের উপর্যুপরি লীগ বিজয়। বিশেষ করে কলিকাতায় যেদিন মোহামেডান স্পোর্টিংয়ের সাথে মোহনবাগানের খেলা হত, ময়দানে টানটান উত্তেজনা বিরাজ করত। দুই টিমের ফুটবলের লড়াই যেন তখন মুসলমান-হিন্দুর জাতিগত লড়াইয়ে রূপান্তরিত হত। হিন্দু দর্শকরা পরিকল্পিতভাবে চেষ্টা করত মোহামেডানের খেলোয়াড়দের টিটকারী ও গালাগালি করে দমিয়ে দিতে। মরহুম ব্যারিস্টার এটিএম মোস্তফার এক ভাইয়ের মুখে শুনেছি, সোহরাওয়ার্দীর লোকজন, বিশেষ করে শেখ মুজিব মাঠে উপস্থিত থাকলে হিন্দু দর্শকরা না-কি এ ধরনের

www.pathagar.com

বাড়াবাড়ি থেকে নিবৃত্ত থাকত। তবে এরপরও অনুচ্চস্বরে তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করত– 'সরওয়ার্দীর গুণ্ডাটা মাঠে এসেছে'। হোসেন শহীদ সোহারাওয়ার্দীর ভাবশিষ্য শেখ মুজিবকে তদানীন্তন কলিকাতার সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন হিন্দুরা 'গুণ্ডা' মনে করবে, এতে অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। কলিকাতার অসহায় মুসলমানদের উপর তাদের শোষণ, জুলুম, নিযাতন চালিয়ে যাবার পথে সোহরওয়ার্দী ছিলেন বড় অন্তরায়। এ জন্য সোহরওয়ার্দীর প্রতি তাদের বিরূপতাকে তারা কখনও গোপন করত না। হিন্দু পত্র-পত্রিকায় সোহরওয়ার্দীর নাম বিকৃত করে লেখা হত 'সুরাবর্দী' এবং এ বদভ্যাস অদ্যাবধি তারা পরিবর্তন করতে পারেনি। সোহরওয়ার্দীকে তারা এখনও কী পরিমাণ ঘৃণা করে তার প্রমাণ মেলে একাত্তর পরবর্তী আমলে ভারত-বৃটেন যৌথ উদ্যেগে নির্মিত চলচ্চিত্র 'গান্ধী' থেকে। এই ছবিতে জিন্নাহকে দেখানো হয়েছে একজন সাম্প্রদায়িক নেতারূপে, আর শহীদ সোহরওয়ার্দীকে দেখানো হয়েছে জিন্নার অনুগত এক 'গুণ্ডা সর্দার' হিসাবে। যেখানে নেতাকে তারা মনে করত 'গুন্ডা-সর্দার', শিষ্যকে 'গুণ্ডা' মনে করবে– এতে আর আশ্চর্য কি!

সাম্প্রদায়িক হিন্দুদের দৃষ্টিতে সোহরওয়ার্দী বা তাঁর অনুসারীরা 'গুন্ডা' অভিধায় অভিহিত হবার আসল কারণ অবশ্য ছিল অন্যত্র। সোহরওয়ার্দী আগাগোড়া ছিলেন সংগ্রামী জননেতা। শেখ মুজিবসহ তার অধিকাংশ অনুসারীও ছিলেন এ্যাকশনধর্মী ও সংগ্রামী রাজনৈতিক কর্মী। বাংলাদেশে পাকিস্তান আন্দোলনকে অপ্রতিরোধ্য গণআন্দোলনে পরিণত করে তুলতে মুসলিম লীগের সাথে সম্পর্কিত সকল নেতা কর্মীদেরই অবদান ছিল– এ কথা যেমন সত্য, তেমনি এ কথাও সত্য যে, পাকিস্তান আন্দোলনের সেই চরম মুহূর্তে হোসেন শহীদ সোহরওয়ার্দী, আবুল হাশিম এবং তাদের অনুসারীদের ছিল বিশেষ অবদান, যা অস্বীকার করা আর ইতিহাসকে অস্বীকার করা একই কথা। ১৯৪৫-১৯৪৬ সালে অনুষ্ঠিত যে সাধারণ নির্বাচন পাকিস্তান ইস্যুতে গণভোটরূপে বিবেচিত হয়েছিল, সেই নির্বাচনে মুসলিম লীগ সবচেয়ে গৌরবজনক বিজয় অর্জন করেছিল বাংলাদেশ। ১৯৪৫ সালের নভেম্বরে কেন্দ্রীয় আইন সভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ থেকে কেন্দ্রীয় আইন সভার ছয়টি মুসলিম আসনের সব ক'টিতেই মুসলিম লীগ প্রার্থীরা জয় লাভ করেন। প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচনের দিন ধার্য হয়। ১৯৪৬ সালের ১৯ মার্চ থেকে ২২ মার্চ। নির্বাচনের পূর্বেই প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সভাপতি মওলানা আকরম খাঁ অসুস্থতার জন্য বায়ু পরিবর্তনের উদ্দেশে মধুপুরে চলে যান। খাজা নাজিমুদ্দীনও রাজনৈতিক কাজে লন্ডন যান। (দ্রষ্টব্য– কায়েদে আজম ঃ এম এ এইচ ইস্পাহানী, পৃঃ ১৩৯-৪০)। ফলে লীগের নির্বাচনী অভিযান পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বর্তে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ডের সম্পাদক হোসেন শহীদ

www.pathagar.com

সোহরওয়ার্দী এবং লীগ সম্পাদক আবুল হাশিমের উপর। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, তারা এ দায়িত্ব পালনে পরম নিষ্ঠার পরিচয় দেন।

প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচনের প্রাক্কালে পাকিস্তান আন্দোলনের অবিসম্বাদিত নেতা কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ নির্বাচনী অভিযান উপলক্ষে বাংলা ও আসাম সফর করেন। ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারীর শেষ দিকে তিনি কলিকাতায় আসেন এবং প্রাদেশিক লীগের ট্রেজারার এম এ এইচ ইস্পাহানীর বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। ১ মার্চ তিনি লীগ কর্মীদের সঙ্গে মিলিত হন এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ত্যাগ স্বীকার করে এগিয়ে যাবার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। এরপর তিনি রেলযোগে বাংলাদেশ ও আসাম সফরে বের হয়ে যান। এ সফরে তাঁর সঙ্গী ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরওয়ার্দী ও এম এ এইচ ইস্পাহানী। এই সফরে প্রত্যেক স্টেশনে জনসাধারণ তাঁকে যে বিপুল সংবর্ধনা দেয় তার বিবরণী পাওয়া যায় ইস্পাহানী লিখিত 'কায়েদে আজম' শীর্ষক গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন, 'প্রায় প্রত্যেক স্টেশনে গাড়ী থামাতে হত। জিন্নাহকে এক নজর দেখার জন্য প্রত্যেক স্টেশনে পুরুষ, নারী ও ছেলে মেয়েদের বিরাট সমাবেশ হয়। অনেকে বহু দূরবর্তী গ্রাম থেকে তাদের নেতাকে সম্মান দেখাবার জন্য আসে। প্রত্যেক স্টেশনে জিন্নাহকে রেল সেলুনের দরজায় এসে দাঁড়াতে হয় এবং তাদের উদ্দেশে কিছু বলতে হয়। তিনি তাদেরকে উৎসাহ দেন এবং নির্বাচনে মুসলিম লীগের সাফল্যের জন্য চেষ্টা করতে পরামর্শ দেন। জিন্নাহকে দেখার জন্য গ্রামের লোকেরা বহু জায়গায় জোর করে রেলগাড়ী থামায়। কয়েকদিন এরূপ চলতে থাকে। রাত্রিতেও এই অবস্থা হয়। ঘুমের ব্যাঘাত হওয়াতে জিন্নাহ ক্লান্ত হয়ে পড়েন। একদিন মধ্যরাতের পর জনতা তাকে দেখার জন্য দাবী জানায়। কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত হননি। তখণ দেখা দেবার মত তার শক্তি ছিল না।' (দ্রষ্টব্য ঃ কায়েদে আজম, এমএএইচ ইস্পাহানী, পৃঃ ১৩৯-১৪৩)।

নির্বাচনী অভিযানে শুধু মুসলিম লীগের নেতা কর্মীরাই নয়, মুসলিম লীগ ন্যাশনাল গার্ড, জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম, মুসলিম ছাত্র লীগ ও অন্যান্য সংস্থার নেতা কর্মীগণও অংশ নেন। মুসলিম লীগের প্রচার অভিযানে ফুরফুরার পীর হযরত মওলানা আবদুল হাই সিদ্দিকী (রহঃ), শর্ষিনার পীর হযরত মওলানা নেসারউদ্দীন আহমদ (রহঃ), মওলানা রুহুল আমীন (রহঃ), মওলানা মোয়েজুদ্দীন হামিদী (রহঃ), মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) প্রমুখ পীর মাশায়েখ, বুযর্গবৃন্দও বলিষ্ঠ অংশ নেন। মোটের উপর বাংলার আলেম সমাজ থেকে শুরু করে রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীবৃন্দ, কৃষক শ্রমিক, বামপন্থী নেতৃবৃন্দ শিল্পী সাহিত্যিক-সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবীবৃন্দ এবং তরুণ ও ছাত্র সমাজ একাট্টা হয়েছিলেন পাকিস্তান

www.pathagar.com

দাবীর পেছনে। এই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের ফলেই মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে পাকিস্তান আন্দোলন বাংলার জমিনে অপ্রতিরোধ্য গণআন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। আসাম বাংলা থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র প্রদেশ হলেও বাংলাদেশের সঙ্গে এর ভৌগোলিক সংলগ্নতার কারণে বাংলা আর আসামের রাজনীতি সবসময়ই পরিপূরক ছিল। মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাবেও উপমহাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত এই দু'টি প্রদেশের সমবায়েই পূর্ব পাকিস্তান তথা মুসলিম প্রধান পূর্বাঞ্চলীয় রাষ্ট্র গঠনের কথা ছিল। ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, যোগাযোগ প্রভৃতি অনেক ব্যাপারেই বাংলা ও আসামের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। বিভাগ-পূর্ব কালে আসামে ছিল দু'টি প্রধান অঞ্চল। তার একটি আসাম ভ্যালি, অপরটি সুর্মা ভ্যালি। এই সুর্মা ভ্যালির অধিবাসীদের অধিকাংশের ভাষাই ছিল বাংলা। আসাম ভ্যালিতেও অনেক বাঙালী বাস করতো। তাছাড়া ঐ অঞ্চলের জনগণের ব্যবহৃত অসমীয় ভাষার সঙ্গেও বাংলা ভাষার সামঞ্জস্য ব্যাপক। আসামের বিশাল অনাবাদী এলাকা বন-জঙ্গল সাফ করে বাংলা থেকে যাওয়া কৃষকরা বসবাসযোগ্য করে তোলায়ও বাংলার সঙ্গে আসামের আরও নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যাওয়া কৃষকদের অধিকাংশ মুসলমান হওয়ায় আসামের পাকিস্তান আন্দোলনে বাঙালী প্রভাব ছিল প্রবল। এই সুবাদেই পাকিস্তান আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্বে আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও জনাব মাহমুদ আলী উভয়ই ছিলেন বাঙালী।

আসামে এক পর্যায়ে মুসলিম লীগ নেতা স্যার মোহাম্মদ সাদুল্লাহর নেতৃত্বে প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল এবং আসাম থেকে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটিতে একমাত্র সদস্য ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতা মরহুম আবদুল মতিন চৌধুরী।

আসামে পাকিস্তান আন্দোলনের নেতা হিসেবে আমরা মওলানা ভাসানীকেই বুঝতাম। সাতচল্লিশের আগে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে দেখার সুযোগ আমার হয়নি, কিন্তু তিনি সে সময়ই আমার ও আমার মত আরও অনেক তরুণের কাছে হয়ে উঠেছিলেন এক কিংবদন্তীর নায়ক। আসামে বাঙালী কৃষকদের উপর কংগ্রেস সরকারের জুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে তার দুঃসাহসী সংগ্রামের কাহিনী নানা মুখে শুনে এবং পত্র-পত্রিকায় পড়ে আমরাও তার মত নির্যাতিত মানবতার মুক্তির নিরাপোষ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে অনুপ্রাণিত হতাম।

নির্বাচনে ঐতিহাসিক সাফল্য

বাংলাদেশে শহীদ সোহরওয়ার্দী, আবুল হাশিম প্রমুখ এবং আসামে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সংগ্রাম বৃথা যায়নি। তাদের সংগ্রাম

www.pathagar.com

যে বৃথা যায়নি, তার প্রমাণ পাওয়া গেল পাকিস্তান ইস্যুতে অনুষ্ঠিত ১৯৪৫-১৯৪৬ সাধারণ নির্বাচনেই। ১৯৪৫ সালের কেন্দ্রীয় আইন সভার নির্বাচনে সমগ্র ভারতের ৩০টি মুসলিম আসনের সব ক'টিতেই মুসলিম লীগ জয়ী হয় এ কথা আগেই বলেছি। প্রাদেশিক আইন পরিষদ নির্বাচনেও বাংলাদেশ ১১৯টি মুসলিম আসনের মধ্যে ১১৩টিতেই মুসলিম লীগ জয়ী হয়। আসামে ৩৪টি মুসলিম আসনের মধ্যে ৩১টিতেই মুসলিম লীগ প্রার্থীরা জয়ী হন।

প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচনে পাঞ্জাবে ৮৬টি মুসলিম আসনের মধ্যে ৭৫টি আসন পায় মুসলিম লীগ। খিজির হায়াত খানের ইউনিয়নিস্ট দল ২০টি আসন দখল করেও কংগ্রেস ও আকালী দলের সহায়তায় মন্ত্রিসভা গঠন করে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ৩৮টি মুসলিম আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ পায় মাত্র ১৭টি আসন। কংগ্রেস দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করায় লালকোর্তা নেতা ডাঃ খান সাহেবের নেতৃত্বে সেখানে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। সিন্ধু প্রদেশের আইন সভার মোট ৬০টি আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ পায় মাত্র ২৭টি, জিএম সৈয়দের দল পায় ৪টি, স্বতন্ত্র মুসলিম ৪টি এবং কংগ্রেস ২১টি আসন পায়। কোন দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় এই প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন কঠিন হয়ে পড়ে। এর ফলে ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বরে এই প্রদেশে পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে মুসলিম লীগ ৩৫টি আসন পেয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করতে সক্ষম হয়। নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, যুক্ত প্রদেশ, মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রভৃতি অমুসলিম প্রধান প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করে। অমুসলিম প্রধান প্রদেশসমূহের মুসলিম আসনের মধ্যে আসামের কথা আগেই বলেছি। বিহারে প্রাদেশিক আইন সভায় ৪০টি মুসলিম আসনের মধ্যে ৩৪টি, যুক্ত প্রদেশে ৬৬টির মধ্যে ৫৫টি এবং মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের সবক'টি মুসলিম আসনেই মুসলিম লীগ জয়ী হয়।

প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম প্রধান প্রদেশগুলোতে ১৯৪৬ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে একমাত্র বাংলাতেই মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা গঠন সম্ভব হয়। মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী দলের নেতা নির্বাচিত হন হোসেন শহীদ সোহরওয়ার্দী। তাঁর নেতৃত্বে প্রাদেশিক আইন সভায় মুসলিম লীগ দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে বলে গভর্নর তাঁকে মন্ত্রিসভা গঠনের আহবান জানান।

তিনি স্বতন্ত্র সদস্যদের সহযোগিতায় মন্ত্রীসভা গঠন করেন। মুসলিম প্রধান প্রদেশসমূহের মধ্যে একমাত্র বাংলাতেই এভাবে মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা গঠন সম্ভব হয়। ফলে সোহরওয়ার্দী মন্ত্রিসভার ওপর পাকিস্তান আন্দোলনকে সফল করে তোলার ব্যাপারে ঐতিহাসিক দায়িত্ব বর্তে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, জনাব সোহরওয়ার্দী সে

www.pathagar.com

দায়িত্ব পালনে অপরিসীম প্রজ্ঞা ও অসমসাহসিকতার পরিচয় দেন।

হোসেন শহীদ সোহরওয়ার্দীকে সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন হিন্দুরা যত বিদ্বেষের চোখেই দেখুক না কেন, তিনি ছিলেন সর্বপ্রকার সংকীর্ণতার উর্ধ্বে। তিনি মন্ত্রীসভা গঠনের পর সর্বপ্রথম যে কাজগুলো করেন, তার অন্যতম ছিল বৃটিশ আমলে সন্ত্রাস আন্দোলনের দায়ে কারারুদ্ধ বিভিন্ন হিন্দু নেতাদের মুক্তি দান। তিনি কখনও সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে প্রশ্রয় দিতেন না। তবে অসাম্প্রদায়িকতার আলখেল্লা পরে যারা মুসলিম জনগণের ওপর চিরস্থায়ীভাবে নির্যাতন চালানোর ফিকিরে ছিলো, তিনি তাদের স্বরূপ চিনতে কখনও ভুল করেননি। ১৯৪৫-৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনের আগে কংগ্রেস দাবী করত, ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস। নেহরুর ভাষায়– ভারতের রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে দু'টি পক্ষের একটি বৃটিশ সরকার, অপরটি কংগ্রেস। অপরপক্ষে মুসলিম লীগ দাবী করত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে প্রধান তিনটি পক্ষের একটি বৃটিশ, অপর দু'টি হিন্দুদের প্রতিনিধিত্বকারী কংগ্রেস এবং মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী মুসলিম লীগ। ১৯৪৫-৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে ভারতবর্ষের জনগণকে শুধু কংগ্রেস প্রতিনিধিত্ব করবে, না কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ যথাক্রমে হিন্দু ও মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করবে, এটাই ছিল প্রধান ইস্যু। ১৯৪৫-৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে এ সত্য দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল যে, কংগ্রেস হিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব করে, আর মুসলিম লীগ প্রতিনিধিত্ব করে মুসলমানদের।

১৯৪৫-৪৬ সালে পাকিস্তান দাবীর পেছনে ভারতবর্ষের মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ, এটা প্রমাণিত হবার পরই যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়ে গেল, তেমন মনে করবার কোন হেতু নেই। কংগ্রেস তখনও তার জিদ ত্যাগ করেনি যে, তারা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করে।

মুসলিম লীগ একদা নবাব নাইট জমিদারদের প্রতিষ্ঠান ছিল বলে তার নেতাদের মধ্যে ত্যাগী ও সংগ্রামী মনোভাবের বেশ অভাব ছিল। কিন্তু ১৯৩৬ সালে কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ পুনর্গঠনের পালা শুরু হলে ক্রমেই এই সংগঠনের মধ্যে সংগ্রামী ও ত্যাগী নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটতে থাকে এবং অচিরেই মুসলিম লীগ সর্বভারতীয় মুসলমানদের গণপ্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। বিশেষ করে ১৯৪০ সালে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হবার ফলে উপমহাদেশের মুসলমানদের সামনে এমন একটি লক্ষ্য উপস্থাপিত হয়, যাকে কেন্দ্র করে মুসলমানরা নজিরবিহীন দ্রুততম সময়ের মধ্যে মুসলিম লীগের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পড়ে। মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবীর প্রতি সমর্থন যোগাতে মুসলিম সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই এক অভূতপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়।

www.pathagar.com

মুসলিম লীগের এই ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তাকে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ মোটেই সুনজরে দেখতে পারেননি। তাই তারা বারবার চাপ দিচ্ছিলেন, বৃটিশ-রাজ অবিলম্বে কংগ্রেসের হাতে ভারত শাসনের দায়িত্ব দিয়ে ভারতবর্ষ ত্যাগ করুক। ১৯৪২ সালে কংগ্রেস এই লক্ষ্যেই 'কুইট ইন্ডিয়া' (ভারত ছাড়) আন্দোলনের ডাক দেয়। কিন্তু ভারতবর্ষের মুসলিম জনগণ তখন মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবীর পেছনে ঐক্যবদ্ধ। তাদের বক্তব্য ঃ দ্রুত স্বাধীনতার স্বার্থে স্বাধীনতার রূপরেখা ও কাঠামো সম্বন্ধে ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলিম নেতৃবৃন্দের সমঝোতা হওয়ার প্রয়োজন সর্বাগ্রে। এ সুবাদেই ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলিম জনগণের প্রতিনিধিত্ব করবে কারা সে প্রশ্ন অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৪৫-৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর এ প্রশ্নে কংগ্রেসের টালবাহানার আর কোন অবকাশ ছিল না। কিন্তু মুসলিম জনগণের মর্যাদার সঙ্গে বাঁচার দাবীর প্রতি যাদের চিরকাল ছিল অনীহা, তাদের চক্রান্ত জাল অত সহজে বন্ধ হবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। বিশেষত তাদের প্রতি বৃটিশেরও যখন ছিল প্রচ্ছন্ন সমর্থন ও আশীর্বাদ।

ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ প্রমুখ হিন্দু নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ক্লাইভের দীর্ঘদিনের গোপন আঁতাতের ঘটনা এখন সবারই জানা। এই আঁতাতের ধারাবাহিকতায়ই একদা ঋষি বঙ্কিম বলতে পেরেছিলেন, 'ইংরেজ আমাদের শত্রু নয়, আমাদের আসল শত্রু মুসলমান'। কিন্তু বৃটিশ শাসনের অবসানের প্রাক্কালেও যে ক্লাইভ জগৎশেঠদের আঁতাতের সেই পুরাতন নাটকের পুনরাভিনয় হবে, এতটা অনেকেই কল্পনা করতে পারেননি। কিন্তু যা অনেকে কল্পনাও করতে পারেননি, তাই বাস্তবে ঘটেছিল ভারতে বৃটিশ শাসনের শেষ বছরগুলোতে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এক পর্যায়ে ১৯৪২ সালে অক্ষশক্তির হাতে পূর্ব রণাঙ্গনে যখন ইংরেজরা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়, তখনই প্রথম ভারতে বৃটিশ শাসনের সমূহ বিপদের ঘন্টা ধ্বনি বেজে ওঠে। যুদ্ধকালীন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল যুদ্ধজয়ে ভারতীয় জনগণের সহযোগিতা কামনা করে তাঁর অন্যতম মন্ত্রী ষ্টাফোর্ড ক্রীপসকে যুদ্ধপরবর্তীকালে স্বাধীনতাদানের এক পরিকল্পনাসহ ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। এতে কোন প্রদেশ ইচ্ছা করতে ভারতীয় ফেডারেশন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার ব্যবস্থা থাকায় কংগ্রেস এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ক্রীপস পরিকল্পনায় লাহোর প্রস্তাবের প্রতিফলন না থাকায় মুসলিম লীগও এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।

১৯৪৫ সালে অক্ষশক্তির পরাজয়ের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। যুদ্ধশেষে মিঃ এটলির নেতৃত্বে ইংল্যান্ডে শ্রমিক দল নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করে। মহাযুদ্ধের ফলে এ দেশের সমাজদেহে যে ক্ষত সৃষ্টি হয়, তার

www.pathagar.com

ফলশ্রুতিতে দেশের সাধারণ মানুষের জীবনে নানা সমস্যা দেখা দেয়। ফলে জনগণের মধ্যে বৃটিশ শাসনের অবসান কামনায় স্বাধীনতার স্পৃহা আরও জোরদার হয়ে ওঠে। বৃটিশ ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর বহু সদস্যই গোপনে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়েছিল। যুদ্ধে অক্ষশক্তির পরাজয়ের ফলে তাদের অনেকেই ধরা পড়ে এবং তাদের বিচার শুরু হয়। এতে সেনাবাহিনীতেও বৃটিশ বিরোধী বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। ফলে বৃটিশ সরকার বুঝতে পারে যে, ভারতে বৃটিশ শাসন অব্যাহত রাখা আর সম্ভব নয়।

এর মধ্যে ১৯৪৬ সালে বৃটিশ ভারতীয় নৌবাহিনীতে এমন এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটে, যার ফলে বৃটিশ সরকারের টনক নড়ে ওঠে। ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বৃটিশ নৌ-বাহিনীর এডমিরাল গডফ্রে বোম্বাইয়ে একটি যুদ্ধ-জাহাজ পরিদর্শনে গেলে দেশী নৌ-সেনারা বৃটিশবিরোধী শ্লোগান দেয়। তাদের গ্রেফতার করা হলে জাহাজের সহস্রাধিক নৌ-সেনা ধর্মঘট করে। এ খবর অন্যান্য জাহাজে ছড়িয়ে পড়লে অন্যান্য জাহাজের ২২ সহস্রাধিক হিন্দু-মুসলিম নৌসেনা ধর্মঘটে যোগ দেয়।

নৌ-বিদ্রোহ করাচীও কলিকাতা বন্দরেও ছড়িয়ে পড়ে। ধর্মঘটী নৌ-সেনারা নৌ-অধ্যক্ষের ফ্লাগশীপ 'নর্মদা' থেকে এডমিরালের পতাকা নামিয়ে সেখানে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের পতাকা উড়িয়ে দেয়। কংগ্রেস ও লীগ নেতৃবৃন্দের চেষ্টায় বিদ্রোহ আপাতত প্রশমিত হলেও অবস্থা বেগতিক দেখে ফেব্রুয়ারী মাসের ১৯ তারিখেই বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলী স্বাধীনতার নতুন প্রস্তাবসহ ভারতবর্ষে তিন সদস্যের একটি মন্ত্রী মিশন প্রেরণের ঘোষণা দেন।

সংখ্যালঘু নয় স্বতন্ত্র জাতি

১৯৪৫ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় পরিষদ নির্বাচনের ফলাফলেই এটা প্রথম স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে যে, ভারতবর্ষের মুসলিম জনগণ পাকিস্তান দাবীতে মুসলিম লীগের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। মুসলিম জনগণের এই সুস্পষ্ট রায় প্রকাশের পরও বৃটিশ সরকার মুসলিম জনগণের ন্যায্য দাবী-দাওয়ার প্রতি অবজ্ঞার মনোভাব ত্যাগ করতে পারেনি। ১৯৪৬ সালের ১৯ মার্চ প্রাদেশিক নির্বাচন শুরু হবার মাত্র ৪ দিন আগে ১৫ মার্চ তারিখে এক পার্লামেন্ট বিতর্ককালে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ এটলী ঘোষণা করেন, "সংখ্যালঘুদের অধিকারের প্রতি আমাদের লক্ষ্য আছে। এটা দেখতে হবে যাতে সংখ্যালঘুগণ নিঃশঙ্ক হয়ে বাস করতে পারে; তবে সংখ্যাগুরুদের উন্নতির পথে যদি সংখ্যালঘুরা বাধা হয়ে দাঁড়ায় তা আমরা হতে দেব না।" বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে স্বাভাবিকভাবেই উল্লসিত ও লীগ নেতৃবৃন্দকে বিক্ষুব্ধ করে। মুসলিম লীগ প্রধান মোহাম্মদ আলী

www.pathagar.com

জিন্নাহ বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, "উপমহাদেশের মুসলমানরা সংখ্যালঘু নয়; তারা একটি স্বতন্ত্র জাতি এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ তাদের জন্মগত অধিকার।"

মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা

১৯৪৬ সালের ১৯ থেকে ২২ মার্চ পর্যন্ত প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। প্রায় একই সময়ে ১৯৪৬ সালের ২৩ মার্চ মন্ত্রী মিশন করাচী হয়ে ২৪ মার্চ দিল্লী পৌছেন। তারা কংগ্রেস, লীগ নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী এবং সংখ্যালঘু নেতাদের সঙ্গে আলোচনার মারফত একটি সর্বসম্মত আপস ফর্মুলা গ্রহণের চেষ্টা চালিয়ে যান। কংগ্রেস সভাপতি মওলানা আবুল কালাম আজাদ ৩ এপ্রিল মন্ত্রী মিশনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও যোগাযোগ সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের হাতে রেখে অন্যান্য সববিষয় প্রদেশের হাতে ছেড়ে দেয়ার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন। লীগ সভাপতি জিন্নাহ স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবী উত্থাপন করলে মন্ত্রী মিশন তাকে একটি অ-সার্বভৌম বৃহৎ পাকিস্তান অথবা একটি ক্ষুদ্র সার্বভৌম পাকিস্তান এ দুইয়ের একটি বেছে নিতে বলেন। জিন্নাহ নীতিগতভাবে পাকিস্তান দাবী স্বীকার করে নেয়ার উপর জোর দিয়ে বলেন, এলাকা সম্বন্ধে পরে আলোচনা হতে পারে। জিন্নাহর এ দাবী গান্ধী, নেহরু প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ প্রত্যাখ্যান করেন। এসব ব্যর্থ আলোচনার পর ১৯৪৬ সালের ১৬ মে মন্ত্রী মিশন তাদের নিজস্ব পরিকল্পনা প্রকাশ করেন।

মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনায় পাকিস্তান দাবী অগ্রাহ্য করা হলেও সমগ্র ভারতবর্ষের প্রদেশগুলোকে হিন্দু ও মুসলমান সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে তিনটি গ্রুপে বিভক্ত করা হয় ঃ (ক) যুক্তপ্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ; (খ) পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান, (গ) বাংলাদেশ ও আসাম। এই পরিকল্পনার ভিত্তিমূলে প্রদেশ, বিভিন্ন প্রদেশের সমবায়ে গ্রুপ এবং বিভিন্ন গ্রুপের সমবায়ে সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র এই তিন পর্যায়ে সরকার কার্যকর থাকবে। দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও যানবাহন কেন্দ্রীয় যুক্তরাষ্ট্র সরকারের হাতে এবং বাদ বাকী সব বিষয় প্রাদেশিক সরকারের আওতাধীন থাকবে। গ্রুপ সরকারের হাতে কি কি বিষয় থাকবে তা বিভিন্ন গ্রুপের সংশ্লিষ্ট প্রদেশসমূহ স্থির করবে। শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য একটি গণপরিষদ গঠিত হবে। কোন সম্প্রদায় সম্পর্কিত বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আইন সভার উভয় প্রধান সম্প্রদায়ের মেজরিটি সদস্যদের উপস্থিত ও সমর্থন আবশ্যক হবে। লোকসংখ্যা অনুপাতে প্রত্যেক প্রদেশ ও প্রধান সম্প্রদায়গুলোকে গণপরিষদে আসন দেয়া হবে এবং প্রতি দশ লাখ লোকের জন্য

www.pathagar.com

একটি আসন থাকবে। প্রতি দশ বছর অন্তর প্রদেশগুলো আইন সভার মেজরিটি ভোটে শাসনতন্ত্রের শর্ত পুনর্বিবেচনা করতে পারবে। মন্ত্রী মিশন একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের জন্যও সুপারিশ করেন।

কংগ্রেস গ্রুপ সিস্টেমের মধ্যে অখণ্ড ভারতের বিরোধিতা লক্ষ্য করে মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনার তীব্র সমালোচনা করে। অপরদিকে মুসলিম লীগ এতে সর্বভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবস্থাকে পাকিস্তান পরিকল্পনার বিরোধিতা বলে বিবেচনা করে। তবুও স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনাকে এই বিবেচনায় একটি আপস ফর্মুলারূপে গ্রহণ করে যে, দশ বছর পর ইচ্ছা করলে সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র থেকে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলো বেরিয়ে আসতে পারবে। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রশ্নে বড়লাটের সাথে আলোচনার জন্য লীগের পক্ষ থেকে জিন্নাহকে ক্ষমতা দেয়া হয়। পক্ষান্তরে কংগ্রেস অন্তর্বর্তী সরকারের প্রস্তাব নাকচ করে দিলেও অখণ্ড ভারতের জন্য একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত গণপরিষদে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেয়।

ইতিমধ্যে প্রাদেশিক সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরপরই দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয় মুসলিম লীগ টিকিটে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভার সদস্যদের সম্মেলন। ১৯৪৬ সালের ৭ থেকে ১০ এপ্রিল পর্যন্ত দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলন মুসলিম লীগ লেজিসলেটার্স কনভেনশন বা দিল্লী সম্মেলন নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এই সম্মেলনের একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্য ছিল এ কারণে যে, এই সম্মেলনে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ১৯৪০ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশনের প্রস্তাবকে আংশিক সংশোধন করে উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলীয় মুসলিম-প্রধান এলাকাসমূহে একাধিকের বদলে একটি রাষ্ট্র (পাকিস্তান) গঠনের প্রস্তাব নেয়া হয়।

দিল্লী সম্মেলন

দিল্লীতে ১৯৪৬ সালে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ লেজিসলেটার্স সম্মেলনে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভার প্রায় পাঁচশ' সদস্য যোগ দেন। তবে এই গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে আইন সভার সদস্য নন এমন বহু মুসলিম লীগ নেতা লীগ প্রতিনিধিরূপে এবং শান্তি শৃংখলা রক্ষার জন্য মুসলিম লীগ ন্যাশনাল গার্ড ও মুসলিম ছাত্র লীগের বহু সদস্য স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ থেকে যে স্বেচ্ছাসেবক দল এই উপলক্ষে দিল্লী সম্মেলনে যায় তাদের অন্যতম ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। এই ঘটনার উল্লেখ করেই ১৯৭১ সালে এয়ার মার্শাল (অবঃ) আসগর খানের সাথে এক আলাপচারিতায় শেখ মুজিব বলেছিলেন, কাঁধে পাকিস্তানের (অর্থাৎ মুসলিম লীগের) পতাকা, কণ্ঠে 'বান কার রহেগা পাকিস্তান'

www.pathagar.com

শ্লোগান তুলে তিনি কলিকাতা থেকে দিল্লী গিয়েছিলেন। (দ্রষ্টব্য 'বাঙালী হত্যা ও পাকিস্তানের ভাঙন', মাসুদুল হক, ঢাকা ১৯৯৭, পৃঃ ৯১)।

দিল্লী সম্মেলনে বাংলাদেশের মুসলিম লীগ লেজিসলেটার্সদের নেতৃত্ব দেন প্রাদেশিক লীগ পার্লামেন্টারী দলনেতা হোসেন শহীদ সোহরওয়ার্দী। বাংলাদেশের অন্যান্য নেতাদের মধ্যে খাজা নাজিমুদ্দীন, মওলানা আকরম খাঁ, তমিজউদ্দীন খাঁ, আবদুর রহমান সিদ্দিকী, আবুল হাশিম, আবুল কালাম শামসুদ্দীন প্রমুখ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। আসাম হতে সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মওলানা ভাসানী, স্যার মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, আবদুল মতিন চৌধুরী প্রমুখ। সম্মেলনে মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন বাংলাদেশের দলনেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। এই প্রস্তাবে বলা হয়- "উত্তর-পূর্ব ভারতের বাংলাদেশ ও আসাম এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান পাকিস্তান অঞ্চল নামে অভিহিত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলো নিয়ে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করতে হবে এবং অবিলম্বে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য প্রতিশ্রুতি দাবী করা যাচ্ছে।"

এ প্রস্তাবের সাথে ১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের আংশিক পার্থক্য ছিল। কারণ লাহোর প্রস্তাবে উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বের মুসলিম প্রধান এলাকাসমূহে একাধিক স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের কথা ছিল। সম্মেলনের বিষয় কমিটিতে এ প্রশ্নে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবুল হাশিম এর প্রতিবাদ জানান। তবে জিন্নাহর অনুরোধে প্রস্তাবের খসড়ায় তিনি কিছুটা পরিবর্তন করে দেন, যা প্রকাশ্য সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। (দ্রষ্টব্য- 'আমার জীবন ও বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি'– আবুল হাশিম, অনুঃ শাহাবুদ্দীন মুহম্মদ আলী, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃঃ ১২৫-১২৬)

প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবুল হাশিম যে লাহোর প্রস্তাবের এ ধরনের সংশোধনে খুশি ছিলেন না, তা সুস্পষ্ট। কিন্তু দিল্লী প্রস্তাবের উত্থাপক জনাব হোসেন শহীদ সোহরওয়ার্দীই কি এই সংশোধনের সাথে সম্পূর্ণ একমত ছিলেন? পরবর্তীকালে যিনি আবুল হাশিম সাহেবের সাথে মিলে বৃহত্তর সার্বভৌম বাংলা প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্যোক্তা হিসাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন, সেই সোহরওয়ার্দীও সম্ভবত এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় ছিলেন না। দিল্লী লেজিসলেটার্স কনভেনশনে মূল প্রস্তাব উত্থাপন করতে যেয়ে তিনি যে ভাষণ দেন, সেই ভাষণের একাংশে বলেন, "অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেছেন, পাকিস্তানই আমার চূড়ান্ত দাবী কি-না? আমি এ প্রশ্নের কোন জবাব দেব না, তবে একথা আমি অবশ্যই বলব, এ মুহূর্তে পাকিস্তানই আমার প্রধান দাবী" (দ্রষ্টব্য- দিল্লী

www.pathagar.com

কনভেনশনে শহীদ সোহরওয়ার্দীর ভাষণ, দৈনিক ইত্তেফাক-এর বিশেষ সোহরওয়ার্দী স্মরণ সংখ্যা, ১৯৬৩)।

দিল্লী কনভেনশন ছিল মুসলিম লীগ লেজিসলেটার্সদের কনভেনশন। পক্ষান্তরে লাহোর প্রস্তাব ছিল নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব। কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সংগঠনের নেতৃত্বের সর্বোচ্চ রূপ বিধায় কাউন্সিলের প্রস্তাব সংশোধনের এখতিয়ার লেজিসলেটার্স কনভেনশনের থাকার কথা নয়। এ নিরিখে দিল্লী প্রস্তাবের গঠনতান্ত্রিক মর্যাদা নিয়ে সহজেই প্রশ্ন উঠতে পারে। তবুও এ প্রস্তাবে তৎকালীন বৈরী পরিস্থিতির আলোকে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিভঙ্গীর মোটামুটি প্রতিফলন যে ঘটেছিল, তা সুস্পষ্ট। এটাও স্পষ্ট যে, দিল্লী কনভেনশনের পর পাকিস্তান আন্দোলন আরও এক ধাপ শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

দিল্লী কনভেনশনের পরপরই বাংলাদেশে হোসেন শহীদ সোহরওয়ার্দীর নেতৃত্বে মুসলিম লীগের মন্ত্রী সভা গঠিত হয়। ১৯৪৬ সালের ২৪ এপ্রিল সোহরওয়ার্দী মন্ত্রী সভা শপথ গ্রহণ করে। এই মন্ত্রী সভায় যারা মন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন তারা হচ্ছেন ঃ হোসেন শহীদ সোহরওয়ার্দী, আহমদ হোসেন (রংপুর), খান বাহাদুর আবদুল গোফরান (নোয়াখালী), খান বাহাদুর সৈয়দ মোয়াজ্জম উদ্দীন হোসেন (ময়মনসিংহ), খান বাহাদুর আবদুর রহমান (চব্বিশ পরগনা), শামসুদ্দীন আহমেদ (কুষ্টিয়া), খান বাহাদুর মোহাম্মদ আলী (বগুড়া) ও যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল। ময়মনসিংহের নূরুল আমীন। ত্রিপুরা (কুমিল্লা) জেলার তফাজ্জল আলী যথাক্রমে প্রাদেশিক আইন পরিষদের স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হন। চীফ হুইপ মনোনীত হন ত্রিপুরার জনাব মফিজউদ্দীন আহমদ।

ইতিমধ্যে ১৯৪৬ সালের ১৬ মে বড়লাট ও মন্ত্রী মিশন অন্তর্বর্তী সরকার গঠন সম্পর্কে তাদের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। ঘোষণায় বলা হয়, "বড়লাটের শাসন পরিষদ ১৪ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে এবং এদের মধ্যে ৬ জন কংগ্রেস, ৫ জন মুসলিম লীগ, ১ জন ভারতীয় খৃষ্টান, ১ জন শিখ ও ১ জন পার্সি সম্প্রদায় থেকে গ্রহণ করা হবে। ঘোষণায় আরও বলা হয়, যদি দু'টি প্রধান দল অথবা তাদের একটি যুক্ত সরকারে যোগ দিতে অস্বীকার করে তবুও বড়লাট অন্তর্বর্তী সরকার গঠনে অগ্রসর হবেন।" কংগ্রেস অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিতে অস্বীকার করলেও গণপরিষদে যোগ দেয়ার পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ২৫ জুন মুসলিম লীগের কার্যনির্বাহকে কমিটির সভায় অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও বড়লাট তার পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে মুসলিম লীগকে সরকার গঠন করতে দিতে অসম্মত হন।

www.pathagar.com

নেহরুর ভূমিকা

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসের এই যুগসন্ধিক্ষণে কংগ্রেস মওলানা আবুল কালাম আজাদের স্থানে দলের সভাপতি নির্বাচিত করে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে। ১০ জুলাই কংগ্রেসের নবনির্বাচিত সভাপতি জওহরলাল নেহরু এক সাংবাদিক বিবৃতিতে বলেন যে, কংগ্রেস গণপরিষদে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তবে কংগ্রেস গণপরিষদে মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা প্রয়োজনমত রদবদল ও সংশোধন করতে পারবে। গ্রুপ সিস্টেম সম্বন্ধে তিনি বলেন, গ্রুপ ব্যবস্থা থাকবে না।

নেহরুর এ বিবৃতিতে স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম লীগ মহলে কংগ্রেসের মতিগতি সম্বন্ধে নতুন করে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। মন্ত্রী মিশনের দুই সদস্য লর্ড পেথিক লরেন্স ও স্যার স্টাফোর্ড ক্রীপস বৃটিশ পার্লামেন্টে বলেন, নেহরুর বিবৃতিতে মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনার ভুল ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। নেহরুর বিবৃতির উপর মন্তব্য করতে গিয়ে কংগ্রেস নেতা মওলানা আবুল কালাম আজাদও বলেন, "এ এমন এক দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা, যা ইতিহাসের সমগ্র গতিধারাই পাল্টে দিয়েছে।" কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর বিবৃতির পর মুসলিম লীগও সমগ্র পরিস্থিতি নতুনভাবে পর্যালোচনার প্রয়োজন অনুভব করে। এই লক্ষ্যে ২৭ জুলাই বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস

বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের এই বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন নানা কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কংগ্রেসের মন্ত্রী মিশন সম্পর্কিত বক্তব্যের ফলে মুসলিম লীগ মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনার প্রতি তার সমর্থন প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়। কাউন্সিল সেশনের অপর এক প্রস্তাবে উপমহাদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীকে পাকিস্তান অর্জনের লক্ষ্যে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকার আহবান জানানো হয় এবং এই লক্ষ্যে ১৬ আগস্ট সমগ্র উপমহাদেশে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' (ডাইরেক্ট একশন ডে) পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বৃটিশ সরকারের মুসলিম বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে মুসলমানদের প্রতি বৃটিশ সরকার প্রদত্ত খেতাব বর্জনের আহবান জানানো হয়। এর ফলে মুসলমানদের মধ্যে বৃটিশ প্রদত্ত স্যার, খান বাহাদুর, খান সাহেব প্রভৃতি খেতাব বর্জনের হিড়িক পড়ে যায়। মুসলিম লীগের আহবানে মুসলিম জনগণ পাকিস্তান অর্জনের লক্ষ্যে যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হয়। বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশনের সমাপ্তি ভাষণে জিন্নাহ ঘোষণা করেন, 'আজ

www.pathagar.com

আমরা আমাদের ইতিহাসের এক যুগান্তকারী স্তর সূচনা করেছি। লীগের সমগ্র ইতিহাসে আমরা এ পর্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক পন্থা ব্যতীত অন্যভাবে কিছু করি নাই।' মুসলিম লীগ পাকিস্তান অর্জনের লক্ষ্যে সর্বোচ্চ ত্যাগ ও সংগ্রামের আহ্বান জানালেও প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল ও জনসভার মাধ্যমে মুসলিম জনমনের ক্ষোভ ও প্রতিবাদ জ্ঞাপনের বাইরে অন্য কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করেনি। সমগ্র ভারতবর্ষে একমাত্র বাংলাদেশে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা ছিল বলে সবার দৃষ্টি ছিল বাংলার দিকে। বাংলাদেশেও মুসলিম লীগ ১৬ আগস্ট যথারীতি হরতাল ও জনসভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। ঐদিন সরকার সমগ্র প্রদেশে সরকারী ছুটি ঘোষণা করে। প্রাদেশিক রাজধানী কলিকাতা নগরীর গড়ের মাঠে মুসলিম লীগ বিরাট গনজমায়েতের আয়োজন করে। বাংলাদেশে মুসলিম লীগ সরকারে অধিষ্ঠিত থাকায় সকল কর্মসূচী যাতে শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয় সেটাই ছিল মুসলিম লীগের লক্ষ্য।

কিন্তু মুসলিম লীগের এ শান্তিপূর্ণ লক্ষ্যকে বানচাল করার জন্য কলিকাতার হিন্দু মহাসভাপন্থী ও কংগ্রেসের কট্টর সাম্প্রদায়িক হিন্দুরাও যে গোপনে প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তা পুলিশ বিভাগে একচেটিয়া হিন্দু প্রাধান্যের কারণে প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী জানতে পারেননি। গড়ের মাঠের মুসলিম লীগ গণজমায়েতে বক্তৃতা দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোহরওয়ার্দী শান্তিপূর্ণভাবে বৃটিশ সরকারের অন্যায় নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে জনগণের প্রতি আহবান জানান। প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবুল হাশিম ঘোষণা করেন, "হিন্দু জনগণের বিরুদ্ধে নয়, আমাদের সংগ্রাম বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অন্যায় একচোখা নীতির বিরুদ্ধে।"

কলিকাতায় দাঙ্গা

মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ সাম্প্রদায়িক হিন্দুদের চক্রান্ত সম্বন্ধে কতটা অনবহিত ছিলেন, তার অন্যতম প্রমাণ, গড়ের মাঠের জনসভায় জনাব আবুল হাশিম তার দুই অল্পবয়স্ক পুত্র বদরুদ্দীন মুহম্মদ উমর (১৫) ও শাহাবুদ্দীন মুহম্মদ আলীকে (৮) সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। মুসলিম লীগের অন্যতম নেতা ফরিদপুরের চৌধুরী মোয়াজ্জম হোসেন (লাল মিয়া) তাঁর ৬/৭ বছরের নাতিকে সঙ্গে নিয়ে ময়দানের গণজমায়েতে যোগ দান করেছিলেন। গোলমালের আশংকা থাকলে নিশ্চয়ই তারা এদের সঙ্গে নিয়ে জনসভায় যেতেন না। (দ্রষ্টব্য- আমার জীবন ও বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি ঃ আবুল হাশিম, পৃষ্ঠা- ১৩৩)।

ময়দানে যখন মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ শান্তিপূর্ণ পথে তাদের দাবী আদায়ের জন্য জনগণের প্রতি আহবান জানাচ্ছিলেন, তখন কলিকাতা শহরের বিভিন্ন স্থানে দাঙ্গাবাজ হিন্দুরা মুসলিম নিধনে মেতে উঠেছে। সভায় থাকতেই লীগ নেতৃবৃন্দ

www.pathagar.com

বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা লোকদের মুখে এসব খবর পান। ময়দানের জনসভায় আসার পথে মুসলিম লীগের কোন কোন শোভাযাত্রায় হিন্দুরা ছিটেফোঁটা আক্রমণ চালালেও নেতৃবৃন্দ এসব আক্রমণকে বিভিন্ন ঘটনা বলেই মনে করেছিলেন। কিন্তু তাদের তখনও জানা ছিল না যে, ১৬ আগস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস উপলক্ষ করে উপমহাদেশের একমাত্র মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভাকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করতে এবং মুসলিম জনগোষ্ঠীর পাকিস্তান দাবী চিরতরে ভুলিয়ে দেয়ার লক্ষ্যেই কট্টর হিন্দুরা কলিকাতায় নৃশংস দাঙ্গার চক্রান্ত পাকায়। ফলে অপ্রস্তুতির কারণে প্রথম কয়েকদিন মুসলমানরা নির্মম নিধনযজ্ঞের শিকার হয়।

কলিকাতার পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে একচেটিয়া হিন্দু প্রাধান্য ছিল। তারা হিন্দুদের দাঙ্গা প্রস্তুতির খবর জেনেও তা শ্বেতাঙ্গ আইজি মিঃ টেইলরকে জানায়নি বলে তিনি জানান। ফলে প্রধানমন্ত্রী এ ব্যাপারে পূর্বাহ্নে কিছুই জানতে পারেননি। দাঙ্গা শুরু হবার অব্যবহিত পরেই প্রধানমন্ত্রী চীফ সেক্রেটারী, স্বরাষ্ট্র সচিব, পুলিশ কমিশনার ও পুলিশের আইজি'র সভা ডাকেন এবং পরিস্থিতি সম্বন্ধে তাকে পূর্বাহ্নে কেন অবহিত করা হয়নি তা জানতে চান। সবাই নিরুত্তর থাকেন।

প্রধানমন্ত্রী সোহরওয়ার্দী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অবিলম্বে সেনাবাহিনী তলব করতে শ্বেতাঙ্গ গভর্নরকে অনুরোধ জানান। কিন্তু গভর্নর সে অনুরোধ রক্ষা করলেন না। কলিকাতা পুলিশে হিন্দুদের একচেটিয়া প্রাধান্য ছিল। পুলিশ কমিশনার ছিল ইংরেজ। কলিকাতার পুলিশ বাহিনী যথেষ্ট শক্তিশালীও ছিল না। দাঙ্গার প্রথম দিন শুধু হিন্দুরা মুসলিম নিধনে অংশ নিলেও দ্বিতীয় দিন থেকে শিখরাও হিন্দুদের সঙ্গে মুসলিম হত্যায় যোগ দেয়। ফলে কলিকাতা মহানগরীর মাত্র শতকরা ২৪ ভাগ মুসলিম অধিবাসীদের জীবনে কেয়ামত নেমে আসে।

দাঙ্গা দমনে শ্বেতাঙ্গ গভর্নর ও পুলিশ কমিশনারের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা না পেয়ে শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী সোহরওয়ার্দী তার নিজের কর্মস্থল পরিবর্তন করে লাল বাজারস্থ পুলিশ হেড কোয়ার্টারের কনট্রোল রুমে দিনরাত অবস্থান শুরু করেন। সোহরওয়ার্দী এ সময় তাঁর নিজের জীবন বিপন্ন করেও যেভাবে কলিকাতার অসহায় মুসলমানদের বাঁচানোর জন্য তার গাড়ীতে করে মহানগরীর বিভিন্ন দাঙ্গা উপদ্রুত এলাকায় ঘোরাফেরা করেন, সে কথা এখনও প্রত্যক্ষদর্শীরা শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করেন। কলিকাতার দাঙ্গা দমনে স্থানীয় প্রচেষ্টা অপর্যাপ্ত বিবেচিত হওয়ায় সোহরওয়ার্দীর অনুরোধে পাঞ্জাব সরকার একটি বড় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী কলিকাতায় পাঠায়। তাদের সাহায্যেই অবশেষে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। কিন্তু ইতিমধ্যেই যে সর্বনাশ হবার তা হয়ে যায়। নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকদের হিসাবেও কলিকাতার এই দাঙ্গায় প্রায় ৫০,০০০ নর-নারী প্রাণ

www.pathagar.com

হারায়, যাদের অধিকাংশই ছিল মুসলমান।

কলিকাতা দাঙ্গায় মুসলমানদের এতবড় ক্ষয়ক্ষতি হবার পরও হিন্দু পত্র-পত্রিকা সোহরওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ সরকারকে এ দাঙ্গার জন্য দায়ী করতে ভোলেনি। তাদের বক্তব্য, সোহরওয়ার্দীর প্ররোচণায় মুসলমানরাই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে এ দাঙ্গা বাধায়। কলিকাতা মহানগরীতে মুসলমানদের সংখ্যা মাত্র শতকরা ২৪। কলিকাতা পুলিশ বাহিনীতে একচ্ছত্র হিন্দু প্রাধান্য। মুসলমানরা সকল ব্যাপারেই হিন্দুদের তুলনায় পিছিয়ে। দাঙ্গায় শেষ পর্যন্ত দেখা গেল মুসলমানরাই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। এতদসত্ত্বেও হিন্দু পত্র-পত্রিকার এসব গাঁজাখোরী মুসলিম বিরোধী প্রচারণা নতুনভাবে প্রমাণ করল, মুসলমানদের তারা কি চোখে দেখে।

কলিকাতার দাঙ্গায় মুসলমানরা প্রচুর ক্ষতিগ্রস্ত হলেও দাঙ্গাবাজ হিন্দু মহাসভাপন্থী ও কট্টর কংগ্রেসী হিন্দুরা মুসলমানদের চিরতরে পাকিস্তান দাবী ভুলিয়ে দেবে বলে যে খোয়াব দেখেছিল, তা অবাস্তব প্রমাণিত হল। কলিকাতায় হিন্দুদের নৃশংস মুসলিম নিধনের প্রতিক্রিয়ায় মুসলমানদের মধ্যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংকল্প আরও শাণিত হল। তারা যে কোন মূল্যে জীবনের শেষ রক্তবিন্দুর বিনিময়ে হলেও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইস্পাত কঠিন ঐক্য গড়ে তুলল মুসলিম লীগের নেতৃত্বে।

কলিকাতা দাঙ্গায় বিপুল সংখ্যক মুসলমান নিহত হওয়ায় মুসলিম-প্রধান পূর্ববঙ্গে এর তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বিশেষতঃ কলিকাতায় নিহত মুসলমানদের অনেকেরই বাড়ি নোয়াখালী ছিল বলে নোয়াখালীতে এর প্রতিক্রিয়ায় দাঙ্গা শুরু হয়। তবে সঙ্গে সঙ্গে সরকার কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে দাঙ্গা তেমন মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারেনি। মুসলমানদের মতে, ১০০ এবং সরকারী হিসাবে এতে ২২০ জন প্রাণ হারায়। কিন্তু এই দাঙ্গা সম্পর্কে হিন্দু পত্র-পত্রিকাগুলো এমন সব গুজব ও অতিরঞ্জিত সংবাদ প্রকাশ করতে থাকে, যেন নোয়াখালীর দাঙ্গা কলিকাতার হত্যাকাণ্ডকেও ছাড়িয়ে গেছে। কংগ্রেস নেতা গান্ধী কলিকাতা দাঙ্গার সময় সেখানে না গেলেও নোয়াখালী এসে দাঙ্গা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও দীর্ঘদিন ধরে সেখানে অবস্থান করেন।

বিহার ও অন্যান্য প্রদেশে দাঙ্গা

হিন্দু পত্র-পত্রিকার অতিরঞ্জিত সংবাদ প্রকাশের ফলে সমগ্র ভারতবর্ষেই হিন্দুদের মধ্যে মুসলিমবিরোধী সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বিহারে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা ঘটা করে 'নোয়াখালী দিবস' পালন করে মুসলিম গণহত্যার ইন্ধন যোগায়। ফলে বিহারের শতকরা ১৪ ভাগ সংখ্যালঘু মুসলমানদের বিরুদ্ধে শুরু হয় অকল্পনীয় ভয়াবহ পাইকারী হত্যা অভিযান। ১৯৪৬ সালের ৩০ অক্টোবর হতে ৭

www.pathagar.com

নভেম্বর পর্যন্ত পরিকল্পিতভাবে মুসলমানদের হত্যা করা হয়। সামরিক কর্তৃপক্ষের হিসাব অনুযায়ী এই একতরফা দাঙ্গায় ১৫০০০ মুসলমান প্রাণ হারায়। কংগ্রেসের মতে, এই সংখ্যা ছিল ২০০০। আর মুসলিম লীগের মতে, এই সংখ্যা ছিল ৩০,০০০। সামরিক কর্তৃপক্ষের এই হিসাব এ জন্য বিশেষ বিবেচনার দাবী রাখে যে, এই দাঙ্গা দমনে সামরিক বাহিনীকে তলব করতে হয়েছিল।

দাঙ্গা দমনে বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করেন পূর্বাঞ্চলীয় জেনারেল অফিসার কমান্ডিং জেনারেল টুকার। টুকার লিখেছেন, "১৯৪৬ সালে যতগুলো ভয়ংকর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক ঘটনা ছিল এই যে, হিন্দুদের বিরাট জনতা রীতিমত প্রস্তুত হয়ে হঠাৎ সংখ্যালঘু মুসলমানদের আক্রমণ করে। ... এই কার্য পূর্ব নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও কর্মসূচী অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয়।' কলিকাতার দৈনিক স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদক মিঃ আয়ান স্টিফেনস মন্তব্য করেন, 'বিহারে অনুষ্ঠিত হত্যাকাণ্ডের পর ভারত বিভাগ অনিবার্য হয়ে পড়ে।' [দ্রষ্টব্য ঃ বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, ডঃ এম এ রহিম, ১৯৭৬, পৃঃ ২৯৬]

দুর্ভাগ্যের ব্যাপার এই যে, নোয়াখালীর সামান্য দাঙ্গার পর বিহারে এমন ভয়াবহ দাঙ্গা হওয়ার পরও অহিংসার বাণী প্রচারক মহাত্মা গান্ধী বিহারে যাবার প্রয়োজন অনুভব করেননি। তিনি নোয়াখালীতেই রয়ে যান। শুধু গান্ধীই নন, বিহারের দাঙ্গা বন্ধ করতে কংগ্রেসের কোন গুরুত্বপূর্ণ হিন্দু নেতাই বিহারে যাননি বা কোন আন্তরিক প্রয়াস চালাননি। কংগ্রেসের বড় নেতাদের মধ্যে একমাত্র সীমান্ত প্রদেশের খান আবদুল গাফফার খান বিহারে যেয়ে দাঙ্গাউপদ্রুত মুসলমানদের পাশে দাঁড়ান। বিহারে দাঙ্গা সম্পর্কে গান্ধীর মনোভাব তখন মুসলমানদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার করে। অবশেষে এ কে ফজলুল হকের তীব্র সমালোচনার মুখে ১৯৪৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী মিঃ গান্ধী পাটনার উদ্দেশ্যে নোয়াখালী ত্যাগ করেন। [দ্রষ্টব্য ঃ আমার জীবন ও বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি, আবুল হাশিম, পৃঃ ১৪৭]।

শুধু বিহারেই নয়, মুসলিমবিরোধী দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছিল অন্যান্য হিন্দু-প্রধান প্রদেশেও। মধ্যপ্রদেশ, দিল্লী, পাঞ্জাব, যুক্ত প্রদেশেও ঘটল একই ঘটনা। যুক্ত প্রদেশের গড়মুক্তেশ্বরে ২০০০ মুসলমানকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হল। এভাবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকায় মুসলিম নিধন একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হওয়ায় মুসলমানদের মধ্যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংকল্প ক্রমেই দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে লাগল।

www.pathagar.com

ইন্টেরিম গভর্নমেন্ট

ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নে হিন্দুদের প্রতি বৃটিশ সরকারের পক্ষপাত প্রকাশ পেয়েছিল বেশ আগেই। আগেই বলা হয়েছে, বড় লাট লর্ড ওয়াভেল তাঁর পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে মুসলিম লীগকে অন্তর্বর্তী সরকারে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। এরপর মুসলিম লীগকে বাদ দিয়েই বৃটিশ সরকার কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল নেহরুকে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের সুযোগ করে দেন। এতে স্বভাবতই মুসলিম লীগ ক্ষুব্ধ হয়। ২ সেপ্টেম্বর কালো পতাকা উত্তোলন ও কালো দিবস পালনের মাধ্যমে মুসলিম লীগ ভারতের সর্বত্র বৃটিশ-কংগ্রেস আঁতাতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। বড়লাট বুঝতে পারলেন, মুসলিম লীগ যেভাবে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি সংগ্রামমুখর হয়ে উঠেছে, তাতে লীগকে অন্তর্বর্তী সরকারে বাইরে রেখে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার আশা পূরণ সম্ভব নয়। তিনি নতুন করে লীগকে অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দেয়ার আহবান জানালেন। লীগ সরকারের ভিতরে ও বাইরে আন্দোলন চালিয়ে যাবার লক্ষ্য নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল।

কংগ্রেস প্রথমে মুসলিম লীগকে অন্তর্বর্তী সরকারের কোন গুরুত্বপূর্ণ পোর্টফোলিও দিতে অস্বীকার করলেও পরে অর্থ দফতর লীগকে দিতে রাজি হয়। কংগ্রেসের ধারণা ছিল লীগ নেতাদের মধ্যে কেউ অর্থনীতি বিষয়ে পারদর্শী নয় বলে এ পদে তারা চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেবে। এ সময় বিশিষ্ট মুসলিম অর্থনীতিবিদ চৌধুরী মোহাম্মদ আলী কায়েদে আজমকে অর্থ দফতরের দায়িত্ব লীগের হাতে নেয়ার পরামর্শ দিয়ে সর্বপ্রকার সহযোগিতার আশ্বাস দেন। মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিল। লিয়াকত আলী খান স্বয়ং অর্থ দফতরের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তিনি চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর সহায়তায় গণপরিষদে এমন এক সুন্দর বাজেট পেশ করেন, যা সর্বত্র 'পুওর ম্যানস বাজেট' (গরীবের বাজেট) বলে প্রশংসিত হল। অর্থ দফতরের অনুমোদন সরকার পরিচালনার সর্বত্র অপরিহার্য এটা স্মরণে রেখে অর্থমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান সুপরিকল্পিত অসহযোগিতার মাধ্যমে কংগ্রেস মন্ত্রীদের নিজ নিজ দফতর চালানো অসম্ভব করে তুললেন।

অন্তর্বর্তী সরকারের মধ্যে লীগ কংগ্রেস দ্বন্দ্বজনিত এই অচলাবস্থা এবং হিন্দু-প্রধান প্রদেশসমূহে মুসলিমবিরোধী দাঙ্গা বিস্তারের পাশাপাশি পাকিস্তান অর্জনের লক্ষ্যে লীগের নেতৃত্বে মুসলিম জনগোষ্ঠীর অনমনীয় মনোভাব দৃষ্টে বৃটিশ সরকার সমগ্র পরিস্থিতি নিয়ে নতুন করে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ এটলী ১৯৪৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারী ঘোষণা করেন, ১৯৪৮ সালের জুনের আগেই দায়িত্বশীল ভারতীয়দের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বৃটিশ সরকার দৃঢ়সংকল্প।

www.pathagar.com

এটলী বললেন, এই সময়ের মধ্যে কোন সর্বসম্মত শাসনতন্ত্র রচনা সম্ভব না হলে বৃটিশ সরকার বৃটিশ ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা কোন প্রকার কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অথবা আঞ্চলিকভাবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে অথবা অন্য কোন যুক্তিযুক্ত উপায়ে এ কাজ সম্পন্নের কথা বিবেচনা করবে।' তিনি একই সঙ্গে লর্ড ওয়াভেলের স্থলে লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেনকে বড় লাট নিয়োগেরও ঘোষণা দেন।

নেহেরু-মাউন্টব্যাটেন আঁতাত

লর্ড ওয়াভেলের শেষ দিকের কিছু কিছু কাজকর্ম কংগ্রেসের পছন্দ হয়নি। তার বদলে লর্ড মাউন্টব্যাটেন বড়লাট হওয়ায় কংগ্রেস-বৃটিশ আঁতাতের আশংকা সত্য প্রমাণিত হল। মাউন্টব্যাটেন পরিবারের সঙ্গে নেহরুর দীর্ঘদিনের সুগভীর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ওয়াকিবহাল মহলের কারো অজানা ছিল না। অন্তর্বর্তী সরকারে মুসলিম লীগের সম্পর্কে কংগ্রেসের তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে ইতোমধ্যে কংগ্রেসের অনেকের মধ্যেও ভারত বিভাগের অপরিহার্যতা নিয়ে একটা চিন্তা জন্ম নিচ্ছিল। তারা অবশ্য ভাবছিলেন, এমনভাবে ভারত বিভাগ সম্পন্ন করতে হবে, যাতে পাকিস্তান পুনরায় অখণ্ড ভারতের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যেতে বাধ্য হয়। জওহরলাল নেহরু, সরদার বল্লভভাই প্যাটেল প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবর্গ যে সেদিন এই মনোভাব নিয়েই ভারত বিভাগ সমর্থনের দিকে এগিয়েছিলেন, তার প্রমাণ পরবর্তীকালে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

লর্ড মাউন্টব্যাটেন ১৯৪৭ সালের ২২ মার্চ বড়লাটের কার্যভার গ্রহণ করেন। তিনি লীগ ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হন যে, মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব নয় এবং ভারত বিভাগ ছাড়া হিন্দু মুসলমান সমস্যা সমাধানের আর কোন পথ নেই। অন্তর্বর্তী সরকারের তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে নেহরু ও প্যাটেল একটি কীটদষ্ট পাকিস্তানের বিনিময়ে ভারত বিভাগে সম্মত হন। মাউন্টব্যাটেনেরও এতে সায় ছিল। এ সম্পর্কে মাওলানা আজাদ লিখেছেন, মাউন্ট ব্যাটেনের ভারত আগমনের কয়েক দিনের মধ্যেই নেহরু ও প্যাটেল তাদের নিজস্ব পরিকল্পনা মতে, ভারত বিভাগের দিকে ঝুঁকে পড়েন। তারা গান্ধীকেও তাদের পরিকল্পনায় রাজি করাতে সমর্থ হন।

আসলে এসবই ছিল একটি পাতানো খেলা। বড়লাটের শাসনতান্ত্রিক উপদেষ্টা মিঃ ভিপি মেনন লিখেছেন, মাউন্ট ব্যাটেনের কার্যভার গ্রহণের পূর্বে ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বরের শেষ দিকে এবং ১৯৪৭ সালের জানুয়ারীর প্রথম দিকে তিনি বল্লভ ভাই প্যাটেলকে ভারত বিভাগে সম্মত করতে সমর্থ হন। মেনন ভারত বিভাগের একটি খসড়া পরিকল্পনা ভারত সচিবকে পাঠিয়েছিলেন এবং লিখেছিলেন যে, কংগ্রেসের নিকট এরূপ পরিকল্পনা গ্রহণযোগ্য হতে পারে।' [দ্রষ্টব্য ঃ ট্রান্সফার অব পাওয়ার

www.pathagar.com

ইন ইন্ডিয়া, ভি পি মেনন, পৃঃ ২৫৮-২৫৯]। এই পটভূমিতে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ভারতে আসার কয়েকদিনের মধ্যেই গান্ধী, নেহরু, প্যাটেল প্রমুখ কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ মওলানা আবুল কালাম আজাদ ও অন্যান্য কংগ্রেসী মুসলমানদের অবাক করে দিয়ে বিশেষ পরিকল্পনায় ভারত বিভাগের প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাবেন এতে আশ্চর্যের কিছু ছিল না।

কিন্তু কি সে বিশেষ পরিকল্পনা– যার মাধ্যমে কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ এভাবে ভারত বিভাগ মেনে নিতে রাজি হয়ে গেলেন?

তেসরা জুন পরিকল্পনা

ভারত বিভাগ প্রস্তাবের সাথে সাথে মুসলিম-প্রধান বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশদ্বয়কেও বিভক্ত করতে হবে। জিন্নাহ বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগ প্রস্তাবের তীব্র সমালোচনা করেন। এদিকে, মাউন্ট ব্যাটেনের সঙ্গে আলোচনার পর গান্ধী নেহরু প্যাটেল ভারত বিভাগ মেনে নিতে প্রস্তুত হন। ২৮ এপ্রিল গণপরিষদ সভাপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ এর সদস্যদের উদ্দেশ্যে ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলেন, এমনও হতে পারে যে, সবগুলো প্রদেশ যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত নাও হতে পারে। যদি দুর্ভাগ্যজনকভাবে তেমনটাই ঘটে, আমাদের এক অংশের শাসনতন্ত্র নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

ইতোপূর্বে মাউন্ট ব্যাটেন তাঁর উপদেষ্টাদের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রদেশগুলোর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তাবসহ একটি শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা তৈরী করেন। এ খসড়া সামান্য রদবদলসহ বৃটিশ সরকারের অনুমোদন লাভ করলেও নেহরুর বিরোধিতার কারণে বাতিল হয়ে যায়। উভয়ের সিমলায় অবস্থানকালে মাউন্ট ব্যাটেন খসড়াটি নেহরুকে দেখতে দিলে তিনি তা নাকচ করে দেন। বড় লাট উপদেষ্টা ভিপি মেননকে বললে মেনন তার পূর্বতন খসড়ার আলোকে আরেকটি পরিকল্পনা রচনা করেন। মাউন্ট ব্যাটেন ১১ মে নেহরুকে এটা দেখতে দেন। নেহরু অনুমোদন করলে ১৮ মে বড় লাট এ খসড়া নিয়ে লন্ডন যান। এটলী সরকারের অনুমোদন নিয়ে ৩১ মে বড়লাট এই নতুন পরিকল্পনাসহ ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। ২ জুন ৭ জন লীগ কংগ্রেস ও শিখ নেতার সঙ্গে সংক্ষিপ্ত বৈঠকের পর ৩ জুন এই পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়।

তেসরা জুন পরিকল্পনা হিসাবে খ্যাত এই পরিকল্পনা ছিল মূলত স্বল্পতম সময়ের মধ্যে বৃটিশদের ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিকল্পনা। ১৭৫৭ সালে যে বৃটিশ নানা ছল-চাতুরী ও চক্রান্তের মাধ্যমে এদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কব্জা করেছিল, তারা হঠাৎ ক্ষমতা হস্তান্তরে ব্যাগ্র হয়ে পড়ল কেন, এ প্রশ্ন ওঠে স্বাভাবিকভাবেই। তারা স্বেচ্ছায় খুশী মনে ক্ষমতা হস্তান্তরে রাজি হয়নি। চতুর বৃটিশ জাতি বুঝতে পারছিল পলাশী ষড়যন্ত্রের সেদিনের সাথে এ দিনের অনেক পার্থক্য। পলাশী ট্রাজেডীর

www.pathagar.com

প্রাক্কালে নবাব দরবারের হিন্দু অমাত্যরা মুসলিম শাসন অবসানে ইংরেজদের সাথে হাত মিলিয়েছিল এ আশায় যে, কালে ভারতে আবার হিন্দু শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। হিন্দুরা এখন তাদের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুযোগ ফিরে এসেছে বলে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। তারা বরং আশা করছে, পলাশী চক্রান্তে হিন্দুদের মুখ্য অবদানের প্রেক্ষিতে ইংরেজরা বিদায় মুহূর্তে তাদের উপযুক্ত প্রতিদান দিয়ে যাবে। হিন্দু রাজনীতিকদের এই প্রত্যাশা পূরণের পথ প্রশস্ত করতেই বৃটিশ সরকার নেহরুর অন্তরঙ্গ বন্ধু মাউন্টব্যাটেনকে বৃটিশ-ভারতের শেষ ভাইসরয় করে পাঠান।

তবে সবচাইতে যে বড় ফ্যাক্টর ইংরেজদের দ্রুত ভারত ত্যাগের সপক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য করে তা ছিল ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমান জাতির মধ্যে বৃটিশ-বিরোধী শক্তিশালী স্বাধীনতা আন্দোলন। হিন্দু ও মুসলিম জনগণের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও স্বাধীনতা চেতনার মধ্যে যতই পার্থক্য থাকুক, তারা কেউই আর বৃটিশের গোলামী বরদাশত করতে রাজি ছিল না। এ স্বাধীনতা চেতনা যেমন ছড়িয়ে পড়েছিল বেসামরিক জনগণের মধ্যে, তেমনি তার বিস্তৃতি ঘটেছিল বৃটিশ-ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর এদেশীয় সদস্যদের মধ্যেও। এ ব্যাপারে নৌ-বাহিনীর বিদ্রোহের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। সেনাবাহিনী ও বিমান বাহিনীর মধ্যেও পড়েছিল নৌ-বিদ্রোহের প্রভাব। সবকিছু মিলে সশস্ত্র বাহিনীর এদেশীয় সিপাহী, নাবিক ও বৈমানিকদের উপর আর কিছুতেই বৃটিশ সরকার ভরসা রাখতে পারছিল না। বৃটিশ সরকার স্পষ্ট বুঝতে পারছিল ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব দমনে তারা সক্ষম হলেও সে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি এখন আর সম্ভব হবে না।

গোঁদের উপর বিষফোঁড়ার মত ইংরেজদের জন্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তাদের বিজয়ও তাদের জন্য একটা অভাবিত সমস্যা সৃষ্টি করে বসেছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পূর্ব রণাঙ্গনে জাপানী ফৌজের হাতে বৃটিশ-ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর প্রায় ৭০,০০০ সৈন্য বন্দী হয়। এদের নিয়েই জাপানের সহযোগিতায় সুভাষ চন্দ্র বসু গঠন করেছিলেন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি, যা আজাদ হিন্দ ফৌজ হিসাবে এদেশে খ্যাতি লাভ করেছিল। এই ফৌজের সৈন্যরা পরবর্তীকালে বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত জাপান পরাজিত হলে আজাদ হিন্দ ফৌজের এসব সৈন্যরা বৃটিশ বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসারদের বিরুদ্ধে ১৯৪৫ সালের শেষদিকে দিল্লীর লাল কেল্লায় বিচার শুরু হয় যুদ্ধপরাধী হিসাবে।

আজাদ হিন্দ ফৌজের তথাকথিত যুদ্ধাপরাধী এই অফিসারদের বিরুদ্ধে সামরিক আইন মোতাবেক বিচার করা যতটা সহজ ছিল, তা কার্যকর করা মোটেই সহজ ছিল না। সমগ্র ভারতবর্ষ এই অন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে সমস্বরে গর্জে ওঠে।

www.pathagar.com

কংগ্রেস, মুসলিম লীগসহ সকল রাজনৈতিক দল এই বিচারের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন শুরু করে দেয়। বৃটিশ সরকার বিচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ব্যাপকতায় ভীত হয়ে ১৯৪৬ সালের ৪ জানুয়ারী আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারাধীন অফিসারদের মুক্তি দিলেও বিচার ক্রিয়া সমাপ্ত হওয়ায় যাদের বিরুদ্ধে দন্ডাদেশ ঘোষিত হয়েছিল তাদের আটকে রেখে দেয়।

আজাদ হিন্দ ফৌজে হিন্দু, মুসলমান, শিখ সব ধর্মের অফিসার ও সৈন্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এদের মুক্তির লক্ষ্যে আন্দোলনও গড়ে উঠেছিল সর্বস্তরে। ছাত্র, শ্রমিক, রাজনৈতিক কর্মী সবাই সেদিন গর্জে উঠেছিল বৃটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের এই সাহসী সৈনিকদের মুক্তির দাবীতে। আজাদ ফৌজের যে সব দুঃসাহসিক অফিসারের নাম সেদিন পত্র-পত্রিকার পাতায় শিরোনাম সৃষ্টি করেছিল তাদের মধ্যে ছিল ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ, ক্যাপ্টেন ধীলন, ক্যাপ্টেন রশিদ আলী, ক্যাপ্টেন বোরহান উদ্দিন, ক্যাপ্টেন এহসান কাদির প্রমুখ। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয় দলই এই অভিযুক্ত অফিসারদের পক্ষে মামলা পরিচালনার লক্ষ্যে নামকরা আইনজীবীদের নিয়ে পৃথক পৃথক কমিটি গঠন করে। ক্যাপ্টেন রশিদ আলীর অভিপ্রায় অনুসারে তাঁর এবং ক্যাপ্টেন বুরহান উদ্দিন ও ক্যাপ্টেন এহসান কাদির প্রমুখের মামলা পরিচালনা করে মুসলিম লীগ কর্তৃক গঠিত কমিটি।

আজাদ হিন্দ ফৌজের অভিযুক্ত স্বাধীনতাকামী অফিসারদের মধ্যে ক্যাপ্টেন রশিদ আলীর শাস্তির প্রতিবাদে গড়ে ওঠা আন্দোলন সে সময় সারাদেশে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। ক্যাপ্টেন রশিদ আলীর শাস্তির প্রতিবাদে ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সমগ্র ভারতবর্ষে 'রশিদ আলী দিবস' উদ্‌যাপিত হয়। উক্ত প্রতিবাদ দিবসে বিভিন্ন শহরে পুলিশের সাথে বিক্ষুব্ধ জনগণের সংঘর্ষ বাধে। রশিদ আলী দিবসে কলিকাতার মুসলিম ছাত্রীরা যেখানে পুলিশের লাঠিচার্জ, গুলিবর্ষণ অগ্রাহ্য করে বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করে, তা সেকালের প্রেক্ষাপটে ছিল অভাবিতপূর্ব। (দ্রষ্টব্য ঃ আমাদের মুক্তি সংগ্রাম, মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ, ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৬৯, পৃঃ ৩৬০)।

নৌ-বিদ্রোহের ঘটনার মতই আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসারদের বিচারের ঘটনা প্রমাণ করেছিল ঃ (এক) বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম আর বেসামরিক জনগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। (দুই) উপমহাদেশের রাজনীতিতে শুধু বৃটিশ সরকার আর কংগ্রেস এ দু'টি পক্ষই নেই, মুসলিম লীগও একটি গুরুত্বপূর্ণ পক্ষ, যার সমর্থন ছড়িয়ে পড়েছিল নৌ-বাহিনীসহ বৃটিশ ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের মধ্যেও। বিশেষ করে ১৯৪৫-৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর নিখিল ভারত মুসলিম লীগই যে উপমহাদেশীয় মুসলমান একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক

www.pathagar.com

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠায় তা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

এমনি পটভূমিতে মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবীকে আর সরাসরি অগ্রাহ্য করার সুযোগ ছিল না বৃটিশ কর্তৃপক্ষের। ইন্টেরিম সরকারে মুসলিম লীগকে শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়েছিল এই অনুভূতি থেকেই। অন্তর্বর্তী সরকারের কংগ্রেস হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিল মুসলিম লীগকে তুচ্ছ করার মজা। এরপর থেকেই মুসলিম লীগের দাবী সরাসরি অগ্রাহ্য না করে তাকে ভেতর থেকে দুর্বল করে দেয়ার লক্ষ্যে চলে যে সূক্ষ্ম প্রচেষ্টা, তারই ফসল ছিল ৩ জুন পরিকল্পনা। নেহরুর বন্ধু মাউন্টব্যাটেনের সচেতন পৃষ্ঠপোষকতায় বড় লাটের তথাকথিত উপদেষ্টা ভিপি মেননের রচিত ও নেহরু কর্তৃক অনুমোদিত এই পরিকল্পনা কিভাবে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দকে না দেখিয়ে মাউন্টব্যাটেন নিজে নিয়ে গিয়ে ইংল্যান্ড থেকে এটলী সরকারকে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে আনেন, সে ঘটনা আগেই বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। এমনকি, বৃটিশ সরকারের অনুমোদিত এ পরিকল্পনা হিন্দু, মুসলিম ও শিখ নেতাদের ২ জুন দেখানো হলেও তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা বা আলোচনার কোন সুযোগ দেয়া হয়নি। এ পরিকল্পনা সম্পর্কে বড় লাটের বক্তব্য ছিল, হয় একে গ্রহণ অথবা বর্জন করতে হবে। তবে লীগ এ পরিকল্পনা বর্জন করলে তাদের পরিণতি শুভ হবে না। অর্থাৎ সেক্ষেত্রে কংগ্রেসের হাতেই সকল ক্ষমতা হস্তান্তর করবে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ। এমনি হুমকির মুখেই মুসলিম লীগ কংগ্রেসের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ৩ জুন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

সার্বভৌম বাংলা আন্দোলন

মাউন্টব্যাটেন বড়লাট হয়ে আসার পরপরই এ ধরনের প্রস্তাবের আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগের আভাস পাওয়া মাত্র মুসলিম লীগ নেতা কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তার তীব্র প্রতিবাদ জানান। কিন্তু গান্ধী, নেহরু, প্যাটেল বাংলা ও পাঞ্জাব বিভক্তিকরণের প্রশ্নে আগাগোড়া অনড় থাকেন। তাদের বাংলা ও পাঞ্জাব বিভক্তির প্রশ্নে এই অনড় অবস্থানের আসল উদ্দেশ্য অবশ্য পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কর্তৃক কুমিল্লার কংগ্রেস নেতা আশরাফউদ্দিন আহমদ চৌধুরীকে পার্টিশনের প্রাক্কালে লিখিত একটি পত্রে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ পত্রে নেহরু কংগ্রেস কর্তৃক ৩ জুন পরিকল্পনা গ্রহণের স্বপক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে বলেন, "কংগ্রেস অখণ্ড ভারতের লক্ষ্য বিসর্জন দিয়েছে, এ কথা সত্য নয়। ...কংগ্রেস ভারত বিভাগ মেনে নিয়েছে শুধুমাত্র বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগের শর্তে। কারণ, একমাত্র এ পথেই আমরা অখণ্ড ভারত পুনরায় ফিরে পেতে পারি।" [দ্রষ্টব্য ঃ রাজ বিদ্রোহী আশরাফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী, জামালুদ্দিন চৌধুরী]। এখানে

www.pathagar.com

উল্লেখযোগ্য যে, এই বইয়ের লেখক জামালুদ্দিন চৌধুরীর ভগ্নী বেগম রাবেয়া চৌধুরী বহুদিন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সদস্য ছিলেন।

একদিকে গান্ধী, নেহরু, প্যাটেল প্রমুখ কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ, অন্যদিকে হিন্দু মহাসভার বাঙ্গালী নেতা ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী বাংলা বিভাগের জণ্য জোর আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকেন। ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী এমনও ঘোষণা করেন, ভারত ভাগ না হলেও বাংলা ভাগ করতেই হবে। অন্ততপক্ষে বাংলা যাতে বিভক্ত না হয় তার জন্য মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। তাদের এ চেষ্টারই অন্যতম ফসল ছিল ১৯৪৭ সালের সার্বভৌম বাংলা আন্দোলন। তাদের এতদিনকার দাবী ছিল বাংলাদেশ হবে পাকিস্তানের অংশ। বাংলা বিভাগ এড়াতে তারা ভারত ও পাকিস্তানের বাইরে একটি স্বতন্ত্র সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে হলেও বাংলাকে অবিভক্ত রাখার প্রস্তাব দেন।

ভারত ও পাকিস্তানের বাইরে স্বতন্ত্র স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলা গঠনের প্রস্তাবের মূল উদ্যোক্ত বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ হলেও এতে সমর্থন দান করেন প্রাদেশিক কংগ্রেস নেতৃত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ উপলক্ষে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস নেতাদের পরপর কয়েকটা সভা হয়। এসব সভায় মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে শহীদ সোহরাওয়ার্দী, খাজা নাজিমুদ্দিন, আবুল হাশিম এবং কংগ্রেসের শরৎচন্দ্র বসু, কিরণশংকর রায় প্রমুখ অংশ নেন। অতঃপর ১৯৪৭ সালের ২০ মে শরৎচন্দ্র বসুর বাসভবনে অনুষ্ঠিত সভায় বৃহত্তর সার্বভৌম বাংলা গঠনের এক খসড়া পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ২০ মে মঙ্গলবার এ সভায় যোগ দেন মুসলিম লীগের শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, ডাঃ আবদুল মোত্তালেব মালিক ও ফজলুর রহমান এবং কংগ্রেসের শরৎচন্দ্র বসু, কিরণশংকর রায় ও সত্যরঞ্জন বখশী।

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতাদের উপস্থিতিতে এই প্রস্তাবে প্রাদেশিক কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের পক্ষে স্বাক্ষর করেন শরৎচন্দ্র বসু ও আবুল হাশিম। এই খসড়া চুক্তিতে বলা হয় ঃ (এক) বাংলাদেশের মুসলিম লীগ সরকার ক্ষমতাসীন থাকবে। কিন্তু হিন্দু মন্ত্রীদের স্থানে বঙ্গীয় কংগ্রেসের সভ্যদেরকে নিয়োগ দান করা হবে। (দুই) বাংলাদেশ পাকিস্তান বা হিন্দুস্থান কোন রাষ্ট্রে যোগ দেবে না। ইহা অবিভক্ত ও স্বাধীন থাকবে। বাংলাদেশ পাকিস্তানে বা ভারত যোগ দেবে অথবা স্বাধীন থাকবে, বাংলাদেশের গণপরিষদে সে সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে। সার্বজনীন বয়স্ক ভোটে যুক্ত নির্বাচন প্রথায় গণপরিষদ নির্বাচিত হবে। (তিন) লোকসংখ্যার ভিত্তিতে মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের জন্য আসন নির্ধারিত করা হবে। (দ্রষ্টব্য ঃ বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস। ডঃ এম এ রহিম, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃঃ-৩২৫)।

www.pathagar.com

এই চুক্তির ভিত্তিতে সোহরাওয়ার্দী, শরৎ বসু ও আবুল হাশিম বৃহৎ বঙ্গের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। এই পরিকল্পনায় পূর্ণিয়া থেকে আসাম পর্যন্ত বাংলা ভাষাভাষী ভূভাগ নিয়ে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়। তিনটি অঞ্চল এই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হবে। (এক) মধ্য বাংলা অঞ্চলঃ চট্টগ্রাম, ঢাকা, রাজশাহী, প্রেসিডেন্সী বিভাগ এবং সিলেট জেলা এই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ-এর অন্তর্ভুক্ত থাকবে। (দুই) পূর্ব অঞ্চল সিলেট ব্যতীত আসাম নিয়ে এই অঞ্চল গঠিত হবে। (তিন) পশ্চিম অঞ্চল, বর্ধমান বিভাগ ও বিহারের পূর্ণিয়া বিভাগ এর অন্তর্ভুক্ত হবে। আইন সভায় হিন্দু-মুসলিমদের সমানসংখ্যক আসন থাকবে। প্রধানমন্ত্রী সব সময় মুসলমানদের মধ্য হতে হবে; পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশের রাষ্ট্র প্রধানের পদ হিন্দু, মুসলমান ও সংখ্যালঘুরা পাবে। এই শাসনতন্ত্র ১০ বছর পরীক্ষামূলকভাবে চলবে, যদি এটা কার্যকরী করতে অসুবিধা হয় তাহলে ১০ বছর পর যে কোন অঞ্চল এই রাষ্ট্র ব্যবস্থা থেকে সরে দাঁড়াতে পারবে এবং ইচ্ছামত স্বাধীন হতে অথবা ভারত বা পাকিস্তানে যোগ দিতে পারবে। (দ্রষ্টব্য ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ-৩২৫)।

১৯৪৭ সালের ২০ মে স্বাক্ষরিত এ চুক্তির নকলসহ শরৎচন্দ্র বসু একখানি পত্র গান্ধীকে পাঠান ২৩ মে তারিখে। সোহরওয়ার্দীও জিন্নাহর নিকট চুক্তির একটি কপি প্রেরণ করেন। জিন্নাহ বৃহত্তর সার্বভৌম বাংলার প্রস্তাবের প্রতি সহানুভূতিশীল হলেও গান্ধীর মনোভাব শুধু নেতিবাচকই নয়, হতাশাব্যঞ্জক ছিল। সার্বভৌম বাংলা প্রস্তাবের প্রতি জিন্নাহর মনোভাব সম্পর্কে শেখ মুজিবের লেখা থেকেও সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। সোহরওয়ার্দীর উদ্যোগে পরিচালিত সার্বভৌম বাংলা আন্দোলন সম্পর্কে শেখ মুজিব বলেন, "তিনি (সোহরওয়ার্দী) একমাত্র ব্যক্তি যিনি খণ্ডিত পাকিস্তানে খণ্ডিত বাংলার কুফল উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তাহার ফলে উদ্ভব হইয়াছিল বৃহত্তর বাংলার 'সোহরওয়ার্দী বসু চুক্তি' জনাব সোহরাওয়ার্দী ও মিঃ শরৎচন্দ্র বসুর নামানুসারে। এই পরিকল্পনার প্রতি কায়েদে আজমেরও আশীর্বাদ ছিল, কিন্তু মিঃ বল্লভ ভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে পরিচালিত চরমপন্থী কংগ্রেস মহল এবং মিঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর ন্যায় সাম্প্রদায়িকতাবাদীগণ এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করিতে দেয় নাই।" (দ্রষ্টব্য ঃ 'নেতাকে যেমন দেখিয়াছি' শেখ মুজিবুর রহমান, ইত্তেফাক, সোহরাওয়ার্দী সংখ্যা, ১৯৬৪, পৃঃ-১৪৬)।

শুধু জিন্নাহ্‌ই নন, মুসলিম লীগের অন্যান্য নেতারাও বাংলা বিভাগের প্রবল বিরোধিতা করেন। মাউন্ট ব্যাটেন ১৯৪৭ সালের মার্চে গভর্নর জেনারেল হয়ে ভারতে আসার পর থেকেই বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগের ভাসা ভাসা আলোচনা শুরু হয়। মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ তখন থেকেই এর বিরোধিতা করে আসছিলেন। মুসলিম লীগের অন্যতম নেতা খাজা নাজিমুদ্দীন ১৯৪৭ সালের ২২ এপ্রিল এক

www.pathagar.com

বিবৃতিতে বলেন, "আমার সুচিন্তিত অভিমত এই যে, স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা, তার জনসাধারণ মুসলমান বা অমুসলমান যেই হোক, তাদের স্বার্থের পক্ষে অনুকূল এবং আমি একইভাবে সুনিশ্চিত যে, প্রদেশের বিভক্তি বাঙালীর স্বার্থে চরম আঘাত হানবে।" (দ্রষ্টব্যঃ "A Socio Politocal History of Bengal and the Birth of Bangladesh, Kamruddin Ahmad, 4th Edition, 1975, Dhaka, P.83)।

জিন্নাহ যে বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগ রোধের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন, তার প্রমাণ মেলে মাউন্ট ব্যাটেনের কথায়ও। মাউন্ট ব্যাটেন দেশ বিভাগের বহু পর ১৯৪৮ সালের ৬ অক্টোবর লন্ডনে বাংলা বিভাগের পেছনে তার নিজের কৃতিত্ব জাহির করতে গিয়ে বাংলা ও পাঞ্জাব রোধে জিন্নাহর আপ্রাণ চেষ্টার কথা স্বীকার করেন। তিনি ঐ ভাষণের একাংশে বলেন, "ঐ দু'টি প্রদেশ কেন ভাগ করা সঙ্গত হবে না তার স্বপক্ষে জিন্নাহ্ শক্তিশালী যুক্তি প্রদর্শন করেন। তিনি (জিন্নাহ্) বলেন, ঐ প্রদেশদ্বয়ের স্বতন্ত্র জাতিগত বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং বিভক্তি তাকে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত করবে।" (দ্রষ্টব্য ঃ প্রাগুক্ত, কমরুদ্দীন আহমদ, পৃঃ-৮৩)।

জিন্নাহ্ আগাগোড়াই বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগের ক্ষতিকর দিক সম্বন্ধে একদিকে বড়লাট লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনকে, অন্যদিকে হিন্দু ও শিখ নেতৃবৃন্দকে বুঝাতে চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। তবে এক পর্যায়ে জিন্নাহ্ বুঝতে পারেন যে, তাঁর এসব চেষ্টা নিষ্ফল হতে চলেছে, কারণ মাউন্ট ব্যাটেন এবং হিন্দু ও শিখ নেতৃবৃন্দ অনেক আগে থেকেই গভীর আঁতাতের মাধ্যমে এ বিষয়ে কাজ করে চলেছেন। বাংলাদেশের বিশিষ্ট গবেষক, রাজনীতিক কমরুদ্দীন আহমদ এ প্রসঙ্গে বলেন, "জিন্নাহ্ শীঘ্রই বুঝতে পারলেন- পাঞ্জাব ও বাংলা বিভাগের বুদ্ধি দিয়েছেন স্বয়ং মাউন্ট ব্যাটেন এবং হিন্দু ও শিখ নেতৃবৃন্দকে এ দু'টি প্রদেশ বিভাগের ভয়ংকর পরিণতি সম্বন্ধে বুঝানোর চেষ্টা চালানো বৃথা হবে।" (দ্রষ্টব্য ঃ প্রাগুক্ত, কমরুদ্দীন আহমদ, পৃঃ-৮৩)।

এতো গেল সার্বভৌম বাংলা আন্দোলন সম্পর্কে মুসলিম লীগ মহলের দৃষ্টিভঙ্গী। সার্বভৌম বাংলার আন্দোলন সম্পর্কে কংগ্রেস নেতৃত্ব, বিশেষ করে গান্ধীর প্রতিক্রিয়া কি ছিল? সার্বভৌম বাংলা সম্পর্কে ১৯৪৭ সালের ২০ মে স্বাক্ষরিত চুক্তির একটা কপিসহ শরৎ চন্দ্র বসু গান্ধীকে পত্র পাঠিয়েছিলেন ২৩ মে। গান্ধী তার তাৎক্ষণিক জবাবে জানালেন, "প্রিয় শরৎ, তোমার পত্র পেয়েছি। খসড়াটিতে এমন কিছু নেই যার থেকে মনে করা যেতে পারে যে, নিছক সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে কিছু করা হবে না। প্রত্যেক আইনের জন্য কার্যনির্বাহীদের এবং আইন সভার হিন্দু সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন থাকতে হবে।"

www.pathagar.com

ইতিমধ্যে ১৯৪৭ সালের ৯ জুন শরৎ চন্দ্র বসু জিন্নাহ্‌কেও একটি পত্র দেন। তাতে বাংলা বিভক্তির বিরুদ্ধে তার প্রভাব প্রয়োগের আবেদন জানান। জিন্নাহ আইন সভার মুসলিম সদস্যদের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ভোটদানের নির্দেশ দেন। ফলে মুসলমান সদস্যগণ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ভোট দেন। অপরপক্ষে হিন্দু সদস্যগণ কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় সদস্যদের নির্দেশে বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে ভোট দেন। (দ্রষ্টব্য ঃ "আমার জীবন ও বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি" আবুল হাশিম, অনুবাদ ঃ শাহাবুদ্দীন মোহাম্মদ আলী, ১৯৮৭, পৃঃ ১৭৮-১৭৯)।

ইতিমধ্যে হিন্দু নেতাদের কে বা কারা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ভোটদানের জন্য উৎকোচ দেয়া হচ্ছে বলে গান্ধীর কান ভারি করে তোলেন। গান্ধী যেন এ গুজব বিশ্বাস করার জন্য আগে থেকেই মানসিকভাবে তৈরি ছিলেন। শরৎ চন্দ্র বসু এ বিষয় জানতে পেরে গান্ধীকে নিম্নমর্মে টেলিগ্রাম পাঠান ঃ "যুক্ত বাংলার সমর্থনে ভোট ক্রয় করার জন্য যে অকাতরে অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে সে বিষয়ে আপনার সংবাদদাতার নাম প্রকাশ্যভাবে ব্যক্ত করার জন্য এবং সত্য যাচাই করার জন্য অনুসন্ধান চালাতে অনুরোধ জানাচ্ছি। যদি সংবাদ সঠিক না হয় তাহলে সংবাদদাতাকে শাস্তি দিন। সংবাদ যদি সঠিক হয় তাহলে উৎকোচ দাতা ও গ্রহিতাকে শাস্তি দিন।" গান্ধী জবাবে প্রেরিত তার টেলিগ্রামে শুধু "নাম প্রকাশ করা উচিত হবে না" এই কথা বলে প্রসঙ্গ এড়িয়ে যান। (দ্রষ্টব্য ঃ প্রাগুক্ত, আবুল হাশিম, পৃঃ ১৭৯-১৮০)।

সার্বভৌম বাংলার প্রস্তাব সম্বন্ধে গান্ধী ১৯৪৭ সালের ৮ জুন শরৎ চন্দ্র বসুকে লিখিত পত্রে বিস্তারিত বক্তব্য দেন। পত্রে তিনি লিখেন, "প্রিয় শরৎ, তোমার খসড়া পড়লাম। আমি এখন পরিকল্পনাটি নিয়ে মোটামুটিভাবে পণ্ডিত নেহরু এবং সরদারের সঙ্গে আলোচনা করেছি। দুইজনই প্রস্তাবটির বিরুদ্ধে অনঢ় এবং তারা মনে করেন– এটা কেবল তফসিলী সম্প্রদায়ের এবং হিন্দু নেতাদের দ্বিধাবিভক্ত করার ফন্দি। তাদের কাছে এটা সন্দেহ নয় বরং প্রায় দৃঢ় বিশ্বাস। তারা আরও মনে করেন যে, তফসিলী সম্প্রদায়ের ভোট সংগ্রহের জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে। যদি তাই হয়, তোমার উচিত আপাতত সংগ্রাম থেকে বিরত থাকা।" পত্র শেষ করেন তিনি এভাবে ঃ "তোমার উচিত হবে বাংলার অখণ্ডতার জন্য সংগ্রাম পরিত্যাগ করা এবং বঙ্গভঙ্গের জন্য যে পরিবেশ রচিত হয়েছে তাতে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি না করা।" (দ্রষ্টব্য ঃ 'আমার জীবন ও বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি', আবুল হাশিম, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃঃ ১৮০-১৮১)।

শরৎ চন্দ্র বসু ১৪ জুন গান্ধীকে এর জবাবে পত্র দেন। তাতে তিনি দুঃখ করে বলেন, "প্রিয় মহাত্মাজী, আপনার আট তারিখের সহৃদয় চিঠি গতকাল বৈকালে

www.pathagar.com

আমার হাতে পৌছেছে। আমি জানতে পারলাম, জওহরলাল এবং বল্লভ ভাই দু'জনেই প্রস্তাবটির বিরুদ্ধে অনঢ় এবং এটা হিন্দু ও তফসিলী সম্প্রদায়ের নেতাদের বিভক্ত করার একটি চক্রান্ত। তাদের এই মতের সঙ্গে আমি একমত হতে পারি না। জানুয়ারী মাসে এবং তারপর থেকে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে এবং পরবর্তীকালে কতিপয় কংগ্রেস নেতৃবর্গের সাথে আলাপ আলোচনার পর নিশ্চিতভাবে এবং জোরালোভাবে আমি বলতে পারি যে, সেখানে চক্রান্ত বলে কোন ব্যাপার ছিল না। আমি বুঝতে পারি না যে, তফসিলী সম্প্রদায়ের ভোট সংগ্রহের জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে বলতে জওহরলাল ও বল্লভ ভাই কি বোঝাতে চাইছেন। সত্য ঘটনার ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব। সন্দেহ ও অনুমানের ক্ষেত্রে নয়। যাই হোক, আমাকে বলতে হয় যে, তফসিলী সম্প্রদায়ের ভোট সংগ্রহের জন্য অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে এ বিষয়ে সন্দেহ অথবা অনুমান সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।" (দ্রষ্টব্য : প্রাগুক্ত, আবুল হাশিম, পৃঃ ১৮৪)

শরৎ চন্দ্র বসু গান্ধীকে আরেকটি পত্র লেখেন এবং সেই পত্রে উল্লেখ করেন, "আমার ভাবতে কষ্ট হয় যে, যে কংগ্রেস একদা ছিল একটি মহান জাতীয় প্রতিষ্ঠান, তা দ্রুত কেবলমাত্র হিন্দুদের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে চলেছে।" (দ্রষ্টব্য : প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮৫)।

এই প্রেক্ষাপটে সার্বভৌম বাংলার চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অতঃপর ১৯৪৭ সালের ২৯ জুন বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্যদের এক যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যৌথ সভা মেজরিটি ভোটে পাকিস্তানে যোগদানের পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করে। এর পনের মিনিট পর বাংলার মুসলিম ও হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের সদস্যগণ পৃথক পৃথক সভায় মিলিত হন। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের সদস্যদের সভায় অখণ্ড বাংলার পক্ষে এবং হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের সভায় বঙ্গভঙ্গের পক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হয়। কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্যগণ বঙ্গভঙ্গের পক্ষে ভোট দেন।

বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগের ব্যবস্থা এভাবে চূড়ান্ত হওয়ার পর ৩ জুন পরিকল্পনার অন্যান্য বিষয় বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অগ্রসর হল সরকার। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ও আসাম প্রদেশের সিলেট জেলায় গণভোটের উদ্যোগ নেয়া হল। যেহেতু উপমহাদেশ বিভক্ত হচ্ছিল মুসলিম ও হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশের ভিত্তিতে, সুতরাং বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগের প্রশ্ন উঠার কথা ছিল না। তবুও পাঞ্জাবে ও বাংলায় যথেষ্ট সংখ্যক শিখ ও হিন্দু বসবাস করত, এই যুক্তিতে এই দু'টি প্রদেশ বিভাগের ব্যবস্থা করা হল। কিন্তু উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে বলতে গেলে শতকরা ৯৯ এরও বেশী অধিবাসী মুসলমান। সেখানে গণভোট অনুষ্ঠানের যুক্তি কোথায়? নেহরু ভেবেছিলেন, সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছে,

www.pathagar.com

তাই গণভোটে সীমান্ত প্রদেশ হয়ত ভারতে যোগ দিতে পারে। কিন্তু তার সে আশা পূরণ হল না। গণভোটে 'সীমান্ত গান্ধী' খান আবদুল গফফার খান ও তার ভাই ডাঃ খান সাহেবের সমস্ত প্রচারণা উপেক্ষা করে জনগণ পাকিস্তানে যোগদানের পক্ষে সিদ্ধান্ত নিল।

সিলেট গণভোট অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৭ সালের ৬ ও ৭ জুলাই। এর আগেই আমার কলেজ জীবনের পাট চুকে গেছে। কলেজ জীবন মানে ঢাকা গভর্নমেন্ট ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের সেই উত্তেজনাময় দিনগুলো। দু'বছরের এ জীবন যে কখন কিভাবে কেটে গেছে, টেরই পাইনি। আমরা বিশেষত আমি তখন পাকিস্তান আন্দোলনে বিভোর হয়ে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে ছোটাছুটি করে বেড়িয়েছি। ঢাকা থেকে গফরগাঁ, গফরগাঁ থেকে ঢাকা। ঢাকা থেকে ফরিদপুর, ফরিদপুর থেকে মাদারীপুর, শিবচর হয়ে আবার ফরিদপুর। ফরিদপুর থেকে রাজবাড়ী, পাংশা, বালিয়াকান্দি। আবার ঢাকা ফিরেই ঢাকার মুসলিম লীগ প্রার্থী এটিএম মজহারুল হকের নির্বাচনী অভিযানে ঢাকার আশপাশে ঝটিকা সফর। কোথায় না গিয়েছি।

'শেষ পর্যন্ত আপনিও?'

১৯৪৫ থেকে ১৯৪৭-এ দু'বছরের কলেজ জীবনে এসব রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি সাহিত্য-সংস্কৃতির অঙ্গনেও নিয়মিত অংশ নিয়েছি। এই উপলক্ষেই নাজিরা বাজারে 'শহীদ নজীর লাইব্রেরী'-তে যেতাম পাকিস্তান আন্দোলনের পরিপোষক পুস্তক-পুস্তিকা ও সংবাদপত্র পাঠ ও আলোচনা সভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে। এ উপলক্ষ্যেই কাজী আলাউদ্দীন রোডে 'পাকিস্তান লাইব্রেরী' নামের পুস্তকালয়ে যেতাম সময় পেলেই। ঐ লাইব্রেরীর পরিচালনায় ছিলেন ফেনীর আজীজ আহমদ, যিনি সাতচল্লিশের পর পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ও পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ছিলেন।

এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ে ফজলুল হক মুসলিম হলের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের এক সাহিত্য সম্মেলনের কথা। এই সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৬ বা ১৯৪৭ সালে। ঠিক কত তারিখে এটি অনুষ্ঠিত হয় তা মনে নেই। তবে এতে যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের কথা বেশ মনে আছে। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন কাজী মোতাহার হোসেন। তবে তিনি সভাপতির সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দিয়েই খালাস পান নাই, শ্রোতাদের অনুরোধে তাকে সভায় দু'খানি নজরুল সঙ্গীতও পরিবেশন করতে হয়েছিল। সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সাংবাদিক আবুল মনসুর আহমদ। তিনি তাঁর ভাষণের এক পর্যায়ে বলেন, কেউ কেউ মনে করেন, সাহিত্যের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক থাকা ঠিক নয়।

www.pathagar.com

আমি মনে করি, রাজনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কবিহীন সাহিত্য সম্পূর্ণ মূল্যহীন। এই সাহিত্য সংসদের নামের সাথে 'পূর্ব পাকিস্তান' যুক্ত না থাকলে আমি এ সম্মেলনে আসার প্রেরণাই অনুভব করতাম না। সম্মেলনের প্রধান আকর্ষণ অবশ্য ছিলেন গায়ক আব্বাস উদ্দীন আহমদ। এতদিন আব্বাস উদ্দীনের গান শুনেছি গ্রামোফোন রেকর্ডে। এই প্রথম সরাসরি তার গান শুনবার সৌভাগ্য হল। আব্বাস উদ্দীনের পরনে ছিল পাজামা, চুরিদার হাতার পাঞ্জাবী গলায় চাদর ঝোলানো। পর পর নজরুল ইসলাম, গোলাম মোস্তফা ও জসিম উদ্দীনের কয়েকটি গান শুনিয়ে তিনি হল শুদ্ধ দর্শক-শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে দেন।

ঐ সাহিত্য সম্মেলনে কবি সানাউল হক একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। মুনীর চৌধুরী পরিবেশন করেছিলেন একটি ক্যারিকেচার। তার ক্যারিকেচারের থিম ছিল রেডিও'র নব ক্রমাগত ঘুরিয়ে সেন্টার বদল করে চললে কেমন আওয়াজ হয় তা দেখানো। প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের পক্ষে অজিত কুমার গুহ শুভেচ্ছা বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বামপন্থী তরুণ বুদ্ধিজীবী সরদার ফজলুল করিম পাকিস্তান আন্দোলনের প্রতি তার সমর্থনের কথা জানাতে গিয়ে তাঁর চিরাচরিত বিনয়ী ভঙ্গিতে হাসি মুখে এক পর্যায়ে বলেছিলেন- "আমাকে কেউ কেউ প্রশ্ন করেছে, 'শেষ পর্যন্ত আপনিও? আমি তাদের বলেছি- হ্যাঁ শেষ পর্যন্ত আমিও।"

কলেজ জীবনের দু'বছর পরীক্ষার পড়াশোনার চাইতে অন্যান্য বিষয়েই অধিক ব্যস্ত থাকতাম বলে হঠাৎ একদিন যখন ফাইনাল পরীক্ষার তারিখ এসে গেল, প্রথম প্রথম একটু অপ্রস্তুতই হয়েছিলাম। তবে রাত জেগে পড়াশোনা করে শেষ পর্যন্ত মোটামুটি ভালই পরীক্ষা দিয়েছিলাম। ইংরেজী দ্বিতীয়পত্রের অন্যতম পাঠ্যগ্রন্থ ছিল চার্লস ডিকেন্স-এর ফরাসী বিপ্লবের পটভূমিতে রচিত 'এ টেল অব টু সিটিজ' নামক উপন্যাস।

সে সময়ে গুলিস্তান হলের অদূরে 'ব্রিটেনিয়া টকিজ' বলে একটা ছোট সিনেমা হল ছিল। ইংরেজী বই দেখার দরকার হলে আমরা পুরানা ঢাকা থেকে ঐ হলে আসতাম। আমাদের যখন পরীক্ষা চলছিল তখন ঐ হলে 'এ টেল অব টু সিটিজ' ছবিটা প্রদর্শিত হচ্ছিল। পরীক্ষা শেষ হতে হতে ছবিটা শেষ হয়ে যেতে পারে। সুতরাং সিদ্ধান্ত নিলাম পরীক্ষার আগের সন্ধ্যায় হলে যেয়ে ছবিটি দেখব। বইটা আমার আগেই ভাল পড়া ছিল। পরীক্ষার আগের সন্ধ্যায় বন্ধুরা যখন পড়াশোনায় ব্যস্ত, আমি খোদা ভরসা করে ব্রিটেনিয়া টকিজ-এ যেয়ে ছবিটা দেখে আসলাম এবং পরদিন পরীক্ষা অন্যান্য অনেক বন্ধুর তুলনায় ভালই দিলাম।

ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা শেষ হবার পরই শুরু হল আহসানুল্লাহ রোডের

www.pathagar.com

প্যারাডাইস হোস্টেল থেকে পাততাড়ি গুটাবার পালা। শুধু হোস্টেল নয়, কলেজ জীবনও সাঙ্গ হল পরীক্ষা দেবার পর। একেকটা ফাইন্যাল পরীক্ষা যেমন অনাগত নতুন সম্ভাবনাময় সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে আমার জীবনে, তেমনি অতীতের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের বেদনাও কম দেয়নি। চল্লিশে তালিমনগর জুনিয়র মাদ্রাসার ক্লাসফ্রেন্ডদের কাছ থেকে বিদায় নিতে যেমন নাড়ি ছেঁড়ার বেদনা অনুভব করেছিলাম, অথবা পাঁচচল্লিশে ফরিদপুর ময়েজুদ্দিন হাই মাদ্রাসার ক্লাস ফ্রেন্ডদের ছেড়ে আসতে যতটা দুঃখ অনুভব করি, তার তুলনায় অবশ্য এবারের বিচ্ছেদ ব্যথ্য অনেক কম ছিল। কারণ ইন্টারমিডিয়েট পাস করার পর সবাইতো ভর্তি হব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। আর যাদের বাড়ীই ঢাকা শহরে, তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ু ক বা নাই পড়ু ক, তাদের তো ঢাকায়ই থাকার কথা।

কিন্তু এসব কথা তাত্ত্বিক কথা। বাস্তব সত্য এই যে, গত দু'টি বছর ধরে কলেজে এক সঙ্গে পড়ার সুবাদে ক্লাস ফ্রেন্ডদের সাথে যে একাত্মতা গড়ে উঠেছিল, তাতে ছেদ পড়ল নির্মমভাবে। সাতচল্লিশে আইএ পরীক্ষা দেবার পরও মোটামুটিভাবে ঢাকায়ই আমার শিক্ষা ও কর্ম জীবন অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও ইন্টারমিডিয়েটের ক্লাস ফ্রেন্ডদের ক'জনের সাথেই বা সম্পর্ক বজায় রাখতে পেরেছি। আজ এতদিন পর যখন পেছন ফিরে তাকাই, অনেক ক্লাস ফ্রেন্ডের নামই স্মরণ করতে পারছি না। আমাদের ক্লাস ফ্রেন্ডদের মধ্যে একজন ছিলেন হাফেজে কোরআন। ঢাকার আদি বাসিন্দা ছিলেন বলে তাঁর উচ্চারণে একটা ঢাকাইয়া একসেন্ট ছিল। অত্যন্ত সহজ সরল মানুষটি। বয়সে আমাদের অনেকের বড়, তদুপরি হাফেজ ছিলেন বলে আমরা তাঁকে খুব সম্মান করতাম। অথচ আজ তাঁর নামটা পর্যন্ত মনে করতে পারছি না। ক্লাস ফ্রেন্ডদের মধ্যে আইউব আলী, আবদুর রশিদ, আবদুল হালিম প্রমুখের কথা বেশ মনে পড়ে। কারণ, পরবর্তীকালে বহুদিন পর্যন্ত এদের সাথে সম্পর্ক ছিল। শেষোক্ত বন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্রার অফিসে চাকরি পেয়েছিলেন। মনে পড়ে বাগেরহাটের বন্ধু ইব্রাহীম হোসেনের কথা। তার কাছে বাগেরহাটের স্থানীয় রাজনীতির কথা শুনতাম প্রায়ই। হোস্টেলে আরও থাকতেন ময়মনসিংহের সিরাজুল ইসলাম, মমতাজ উদ্দিন তালুকদার ও তাহের উদ্দিন তালুকদার। শেষোক্ত বন্ধুদ্বয়ের বাড়ী পাকুন্দিয়া। সিরাজুল ইসলাম হোস্টেলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গান গাইতেন। তবে ময়মনসিংহের আঞ্চলিক প্রভাবে 'যদি কোন ভালবাসা কিছু আলো কিছু আশা' গানটি যখন গাইতেন সেটা হয়ে উঠত 'যদি কুনু ভালুবাসা কিছু আলু কিছু আশা'। আমরা ক্ষেপাতাম– 'কিছু আলু কিছু আদা'।

চমৎকার গান গাইতেন শামসুদ্দীন। বাড়ী রাজশাহীর বদলগাছি। ছোটখাটো

www.pathagar.com

মানুষটি এই শামসুদ্দীন ছিলেন হোস্টেলে আমার রুমমেট। আইএ পড়ার সময় আমি একবার পানি বসন্তে আক্রান্ত হই, শামসুদ্দীন তখন আমাকে প্রচুর সেবাযত করেন। তার বাড়ী আর কবি তালিম হোসেনের বাড়ী একই বদলগাছিতে। তালিম হোসেনের 'হে বঞ্চিত মজলুমের দরদী কায়েদে আজম' প্রভৃতি জনপ্রিয় শামসুদ্দীনের দরদী কণ্ঠে যখন শুনতাম, সুরের আবেশে আমরা যেন তন্ময় হয়ে পড়তাম। শামসুদ্দীন ইংরেজীতে অনার্স পড়েছিলেন। বহুদিন হয়ে গেছে, জানি না, এখন তিনি কোথায় কেমন আছেন। ক্লাস ফ্রেন্ডদের মধ্যে নূরুল্লাহ খান ও আবদুল ওদুদ ভুইয়া রাজনৈতিক মনোভাবাপন্ন ছিলেন। শেষোক্ত বন্ধু আইন ব্যবসায়ে যোগ দিয়েছিলেন জানতাম। তবে বহুদিন তারও খোঁজ খবর জানি না। নূরুল্লাহ খান ছিলেন সুবক্তা, অপরিমেয় সম্ভাবনাময় এক তরুণ। কিন্তু আল্লাহর কি মর্জি, অকাল মৃত্যু তাঁর সকল সম্ভাবনায় ছেদ টেনে দিয়েছে।

আমার ক্লাস ফ্রেন্ডদের অন্যতম ছিলেন নূরুল ইসলাম পাটোয়ারী। আইএ পাস করার পর দু'জনই আমরা বাংলা অনার্সে ভর্তি হয়েছিলাম। ১৯৫০ সালে অনার্স ফাইন্যাল পরীক্ষা দেয়ার কথা ছিল। আমি তমদ্দুন মজলিস ও ভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ার দরুন অনার্স ফাইন্যাল পরীক্ষা দিতে পারিনি। আমার দেখাদেখি পাটোয়ারীও পরীক্ষা থেকে বিরত থাকে। দীর্ঘ এগার বছর পর হলেও আমি শেষ পর্যন্ত এমএ পাস করি। কিন্তু পাটোয়ারী সাংসারিক ও সাংবাদিক জীবনে ঢুকে পড়ায় বাংলাদেশ আমলে তাকে আন্ডারগ্রাজুয়েট অবস্থায়ই দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হয়। ইন্টারমিডিয়েট ক্লাস ফ্রেন্ডদের মধ্যে একমাত্র পাটোয়ারীর সঙ্গেই আমার আমৃত্যু অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল।

কলেজ জীবনে ক্লাস ফ্রেন্ডদের বাইরেও বেশ কিছু সিনিয়র ও জুনিয়র কলেজ ফ্রেন্ডের সাথে আমার অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিল। এদের অন্যতম ছিলেন আমার ক্লাস ফ্রেন্ড নূরুল্লাহ খানের বড় ভাই বাকীবিল্লাহ খান। বয়সে আমাদের বড় হয়েও তিনি আমাদের জুনিয়র হয়ে যান বোর্ডের নিয়মের কারণে। তখন টাইটেল পাসকেও ম্যাট্রিকুলেশনের সমমানের ধরা হত বলে কলিকাতার মাদ্রাসা আলিয়া থেকে কৃতিত্বের সাথে টাইটেল পাস করেও তাকে ১৯৪৬ সালে আইএ-তে ভর্তি হতে হয়েছিল। এ ধরনের আরেক বন্ধু ছিলেন ইব্রাহীম আখন্দ। মূল বাড়ী ময়মনসিংহ হলেও বহুদিন থেকেছেন আসামে। বাঙ্গাল খেদার শিকার হয়ে চলে আসতে হয়েছিল আসাম ছেড়ে। তিনি ভাল অসমীয় ভাষা জানতেন। তাঁর কাছে আমরা অসমীয় ভাষা শিখেছিলাম। পরবর্তীকালে রেডিওতে উচ্চ পদে তিনি কাজ করেছেন। প্রখ্যাত আবৃত্তিকার শফি কামাল যে তার সন্তান, তা জেনেছি অনেক পরে।

www.pathagar.com

কলেজ জীবনে আমার সিনিয়র কলেজ ফ্রেন্ডদের মধ্যে মুহম্মদ আবু বকর, এনামুল হক ছিলেন অন্যতম। মেধাবী ছাত্র মুহম্মদ আবু বকরের বাড়ী ছিল যশোর। পরবর্তীকালে নার্কোটিকস বিভাগে তিনি উচ্চ পদে চাকরি করেছেন। আমার ইসলামিক ফাউন্ডেশনে কর্মরত থাকা অবস্থায়ও আমার কাছে তিনি মাঝে মাঝে আসতেন। বহুদিন তার সাথে দেখা সাক্ষাৎ নেই। জানি না, তিনি এখন কোথায় কেমন আছেন।

এনামুল হক ক্লাস ফ্রেন্ড না হলেও আমার জীবনে অনেক প্রভাব বিস্তার করেন তার ও আমার উভয়ের বাড়ী বৃহত্তর ফরিদপুরে হবার সুবাদে এবং উভয়ে ফরিদপুর ময়েজুদ্দিন হাই মাদ্রাসা ও ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের ছাত্র হবার কারণে। পাকিস্তান আন্দোলন চলাকালে আমি তাঁর গ্রামের বাড়ী গেছি। কালুখালি-ভাটিয়াপাড়া লাইনে বোয়ালমারী রেল স্টেশনে নেমে যেতে হয়েছিল তার গ্রামের বাড়ী দুর্গাপুর, তার ভাষায়, দরগাপুর। জানি না এখন তার গ্রাম কোন নামে পরিচিত রয়েছে। এনামুল হকের বড় ভাইয়ের নাম, যতদূর মনে পড়ে ডাঃ আবদুল্লাহ। খুবই সজ্জন, ধর্মপ্রাণ মানুষ। তার মেজভাই ফজলুর রহমান রেশনিং ডিপার্টমেন্টে চাকরি করতেন মীর কাদিমে পাকিস্তান আমলে। মীর কাদিমে এনামুল হকের সঙ্গে যেয়েই পরিচিত হয়েছিলাম কথা সাহিত্যিক আবু ইসহাকের সাথে। তিনিও ঐ একই ডিপার্টমেন্টে চাকরি করতেন তখন।

ঢাকায় আমার দু'বছরের ইন্টারমিডিয়েট জীবনে আমি যেসব সাহিত্যিকের প্রেরণা লাভ করি তাদের অনেকের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তবে আর দু'জনের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ না করলেই নয়। এদের একজন ইব্রাহীম খাঁ। শুনেছিলাম তিনি সাহিত্যিক ছাড়াও ছিলেন একটি কলেজের (করটিয়া সাদত কলেজ) অধ্যক্ষ। পত্র-পত্রিকায় তার লেখা পড়ে আমরা তরুণরা ধরেই নিয়েছিলাম তিনি হবেন ১৯৪৬ সালের সোহরওয়ার্দী মন্ত্রীসভার শিক্ষামন্ত্রী। কিন্তু বাস্তবে যখন দেখলাম তিনি নন, শিক্ষামন্ত্রী হলেন আমাদের অজানা অন্য এক ব্যক্তি (সৈয়দ মোয়াজ্জমউদ্দীন হোসেন), আমরা বেশ মর্মাহত হয়েছিলাম।

অপর যে সাহিত্যিক ঐ সময় পাকিস্তান আন্দোলনে আমাদের প্রেরণা যোগাতেন তিনি ছিলেন আবু জাফর শামসুদ্দীন। পেশায় সাংবাদিক, নেশায় সাহিত্যিক আবু জাফর শামসুদ্দীনের প্রথম উপন্যাস 'পরিত্যক্ত স্বামী' ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল। মুসলমানদের মধ্যে কবি অনেকে থাকলেও ঔপন্যাসিক বেশী ছিল না বলে আবু জাফর শামসুদ্দীনের প্রতি ছিল আমাদের বিশেষ দুর্বলতা। পেশাগতভাবে তিনি তখন ছিলেন কলিকাতার দৈনিক আজাদ-এর ঢাকাস্থ প্রতিনিধি। তাঁর অফিস ছিল রোকনপুরে আমাদের কলেজের ঠিক পেছন দিকে। পাকিস্তান আন্দোলন সম্বন্ধে

www.pathagar.com

কারও মনে কোন প্রশ্নের উদয় হলে আমরা চলে যেতাম তাঁর অফিসে। তিনি ব্যাখ্যা করে আমাদের প্রশ্নের সুন্দর সমাধান দিয়ে দিতেন।

এনামুল হকের গ্রামে বেড়াতে যাবার ব্যাপার দু'টি ঘটনার কারণে আমার স্মৃতিপটে আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে। যেদিন তার বাড়ীতে যাই, সেদিন সন্ধ্যার পর তাদের গ্রামের হালট দিয়ে আমরা দু'জন বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। পাকিস্তান আন্দোলন তখন তুঙ্গে এবং আমরা দু'জনই ছিলাম ঐ আন্দোলনের স্বপ্নে বিভোর। সন্ধ্যা রাতের আবছা আঁধারে আমরা দু'জন উৎসাহের আতিশয্যে গলাগলি ধরে গেয়েছিলাম সেদিনের জনপ্রিয় গান ঃ 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান কবুল মোদের জান পরাণ' এবং 'ঝির ঝির ঝির ঝির পূবান বাতাসে ধাও, ওরে আমার ময়ূরপঙ্খী নাও'। আমাদের দু'জনের কেউই গায়ক নই। সুতরাং গানের তাল, মানের কোন বালাই ছিল না। কিন্তু আমরা নিশ্চিত, আমাদের হেড়ে গলার এ সঙ্গীত প্রয়াস কাউকে সেদিন বিরক্ত করেনি। কারণ, তখন এসব গানের এ ধরনের চর্চা গ্রামেগঞ্জে হরহামেশাই চলতো সর্বস্তরের তরুণদের মধ্যে। পাকিস্তান আন্দোলনে সেদিনের তরুণ সমাজের অংশগ্রহণের পেছনে এসব গানের ছিল সঞ্জীবনী প্রেরণা।

এনামুল হকের গ্রামের আরেকটি যে ঘটনা আমার স্মৃতিপটে দাগ কেটে আছে, সেটি একটি নামাজের ঘটনা। এনামুল হকদের বাড়ীতে একটি মসজিদ ছিল। সেই মসজিদে নামাজ পড়তে গেছি। যতদূর মনে পড়ে সেটা ছিল মাগরিবের ওয়াক্ত। কি মনে করে জানি না, আমাকে ইমামতি করতে দেয়া হল। আমি এর আগেও আমাদের গ্রামের মসজিদে বহুবার ইমামতি করেছি। সুতরাং একে আমি সহজভাবেই নিয়েছিলাম। কিন্তু সেই ইমামতি করতে যেয়েই আমার প্রায় ভড়কে যাবার দশা। প্রথম রাকাতে আমার সূরা ফাতিহা তেলাওয়াত শেষ হবার সাথে সাথে পেছন থেকে এমন উচ্চস্বরে 'আ-মী-ন' আওয়াজ উঠলো যে, আমি কিছুক্ষণের জন্য প্রায় সম্বিৎ হারা হয়ে পড়লাম। সম্বিৎ ফিরে পেতেই মনে পড়ে গেল– এনামুল হকরা তো আহলে হাদীস। এনামুল হক আহলে হাদীস ছিলেন, তা আগেও লক্ষ্য করেছি। আমাদের সাথে নামাজ পড়ার সময়ও তিনি সূরা ফাতেহার প্রকাশ্য তেলাওয়াত অন্তে অনুচ্চ স্বরে 'আমীন' বলতেন। তিনি সে আওয়াজটা একা করতেন বলে তা আমাদের কানে তেমন বাজত না। কিন্তু মসজিদ শুদ্ধ মুসল্লীর সমবেত উচ্চকণ্ঠের আমীন আওয়াজ শোনার এই প্রথম অভিজ্ঞতায় ক্ষণিকের জন্য হলেও আমি সত্যই ভড়কে গিয়েছিলাম।

আমাদের এলাকায় আহলে হাদীসকে বলা হয় লা-মজহাবী। আমাদের গ্রামে এবং আশপাশের অধিকাংশ গ্রামে তেমন আহলে হাদীস নেই। পাশের বাবুপুর গ্রামে একজন আহলে হাদীস ছিলেন। নাম মৌলভী আবদুর রহমান। তিনি ছিলেন

www.pathagar.com

পরহেজগার, সারাক্ষণ পাগড়ী পরে থাকতেন। কিন্তু লা-মজহাবী বলে তাকে সামাজিকভাবে কিছুটা হেয় জ্ঞান করা হতো। আমাদের এলাকার শতকরা ৯৯ জন লোকই হানাফী মজহাব ভুক্ত। লা-মজহাবীদের তারা সুনজরে দেখতেন না। লা-মজহাবীরাও হানাফীদের বিরুদ্ধে এমন কি ইমাম আবু হানিফার বিরুদ্ধেও নানারকম কুৎসা রটনা করতেন। ফলে দ্বন্দ্বটা হয়ে উঠেছিল অনিবার্য। এ দ্বন্দ্ব কতটা প্রকট ছিল, একটা উদাহরণ দিলে তা স্পষ্ট হবে। একবার বহুদিন দেশে বৃষ্টি না হওয়াতে চার দিকে হা হা রব উঠল। শেষ পর্যন্ত বৃষ্টির জন্য মাঠে ইস্তেস্কা নামাজের সিদ্ধান্ত হল। কিন্তু নামাজ শেষে মোনাজাত কিভাবে হবে, তা নিয়ে লাগলো তর্ক। লা-মজহাবীরা যেভাবে মোনাজাত করেছে সেভাবে মোনাজাত করা চলবে না, এটাই হল গ্রামের হানাফী আলেমদের সিদ্ধান্ত। যদিও আমার দৃষ্টিতে আহলে হাদীসদের মোনাজাত পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত ভাল মনে হয়েছিল।

পাকিস্তান আন্দোলনের জোয়ারে অবশ্য এসব কুসংস্কার ও সংকীর্ণতার অনেক কিছুই সেদিন ভেসে গিয়েছিল। যেমন ভেসে গিয়েছিল মুসলমান সমাজের তথাকথিত আশরাফ-আতরাফ ও উঁচু-নীচুর কৃত্রিম ব্যবধান। আমার এলাকার যে মুসলমান জমিদারদের সামনে সাধারণ ঘরের শিক্ষিত মুসলমানদেরও চেয়ারে বসা এককালে নিষিদ্ধ ছিল, সেই সাধারণ গেরস্ত ঘরের শিক্ষিত ছেলেদের হাতেই তখন পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃত্ব এবং তাদের এ প্রাধান্যকে অস্বীকার করার কোন উপায় ছিল না জমিদারদেরও।

পাকিস্তান আন্দোলনে আমাদের এলাকার তরুণদের মধ্যে সবচাইতে সক্রিয় ও অগ্রণী ভূমিকা ছিল বাবুপুরের উল্লেখিত মৌলভী আবদুর রহমানের ছেলে আবুল হোসেনের। শুধু পাকিস্তান আন্দোলনেই নয়, পাকিস্তান আমলের ভাষা আন্দোলনেও এই আবুল হোসেনের ছিল সক্রিয় বলিষ্ঠ ভূমিকা। এসব উপলক্ষেই আমি গ্রামে গেলেই আবুল হোসেন আসত আমাদের বাড়ী। প্রথম প্রথম একটি লা-মজহাবী ছেলের সাথে আমার এই মেলামেশাকে আমার আব্বা সুনজরে দেখতেন না। কিন্তু পরে আব্বাসহ আমার পরিবারের সবার কাছেই সে অত্যন্ত আপনজন হয়ে উঠেছিল।

পাকিস্তান আন্দোলন সমাজের সর্বস্তরে কিরূপ পরিবর্তন এনেছিল, তা টের পেলাম আইএ পরীক্ষা পর্ব সেরে বাড়ী গেলে। ঢাকায় দু'বছর আইএ পড়ার সময়েও ছুটি-ছাটাতে বাড়ী গেছি। কিন্তু তখন সব সময়ই তাড়া থাকত কখন কলেজ আবার খুলবে এবং আমাকে ফিরতে হবে ঢাকার হোটেল জীবনে। কিন্তু এবারে সে তারা নেই। এ পরীক্ষার ফল বেরোলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির চেষ্টা করতে হবে– এ ধরনের তাগিদ মনের মধ্যে অবশ্যই ছিল। সে হিসাবে পরীক্ষার

www.pathagar.com

রেজাল্ট কী হবে এ নিয়ে একটা টেনশনে থাকাও অস্বাভাবিক ছিল না। আমার জীবনে দেখেছি, আমি যেসব পরীক্ষা যথেষ্ট ভাল দিয়েছি, এমন কি স্ট্যান্ড করেছি সেসব পরীক্ষায়ও কি জানি ফেল করি কিনা– রেজাল্ট বেরোনোর আগ পর্যন্ত এ ধরনের একটা টেনশনে থেকেছি। এবারই প্রথম আইএ ফাইনাল পরীক্ষা দেবার পর পরীক্ষার রেজাল্টের বদলে আমার সব ভয়, সব টেনশন জমা হয়েছিল অন্য একটি প্রশ্নকে কেন্দ্র করে– শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হবে তো?

রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রতি মুহূর্তে এমন সব পরিবর্তন দ্রুত ঘটে চলছিল যে, কোন কিছুর ব্যাপারেই নিশ্চিত হবার উপায় ছিল না। ১৯৪৫-৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর একথা যখন সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল যে, উপমহাদেশের মুসলমানরা মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবীর পক্ষে ঐক্যবদ্ধ, তারপর তো এ সম্পর্কে কোন অনিশ্চয়তাই আর থাকার কথা ছিল না। কিন্তু বৃটিশ ও কংগ্রেস এর পরেও এ গণদাবী নিয়ে কম টালবাহানা করেনি। কেবিনেট মিশনের গ্রুপ সিস্টেমের প্রস্তাব কংগ্রেস মেনে নেয়ার পরও নেহরুর এক বিবৃতিতে সে প্রস্তাব কেমন ভণ্ডুল হয়ে যায় তা সবারই মনে আছে। এমন কি কংগ্রেস নেতা মওলানা আবুল কালাম আজাদও এ নিয়ে নেহরুকে কম সমালোচনা করেননি। এর পর ইন্টেরিম সরকার নিয়ে বড় লাট লর্ড ওয়াভেলের ডিগবাজি। পরিশেষে নেহরুর ব্যক্তিগত বন্ধু লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের গভর্নর জেনারেল হিসেবে নিয়োগ লাভ এবং মাউন্ট ব্যাটেন কর্তৃক নেহরুর সঙ্গে গোপন পরামর্শের পর ৩ জুন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং এই পরিকল্পনায় বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগের শর্তে এই লক্ষ্যে ভারত বিভাগের প্রস্তাব অনুমোদন, যাতে করে কংগ্রেসের স্বপ্নের অখণ্ড ভারত পুনঃ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়– এর প্রতিটি ঘটনাই ছিল মুসলমানদের জন্য এক এক চ্যালেঞ্জ বিশেষ।

একদিকে রাজনৈতিক অঙ্গনে এসব নিত্যনতুন ঘটনা প্রবাহ, অন্যদিকে ১৯৪৬-এর পর থেকে সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে যে নৃশংস মুসলিম নিধনযজ্ঞ শুরু হয়ে যায়, তাতে প্রতি মুহূর্তে মুসলমানরা তাদের ভবিষ্যৎ ভেবে শঙ্কিত ছিল। সেদিন গুটিকতক ব্যতিক্রম বাদে সকল মুসলিম নেতা যে কায়েদে আজমের নেতৃত্বে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবীর সমর্থনে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন, তার কারণ তাদের মনে এ আশঙ্কা ঘনীভূত হয়েছিল, পাকিস্তান না হলে তাদেরকে স্পেনের মুসলমানদের ভাগ্যবরণ করতে হবে। আমরা ছাত্র সমাজও সেদিন এই একই আশঙ্কায় কায়েদে আজমের আহবানে সাড়া দিয়ে আমাদের ছাত্রজীবনের কিছুটা ক্ষতিসাধন করেও পাকিস্তান আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। আমাদের মনে হয়েছিল, জাতি হিসেবেই যদি আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাই, তা হলে ব্যক্তিগতভাবে উচ্চ শিক্ষা লাভের কিইবা মূল্য থাকবে?

www.pathagar.com

আইএ ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে বাড়ী এসে দেখলাম, পাকিস্তান আন্দোলন এখন মোটেই গুটিকতক শিক্ষিত লোক বা নেতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। পাকিস্তান দাবী জাতির শিরায় শিরায় সমাজের সর্বস্তরে এমন এক গতিবেগ সৃষ্টি করেছে যার তুলনা বিরল। কংগ্রেস অর্ধ শতাব্দীরও বেশী সময় ধরে জাতির সামনে স্বাধীনতার কোন বাস্তব রূপরেখা তুলে ধরতে সমর্থ না হওয়াতে ঐ আন্দোলন এক অন্ধ আবর্তে ঘুরপাক খেয়ে চলছিল। তার তুলনায় লাহোর প্রস্তাবে প্রতিফলিত হয়েছিল উপমহাদেশের বহু শতাব্দীর বাস্তবতা। মুসলিম লীগ এটা চায়নি যে, ভারতবর্ষে শুধু মুসলমানদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। কংগ্রেসের অখণ্ড ভারতের দাবীর বিপরীতে পাকিস্তান দাবীর মোদ্দা কথাই ছিল– এই বিশাল উপমহাদেশের যে অংশে হিন্দুরা মেজরিটি সেখানে তাদের নেতৃত্বে এবং যে অংশে মুসলমানরা মেজরিটি সেখানে তাদের নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক শাসন কায়েম হবে। কায়েদে আজম একথাটাই এভাবে বলতেন, লিভ এন্ড লেট লিভ, তোমরাও বাঁচো, আমাদেরও বাঁচতে দাও। তা ছাড়া তিনি স্পষ্টভাবেই বলতেন, পাকিস্তান কখনও সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হবে না। লাহোর প্রস্তাবের সুস্পষ্ট বক্তব্যও ছিল, উপমহাদেশের হিন্দু ও মুসলিম অধ্যুষিত সকল স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রেই সংখ্যালঘুদের অধিকার সুরক্ষিত থাকতে হবে।

কংগ্রেস চেয়েছিল, ব্রুট মেজরিটির জোরে মুসলমানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক অধিকার নস্যাৎ করে দিতে। ১৯৪৬ সালের আগস্ট থেকে ভারতবর্ষের হিন্দু-প্রধান অঞ্চলগুলোতে যেভাবে মুসলিম নিধন পর্ব শুরু হল, তার উদ্দেশ্য নিশ্চয় ছিল মুসলমানদের পাকিস্তান দাবীর সাধ মিটিয়ে দেয়া। কিন্তু এর ফলে মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংকল্পই দৃঢ়তর হল। যদিও আমরা মুসলিম প্রধান অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলাম বলে আমাদের অঞ্চলে মুসলিম বিরোধী দাঙ্গার আশঙ্কা তেমন একটা ছিল না, তবুও ভারতের বিহার, কলিকাতা এবং অন্যান্য হিন্দু প্রধান অঞ্চলের দাঙ্গাবাজরা যে সুযোগ পেলে আমাদের উপরে একদিন চড়াও হতে চেষ্টা করবে না– এমন আশঙ্কাও উড়িয়ে দেয়া সম্ভব ছিল না। বিশেষ করে তারা যখন শিক্ষা-দীক্ষা, চাকরি-বাকরী, ব্যবসা-বাণিজ্য সবক্ষেত্রে মুসলমানদের চাইতে অনেক অগ্রসর। যা হোক, এই আশঙ্কা থেকে নেহায়েত আত্মরক্ষার তাগিদে মুসলিম তরুণরা কোন কোন স্থানে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি শরীর চর্চা, লাঠিখেলা, তলোয়ার খেলা, কুস্তি এবং কোথাও আক্রান্ত হলে কিভাবে আত্মরক্ষা করে বেরিয়ে আসতে হবে তার নানা কসরৎ শিক্ষাগ্রহণ করতে লাগল। এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করে মুসলিম লীগ ন্যাশনাল গার্ড।

পাকিস্তান আন্দোলনকালে আমাদের এলাকায় আবুল হোসেন নামের এক তরুণ

www.pathagar.com

কর্মীর কথা আগেই উল্লেখ করেছি। আমাদের ইউনিয়নে অপেক্ষাকৃত বয়স্কদের মধ্যে খোশবাড়ীর আবদুল জলিলের নেতৃস্থানীয় ভূমিকা বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। রাজবাড়ীর দুই উকিল আহমদ আলী মৃধা ও মাজেদ আলী খান ছিলেন যথাক্রমে মহকুমা মুসলিম লীগের সভাপতি ও সম্পাদক। সালুখালীর জমিদার খানবাহাদুর ইউসুফ হোসেন চৌধুরী যদিও ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে অন্যতম এমএলএ হয়েছিলেন তবুও পাংশা থানায় কাজী আব্দুল মাজেদই ছিলেন পাকিস্তান আন্দোলনের মূল নেতা। পাংশায় তরুণদের নেতা ছিলেন সৈয়দ সালাহউদ্দিন মাহমুদ ওরফে জ্যোৎস্না মিয়া। জ্যোৎস্না মিয়া পরবর্তীকালে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছেন। জ্যোৎস্না মিয়ারা তখন পাংশায় একটি ক্লাব ও পাঠাগারও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আন্তরিকতায় টগবগ, লম্বা ছিপছিপে, চোস্ত পাজামা শেরোয়ানী পরিহিত জ্যোৎস্না মিয়া যখন বক্তৃতা দিতেন– অনেকেই তাকে বলতেন, ক্ষুদে জিন্নাহ!

১৯৪৭ সালের আগস্টপূর্ব দিনগুলোতে পাকিস্তানের মূল দাবী কংগ্রেস স্বীকার করে নিতে বাধ্য হলেও ইংরেজ সরকার ও কংগ্রেস নেতাদের মতিগতি সম্পর্কে আমরা কিছুতেই শংকামুক্ত হতে পারছিলাম না। এই প্রেক্ষাপটেই তখন মুসলিম লীগ ন্যাশনাল গার্ডে যোগ দিয়ে আমরা গ্রামে গ্রামে কুচকাওয়াজের পাশাপাশি শরীর চর্চা, ছুরিখেলা, তলোয়ার চালনা, ঢাল-শড়কি, বিশেষ করে লাঠিখেলা প্রভৃতি শিখছিলাম। এগুলোর জন্য আমাদের ইনস্ট্রাকটর ছিল। কিন্তু গ্রামে গ্রামে বিপুল সংখ্যার তরুণদের লাঠিখেলা প্রশিক্ষণের জন্য এত ওস্তাদ পাওয়া যাবে কোথায়? এই অভাব পূরণে আমাদের গ্রামে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে এগিয়ে এলেন আমার আব্বা। তিনি লাঠিখেলা জানতেন বলে শুনেছিলাম। এবার বাস্তবে তার প্রমাণ পেলাম। কথাসাহিত্যিক সরদার জয়েনউদ্দিনের ভগ্নীপতি, আমার চাচা মফিজউদ্দিন মণ্ডল লাঠিখেলা জানতেন কিনা জানি না তবে তিনি সুন্দর পুঁথিপাঠ জানতেন। তিনি ছিলেন জমিদার সেরেস্তার নায়েব। তিনি ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বর ছিলেন বলে স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক সম্পৃক্তি ছিল তার। তিনিও পাকিস্তান আন্দোলনে আমাদের উৎসাহ দিতেন।

নেহায়েৎ আত্মরক্ষার খাতিরেই লাঠিখেলা ইত্যাদির পাশাপাশি মুসলমানরা ছ্যান, ছোরা, ফালা, শড়কি প্রভৃতি ছোটখাট অস্ত্র তৈরির তাগিদ বোধ করেছিল তখন। এই সুবাদে কর্মকারদের কাছে যেয়ে যে অভিজ্ঞতা তারা লাভ করেছিল তা ছিল বিস্ময়কর। কর্মকাররা সবাই ছিল হিন্দু, তারা কোন মুসলমানদের এসব অস্ত্রতো নয়ই এমন কি ছুরি, বঁটি, দা, কুড়াল, কাঁচি, খন্তা, কোদাল প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নানা অজুহাতে তৈরী করতে শ্রেফ অস্বীকার করে

www.pathagar.com

বসলো। অথচ হিন্দুদের তারা এসব এবং অন্যান্য অস্ত্র ঠিকই তৈরী করে দিচ্ছিল। হিন্দুরা যে ভেতরে ভেতরে কতটা সচেতন ও সংঘবদ্ধ, এটা আমরা আগে কল্পনাও করতে পারিনি।

গণভোট উপলক্ষে সিলেটে

সাতচল্লিশে আইএ পরীক্ষান্তে আমি যখন বাড়ীতে তখনই জানলাম সিলেটের গণভোটের কথা। সিলেটের গণভোট ছিল আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সিদ্ধান্ত হয়েছিল বৃহত্তর ফরিদপুর থেকে একটি মুসলিম লীগ ন্যাশনাল গার্ড দল সিলেটে যাবে। ঐ ন্যাশনাল গার্ড দলে আমিও অন্তর্ভূক্ত ছিলাম। আমার সাথে আর কে কে ঐ দলে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তাদের সবার নাম আজ সম্পূর্ণ মনে নেই। তবে আমার চাচাতো ভাই ইসহাক আলী মণ্ডল যে অন্যতম ছিলেন তা বেশ মনে আছে। আমি তার চাইতে বছর দুয়েকের ছোট। এই ইসহাক আলীর সাথে ছোটকালে একই মক্তবে পড়াশোনা করেছি। এমন এক আপন লোক বিদেশ-বিভূঁইয়ে সেই সুদূর সিলেটে বিপদে-আপদে আমার পাশে থাকবেন এ ছিল আমার আশা। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে আশা শেষ পর্যন্ত পুরা হতে পারেনি। তবে সে প্রসঙ্গে পরে আসা যাবে।

সিলেট বাংলাভাষী এবং মুসলিম প্রধান এলাকা হলেও জেলাটি তখন ছিল আসাম প্রদেশের অন্তর্গত। আসামের বাংলাদেশ সংলগ্ন গোয়ালপাড়াও ছিল বাংলাভাষী এবং মুসলিম প্রধান। কাছাড়, শিলচর প্রভৃতি এলাকারও ছিল একই বৈশিষ্ট্য। কিন্তু অন্যান্য সব এলাকা বাদ দিয়ে বৃটিশ কংগ্রেস চক্রান্তের মাধ্যমে শুধু সিলেট জেলায় গণভোটের ব্যবস্থা করা হয়। সিলেটের জনগণ পাকিস্তানে যোগ দেয়ার পক্ষপাতী কিনা তা যাচাই করতে। আসাম যেমন মুসলিম প্রধান প্রদেশ ছিল না, তেমনি হিন্দু প্রধানও ছিল না। আসামের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অধিবাসী ছিল উপজাতি– না হিন্দু, না মুসলমান। তবে প্রশাসনিক বহু বিষয়ে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ও শিক্ষার ব্যাপারে আসাম ছিল বাংলাদেশের সঙ্গে সংযুক্ত। স্বাভাবিক কারণে গোটা আসাম ও বাংলাকেই লাহোর প্রস্তাবের পূর্বাঞ্চলীয় রাষ্ট্র বলে ধরে নেয়া হয়েছিল। ১৯৪৭ সালের বৃহত্তর সার্বভৌম বাংলার পরিকল্পনাতেও এ কারণেই আসামকে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছিল। আসামের উন্নয়নের ব্যাপারে কলিকাতা বা দিল্লী কেন্দ্রিক প্রশাসনের পরিবর্তে ঢাকা কেন্দ্রিক প্রশাসনই যে অধিক অনুকূল ছিল তা বঙ্গভঙ্গ পরবর্তী ১৯০৫ থেকে ১৯১১ আমলেও প্রমাণিত হয়েছিল। সেই আসামকে বাংলা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয় নেহরু-মাউন্ট ব্যাটেন আঁতাতসৃষ্ট ৩ জুন পরিকল্পনার মাধ্যমে। তবুও আসামের যেটুকু পারা যায় বাংলার সাথে সংযুক্ত রাখার আকাংক্ষাই এ গণভোটকে তাৎপর্যমণ্ডিত করেছিল। সিলেটের

www.pathagar.com

গণভোটে বাংলাদেশের অধিকাংশ লীগ নেতাই অংশগ্রহণ করেন। সিলেটে অনেক আগে থেকেই কংগ্রেস সমর্থক জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের বিরাট প্রভাব ছিল বলে এই প্রভাব কাটিয়ে তোলার লক্ষ্যে পাকিস্তান সমর্থক জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের মাধ্যমে অনেক আলেম পীর মাশায়েখ সিলেট গণভোটে অংশগ্রহণ করেন। শর্ষিনার তদানীন্তন পীরজাদা মওলানা আবু জাফর সালেহের নেতৃত্বে ৪০ জনের একটি কাফেলা এ উপলক্ষে সিলেট গমন করে। এই কাফেলার সিপাহসালার ছিলেন 'কায়েদ সাহেব হুজুর' নামে খ্যাত বিশিষ্ট বুযুর্গ হযরত মওলানা আজিজুর রহমান নেছারাবাদী।

সিলেট গণভোট উপলক্ষে ছাত্র ও তরুণ সমাজের মধ্যেও বিরাট সাড়া পড়ে যায়। পরবর্তীকালে যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে খ্যাতি লাভ করেন সেকালের সেইসব মুসলিম ছাত্র নেতৃবৃন্দ, যেমন নূরুদ্দীন আহমদ, শাহ আজিজুর রহমান, কাজী গোলাম মাহবুব, শেখ মুজিবুর রহমান, সুলতান হোসেন খান, মোয়াজ্জম হোসেন চৌধুরী, খোন্দকার মোশতাক আহমদ, আবদুল মতিন খান চৌধুরী, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এএইচএম কামরুজ্জামান, আবু সালেক প্রমুখ সিলেট গণভোট উপলক্ষে রাত-দিন কাজ করেন।

সিলেটে গণভোট অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৭ সালের ৬ ও ৭ জুলাই। আমরা বেশ কয়েকদিন আগেই সিলেটে পৌঁছে যাই। ফরিদপুর থেকে তখন সিলেট যেতে হত গোয়ালন্দ পর্যন্ত ট্রেনে যেয়ে সেখান থেকে চাঁদপুর পর্যন্ত স্টীমারে, অতঃপর চাঁদপুর থেকে ট্রেনে লাকসাম ও আখাউড়া হয়ে সিলেট। সেকালে (অবিভক্ত) বাংলাদেশে যেসব রেলপথ চালু ছিল সেগুলোর নাম ছিল ইআইআর (ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে), বিএনআর (বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে), ইবিআর (ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে) এবং এবিআর (আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে)। প্রথম দু'টিতে ট্রেন চলাচল করতো হাওড়া রেল স্টেশন থেকে বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে। চট্টগ্রাম বিভাগ ও আসামের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী রেলপথের নাম ছিল এবিআর। বাংলাদেশের অন্যান্য বিরাট অংশ জুড়ে যে রেলপথ ছিল সেটা ছিল ইবিআর। এগুলোর বাইরে শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত পাহাড়ে চলাচলের উপযোগী বিশেষ ধরনের ছোট্ট রেলপথ ছিল, যার নাম 'দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে'– সংক্ষেপে ডিএইচআর।

চাঁদপুর থেকে এবিআর-এর ট্রেনযোগে আমরা সিলেট গিয়েছিলাম। পথে লাকসাম ও আখাউড়ায় গাড়ী বদল করেছিলাম কি-না তা এতদিন পর মনে নেই। তবে আমরা বিরাট দল ছিলাম বলে একটা রেল বগির প্রায় সবটাই আমাদের দখলে ছিল। হৈ-হুল্লোড়ে সময় কাটছিল বেশ ভালই। মাঝে মাঝে সমবেত কণ্ঠে

www.pathagar.com

পাকিস্তান আন্দোলনের গান গাইছিলাম। আর থেকে থেকে 'নারায়ে তকবীর, আল্লাহু আকবর', 'চলো চলো সিলেট চলো, পাকিস্তান কায়েম করো' প্রভৃতি নানা রকম শ্লোগান দিয়ে জানান দিয়ে যাচ্ছিলাম, আমরা কারা, কোথায় যাচ্ছি।

ট্রেন আসামের অভ্যন্তরে সিলেট জেলার সীমানার মধ্যে প্রবেশ করতেই দলপতি জানিয়ে দিলেন সেকথা। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। আসাম প্রদেশে তখন কংগ্রেসী শাসন চলছে। গোপীনাথ ববদলুইয়ের কংগ্রেস সরকার মুসলমানদের উপর নির্যাতন চালিয়ে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট দুর্নাম অর্জন করেছিল। বাংলাদেশের বাইরে অপর একটি প্রদেশে এ প্রথম সফর আমার মনে একটি রোমাঞ্চকর অনুভূতির পাশাপাশি এক অজানা আশংকার ভাবও সৃষ্টি করেছিল। তবুও সন্ধ্যার আলো-আঁধারিতে ট্রেনের জানালা দিয়ে দেখে চলছিলাম দু'পাশের বিভিন্ন দৃশ্য। মাঝে মাঝে ছোট-খাট পাহাড় বা জঙ্গল, আবার থেকে থেকে কৃষি ক্ষেত ও গ্রাম্য জনপদ। বেশ ভালই লাগছিল এসব দেখতে। এরই মধ্যে সন্ধ্যা পেরিয়ে যাবার বেশ পর ট্রেন প্রবেশ করল দু'পাশের অনুচ্চ পাহাড় কেটে তৈরী করা পথে। দু'পাশে জঙ্গলের জন্য বিশেষ কিছু দেখা যাচ্ছিল না। হঠাৎ দলপতি হুকুম দিলেন সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করে দিতে এবং কোন শ্লোগান না দিতে। কিছুক্ষণের মধ্যে ট্রেনের বদ্ধ বগির গায়ে শক্ত কিছু নিক্ষিপ্ত হবার আওয়াজ শুনতে পেলাম। বেশ ক'বারই এ রকম হলো। কিছুটা ভয়ই লাগছিল।

ভয় পাবার মত ব্যাপারই ছিল বটে। মনে হল, কে বা কারা আক্রমণ চালাচ্ছে। দলপতির কাছেই পরে জেনেছিলাম আসল রহস্য। সিলেট বাংলাদেশে যোগ দেবে কি-না এ প্রশ্নেই গণভোট অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। সিলেটের বাংলাদেশে যোগ দেয়ার বিরুদ্ধে যেসব দল কাজ করছিল তার মধ্যে প্রধান ছিল কংগ্রেস। এরা কিছু কিছু উপজাতির মধ্যে এ ধরনের প্রচারণা চালিয়েছিল যে, যারা 'নারায়ে তকবীর আল্লাহু আকবর' বা পাকিস্তানের শ্লোগান দেয়, তারা তোমাদের মারতে চায়। এ ধরনের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত কিছু উপজাতি এর আগেও নাকি চলন্ত ট্রেনের মুসলিম লীগ কর্মীদের কামরায় তীর ধনুক দিয়ে আক্রমণ চালায়।

সিলেটে যেয়ে দেখলাম, হৈ হৈ কাণ্ড, রৈ রৈ ব্যাপার। গণভোট উপলক্ষে সমগ্র সিলেটে মুসলমানদের মধ্যে যেন এক বিরাট সাড়া পড়ে গেছে। সিলেটের মুসলমানরা যেন মুক্তির আশায় একপায়ে খাড়া হয়ে আছে। গণভোটের মাধ্যমে তারা জুলুম-নির্যাতনের হাত থেকে মুক্তির জন্য প্রহর গুনছে। গণভোটে যাতে তারা বাংলাদেশে যোগদানের পক্ষে সঠিকভাবে ভোট দিতে পারে– এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চায় তারা। সিলেট তথা আসাম তখনও গোপীনাথ ববদলুইয়ের কংগ্রেসী সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে। বৈরী প্রশাসনের মোকাবিলায় সিলেটের মুসলমানদের এ মুক্তি প্রয়াসে সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রদেশ, বিশেষ করে

www.pathagar.com

বাংলাদেশ থেকে মুসলিম লীগ, মুসলিম ছাত্র লীগ, জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম, মুসলিম লীগ ন্যাশনাল গার্ডের লোকেরা আমরা তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছি দেখে তারা আমাদের প্রতি দারুন খুশী ও কৃতজ্ঞ।

সিলেটে গণভোটের ব্যাপারে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সমন্বয়কারীর ভূমিকায় ছিলেন সুসাহিত্যিক জনাব হাবীবুল্লাহ বাহার, যিনি পরবর্তীকালে পূর্ব বঙ্গ প্রদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। ঢাকার স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতৃত্বে ছিলেন ১৫০ মোগলটুলীস্থ মুসলিম লীগ কর্মী শিবিরের নেতা, পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক জনাব শামসুল হক।

গণভোটের ব্যাপারে মুসলিম লীগ ন্যাশনাল গার্ডের উপর দায়িত্ব পড়েছিল মুসলিম লীগ, মুসলিম ছাত্রলীগ প্রভৃতি সংস্থার কর্মী এবং সমর্থকদের নিরাপত্তা বিধান করা। এ জন্য যে তাদের কোথাও যুদ্ধ বা সংঘাতে লিপ্ত হতে হয়েছে তা নয়। ন্যাশনাল গার্ডের ইউনিফর্ম পরিহিত সদস্যরা কোথাও মার্চ করে হাজির হলেই হামলাকারীরা হাওয়া হয়ে যেত। আমরা সিলেটে পৌছার এক বা দু'দিন পরই বোধ হয় হবে, আমরা দুপুর বেলা হোটেলে কেবল খেতে বসেছি, এমন সময় খবর এল, মুসলিম লীগ কর্মীদের উপর কংগ্রেসীরা কোথায় হামলা চালিয়েছে। আহার অসমাপ্ত রেখেই তৎক্ষণাৎ আমাদের রওনা হতে হল।

সেদিনটির কথা এখনও আমার স্পষ্ট মনে আছে। আমরা রাস্তার এক পাশ দিয়ে দু'লাইনে মার্চ করে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। আমাদের সাথে যাওয়া ন্যাশনাল গার্ডদের এভারেজের তুলনায় আমরা যারা একটু বেশী লম্বা ছিলাম, এমন দু'জন ছিলাম লাইনের সামনে। পতাকা বহনের দায়িত্বও ছিল আমাদের দু'জনের উপর। মুসলিম লীগের সবুজের উপর সাদা চাঁদ-তারা খচিত পতাকা। পতাকা হাতে যখন হযরত শাহজালাল (রঃ)-এর স্মৃতি বিজড়িত সিলেটের রাস্তা দিয়ে মার্চ করে চলছিলাম, মনে হচ্ছিল, আমি যেন মুসলিম লীগের নয়, ইসলামের পতাকাই বহন করে চলেছি। মনে মনে কিছু ভয়ও যে লাগেনি তা নয়। কারণ, প্রতিপক্ষ আক্রমণ চালালে তার প্রথম শিকার হতে হবে আমাদের দু'জনকেই। যদি আক্রান্তই হই, তখন কি করবো? একদিকে পৈত্রিক প্রাণ, অন্যদিকে 'ইসলামের পতাকা'র মর্যাদা! ভেতর থেকে এক অদম্য আবেগাপ্লুত সংকল্প বলে দিল, ইসলামের মর্যাদা রক্ষার্থে প্রয়োজনে শহীদ হব!

না, শেষ পর্যন্ত আমাকে 'শহীদ' হতে হয়নি। আমরা দ্রুত মার্চ করে অকুস্থলে পৌছবার আগেই হামলাকারীরা উধাও। সুতরাং পুনরায় আমরা বিজয়ীর বেশে মার্চ করতে করতে হোটেলে ফিরে এসে অসমাপ্ত আহার সমাপ্ত করলাম।

www.pathagar.com

বাইরে থেকে আগত কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক ও ন্যাশনাল গার্ডের কোন্ দল কোথায় যাবে এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত দানের অন্যতম দায়িত্বে ছিলেন বাংলাদেশের সাহিত্যিক-রাজনীতিক নেতা হাবীবুল্লাহ বাহার। মাথায় টাক, সদা হাস্যময় বাহার সাহেব জানালেন, করিমগঞ্জ মহকুমার উপজাতি-অধ্যুষিত প্রত্যন্ত অঞ্চলে একটি চৌকষ ন্যাশনাল গার্ড দল পাঠাতে হবে। সেখানে মুসলমানদের উপর নানাভাবে উৎপাত চালানো হচ্ছে। মুসলমানরা হুমকির মুখে আছে। বাহার সাহেব আরও জানালেন, সেখানে যাবে পাঞ্জাব থেকে আগত ন্যাশনাল গার্ড। তবে যেহেতু পাঞ্জাব ন্যাশনাল গার্ডের সংখ্যা অত্যন্ত কম, বাংলাদেশ থেকে আগত ন্যাশনাল গার্ডদের মধ্যে যারা বেশ লম্বা, তাদেরও ঐ দলের অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। বিপজ্জনক এলাকার কথা শুনে আমাদের অনেকের মনেই তখন ভয় ঢুকে গেছে। আমার চাচাতো ভাই ইসাহাক আলী মণ্ডল বেঁটে ছিলেন বলে বেঁচে গেলেও আমি ফেঁসে গেলাম। হাই মাদ্রাসার ক্লাস টেন পর্যন্ত আমি নিজেও খুব বেঁটে ছিলাম। এজন্য মনে মনে আফশোষের অন্ত ছিল না। কলেজে দু'বছর অধ্যয়নকালে আমি এভারেজ বাঙ্গালীর তুলনায়ও দীর্ঘদেহী হয়ে উঠাতে আনন্দই পেতাম। কিন্তু এখন মনে হল, বেঁটে থেকে গেলে এই বিদেশ বিভূঁইয়ে চাচাত ভাইয়ের সাথে আমার এভাবে আজ ছাড়াছাড়ি হত না।

আসাম প্রদেশে মুসলমানরা নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ না হলেও একক সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী ছিল। সংখ্যার বিচারে মুসলমানদের পর উপজাতি, তারপর ছিল হিন্দুদের অবস্থান। আসামে মুসলমানদের মেজরিটিই ছিল বাঙালী। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেও মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশের সমুদ্র বন্দরের সুযোগ-সুবিধা এই স্থল বেষ্টিত (Land-locked) জনপদটির জন্য ছিল অপরিহার্য। তাছাড়া আর্য বংশোদ্ভূত হিন্দু-নিয়ন্ত্রিত ভারতের সাথে নৃতাত্ত্বিক কারণেও মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত আদি অহমীয় ও উপজাতি জনগোষ্ঠী কখনও একাত্মতা অনুভব করতে পারেনি। ফলে আহমীয় ও উপজাতিদের অনেকেই হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের সাথে অধিকতর নৈকট্য অনুভব করত। এসব কারণেই পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল তথা বাংলাদেশের সাথে আসামের সংশ্লিষ্টতার কথা বলা হয়েছিল লাহোর প্রস্তাব ও ১৯৪৭ সালের সার্বভৌম বাংলা আন্দোলনে।

আমরা যখন গণভোট উপলক্ষে সিলেট যাই, তখন অবশ্য এসব বিবেচনা আপাত-অতীতের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কংগ্রেসের একটানা মুসলিমবিরোধী নির্যাতন ও প্রচারের ফলে তখন সিলেটের মুসলমানরা ত্যক্ত-বিরক্ত। তারা যে কোন মূল্যে পাকিস্তান তথা বাংলাদেশে যোগ দিতে শুধু ব্যগ্রই নয়, সংকল্পবদ্ধও। কংগ্রেসের মুসলিমবিরোধী রাজনীতির কারণে আসামে মুসলমানরা কম নির্যাতন

www.pathagar.com

ভোগ করেনি। লাইন প্রথা প্রবর্তনের মাধ্যমে আসামে যে লাখ লাখ বাঙালী কৃষক তাদের বসতবাটি ও জমিজিরাত থেকে নির্মমভাবে উচ্ছেদ হয় তাদের প্রায় সবাই ছিল মুসলমান। আসামে বৃটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের এক পর্যায়ে সিলেটের থানা থেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক ইউনিয়ন জ্যাক পতাকা নামিয়ে সেখানে চাঁদ-তারা খচিত মুসলিম লীগ পতাকা উত্তোলন করতে গিয়ে কংগ্রেস সরকারের লেলিয়ে দেয়া পুলিশের গুলিতে প্রাণ দেন শহীদ আলকাস।

বরদলুই সরকারের মুসলিমবিরোধী জুলুমবাজির সব সীমা-সরহদ্দ ছাড়িয়ে যায় যখন মুসলমানদের নিধনযজ্ঞে মেতে উঠে সরকার নামাজরত মুসলমানদের উপর গুলি চালিয়ে শত শত মুসল্লী হত্যার প্রয়াসে লিপ্ত হয়। এই অমানুষিক শোকাবহ ঘটনার স্মরণেই সিলেট রেফারেন্ডামের অন্যতম শ্লোগান ছিল ঃ 'আসামে আর থাকব না, গুলি খেয়ে মরব না', 'আসাম সরকার জুলুম করে, নামাজের উপর গুলি করে'। কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও বাংলাদেশে যোগদানের বিরুদ্ধে শ্লোগান তৈরি করা হয়েছিল ঃ 'বাংলাদেশে যাব না, না খেয়ে মরব না'। বলা বাহুল্য, বাংলাদেশে ১৯৪৩ সালে বৃটিশ সরকার-সৃষ্ট দুর্ভিক্ষেরই ইঙ্গিত ছিল এতে।

সিলেটের গণভোটে আরও অনেক মজার মজার শ্লোগান ব্যবহৃত হয়েছিল। গণভোটের প্রাক্কালে মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক ঐক্যজনিত যে দৃঢ় আশাবাদ সৃষ্টি হয়েছিল, তার প্রতিফলন ঘটেছিল যে শ্লোগানটিতে, সেটি ছিল ঃ 'সিলেটের গণভোটে কংগ্রেসের পরাজয়, নিশ্চয় নিশ্চয়। সিলেটের জনগণের 'ক'-এর উচ্চারণ প্রায় 'খ'-এর কাছাকাছি। ফলে শ্লোগানের সময় 'কংগ্রেসের' শব্দটা আমাদের অনেকের কাছেই মনে হয়েছিল 'খংগ্রেসের'। গণভোট শুরু হবার আগের দিন অর্থাৎ ৫ জুলাই মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস উভয় দলের পক্ষ থেকেই নিজ নিজ ভোটারদের ভোটের তারিখ মনে করিয়ে দিতে একটা সাধারণ শ্লোগান দেয়া হয়েছিল ঃ 'ভোটের তারিখ কাল-পরশু'। সিলেটের আঞ্চলিক উচ্চারণের প্রভাবে আমাদের কানে এ শ্লোগানটাও মনে হয়েছিল ঃ 'ভুটের তারিখ খাল-পরখু'।

যে ট্রেনে আমরা সিলেট থেকে করিমগঞ্জ গিয়েছিলাম, সেটি কুলাউড়া জংশনে অনেকক্ষণ থামে। যতক্ষণ ট্রেনটি স্টেশনে দাঁড়ানো ছিল, আমরা শ্লোগানে শ্লোগানে প্লাটফর্ম মুখরিত রেখেছিলাম। অবশেষে ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে এলে আমরা যখন আমাদের নির্দিষ্ট বগিতে উঠেছি, তখন কোত্থেকে একটি ছোট্ট মিছিল এসে আমাদের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে শুরু করে। সাথে সাথে আমরাও ঝটপট ট্রেন থেকে নেমে পড়ে পাল্টা শ্লোগান দিতে শুরু করলাম। আমরা এভাবে নেমে পড়ব, তা তারা ভাবতেও পারেনি। আমরা প্লাটফর্মে নামার সাথে সাথেই তারা ভেগে গেল। এরপর করিমগঞ্জ পর্যন্ত আমরা কখনও আর শ্লোগান বিরতি দেইনি।

www.pathagar.com

আগেই বলা হয়েছে, গণভোট কালে সিলেটের করিমগঞ্জ মহকুমার প্রত্যন্ত অঞ্চলে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় যে পাঞ্জাব ন্যাশনাল গার্ডের দলটিকে পাঠানো হয়েছিল তার সকলেই পাঞ্জাবী ছিল না, তার মধ্যে আমার মত দীর্ঘদেহী অনেক বাঙালীও ছিল। অর্থাৎ দলটি পাঞ্জাবী বলে পরিচিত হলেও এতে আমার মত বহু নকল পাঞ্জাবীও ছিল।

দৈর্ঘ্য দিয়ে এভাবে না হয় দৈহিক পার্থক্যটা কিছুটা গোপন করা গেল, কিন্তু ভাষা? ওরা উর্দুতে কথা বলে, আমরা তো উর্দুতে কথা বলতে পারি না। কথা বলতে গেলেই তো আমরা যে বাঙালী তা প্রকাশ হয়ে পড়বে। আমাদের প্রতি এজন্য উপদেশ ছিল, আমরা যেন বাইরের লোকদের সামনে কম কথা বলি এবং যখন কথা বলি তখন বাংলা ক্রিয়াপদের সাথে খাওঙ্গা, করোঙ্গা, যাওঙ্গা ধরনের কিছু উর্দু ধারা মিশেল দিয়ে কথা বলে আমাদের বাঙালীত্ব গোপন রাখতে চেষ্টা করি। এ কৌশলের কারণ ছিল, প্রতিপক্ষ বাঙালীদের তুলনায় পাঞ্জাবীদের অনেক বেশী, প্রায় যমের মত, ভয় করত।

সিলেট জেলার শেষ সীমায় যে রেল স্টেশনটিতে আমরা ট্রেন থেকে নেমেছিলাম, তার নাম আজ আর মনে নেই। স্টেশন থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে আমাদের ক্যাম্প। বেশ কয়েকটা গাড়ী ও জীপে করে আমাদের নিয়ে যাওয়া হয় ক্যাম্পে। যে রাস্তা দিয়ে আমরা যাচ্ছিলাম তার সর্বাঙ্গে অযত্নের ছাপ ছিল স্পষ্ট। ফলে ভ্রমণটা তেমন আরামদায়ক হবার কথা ছিল না। তবুও অজানা নতুন একটা পাহাড়ী জনপদে আসতে পেরে আমার বেশ ভালই লাগছিল। দূরে ছোট ছোট পাহাড় দেখা যাচ্ছে। তবে আমরা যাচ্ছিলাম সমতল ভূমি দিয়েই। নানারকম লোকই দেখছিলাম রাস্তা দিয়ে চলতে। কোন কোন পথযাত্রী আমাদের গাইডের বেশ পরিচিত মনে হল। জীপ থামিয়ে তাদের সাথে সংক্ষিপ্ত কুশল বিনিময় করলেন তিনি।

এরই মধ্যে দেখলাম চার-পাঁচজন উপজাতি পথ চলছে এবং তাদের প্রত্যেকের হাতে বড় বড় দা। আমাদের গাড়ীর দিকে তারা কেমনভাবে তাকাচ্ছে এবং নিজেদের মধ্যে কি সব বলাবলি করছে। আমরা একটু ভয়ই পেয়ে গেলাম। গাইড একটু দূরে গাড়ী থামিয়ে নিজে তাদের সাথে কথা বলতে গেলেন। একটু পরে ফিরে এসে হাসি মুখে জানালেন, এরা খুবই নিরীহ ও অরাজনৈতিক উপজাতি। এরা যাচ্ছে পাহাড়ে কাঠ কাটতে। আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

গণভোট দু'দিন ধরে চললেও আমাদের ঐ ক্যাম্পে থাকতে হয়েছিল মাত্র একদিন একরাত। স্থানীয় মুসলিম লীগ নেতারা জানালেন, 'গোপন সূত্রে আমরা জেনেছি গণভোটের দ্বিতীয় দিনে ওরা আপনাদের ক্যাম্পে আক্রমণ চালাবে বলে

www.pathagar.com

সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাই আমরা এ এলাকার আমাদের সব ভোটারদের প্রথম দিনেই ভোটদান শেষ করবার কথা বলে দিয়েছি। আপনাদের নিরাপত্তার জন্য সরকার কোন সাহায্য করবে না। ভিতরে ভিতরে বরং প্রতিপক্ষকেই সহায়তা দিবে। এমতাবস্থায় আমাদের জন্য আপনারা কোন বড় মুসিবতে পড়েন, তা আমরা চাই না।

আমাদের ক্যাম্পের স্থানটি ছিল, মনে হয়, লোকাল বা ইউনিয়ন বোর্ডের কোন ডাকবাংলো। জেলা বোর্ডের রাস্তার পাশে একটি ঝোপ-জঙ্গল ঘেরা প্রায় ভুতুড়ে এ বাড়ীতেই কাটল আমাদের ৬ জুলাই সারা দিন ও দিবাগত রাত। আমরা যারা ন্যাশনাল গার্ড হিসেবে গিয়েছিলাম তারা মুসলিম লীগ, ছাত্র লীগ কর্মী বা অন্যদের মত ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে আনা, ভোট দেয়ানো প্রভৃতি কাজে অংশ নেইনি। আমাদের প্রধান কাজ ছিল নিরাপত্তার পরিবেশ অক্ষুণ্ন রাখা। সারাদিন আমাদের কাজ ছিল কিছুক্ষণ পরপর রাস্তা দিয়ে মার্চ করে চলা, যাতে করে আমাদের কর্মী ও ভোটারদের উপর প্রতিপক্ষ কোন হামলা চালানোর সাহস না পায় এবং আমাদের লোকদের মনোবল অক্ষুণ্ন থাকে।

অন্যদের সামনে ঐ একদিন আমরা কথা খুব কমই বলেছি। যখন বলেছি, তখনও বলেছি সংক্ষেপে, ইংরেজী বা ভাঙ্গা উর্দুতে। রাতে আমরা ঘুমিয়েছিলাম পালা করে। রাতের প্রথমার্ধে যাদের ঘুমাতে দেয়া হল, তারা শেষার্ধে রাত জেগে ক্যাম্প পাহারা দিল। অনুরূপভাবে যারা প্রথমার্ধে ঘুম কামাই করে ক্যাম্প পাহারা দিল, তাদেরকে রাতের শেষার্ধে ঘুমাতে দেয়া হল। আমার অবশ্য জেগে থেকে ক্যাম্প পাহারা দেয়ার সময়ে তো নয়ই, এমনকি ঘুমের পালায়ও ঘুমানো হয়ে ওঠেনি। নতুন জায়গায় এমনিতেই আমার ঘুম আসে না, তার উপর টেনশন থাকলে তো কথাই নেই।

৭ জুলাই ভোরেই আমরা ঐ উপজাতি-অধ্যুষিত এলাকা ছেড়ে চলে এসেছিলাম। আমরা যে রেলপথে ঐ এলাকায় যাওয়া-আসা করেছিলাম, তার অধিকাংশ স্টেশনের নাম আজ আর মনে নেই। তবে দু'টি স্টেশনের নাম বেশ মনে আছেঃ একটি বদরপুর, অন্যটি ভাঙ্গা। বিশেষ করে শেষোক্তটি মনে থাকার পেছনে ছিল ছোট্ট একটি ঘটনা। ভাঙ্গায় একজন কংগ্রেস কর্মী জাল ভোট দিতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে যায়। বিদ্যুৎগতিতে এ খবর ছড়িয়ে পড়ে করিমগঞ্জসহ সমগ সিলেট জেলায়। সাথে সাথে মুসলিম লীগ কর্মীদের শ্লোগান– 'সিলেটের গণভোটে কংগ্রেসের পরাজয়, নিশ্চয় নিশ্চয়,-এর সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে একটি নতুন শ্লোগান– 'ধরা পড়েছে কংগ্রেসী চোর, কোথায়? ভাঙ্গায়'।

সিলেটের গণভোটে মুসলিম লীগের যেমনটি আশা ছিল, ঠিক তেমনটিই

www.pathagar.com

ঘটল। কংগ্রেসের সাংগঠনিক কলাকৌশল ও নীল নকশার ষড়যন্ত্র, জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের দীর্ঘদিনের প্রভাবকে উপেক্ষা করে সিলেটের মুসলমানরা একচেটিয়া ভোট দিল মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবী তথা বাংলাদেশে যোগ দেয়ার পক্ষে। হযরত শাহজালাল (রহঃ)-এর ঐতিহাসিক সিলেট বিজয়ের পর তাঁর স্মৃতিধন্য পুণ্যভূমি সিলেটের জনগণের মুসলিম উম্মাহ্ সাথে সংহতি ঘোষণার এ যেন ছিল আরেক যুগান্তকারী ঘটনা। কিন্তু ১৯৪৫-৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে বৃটিশ ভারতের মুসলমানদের পাকিস্তানের স্বপক্ষে ঐতিহাসিক ভোটদানের পরও যে অশুভ খড়্গাঘাতে পাকিস্তান আন্দোলনের সে বিজয়কে অনেকটাই ছিনিয়ে নেয়া হয়, সেই একই খড়্গাঘাতে সিলেট গণভোটে মুসলিম লীগের ঐতিহাসিক বিজয়কেও ছিন্নভিন্ন করে দেয়া হয়।

সাম্রাজ্যবাদের শেষ খড়্গ র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ

উপমহাদেশের ইতিহাসের এ অশুভ খড়্গটির নাম র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ। ১৭৫৭ সালের পলাশী ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে উপমহাদেশের মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে ক্রুসেডের ঐতিহ্যবাহী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ যে ক্রুর চক্রান্ত-জাল বিস্তার করেছিল তারই সর্বশেষ মসিলিপ্ত পর্ব ছিল এই র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ।

সাতচল্লিশের জুলাই ও আগস্ট মাস নানা কারণে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ছিল অশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তেসরা জুন পরিকল্পনার আলোকে বৃটিশ শাসকদের হাত থেকে এদেশের জনপ্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের কার্যক্রম দ্রুত এগিয়ে চলছিল। তেসরা জুন পরিকল্পনা মোতাবেক পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যগণ সংখ্যাধিক্য ভোটে পাকিস্তান গণপরিষদে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বেলুচিস্তানের শাহী জির্গা ও কোয়েটা মিউনিসিপ্যালিটির সদস্যগণও পাকিস্তান গণপরিষদে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেন। সীমান্ত প্রদেশে গণভোটে বিপুল ভোটাধিক্যে জনগণ পাকিস্তানে যোগদানের পক্ষে রায় দেয়। ২০ জুলাই বাংলাদেশ প্রাদেশিক আইন পরিষদ পাকিস্তান গণপরিষদে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেয়। জুলাইয়ের ৬ ও ৭ তারিখে সিলেটে অনুষ্ঠিত গণভোটে জনগণ বিপুল ভোটাধিক্যে পাকিস্তানে যোগদানের পক্ষে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।

তেসরা জুন পরিকল্পনাতেই বাংলা ও পাঞ্জাবের খণ্ডিত অংশের মধ্যকার সীমানা নির্ধারণের জন্য বাউন্ডারী কমিশন গঠনের কথা ছিল। সে মোতাবেক বৃটেনের হাউজ অব লর্ডসের সদস্য বিশিষ্ট বৃটিশ আইনজীবী স্যার র‍্যাডক্লিফের নেতৃত্বে একটি বাউন্ডারী কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশনের কাছে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের পক্ষ হতে সীমানা সম্পর্কিত স্ব-স্ব দাবীর স্বপক্ষে যুক্তি তথ্যপ্রমাণাদি উপস্থাপিত হয়। এসব যুক্তি ও তথ্য-প্রমাণের কতটা গুরুত্ব স্যার র‍্যাডক্লিফ দেন,

www.pathagar.com

তা বোঝা দুষ্কর। কারণ বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেল, কী পশ্চিম কী পূর্বাঞ্চল উভয় ক্ষেত্রেই বহু মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদে ভারতকে দিয়ে দেয়া হয়। পাঞ্জাবের মুসলিম প্রধান গুরুদাসপুর জেলা সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে ভারতকে দেয়ার ফলে কাশ্মীরের সাথে ভারতের যোগাযোগের ব্যবস্থা করে দিয়ে কাশ্মীরে সমস্যা সৃষ্টির সুযোগ করে দেয়া হয় ভারতকে। পূর্বাঞ্চলে বাংলাদেশের যশোর, নদীয়া, মালদহ ও দিনাজপুর প্রভৃতি মুসলিম প্রধান জেলার গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং মুর্শিদাবাদ জেলা পুরাটাই সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে ভারতকে দেয়া হয়। গণভোটের মাধ্যমে প্রাপ্ত সিলেট জেলার মুসলিম প্রধান করিমগঞ্জ জেলাকেও অন্যায়ভাবে ভারতকে দিয়ে দেয়ার ফলে সাবেক সিলেটের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা বাণিজ্য কেন্দ্র করিমগঞ্জ থেকে সিলেটকে বঞ্চিত করা হল। উপরন্তু ভারতের সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যের সংযোগপথ উন্মুক্ত করে ঐ রাজ্যের ভারতে যোগদানের পথ সুগম করে দেয়া হয়।

স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম লীগ কর্মীদের মধ্যে র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের এই অন্যায় পক্ষপাতদুষ্ট রায়ের বিরুদ্ধে ক্ষোভ সঞ্চারিত হয়। এর বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নভাবে প্রতিবাদও উত্থিত হয়। কিন্তু পূর্ব প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আজীবন নিয়মতান্ত্রিকতার প্রবক্তা কায়েদে আজম শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের স্বার্থে মুসলিম লীগ কর্মীদের এ রোয়েদাদ মেনে নিতে সম্মত করান।

র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের ফলে পাঞ্জাব, বাংলা ও আসাম প্রদেশের বহু মুসলিম প্রধান অঞ্চল থেকে শুধু পাকিস্তানকে বঞ্চিতই করা হল না, পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের সাথে পশ্চিমাঞ্চলের সমুদ্রপথে যোগাযোগের জন্য মাল ও লাক্ষাদ্বীপ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ থেকেও পাকিস্তানকে বঞ্চিত করা হল। এই দ্বীপগুলো শুধু ভারত ইউনিয়নের মূল ভূ-ভাগ থেকেই বিচ্ছিন্ন নয়, উপরন্তু দেশ বিভাগের সময়ে এর অধিবাসীদের শতকরা ৮০ ভাগই ছিল মুসলমান।

র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদে এসব অন্যায়ের ফলে পাকিস্তানের ন্যায্য পাওনা থেকে লক্ষাধিক বর্গমাইল কম হয়ে পাকিস্তানের আয়তন হয়ে দাঁড়ালো মাত্র ৩ লক্ষ ৬১ হাজার ৭ বর্গমাইল। (দ্রষ্টব্য ঃ আমাদের মুক্তি সংগ্রাম, মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৬৯, ঢাকা, পৃঃ ৪০১-২)।

আসামের সাথে সংলগ্নতার যে অজুহাতে সিলেটের মুসলিম প্রধান করিমগঞ্জ মহকুমাকে ভারতকে দিয়ে দেয়া হল ঠিক একই যুক্তিতে বাংলাদেশের রংপুর জেলার সাথে সংলগ্নতার যুক্তিতে আসামের গোয়ালপাড়া জেলা বিভক্ত করে তার একাংশ বাংলাদেশের সঙ্গে সংযুক্ত করা হত যুক্তিযুক্ত। কিন্তু এসব যুক্তি যার কানে প্রবেশ করার কথা, সেই র‍্যাডক্লিফ সাহেবের কানে তো আগে থেকেই শুধু ভারতের স্বপক্ষের যুক্তিই প্রবেশাধিকার পেয়েছিল। মাউন্টব্যাটেনের যোগ্য শিষ্য স্যার

www.pathagar.com

র‍্যাডক্লিফের কানে পাকিস্তানের স্বপক্ষের কোন যুক্তিই প্রবেশাধিকার পায়নি। সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে পাকিস্তানকে কিভাবে বিপাকে ফেলার সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র চালানো হয়, তা যে কোন সাধারণ মানুষের কাছেও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন কসবা এবং হিলি রেল স্টেশনের কাছের সীমানা লক্ষ্য করা যায়। এই দু'টি ক্ষেত্রেই পরিকল্পিতভাবে বাংলাদেশের ভূখন্ডগত নিরাপত্তাকে একটা নাজুক অবস্থার মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে।

কলিকাতা ছিল অবিভক্ত বাংলার রাজধানী। দার্জিলিং ছিল প্রাদেশিক গভর্নরের গ্রীষ্মকালীন নিবাস। এ দু'টি শহর গড়ে উঠার পেছনেই ছিল গোটা বাংলাদেশের অবদান। এ কারণেই মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে এ দু'টি শহরকে ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশের সাধারণ অধিকারভুক্ত রাখার প্রস্তাব দেয়া হয়। বিশেষ করে কলিকাতা মহানগরী গড়ে ওঠার পেছনে পূর্ববঙ্গের পাট ও অন্যান্য সম্পদের বিরাট অবদান ছিল বলে কলিকাতার উপর পূর্ববঙ্গের দাবী ছিল খুবই ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু মাউন্টব্যাটেন র‍্যাডক্লিফের কাছে ন্যায়বিচারের কোন মূল্য ছিল বলে মনে হয় না। কলিকাতা যে ভারতকে দেয়া হবে সে প্রতিশ্রুতি মাউন্টব্যাটেন আগেই কংগ্রেসকে দিয়েছিলেন। সরদার প্যাটেল ১৯৪৮ সালে কলিকাতার এক জনসভায় বলেছিলেন, "কলিকাতা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পর আমরা পার্টিশন সম্মত হয়েছিলাম"। (দ্রষ্টব্য ঃ কায়েদে আজম, এম. এ. এইচ. ইস্পাহানী, ৮৫৯ পৃঃ)।

জুলাই (১৯৪৭) মাসের ৪ তারিখেই তেসরা জুন পরিকল্পনার আলোকে ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের অবসান ও জনগণের প্রতিনিধিদের নিকট শাসনক্ষমতা হস্তান্তরের চূড়ান্ত ব্যবস্থা সম্বলিত ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের খসড়া বৃটিশ পার্লামেন্টে উত্থাপন করা হয়। এই বিলে সাবেক ভারতবর্ষে ভারত ও পাকিস্তান নামে দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়। পূর্ববঙ্গ, পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নিয়ে পাকিস্তান এবং অন্যান্য প্রদেশ নিয়ে ভারত নামে পৃথক দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের ব্যবস্থা হয়। বিলটি পার্লামেন্টে যথারীতি গৃহীত হবার পর ১৮ জুলাই রাজা ষষ্ঠ জর্জ কর্তৃক স্বাক্ষরিত হবার ফলে আইনে পরিণত হয়।

ভারতীয় স্বাধীনতা আইন গৃহীত হবার পর কংগ্রেস পূর্ব সমঝোতা অনুসারে স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল হিসাবে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের নাম প্রস্তাব করে। লর্ড মাউন্টব্যাটেন নাকি আশা করেছিলেন, মুসলিম লীগও অনুরূপভাবে পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল হিসাবে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের নাম প্রস্তাব করবে। কিন্তু মুসলিম লীগ পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল হিসাবে কায়েদে

www.pathagar.com

আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নাম প্রস্তাব করায় লর্ড মাউন্টব্যাটেন নাকি নাখোশ হন। মাউন্টব্যাটেন পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা প্রশ্নে আগাগোড়া যে বৈরী ভূমিকা পালন করেন, তা মুসলিম লীগ হাই কমান্ডের কারো অজানা ছিল না।

মুসলিম লীগকে কীটদষ্ট দুর্বল পাকিস্তান অথবা অখণ্ড ভারত এ দুইয়ের মধ্যে একটাকে বেছে নেয়ার প্রচ্ছন্ন হুমকি দিতে নেহরুর চাইতে তিনি কোন দিক দিয়েই কম উৎসাহী ছিলেন না। তেসরা জুন পরিকল্পনা যে তিনি নেহরুর সঙ্গে পরামর্শ করেই প্রণয়ন করেন এবং মুসলিম লীগ নেতৃত্বের অজ্ঞাতেই স্বয়ং লন্ডন গিয়ে বৃটিশ সরকারকে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে আনেন, এসব তথ্য মুসলিম লীগ নেতৃত তখন না জানলেও এমন একটা কিছু যে ঘটেছে তা সূক্ষ্মদর্শী জিন্নাহ ঠিকই আঁচ করতে পেরেছিলেন। সুতরাং মুসলিম লীগ হাই কমান্ড নেহরু প্রীতিতে নিমজ্জিত মাউন্টব্যাটেনের ফাঁদে নতুন করে পা দিতে যদি অস্বীকৃতি জানিয়ে থাকেন, তাহলে তাদের বাস্তবতাবোধকে তারিফই করতে হয়।

মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে পূর্বেই করাচী পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাজধানী নির্ধারিত হয়। জুলাই থেকেই সে লক্ষ্যে প্রস্তুতি পর্ব শুরু করা হয়। একইভাবে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ পূর্ববঙ্গের রাজধানী হিসাবে নির্ধারিত হয় ঢাকা। ঢাকা ইতিপূবে ১৯০৫-১৯১১ মেয়াদকালে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানী থাকলেও নবতর পরিস্থিতিতে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন পূরণের ব্যাপারে ঢাকার সামর্থ্য যে সীমাবদ্ধ ছিল তা বলাই বাহুল্য। ভারত ও বাংলা বিভাগের কারণে ঢাকায় নতুন প্রদেশ পূর্ববঙ্গের রাজধানী স্থানান্তরও তাই যথেষ্ট সমস্যা সংকুল ব্যাপার ছিল।

সাতচল্লিশ সালের জুলাই ও আগস্ট মাসে প্রায় দু'শ' বছরের বৃটিশ শাসনের পর ভারতবর্ষ যখন স্বাধীনতা লাভ করতে যাচ্ছিল তখন উপমহাদেশের হিন্দু ও শিখ অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহ চলছে ভয়াবহ মুসলিমবিরোধী দাঙ্গা। স্বাধীন ভারতে ইন্দিরা গান্ধীর শাসনামলে শিখরা হিন্দুদের হাতে ব্যাপক নিগ্রহের শিকার হলেও সাতচল্লিশ সাল পর্যন্ত এবং তারপরও বহুদিন শিখরা মুসলমানদেরকেই তাদের প্রধান শত্রু মনে করত। সাতচল্লিশে পার্টিশনের পূর্বাপর বিহার থেকে শুরু করে পাঞ্জাব পর্যন্ত সর্বত্রই হিন্দু ও শিখরা মুসলমানদের রক্তে মহাসুখে হোলি খেলে। এই নিধনযজ্ঞের মধ্য দিয়েই স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফের নেতৃত্বে বাউন্ডারি কমিশন এবং বড়লাট লড মাউন্ট ব্যাটেনের নেতৃত্বে পার্টিশন কাউন্সিলের কাজ এগিয়ে যেতে থাকে।

পার্টিশনের সময় যে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয় তাতে, ঐতিহাসিক ও মনস্তাত্ত্বিক কারণে মুসলমানদের চাইতে হিন্দু ও শিখদের ভূমিকাই ছিল মুখ্য। পাঞ্জাব বৃটেনের দখলে যাবার পূর্বে শিখ শাসনাধীন ছিল। বৃটিশ শাসনের অবসানে

www.pathagar.com

শিখরা মুসলিম সংখ্যাধিক্যের কারণে পাঞ্জাবে মুসলমানদের শাসনাধীনে যাবে- এটা কল্পনা করা তাদের পক্ষে কঠিন ছিল। অন্যপক্ষে হিন্দুরা ছিল অখণ্ড ভারতের সমর্থক। তারা যেহেতু সমগ্র ভারতবর্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ, স্বাধীনতার পর তারা সব সময় ভারতে কর্তৃত্ব করবে- এটা ছিল তাদের স্বপ্ন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ফলে তারা সাবেক ভারতবর্ষের একটা অংশে মুসলমানদের ওপর কর্তৃত্ব ফলাবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বলে মুসলিম লীগ নেতৃত্ব, বিশেষ করে কায়েদে আজম জিন্নাহ ও শহীদ সোহরওয়ার্দীর ওপর তাদের ক্রোধের অন্ত ছিল না।

দাঙ্গায় প্ররোচিত হবার জন্য দাঙ্গাকারীদের মধ্যে যে ক্ষোভ প্রয়োজন, মুসলমানদের মধ্যে তা ছিল না। তারা তাদের আশা অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ পাকিস্তান পাচ্ছে না এ দুঃখ ছিল। কিন্তু উপমহাদেশের পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে মুসলমানদের স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র যে একটা গঠিত হচ্ছে এতেই তারা ছিল সন্তুষ্ট। এ কারণেই দেখা যায়, কলিকাতায় ছয়চল্লিশের ১৬ আগস্টে হিন্দুদের হাতে আক্রান্ত হবার আগে তারা দাঙ্গায় অংশগ্রহণের কথা চিন্তাও করেনি। আর কলিকাতার দাঙ্গায় নোয়াখালীর প্রচুর মুসলমান প্রাণ না হারালে নোয়াখালীতেও যে দাঙ্গা বাধতো না তা নিশ্চিত।

অখণ্ড ভারতের রাজধানী দিল্লীতে যেমন, তেমনি অবিভক্ত বাংলার রাজধানী কলিকাতাতেও তখন চলছে মুসলিমবিরোধী দাঙ্গাবাজদের পূর্ণ দাপট। দিল্লী ও পাঞ্জাবে দাঙ্গাবাজদের প্রতিহত করতে বেসামরিক প্রশাসন অপ্রতুল প্রমাণিত হওয়ায় একটি বিশেষ সামরিক কমান্ড গঠন করতে হয়। এই কমান্ডের নেতৃত্বে ছিলেন মেজর জেনারেল রীজ (Rees)। ৫০,০০০ অফিসার ও সিপাহী নিয়ে গঠিত এ বাউন্ডারি ফোর্সে ব্রিগেডিয়ার দিগম্বর সিং ও কর্নেল আইউব খানকে যুক্ত করা হয়। পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ যে ট্রেনে করে করাচি যান সে ট্রেনেও আক্রমণ চালানোর পরিকল্পনা ছিল; কিন্তু শেষ মুহূর্তে তা জানাজানি হয়ে যাওয়ায় পরিকল্পনা কার্যকর হতে পারেনি।

সোহরাওয়ার্দীর হত্যা প্রচেষ্টা

কায়েদে আজমের মত বাংলাদেশে অবিভক্ত বাংলার সর্বশেষ প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরওয়ার্দীকেও উগ্রপন্থী হিন্দুরা হত্যার জন্য টার্গেট করেছিল। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ওপর হিন্দুদের রাগ ছিল এ জন্য যে, সোহরওয়ার্দীর ত্বরিত ব্যবস্থার ফলেই কলিকাতার হিন্দু দাঙ্গাবাজরা ১৯৪৬ সালের ১৬ ও ১৭ আগস্টের পর মুসলিম নিধনে আর সাফল্য প্রদর্শন করতে পারেনি। কলিকাতার হিন্দু নিয়ন্ত্রিত পুলিশ ফোর্সের অসহযোগিতার মুখে সোহরওয়াদী পাঞ্জাব থেকে স্পেশাল পুলিশ ফোর্স আনিয়ে তাদের সাহায্যে দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণ করাতে

www.pathagar.com

সোহরওয়ার্দীর ওপর তাদের ক্রোধের অন্ত ছিল না। সোহরওয়ার্দীকে হত্যার জন্য উগ্রপন্থী হিন্দুরা দু'বার চেষ্টা চালায়। দু'বারই অলৌকিকভাবে তিনি রক্ষা পান। সোহরওয়ার্দীর একটি অভ্যাস ছিল, তিনি অবসর সময়ে যখন তিনি নিবিষ্ট মনে কিছু চিন্তা করতেন, তখন এক চক্ষু এমনভাবে বন্ধ রাখতেন যাতে মনে হত তার এক চোখ অন্ধ। সোহরওয়ার্দীকে হত্যার জন্য প্রেরিত এক গুপ্ত ঘাতক এক চক্ষু বিশিষ্ট ব্যক্তিটি সোহরাওয়ার্দী নন ভেবে নাগালের মধ্যে পেয়েও তাকে হত্যা না করে ফিরে যায়। আরেকবার তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে উগ্রপন্থী হিন্দুরা কলিকাতায় শান্তি মিশনে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে যে ঘরে তিনি অবস্থান করছিলেন সেটি ঘেরাও করে ফেলে। সোহরওয়ার্দীর প্রতি অশ্রাব্য গালি বর্ষণের সাথে সাথে তাকে বেরিয়ে আসার আহবান জানাতে থাকলে সোহরাওয়ার্দী দরজা খুলে তাদেরকে বলেন, আপনারা আমাকে হত্যা করতে পারেন, তবে কথা দিতে হবে, এর পর আপনারা আর কোন মুসলমানকে হত্যা করবেন না। বাইরের হৈ চৈ শুনে বিশ্রামরত গান্ধী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে হিন্দুদের উদ্দেশে বলেন, শহীদকে (শহীদ সোহরওয়ার্দীকে) খুন করার আগে তোমাদের আমাকে খুন করতে হবে। ফলে দাঙ্গাবাজরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

শহীদ সোহরওয়ার্দী এভাবে দাঙ্গাবাজদের কবল থেকে বেঁচে গেলেও কলিকাতার সাধারণ মুসলমানদের অবস্থা ততটা নিরাপদ ছিল না। এই নিরাপত্তাহীন অবস্থার মধ্য দিয়েই চলছিল দু'রাষ্ট্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিজ নিজ পছন্দের রাষ্ট্রে আসা-যাওয়ার পালা। সামরিক, বেসামরিক সকল স্তরের সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অপশনের সুযোগ দেয়া হয়েছিল– কে পাকিস্তান, কে ভারতে যোগ দেবে। সে অনুসারে অধিকাংশ মুসলমান পাকিস্তানে এবং অধিকাংশ হিন্দ কর্মকর্তা-কর্মচারী ভারতে কাজ করার পক্ষে অপশন দেন। আগস্ট মাসের প্রথমার্ধ ধরেই নিজ নিজ অপশনের রাষ্ট্রে যোগদানের জন্য যাত্রা করার পালা। সে এক এলাহী কারবার। দিল্লী, লাহোর, করাচীর খবর বলতে পারব না; তবে ঢাকা থেকে কলিকাতা এবং কলিকাতা থেকে ঢাকা হাজার হাজার সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং অন্যান্য লোকজনের আগমন-নির্গমনের সে বিশাল ঘটনা নিজ চোখে দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে।

চারদিকে চলছিল এক মহা রূপান্তরের পালা। রূপান্তর চলছিল আমার জীবনেও। সিলেট গণভোট থেকে ফিরে এলাম বাড়ীতে। ইতিমধ্যেই আমার আইএ পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। হাই মাদ্রাসায় পরীক্ষার তুলনায় ফল কিছুটা খারাপ : ফার্স্ট ডিভিশন এবং বাংলা-আসামের মধ্যে নবম স্থান। পরীক্ষার রেজাল্ট বের হওয়া মানেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য চেষ্টা করতে হবে। সে ব্যাপারে আর্থিক ও

www.pathagar.com

অন্যান্য প্রস্তুতির পালা শুরু হলো। বাড়ীতে বহুদিন পর এবার দেখা হয় মিয়াভাই মোহাম্মদ আবদুস শুকুরের সঙ্গে। তিনি এখন আর শুধু আবদুস শুকুর নন, তিনি এখন মৌলভী আবদুস শুকুর।

'আমার মিয়া ভাই' তালিমনগর থেকে জুনিয়র মাদ্রাসা পাস করার পর ওল্ড স্কীম মাদ্রাসা লাইনে পড়ার জন্য ফুরফুরা শরীফ চলে যান। সেখানে তিনি প্রায় ছয় বছর ছিলেন। তবে মাদ্রাসায় পড়াশোনার চেয়ে পীরের দরবারের বিভিন্ন কাজ এবং ওয়াজ নছিহতে বেশী ব্যস্ত থেকেছেন। মধ্যে তিনি একটানা কয়েক বছর বাড়ীতে আসাও বন্ধ করে দিয়েছিলেন। বাড়ী ফেরার, এমনকি বিবাহের পরও বহুদিন তিনি সংসারের চাইতে ইসলাম প্রচারের লক্ষ্যে ওয়াজ-নছিহতের প্রতিই অধিক আগ্রহী ছিলেন।

জাতীয় জীবনে যে যুগান্তকারী পরিবর্তন অত্যাসন্ন তাকে স্বাগত জানাতেই যেন প্রস্তুতির পালা চলছিল সর্বত্র। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন জনমনে কতটা নাড়া দিয়েছিল তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখা যায় পাংশা থানায় সম্পূর্ণ জনগণের উদ্যোগে একটি স্মারক হাট প্রতিষ্ঠার মধ্যে। কালুখালী রেল স্টেশন থেকে কয়েক মাইল দক্ষিণে সাতচল্লিশের আগস্টে প্রতিষ্ঠিত এ হাটটির নাম হয় 'পাকিস্তান হাট'। সাতচল্লিশের পর এদেশে বহু পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। ইতিমধ্যে অভ্যুদয় ঘটেছে স্বাধীন বাংলাদেশের। কাগজে-কলমে হাটটির নাম এখন হয়ত 'বাংলাদেশ হাট' হয়ে থাকবে। কিন্তু পাংশা, রাজবাড়ী, বালিয়াকান্দির সাধারণ মানুষের মুখে এখনও এ হাটটির পরিচিতি 'পাকিস্তান হাট' হিসাবেই।

চারদিকে একটা সাজ সাজ রব। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাকে কিভাবে হৃদয়ের সবটুকু অনুভূতি উজাড় করে দিয়ে খোশ আমদেদ জানানো যায় তার জন্য গ্রামবাসীর মধ্যে সে কি প্রাণচাঞ্চল্য! একটি মহাপরিবর্তনকে স্বাগত জানাতে গিয়ে গোটা জনগোষ্ঠীই সেদিন যেন পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল।

পরিবর্তন আসছিল আমার নিজের মধ্যেও। জাতীয় জীবনে পরম সৌভাগ্যের বার্তাবহ হিসাবে যে পাকিস্তান আসছে তার সৃষ্টিতে আমারও একটা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভূমিকা ছিল– এ অনুভূতি আমাকে বিশেষভাবে আপ্লুত করে তুলেছিল। অদূর ভবিষ্যতে পাকিস্তানই নয়, আমি প্রবেশাধিকার লাভ করতে চলেছি দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র হিসাবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির কথা মনে উঠতে কিছু উদ্বেগও যে মনের কোণে উঁকি দিত না, তা নয়। ঢাকা গভর্নমেন্ট ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হওয়াতে সেখানে যত কম খরচে পড়া সম্ভব ছিল, হোস্টেলে সিট পাওয়া যত সহজ ছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে সিট পাওয়া তত সহজ নয়। তাছাড়া হলে

www.pathagar.com

থাকতে ব্যয় বাহুল্যের প্রশ্ন তো আছেই। অত খরচ বহনের ক্ষমতাই বা কোথায় আমার পরিবারের? আমাদের পরিবারের আয়তনও যে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট বেড়ে গেছে। কারণ পরিবর্তন এসেছিল আমাদের পরিবারের মধ্যেও।

আমরা তালিমনগরে থাকতেই আমার আব্বা আরেকটি বিবাহ করেছিলেন। নতুন মা হয়ে এলেন আমার দূর সম্পর্কের বিধবা ফুফু, আব্বার মামাতো বোন। তারা দু'বোন অল্প বয়সে এতিম হয়ে পড়লে আব্বাই তাদের মানুষ করেন। দু'বোনকে বিয়েও দিয়েছিলেন। বিয়ে হয়েছিল ঘর জামাই পদ্ধতির। তাদের বাড়ী, জমিজমা সব আমাদের বাড়ী ও জমাজমির সাথে লাগোয়া বলে এ ব্যবস্থা। আমার ঐ ফুফুর যার সাথে বিয়ে হয়েছিল, তিনি অবসরে আমাদের গৃহশিক্ষকতাও করতেন। এক কন্যা সন্তানের পিতা হবার পর তিনি কয়েকদিন রোগভোগের পর অকস্মাৎ মারা যান।

আমার এ ফুফু আমাদের বাড়ীতেই মানুষ হন বলে আমাদের পূর্ব পরিচিত ছিলেন। ছোটকালে আমাকে মাঝে মাঝে তিনি ভাত মাখিয়ে খাওয়াতেন। কিন্তু এই ফুফুই যখন আমাদের বাড়ীতে নতুন মা হয়ে এলেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই সম্পর্কের এক নতুন টানাপড়েন দেখা দিল।

যদিও আমার আব্বার সোয়াশ' বছর বয়েসী নানীকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল, তবুও আমার আপন নানা-নানী, মামা-খালা, দাদা-দাদী, চাচা-ফুফ কাউকে দেখার ভাগ্য আমার হয়নি। এরা অধিকাংশ মারা যান কলেরায়, কেউ কেউ বসন্তে। তখনকার দিনে বসন্ত হলে কেউ কেউ ভাগ্য থাকলে বাঁচলেও বাঁচত, কিন্তু কলেরায় আক্রান্ত হলে খুব কম লোকই বাঁচতো। আর যক্ষ্মা হলে তো কারো রক্ষাই থাকতো না। আব্বার চাচী (আমার মরহুম ছোট দাদার স্ত্রী)কে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। বিধবা হওয়ার পর আমাদের সংসারেই তিনি থাকতেন। ফলে তিনিই ছিলেন আমার আপন দাদীর মতো এবং তার কন্যা ছিলেন আমার আপন ফুফুর মত। বিধবা হওয়ার পর ফুফুর সন্তান আমাদের সাথেই ছোটকালে লালিত-পালিত হয়। আমার এই দাদী আমার মায়ের মতই আমার আব্বার নতুন বিবাহে গভীরভাবে ক্ষুব্ধ হন।

ছুটিছাটা উপলক্ষে বাড়ীতে গেলেই টের পেতাম আমাদের সংসারের অন্তবিরোধের এই তাপ। আমাদের সৌভাগ্য, পরিবারের অভ্যন্তরের এ দুঃখজনক পরিস্থিতি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। সবাই কঠিন বাস্তবতাকে মেনে নেয়াতে পরিবারে সমঝোতামূলক পরিবেশ ফিরে আসে। শেষ দিনগুলোতে আমার মা ও ছোট মা দু'বোনের মতই জীবন কাটিয়ে যান।

আগের কথায় ফিরে আসা যাক। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির উদ্দেশ্যে একদিন ঢাকায়

www.pathagar.com

ফিরে এলাম। এক পর্যায়ে ভর্তিও হয়ে গেলাম, এনামুল হকের দেখাদেখি ইকোনমিক্স অনার্সে। অবশ্য কয়েকদিনের মধ্যে আবার তা পরিবর্তন করে বাংলায় অনার্স নিলাম। ভর্তি হলাম সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের এটাচড ছাত্র হিসাবে। ভর্তি তো হলাম কিন্তু থাকব কোথায়? অবশেষে ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েটের সাবেক ছাত্র মুহম্মদ আবু বকরের চেষ্টায় জায়গীরও একটা মিলে গেল আজিমপুর শাহ সাহেবের বাড়ীর কিছু পরে লালবাগ রোডে তৃতীয় শ্রেণীর এক সরকারী কর্মচারীর (কেরানী) বাড়ীতে। ভদ্রলোকের বাড়ী বিক্রমপুরে। অর্থাৎ মুন্সীগঞ্জ মহকুমায়। চাকরি করেন ঢাকা জেলা কালেক্টরেটে। ছোট্ট একটি ছেলে ও একটি মেয়েকে পড়াতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি

যেবার পাকিস্তান হয়, সেই ১৯৪৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা অনার্সে ভর্তি হয়েছিলাম আমরা মাত্র তিনটি ছাত্রছাত্রী– আমি, নূরুল ইসলাম পাটোয়ারী এবং মমতাজ বেগম। পরবর্তীকালে বিশিষ্ট সাংবাদিক হিসেবে খ্যাত নূরুল ইসলাম পাটোয়ারী আইএতেও আমার সহপাঠী ছিলেন। মমতাজ বেগম পরবর্তীকালে এডভোকেট আবদুল ওদুদ মল্লিকের সহধর্মিনী হিসেবে মমতাজ মল্লিক নামধারণ করেন। কর্মজীবনে তিনি বাংলাদেশ আমলে ইডেন গার্লস কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল হিসেবে রিটায়ার করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা অনার্সের সঙ্গে সাবসিডিয়ারি সাবজেক্ট হিসাবে নিয়েছিলাম রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও আরবী। বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন আরবীসহ সব বিষয়ে লেকচার হত ইংরেজীতে; তবে বাংলা ছিল ব্যতিক্রম। এ ছাড়া ১০০ নম্বরের একটা ইংলিশ কম্পোজিশন টেস্ট আবশ্যিক বিষয় হিসাবে ছিল। বাংলা অনার্সে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রফেসর গণেশ বসু, বিশ্বরঞ্জন ভাদুরী, হরনাথ পাল, মুহম্মদ আবদুল হাই, সৈয়দ আলী আহসান, কাজী দীন মুহম্মদ প্রমুখকে শিক্ষক হিসেবে পাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এ ছাড়া ইদরিস আলী মিয়া এবং মহিউদ্দিন আহমদকে পেয়েছিলাম অস্থায়ী শিক্ষক হিসেবে।

আরবীতে যাদের শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলাম তাদের মধ্যে ছিলেন ডক্টর সৈয়দ মোয়াজ্জম হোসেন, ডঃ সিরাজুল হক, ডঃ মুহম্মদ ইসহাক, শইখ আবদুর রহিম, আবদুস সোবহান প্রমুখকে। ডঃ সৈয়দ মোয়াজ্জম হোসেন তখন বিভাগীয় প্রধান ছাড়াও ছিলেন সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের প্রভোস্ট। পরবর্তীকালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হন। শেষোক্তজন ছিলেন আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রীপ্রাপ্ত। তার ডক্টরেট ছিল না বলে চাকরি জীবনে তার তেমন তরক্কী হয়নি। কিন্তু তার অধ্যাপনা ছিল খুবই উচ্চমানের এবং আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায়

www.pathagar.com

তিনি ছিলেন ডিপার্টমেন্টের সেরা শিক্ষক।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে যাদের শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলাম, তারা অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু। তারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পর ভারতে চলে যান। তাদের সবার নাম মনে পড়ছে না, তবে তাদের একজনের নাম আমি জীবনে কখনও ভুলতে পারব না। বিভাগীয় হেড এই অধ্যাপকের নাম ছিল ডিএন ব্যানার্জি সংক্ষেপে ডিএনবি। তিনি বক্তৃতা দিতেন খুব ধীরে ধীরে, প্রতিটি বাক্য উচ্চারণ করতেন সুস্পষ্টভাবে। ধীরে ধীরে সুস্পষ্টভাবে বক্তৃতা দিতেন বলে তার বক্তৃতার নোট নিতে কোন অসুবিধা হত না। ক্লাসে তিনি এত সুন্দরভাবে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করতেন যে, তাঁর লেকচার শুনেই সবকিছু মনে গেঁথে যেতো, বাড়ীতে তেমন পড়ারও আর প্রয়োজন হতো না। এত ভালো শিক্ষক আমি জীবনে খুব কমই দেখেছি। যে বছর সাবসিডিয়ারী সাবজেক্ট পরীক্ষা হয় প্রথম বছরেই। বছরের মাঝামাঝিতে এসেই আমরা নতুন শিক্ষক হিসাবে পেলাম মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী ওরফে 'ম্যাক' (ইউ)-কে। ডিএনবির ঠিক বিপরীত 'ম্যাক' বক্তৃতা দিতেন খুব দ্রুত। পরবর্তীকালে এই প্রফেসর মোজাফফর আহমদ চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হয়েছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ভর্তি হওয়ার এক মাসের মধ্যেই বৃটিশ শাসনের অবসানে বহু প্রতীক্ষিত পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়। এই একটি মাস আমাদের দু'চোখে তখন শুধু পাকিস্তানের স্বপ্ন। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান হবে তো? না, শেষ মুহূর্তে ইংরেজ বা কংগ্রেসের কোন চক্রান্তে আমাদের আশা-ভরসা সব অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায় কিনা এ আশঙ্কাও যে মনে জাগতো না, তা নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের ক্লাস হতো কার্জন হলে, আর আমাদের অর্থাৎ আর্টস ফ্যাকাল্টির ক্লাস হতো ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের যেখানে এখন ইমার্জেন্সী তার সাথের লাগোয়া অংশে। শুধু আর্টস ফ্যাকাল্টির ক্লাসই নয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীও অবস্থিত ছিল এর এক অংশে। জগন্নাথ হলের এক অংশে অবস্থিত ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অফিস।

আজিমপুর শাহ সাহেব বাড়ীর পেছনে লালবাগ রোডের লজিং থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া-আসা করতাম পায়ে হেঁটেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার সময় কোন সমস্যা হতো না। বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস সেরে দিনাদিন বাসায় ফিরতেও অসুবিধা হতো না। কিন্তু কোন ফাংশন বা অন্য কারণে যেদিন লজিং বাড়ী একা একা ফিরতে রাত হয়ে যেতো, বর্তমান আজিমপুর কলোনীর জায়গাটা পেরোতে ভয়ে গা ছমছম করতো। পলাশী রেলগেটের পর থেকে আজিমপুর ছাপড়া মসজিদ পর্যন্ত আজিমপুর কলোনী তো নয়ই, কোন মনুষ্য বসতিই ছিল না। ছিল বিশাল

www.pathagar.com

আমবাগান, যেখানে দিনের বেলায়ও শিয়াল বিভিন্ন বন্য পশুর আনাগোনা ছিল। আজিমপুর ছাপড়া মসজিদ ছিল তখন প্রকৃত অর্থেই ক্ষুদ্রাকৃতির টিন চালার করুণ চেহারার এক ছাপড়া ঘর।

স্বাধীনতার প্রতীক্ষায়

১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ঢাকা ছিল একটি বৃহৎ জেলা শহরমাত্র। সেই জেলা শহরকে রাতারাতি একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রাদেশিক রাজধানী শহরে পরিণত করাটা মোটেই চাট্টিখানি ব্যাপার ছিল না। ভাগ্যিস ১৯০৫ থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত স্বল্পায়ু 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশের রাজধানী ঢাকার সময় রমনা এলাকায় কিছু সরকারী দালানকোঠা নির্মিত হয়েছিল। যেগুলোতে মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ কিছু অফিসারদের বাসস্থানের ব্যবস্থা হল। কিন্তু অন্যান্য সরকারী কর্মচারীরা থাকবে কোথায়? তাদের বাসস্থান হিসাবে মুলি বাঁশের ছাউনী দিয়ে রাতারাতি থাকার ঘর গড়ে তোলা হলো পলাশী ও নীলক্ষেত এলাকায়। এই অস্থায়ী ঘরগুলোই ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে 'পলাশী ব্যারাক' ও 'নীলক্ষেত ব্যারাক' হিসাবে। মুলি বাঁশের এসব ঘরের মধ্যে যেমন ছিল একতলা ঘর, তেমনি ছিল দোতলা ঘর। এ ধরনের দোতলা ঘরে উপরতলা থেকে কালেভদ্রে চা পড়লেও নীচেরতলার বাসিন্দারা তাকে পেশাব সন্দেহে কিভাবে কোন্দলে লিপ্ত হতো তার এক সরল চিত্র দেখতে পাওয়া যায় মুনীর চৌধুরীর 'পলাশী ব্যারাক' শীর্ষক নাটিকায়।

নবগঠিত প্রদেশের সেক্রেটারিয়েটের স্থান নির্ধারণ করা হয় ইডেন বিল্ডিং-এ। কলিকাতার রাইটারস বিল্ডিং-এর বিপরীতে ঢাকার ইডেন বিল্ডিংস। তবে নামেই বিল্ডিংস। প্রথমদিকে ইডেন বিল্ডিং চত্বরে সম্ভবত একটাই মাত্র ছোটখাট বিল্ডিং ছিল। সেক্রেটারিয়েটের জন্য বাকী সব অফিস করা হয়েছিল পলাশী বা নীলক্ষেত ব্যারাকের মতই মুলি বাঁশের দো'চালা ঘরে। ঘরের চালই যে শুধু মুলি বাঁশের ছিল তা নয়, বেড়াও ছিল মুলি বাঁশের। শুধু নিচের মেঝে ছিল পাকা। ইডেন বিল্ডিং-এর চারদিকে কোন দেয়াল ছিল না, ছিল কাঁটাতারের বেড়া। অফিসের কাজ চালানোর জন্য প্রথম দিকে পর্যাপ্ত সংখ্যক চেয়ার টেবিলও ছিল না। ফলে বহু সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারী মেঝেতে পাটি বিছিয়েই প্রথম দিকে কাজ চালিয়ে যান বহুদিন ধরে। কিন্তু এতে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মনে কোন ক্ষোভ ছিল না। দীর্ঘদিনের পরাধীনতার অবসানে তারা নিজেদের জন্য একটি স্বাধীন রাষ্ট্র পেয়েছে, এ রাষ্ট্রকে যে কোন ত্যাগ ও শ্রমের বিনিময়ে গড়ে তুলতে হবে, এই ছিল তাদের মনোভাব।

একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রাদেশিক রাজধানী হিসেবে ঢাকাকে প্রস্তুতি নিতে হচ্ছিল প্রায় শূন্য থেকে। ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল বটে, তবে তার কোন এফিলিয়েটিভ জুরিসডিকশন ছিল না। প্রদেশে সমস্ত কলেজ ও স্কুল সবই

www.pathagar.com

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত। ঢাকায় একটি শিক্ষা বোর্ড ছিল বটে, কিন্তু সে বোর্ডের এখতিয়ার সীমাবদ্ধ ছিল প্রদেশের নিউস্কীম হাই মাদ্রাসা ও ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ এবং ঢাকা শহরের হাই স্কুল ও ইন্টারমিডিয়েট কলেজের মধ্যে। সে শিক্ষা বোর্ডের জন্য সেগুনবাগিচায় ক্ষুদ্র একটি অফিস ছিল, যার সাথে পরবর্তীকালের ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের কোন তুলনাই চলে না।

১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ঢাকায় কোন দৈনিক পত্রিকা তো ছিলই না, দৈনিক পত্রিকা মুদ্রণ উপযোগী কোন ছাপাখানা ছিল বলেও মনে হয় না। ঢাকায় চাবুক, সোনার বাংলা প্রভৃতি নামে দু'একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল, তবে তার সবগুলোই ছিল হিন্দুদের। বাঙ্গালী মুসলমানদের যে দু'খানি দৈনিক পত্রিকা ছিল, আজাদ ও ইত্তেহাদ- পত্রিকা দু'খানিই কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হত। অল ইন্ডিয়া রেডিওর দায়সারা গোছের একটি স্টেশন ছিল ঢাকায়। এর অফিস ছিল নাজিমুদ্দিন রোডের একটি বিল্ডিংয়ে, এখন যেখানে বুরহানউদ্দিন কলেজ অবস্থিত। সাতচল্লিশের আগে শিল্প-সংস্কৃতি ক্ষেত্রের অন্যান্য মাধ্যমের মত বেতারেও মুসলমানদের অংশগ্রহণ ছিল প্রায় না থাকার শামিল।

সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক কোন ক্ষেত্রেই সাতচল্লিশের আগে বাঙ্গালী মুসলমানদের অবস্থান সবল ছিল না। তাদের সেদিন ছিল শুধ নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের এক অদম্য সংকল্প, 'উন্নত-শির' নিয়ে পৃথিবীতে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্ন। এই স্বপ্ন বুকে নিয়েই তাদের পূর্বসুরিরা ১৯০৫ সালে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশ গঠনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের কুটিল চক্রান্তে মর্মাহত হয়েছিলেন। এই স্বপ্নকে বুকে ধারণ করেই ঢাকায় ১৯০৬ সালে তাদের পূর্বসুরিরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নিখিল ভারত মুসলিম লীগ এবং ১৯৪০ সালের মুসলিম লীগ অধিবেশনে তাঁরা উত্থাপন করেছিলেন ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব। এই স্বপ্নকে বুকে ধারণ করেই ১৯৪৫-৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে বাংলার মুসলমানরা নজিরবিহীন ব্যালট বিপ্লবের মাধ্যমে পাকিস্তান দাবীর সপক্ষে তাদের যুগান্তকারী রায় প্রদান করেছিলেন। সাতচল্লিশের আগস্ট মাসে অবশেষে তাদের সেই বহুদিনের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে চলেছে।

স্বপ্নে উজ্জীবিত আমরাও। আকুল আগ্রহে আমরাও প্রহর গুনছিলাম, কবে আসবে সেই দীর্ঘ প্রতীক্ষার দিনটি। এর মধ্যে সাতচল্লিশ সালের ১১ আগস্ট করাচীতে পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্যদের উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সংখ্যালঘুদের অমূলক আশংকা দূর করতে ঘোষণা করেছেন, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃস্টান কারও প্রতি নাগরিক অধিকারের প্রশ্নে কোন বৈষম্য করা হবে না। অবশেষে এল বহু প্রতীক্ষিত স্বপ্নের

www.pathagar.com

সে দিনটি। সাতচল্লিশের চৌদ্দই আগস্ট। হিজরী হিসাবে চলছিল রমজান মাস। রমজানের ২৭ তারিখ শবে কদরের পবিত্র রজনীতে নতুন করে লিখিত হল মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস। ১৩ আগস্ট বৃটিশ ভারতের সর্বশেষ ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন করাচী যান এবং ১৪ আগস্টের প্রথম প্রহরে পাকিস্তানের গণপরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর কাছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল হিসেবে শপথ গ্রহণের পর জাতির উদ্দেশ্যে বেতার ভাষণ দেন কায়েদে আজম রাত ১২টায়।

তখনকার দিনে টেলিভিশন তো নয়ই, রেডিওর প্রচলনও ছিল নেহায়েত সীমিত। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে কায়েদে আজমের এ বেতার ভাষণ শোনার জন্য মুহম্মদ আবু বকর ও আমি ১৪ আগস্ট দিবাগত রাত ৯টার আগেই খাওয়া-দাওয়া সেরে জায়গীর বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লাম সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের উদ্দেশে। সলিমুল্লাহ মুসলিম হল মিলনায়তনে লোকে লোকারণ্য। কোন মতে সিট যোগাড় করে দু'জনে বসে পড়লাম। এরপর দীর্ঘ প্রতীক্ষার পালা।

অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান

অবশেষে এক সময় আমাদের প্রতীক্ষার অবসান ঘটল। জাতির উদ্দেশে, ইংরেজীতে ভাষণ দিলেন প্রাণপ্রিয় নেতা স্বাধীন পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম গভর্নর জেনারেল কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বললেন, নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে সকলকে নিঃস্বার্থ ও ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে। বেতারের প্রোগ্রাম ঘোষকের ঘোষণায় বুঝা গেল, আর 'অল ইন্ডিয়া রেডিও' নয় আমাদের নিজস্ব বেতার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যার নাম 'পাকিস্তান ব্রডকাস্টিং সার্ভিস'। কারণ ইতোমধ্যেই আমাদের নিজস্ব রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে, যার নাম 'পাকিস্তান'।

স্বাধীনতার প্রথম দিনটা যে আমার কিভাবে কাটল তা আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না। ২শ' বছরের গোলামীর অবসানে এ দিনটা যে আমাদের দেখার সৌভাগ্য হবে তা প্রথমে বিশ্বাসই হতে চায়নি। কারণ বাধা ছিল পদে পদে। সেসব পর্বত প্রমাণ বাধা পায়ে দলে মনজিল মকসুদে পৌঁছতে পারব কিনা এ সংশয় প্রতিনিয়ত তাড়া করে ফিরছিল আমাদের। অবশেষে সব সন্দেহ-সংশয়ের অবসানে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এ আনন্দে সবাই মাতোয়ারা ছিলাম।

অন্যান্য দিনের তুলনায় বেশ আগেই সেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলাম। তবে ক্লাস করতে নয়, আনন্দ-উৎসবে মেতে উঠতে। বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের

www.pathagar.com

বিভিন্ন হল, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ, সেক্রেটারিয়েট, ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল, যাদুঘর, রেডিও অফিস, হাইকোর্ট প্রভৃতি সকল সরকারী-বেসরকারী ভবন, বাড়ীঘর, দোকানপাট, এমনকি মোটরগাড়ী, ট্যাক্সি, ঘোড়ার গাড়ী, রিকশা প্রভৃতি সকল যানবাহনে সর্বত্র সবুজের উপর সাদা চাঁদ-তারা খচিত স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের পতাকা পত'পত করে উড়ছে। ছোট ছোট পতাকা দিয়ে অফিস-আদালত, ঘরবাড়ী, দোকানপাট সাজানো হয়েছে। সারা শহর মেতে উঠেছে অভূতপূর্ব আনন্দের উন্মাদনায়। আর সে উন্মাদনায় গা ভাসিয়ে দিয়েছি আমিও।

সারা শহর জুড়ে চলছে যেন বিশেষ ঈদ উৎসব। ঈদ উৎসবের মধ্যেও থাকে কিছু কর্তব্যের আনুষ্ঠানিকতা। ঈদুল ফিরত ও ঈদুল আযহা দুই ঈদেই ঈদগায় গিয়ে দু'রাকাত নামাজ পড়তে হয়। কোরবানীর ঈদে থাকে কোরবানীর বাধ্যবাধকতা। কিন্তু এ উৎসবে ঐসব বাধ্যবাধকতার কোনটাই নেই। শুধুই আনন্দের জোয়ারে গা ভাসিয়ে চলা। এমনিভাবেই বন্ধু-বান্ধবদের সাথে আনন্দের জোয়ারে ভাসতে ভাসতে গিয়েছিলাম বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়। চানখাঁরপুল থেকে বর্তমানের দোয়েল চত্বরের দিকে যাওয়ার পথে ডানদিকে কার্জন হল এলাকার পাশে রাস্তার উপর একটি ব্যাস দাঁড়ানো। আর সেই বাসের উপরের মাইক্রোফোন থেকে গ্রামোফোন রেকর্ডের গান ভেসে আসছিল। ঢাকার কৃতী গীতিকার নাজির আহমদের সেই বিখ্যাত গান–

"পূরব বাংলার শ্যামলিমা
পঞ্চনদীর তীরে অরুনিমা
ধূসর সিন্ধু মরু সাহারায়
ঝাণ্ডা জাগে যে আজাদ
পাকিস্তান জিন্দাবাদ।
পাকিস্তান জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ।।"

তখনকার দিনে পাকিস্তান সম্বন্ধে বিশিষ্ট কবি-গীতিকারদের রচিত বেশ কতকগুলো গান পাকিস্তান আন্দোলনের কর্মীদের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। তার মধ্যে যেমন ছিল ফররুখ আহমদের বিখ্যাত গান–

লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান
কবুল মোদের জানপরাণ।।

অথবা

'আজাদ করো, আজাদ করো
পাকিস্তান।
বাঁচার মতো বাঁচতে হলে

www.pathagar.com

মরার গান
কণ্ঠভরে নাও শিখে আজ
নওজোয়ান।।'

তেমনি ছিল তালিম হোসেনের অনেকগুলো গান। যেমন- "পাকিস্তান আজাদ!

চলে সেই দেশে মুজাহিদ বেশে
দৃপ্ত প্রাণের সাধ।।
নিশানে আল-হেলাল
বিষানে হাঁকে বেলাল,
বন্ধুর পথ অন্ধকারে,
তওহীদের মশাল!
চলে নিখিলের চির মানুষের
জিন্দেগীর জেহাদ!!"

অথবা

হে বঞ্চিত মজলুমের দরদী কায়েদে আজম!
মৃত্যু সাহারা বক্ষে জাগালে জীবনের জমজম!!
দিল-আজাদীর সেনানী জিন্দাবাদ!
বন্দী জীবনে মুক্তি হলো আবাদ,
হিংস্র জালিম চিত্ত ঘিরিল আঁধিয়ার থম থম!!

অথবা

দিল-আজাদীর দেশ পাকিস্তান!
কদম কদম চল জঙ্গী জোয়ান!!
জানি শুধু হুকুমাত এক আল্লাহর
মানুষের বাদশাহ নাই কেহ আর,
জেগে ওঠ মুসলিম কুল দুনিয়ার
ভেঙ্গে আয় জামানার পাপ জিন্দান।"

কবি ফররুখ আহমদ এবং কবি তালিম হোসেনের এসব জনপ্রিয় গান তখন রেকর্ড হয়েছিল কিনা জানি না। তবে যতদূর মনে পড়ে, কবি গোলাম মোস্তফার পাকিস্তান সম্পর্কিত দু'খানি গান রেকর্ড হয়ে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এ গান দু'খানি ছিল–

সকল দেশের চেয়ে পিয়ারা
দুনিয়াতে ভাই যে কোন্ স্থান?

www.pathagar.com

সে পাকিস্তান, সে পাকিস্তান, সে পাকিস্তান।।

এবং–

ঝির-ঝির-ঝির-জির পুবান বাতাসে ধাও
ওরে আমার ময়ূরপঙ্খী নাও।
পাকিস্তানের পাক মুলুকে আমায় লৈয়া যাও
ওরে আমার ময়ূরপঙ্খী নাও।।

যতদূর মনে পড়ে, এ দু'টি গানেই কণ্ঠদান করেছিলেন বাংলা সঙ্গীতের কিংবদন্তী পুরুষ আব্বাসউদ্দীন আহমদ। আব্বাসউদ্দীনের গাওয়া কাজী নজরুল ইসলামের বিভিন্ন জাগরণী ও ইসলামী গান, গোলাম মোস্তফার বিভিন্ন ইসলামী গান, জসীমউদ্‌দীনের পল্লীগীতি সে সময় বাঙালী মুসলিম সমাজে গভীর সাড়া জাগিয়েছিল। সাতচল্লিশের মধ্য আগস্টে আমাদের স্বাধীনতার সেই ঐতিহাসিক দিনটিতে ঢাকা শহরের কোথাও কোথাও বিশেষ করে হোটেল রেস্তরাঁয় গ্রামোফোন রেকর্ডে সেসব গান বাজিয়েও জনগণ আনন্দ প্রকাশ করেছিল।

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় কার্জন হলের পাশে যে বাস থেকে নাজির আহমদের পাকিস্তান বিষয়ক গানটি পরিবেশনের ব্যবস্থা করা হয় ঐ বাস শহরের অন্যান্য অঞ্চলেও ঘুরে ঘুরে পাকিস্তান সম্পর্কিত গান পরিবেশন করে। সে সময় ঢাকা শহরের অভ্যন্তরে সাধারণত যানবাহন হিসেবে বাস চলাচল করতো না বললেই চলে। জনসাধারণের চলাফেরার প্রধান বাহন ছিল ঘোড়ার গাড়ী এবং অল্প দু'চারটে ট্যাক্সি। রিকশা চলতো, তবে তার সংখ্যাও ছিল বেশ কম। এ কারণে পাকিস্তান সম্পর্কিত গান পরিবেশনকারী বাসটি শহরে যথেষ্ট ঔৎসুক্য সৃষ্টি করেছিল।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ঢাকা শহরে টাউন সার্ভিস হিসেবে বাস চলাচল শুরু হয় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর। এর আগেই ঢাকা-নারায়ণগঞ্জের মধ্যে বাস চলাচল শুরু হয়। তবে বাসের সংখ্যা যেমন ছিল কম, তেমনি ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সড়কে বাস যাত্রীর সংখ্যাও ছিল যথেষ্ট কম। প্রদেশের অন্যান্য অংশের মত ঢাকা-নারায়ণগঞ্জে যাতায়াতকারী অধিকাংশ যাত্রী রেলপথেই যাতায়াত করতে অভ্যস্ত ছিল। আমরা বৃহত্তর ফরিদপুর জেলা হতে ঢাকা আসতে নদীপথে স্টীমারে গোয়ালন্দ-চাঁদপুর হয়ে নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত এসে নারায়ণগঞ্জ থেকে রেলে এসে ঢাকা (ফুলবাড়িয়া) স্টেশনে নামতাম।

ঢাকা নগরী পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে প্রধানত সীমাবদ্ধ ছিল বর্তমানের পুরানা ঢাকা এলাকায়। পাকিস্তান আন্দোলনে এই পুরানা ঢাকার জনগণের ছিল অসাধারণ অবদান। ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত আমি এই পুরানা ঢাকাতেই থেকেছি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে পুরানা ঢাকার জনগণের প্রচণ্ড উৎসাহের যে

www.pathagar.com

পরিচয় পেয়েছি, তা কখনও ভুলবার নয়। পাঁচচল্লিশ থেকে সাতচল্লিশ পর্যন্ত পুরানা ঢাকার গণজীবনের যে দু'টি ব্যাপার আমাকে দারুণভাবে মুগ্ধ করতো, তার একটি ছিল পবিত্র রমজান মাসের রাতে সেহরীর জন্য রোজাদারদের জাগানোর চমৎকার পদ্ধতি। রাত দু'টার পর থেকে তিনটা পর্যন্ত এক এক মহল্লায় বেরিয়ে পড়তেন এসব লোক। রাস্তা বা গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে উচ্চ স্বরে ছন্দে ছন্দে হাঁক ছাড়তেন ঃ 'ওঠো রোজাদারো, আল্লাহ কি পিয়ারো, ওঠো, ছেহরী খা লেও, রাত দো (ঢাই/তিন) বাজ গিয়া'। মাঝে মাঝে রাস্তায় সমবেত কণ্ঠে কাওয়ালী গেয়ে রমজান ও সেহরীর মাহাত্ম্য বয়ান করা হত।

পুরানা ঢাকার গণজীবনের আর যে বিষয়টি আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করতো, সেটা ছিল ঈদ মিছিল। ঢাকার ঐতিহ্যবাহী এ ঈদ মিছিলে সমকালীন আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রতিফলন ঘটতো। এই মিছিলে সমাজের চোর, বদমায়েশ, মদ্যপায়ী, দুর্নীতিপরায়ণ লোকদের যেমন অবাঞ্ছিত রূপে চিত্রিত করা হতো, তেমনি যারা পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধী, তাদেরকেও জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাকারী হিসাবে চিহ্নিত করে জনতার হাতে তাদের জুতাপেটা করার দৃশ্য দেখানো হতো।

বস্তুত পাকিস্তান আন্দোলনের প্রতি পুরানা ঢাকাবাসীর সমর্থন কত প্রচণ্ড, গভীর ও ব্যাপক ছিল এটা তার স্পষ্ট প্রমাণ। স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দিন পুরানা ঢাকার গণজীবনে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। পুরানা ঢাকার গণজীবনে পাকিস্তান আন্দোলন কত গভীরভাবে রেখাপাত করে তার নিদর্শন মেলে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার স্মারক হিসেবে পুরানা ঢাকায় 'পাকিস্তান মাঠ' নামে একটি মাঠ প্রতিষ্ঠা থেকে। কাগজে-কলমে যাই থাক, আজও পুরানা ঢাকার জনগণের কাছে এ মাঠটি 'পাকিস্তান মাঠ' নামেই পরিচিত।

সাতচল্লিশের চৌদ্দই আগস্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের একাংশ বাস্তবায়িত হয়। লাহোর প্রস্তাবের দু'টি প্রধান দিক ছিল ঃ (এক) ভারতবর্ষের হিন্দু অধ্যুষিত ও মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পৃথক পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা, (দুই) মুসলিম অধ্যুষিত উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। লাহোর প্রস্তাবের প্রথমাংশ সাতচল্লিশে বাস্তবায়িত করা হলেও দ্বিতীয়াংশ বাস্তবায়িত করা থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নেন ১৯৪৫-৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত মুসলিম লীগ দলীয় জনপ্রতিনিধিগণ ১৯৪৬ সালের দিল্লী সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে। প্রায় দেড় হাজার মাইলের বৈরী ভূখণ্ডের দু'দিকের দু'টি ভূখণ্ড নিয়ে একটি রাষ্ট্র পরিচালনা করা এমনিতেই ছিল একটি কঠিন কাজ। এ জন্য যে দূরদৃষ্টি, নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগী মনোভাবাপন্ন নেতৃত্ব ছিল

www.pathagar.com

অপরিহার্য, তার অভাব তো ছিলই, তদুপরি দূরের ও নিকটের মুসলিমবিদ্বেষী শক্তিসমূহের বৈরিতা মিলে সাতচল্লিশ পরবর্তী অভিজ্ঞতা আমাদের সুখকর হয়নি।

উনিশ শ' সাতচল্লিশ সালের মে মাসে পাকিস্তান সৃষ্টির প্রাক্কালে কুমিল্লা জেলার কংগ্রেস নেতা আশরাফউদ্দিন আহমদ চৌধুরীর এক পত্রের জবাবে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু লিখেছিলেন, 'অখণ্ড ভারতের নীতি আমরা জলাঞ্জলি দিয়েছি, এ কথা সত্য নয়।... ভারত বিভাগ আমরা মেনে নিয়েছি এই শর্তে যে, বাংলা ও পাঞ্জাবকে বিভক্ত করতে হবে। কারণ একমাত্র এ পথেই অখণ্ড ভারত পুনরায় ফিরে পাওয়া সম্ভব হবে।' [দ্রষ্টব্য ঃ 'রাজবিদ্রোহী আশরাফউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী' - জামালুদ্দিন আহমদ চৌধুরী]। এতে বোঝা যায়, সাতচল্লিশের পার্টিশনকে কংগ্রেসী হিন্দু নেতৃবৃন্দ কখনও মেনে নিতে পারেননি। মাউন্টব্যাটেনসহ বৃটিশ নেতৃবৃন্দের মনোভাবও যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রতি মোটেই অনুকূল ছিল না, তা তদানীন্তন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ এটলী, লর্ড মাউন্টব্যাটেন এমনকি স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফের বিভিন্ন আচরণ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে উপমহাদেশের ভেতর-বাইরের বিভিন্ন শক্তির এসব বৈরী মনোভাব সম্পর্কে পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের দু'একজন ছাড়া কারও সচেতনতা তো ছিলই না, এমনকি জনগণের সমস্যা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা উপলব্ধি করা এবং সে আলোকে নিষ্ঠার সাথে কাজ করার ব্যাপারেও তাদের ব্যর্থতা ছিল সীমাহীন। এর ফলে পরবর্তীকালে জনগণের মধ্যে অসন্তোষ, বিক্ষোভ এবং দুই অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য, ভুল বোঝাবুঝি ও সংঘাত দেখা দেয়। অবশেষে বাংলাদেশের জনগণের ন্যায্য আশা-আকাঙ্ক্ষা সামরিক শক্তিবলে অবদমনের চেষ্টা চালানো হলে রক্তাক্ত প্রতিরোধ যুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হয়।

উপরোক্ত বিভিন্ন কারণে সাতচল্লিশ থেকে একাত্তর এই চব্বিশ বছরে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্যক পূরণ হয়নি, এ কথা যেমন সত্য, তেমনি সত্য এই যে, বৃটিশ শাসনামলের প্রায় দু'শ' বছর ধরে একটানা বঞ্চনার শিকার হয় যে পূর্ববাংলা, তার নিঃস্ব, রিক্ত সমাজদেহে যৎসামান্য হলেও রক্তমাংসের সঞ্চার হয় এই চব্বিশ বছরে। উনিশ শ' সাতচল্লিশ সালের আগে কৃষি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রেই পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় অগ্রসর ছিল। অর্থনৈতিক উন্নয়নের অবকাঠামোগত পার্থক্যের কারণে পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নের জন্য বিশেষ দৃষ্টিদানের যে প্রয়োজন ছিল, সেদিকে নজর না দেয়া ছাড়াও একশ্রেণীর পশ্চিম পাকিস্তানী আমলা ও রাজনীতিক ভেতরে ভেতরে পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলেন। ফলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান সমান গতিতে

www.pathagar.com

উন্নয়নের পথে অগ্রসর হতে পারেনি। এসব কারণে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে উন্নয়নের ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা গেলেও উনিশ শ' সাতচল্লিশ সালের সাথে একাত্তরের অবস্থা তুলনা করলে দেখা যাবে এ চব্বিশ বছরেও উন্নয়নের ক্ষেত্রে পূর্ববাংলা তথা বাংলাদেশের অর্জনও একেবারে তুচ্ছ ছিল না।

বৃটিশ শাসনের কুফল

এখানে মনে রাখা দরকার, গ্রামে গ্রামে কৃষকের গোলা ভরা ধান, গলা ভরা গান, পুকুর ভরা মাছ ও গোয়াল ভরা গরুর যে 'সোনার বাংলা'র চিত্র আমাদের দেশের মানুষ কল্পনা করে, তার দৃষ্টান্ত শুধু দেখা গেছে পলাশী পূর্ববর্তী মুসলিম শাসনামলে। শায়েস্তা খাঁর আমলে টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেত, এ তথ্য আমরা পাই তদানীন্তন সুবে বাংলায় আগত বিদেশী পরিব্রাজকদের বিবরণীতেই। "১৭৫৭ সালের ২৩ জুন যেদিন পলাশীতে বাংলার ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে, সেদিনও বাংলা মুলুক ছিল সারা পৃথিবীতে সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও সম্পদশালী দেশ। তখনও বাংলার বার্ষিক রফতানী বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল তৎকালীন মুদ্রায় সাড়ে সাত কোটি টাকা ও বর্তমান মুদ্রামানে পনের হাজার কোটি টাকা। কিঞ্চিৎ অধিক আড়াই কোটি অধিবাসীঅধ্যুষিত এই বাংলার অনধিক এক হাজার কোটি টাকার আমদানী ব্যয় বাদ দিয়ে বৈদেশিক মুদ্রায় নীট আয় ছিল তৎকালীন সাত কোটি টাকা ও বর্তমান মুদ্রামানে প্রায় চৌদ্দ হাজার কোটি টাকা।... নিত্য ব্যবহায জীবনোপকরণের মূল্য এত কম ছিল যে, পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিবারের ভাত, মাছ, গোশত, দুধ, ঘি, চিনি ইত্যাদি খেয়ে সাধারণ মানের কাপড় পরে এক মাস চলার জন্য প্রয়োজন হত মাত্র এক টাকা চার আনা।" [দ্রষ্টব্য- 'বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস', ডঃ এম এ রহিম, পৃঃ ৫১৫ থেকে উদ্ধৃতি ঃ 'ইতিহাসের অন্তরালে', ফারুক মাহমুদ, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃঃ ২১৪-২১৫]।

নবাব ওমরাহ থেকে শুরু করে বাংলার পল্লীবাসীর প্রতি ঘরেই তখন কিছু না কিছু পরিমাণ সোনা-রূপার মোহর তংকা সঞ্চিত ছিল। মুর্শিদ কুলী খাঁর শাসনকাল থেকে দীর্ঘ ৫৫ বছরের সঞ্চয় একত্রিত করে নবাব সিরাজউদ্দৌলার কোষাগারে পূর্ণিয়া যুদ্ধের পর সঞ্চিত ছিল সার্জন ফোর্থের প্রদত্ত হিসাব মতে মণি-মুক্তা-হীরা-জহরতের মূল্য বাদ দিয়ে তৎকালীন মুদ্রায় আটষট্টি কোটি টাকা অর্থাৎ বর্তমান মুদ্রামানে এক লাখ ছত্রিশ হাজার কোটি টাকা। [দ্রষ্টব্য- S. C. Hill Bengal in 1757-67. P-104 থেকে উদ্ধৃতি ঃ 'ইতিহাসের অন্তরালে', ফারুক মাহমুদ, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃঃ ২১৫]। পলাশী যুদ্ধের পর নবাব সিরাজউদ্দৌলার দেওয়ান রামচাঁদ, বাবু মুনশী নবকিষেন, লর্ড ক্লাইভ ও মীর জাফরকে নিয়ে হাজির হন এ বিত্তসম্পদ লুট করার জন্য।

www.pathagar.com

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, মুসলিম আমলের সুজলা সুফলা, শস্য শ্যামলা, সমৃদ্ধিশালী 'সোনার বাংলা'র লুণ্ঠিত সম্পদেই ইংল্যান্ডের সৌভাগ্যের দুয়ার খুলে যায়। সেই লুণ্ঠিত সম্পদেই ইংল্যান্ডে ঐতিহাসিক শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হয়। পলাশী-পূর্ব সেই মুসলিম শাসনামল সম্পর্কেই ইংরেজ সিভিলিয়ান ডাবলিউ ডাবলিউ হান্টারও স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, 'বাংলার যেসব মুসলমানদের কারও পক্ষে সেদিন দরিদ্র হওয়ার কথা কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না, তাদেরকেই ইংরেজ শাসনে অল্পদিনের মধ্যেই সুপরিকল্পিতভাবে একটি অসহায় বিত্তহীন জনগোষ্ঠীতে পরিণত করা হয়'। জমিদারী, জায়গীরদারী থেকে তাদের উৎখাত করে বৃটিশ পদলেহী হিন্দুদের সেখানে বসানো হয়। প্রশাসন থেকে তাদের বরখাস্ত করে সেখানে অনুগত হিন্দুদের নিয়োগ দেয়া হয়। বহু ক্ষেত্রে তাদের ওয়াকফ সম্পত্তি হতে বেদখল করে মুসলমান পরিচালিত মাদ্রাসা-মক্তবসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় সেবা সংস্থা অচল করে দিয়ে মুসলিম সমাজকে ধর্ম-সংস্কৃতি-অর্থনীতি-শিক্ষা সব দিক দিয়ে পঙ্গু করে দেয়ার চেষ্টা চালানো হয়। মসলিনসহ বাংলার ঐতিহ্যবাহী বস্ত্রশিল্পকে ধ্বংস করে দেয়ার লক্ষ্যে মসলিন শিল্পীদের হাতের আঙ্গুল কেটে দেয়ার মত বর্বর দৃষ্টান্তও স্থাপন করা হয়।

মুসলিম শাসনামলের অধিকাংশ সময়ে সুবে বাংলার রাজধানী ছিল মুসলিম অধ্যুষিত উত্তরবঙ্গ বা পূর্ববঙ্গে। মুসলিম শাসনের শেষ দিকে রাজধানী স্থানান্তরিত হয় মুর্শিদাবাদে। বাংলাদেশে ইংরেজ শাসন শুরুর প্রথম সুযোগেই রাজধানী স্থানান্তরিত হয় হিন্দু অধ্যুষিত পশ্চিমবঙ্গের সাম্রাজ্যবাদ নির্মিত নগরী কলিকাতায়। সেই থেকেই সেদিনের পূর্ববঙ্গ তথা আজকের বাংলাদেশ অঞ্চলের প্রতি ইংরেজ শাসকদের বিমাতাসুলভ আচরণের পালা শুরু। উপমহাদেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে যারা সর্বাধিক শোষণ ও নিগ্রহের শিকার হয় তারা হচ্ছে বাংলার মুসলমান জনগোষ্ঠী, আর যে অঞ্চলটি সর্বাধিক শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হয় সেটি বাংলার মুসলিমঅধ্যুষিত পূর্বাঞ্চল, যার আজকের পরিচয় বাংলাদেশ হিসাবে।

এ কারণেই বাঙালী মুসলমান বারবার ফুঁসে উঠেছে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে এবং অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে এগিয়ে গেছে কখনও বিপ্লবী পথে, কখনও নিয়মতান্ত্রিক পথে। কিন্তু বিক্ষুব্ধ অবহেলিত পশ্চাৎপদ মুসলিম সমাজকে যখনই সামান্যতম উন্নতির সুযোগ দেয়া হয়েছে, ইংরেজের দীর্ঘদিনের অনুগ্রহভোগী হিন্দ নেতৃবৃন্দ নানা ছুতায় সে পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। ১৯০৫ সালের 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশ সৃষ্টি এবং ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে এভাবেই কলিকাতার বাবু সুবিধাভোগীরা তাদের স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেন।

আঠার শতকের শেষার্ধ এবং গোটা উনিশ শতক ধরে একটানা বঞ্চিত হওয়ার

www.pathagar.com

পর বিশ শতকের প্রথম থেকেই বাঙালী মুসলিম সমাজ আত্মপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দৃঢ়সংকল্প হয়ে উঠতে শুরু করে। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ ও প্রতিবেশী সমাজের নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তারা একের পর এক সাফল্য অর্জন করে। এসব সাফল্যের মধ্যে ছিল ১৯০৬ সালে ঢাকায় নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা, ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় সীমিত আকারে হলেও প্রদেশের শাসন কর্তৃত্ব লাভ, ১৯৪৫-৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে পাকিস্তান দাবীর স্বপক্ষে ঐতিহাসিক নিরংকুশ রায় দান এবং সর্বশেষে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা। যদিও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়া মাত্রই বাঙালী মুসলমানের উন্নতির পথের সব বাধা দূর হয়ে গেল এমন মনে করার কোন কারণ নেই, তবুও এ সত্য অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, সাতচল্লিশের পার্টিশন ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা এ পথে ছিল এক সুদূরপ্রসারী মাইলফলক। ১৯৪৭ সালে যে প্রায়-শূন্য অবস্থা থেকে আমাদের যাত্রা শুরু করতে হয়, ১৯৭১ সালে প্রচুর ধ্বংসযজ্ঞের পরও আমাদের উন্নয়ন পরিস্থিতি যে অতটা শূন্য অবস্থায় ছিল না, এ সত্য অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

উনিশ শ' সাতচল্লিশের চৌদ্দই আগস্টে উপমহাদেশের পার্টিশন ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ফলে আমাদের জাতীয় জীবনে যে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সূচিত হয়, তার বিস্তারিত বিবরণী দিতে গেলে একটি স্বতন্ত্র বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করতে হয়, যার সুযোগ এখানে নেই। আমরা এখানে শুধু কয়েকটি ক্ষেত্রে আমাদের পর্যালোচনা সীমাবদ্ধ রাখব। আমরা আগেই দেখেছি, ১৭৫৭ সালে পলাশী বিপর্যয়ের ফলশ্রুতিতে এদেশে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার সুবাদে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় জনগোষ্ঠী হিসেবে বাঙালী মুসলমান এবং জনপদ হিসেবে পূর্ববঙ্গ। একটি সমৃদ্ধ জাতিকে বৃটিশ শাসনের ১৯০ বছর ধরে একটানা নিগ্রহ ও শোষণ-বঞ্চনার শিকার করে নিঃস্ব-রিক্ত জনগোষ্ঠীতে পরিণত করা হয়।

একশ' নব্বই বছর একটানা বৃটিশ শাসন ও শোষণের ফলে ১৯৪৭ সালে যখন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়, আজকের বাংলাদেশ, সেদিনের পূর্ববাংলা শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য সবদিক থেকেই ছিল একটি রিক্ত-নিঃস্ব জনপদ। সবাই জানেন, পৃথিবীর সর্বাধিক এবং সর্বোৎকৃষ্ট পাট উৎপাদিত হয় পূর্ববঙ্গে। কিন্তু বৃটিশ শাসনামলের ১৯০ বছরে পশ্চিমবঙ্গে ৯৩টি পাটকল স্থাপিত হলেও একটি পাটকলও পাট উৎপাদনকারী পূর্ববঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এর সব ক'টি একটি সুপরিকল্পিত চক্রান্তের মাধ্যমে স্থাপিত হয় সাম্রাজ্যবাদ নির্মিত নগরী কলিকাতার আশপাশে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সুবাদে ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে পূর্ববঙ্গে এশিয়ার বৃহত্তম পাটকল আদমজী জুট মিলসহ ৭৭টি পাটকল স্থাপিত

www.pathagar.com

হয়।

পাকিস্তান আমলে পূর্ববঙ্গে ৭৭টি পাটকল স্থাপিত হওয়ার ফলে একদিকে যেমন পাট ও পাটজাত পণ্যের বিশ্ববাজারে আমাদের গুরুত্ব বহু গুণে বেড়ে যায়, তেমনি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে গড়ে ওঠা পাটকলগুলো চরম দুরবস্থার কবলে পতিত হয়। কাঁচাপাটের অভাবে বহু পাটকল বন্ধ হয়ে পড়ার উপক্রম হয়। ফলে গোড়া থেকেই পূর্ববঙ্গের পাটকলগুলো ভারতের শ্যেনদৃষ্টিতে পড়ে যায়। পূর্ববঙ্গের পাটকলগুলোর বিরুদ্ধে ভেতরে ভেতরে তারা ষড়যন্ত্র পাকাতে শুরু করে দেয়। ১৯৭১ সালের পর তারা প্রথম সুযোগেই সুপরিকল্পিতভাবে সুদূরপ্রসারী চক্রান্তের মাধ্যমে এই পাটকলগুলোকে ধ্বংস করে দিতে সক্ষম হয়। ১৯৭১ সালের আগেও আমাদের যে পাট শিল্প ছিল লাভজনক এবং দেশের প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাত, ১৯৭২ থেকে ২/৩ বছরের মধ্যেই তাকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দিয়ে আমাদের পাটকলগুলোকে অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হল। এই রহস্যজনক আত্মঘাতী প্রক্রিয়ার সূচনালগ্নে তদানীন্তন জনৈক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী ঘোষণা করলেন, "আপনারা সেদিনের কথা ভুলে যান যখন বাংলাদেশ ছিল পাটের রাজা, পাটের রাজা এখন ভারত।"

১৯৪৭ সালে আমাদের বস্ত্রশিল্পের দিকে তাকালেও আমরা দেখব এক করুণ চিত্র। মুসলিম শাসনামলে মসলিনসহ আমাদের বস্ত্রশিল্প সুদূর ইউরোপে পর্যন্ত রফতানী হত। বৃটেনের বস্ত্রশিল্পকে জায়গা করে দিতে আমাদের ঐতিহ্যবাহী মসলিনসহ বস্ত্রশিল্পকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল। বৃটিশ শাসিত ভারতবর্ষে বস্ত্রকল ছিল মোট ৪১০টি। এর মধ্যে অধিকাংশই পায় ভারত। ১৯৪৭ সালে পশ্চিম পাকিস্তানে বস্ত্রকল ছিল ১৬টি, পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ববঙ্গে মাত্র ৪টি। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জের ঢাকেশ্বরী, চিত্তরঞ্জন ও লক্ষ্মীনারায়ণ এবং কুষ্টিয়ার মোহিনী মিল। এ ৪টি বস্ত্রকলই ছিল হিন্দু মালিকানাধীন এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে এগুলোর মূলধন ভারতে পাচার করে দেয়া হয়। যা হোক, পাকিস্তান আমলের ২৪ বছরে এ ৪টির সাথে ১৯৭০ সালের মধ্যে আরও ৪৫টি বস্ত্রকল সংযুক্ত হয়।

বৃটিশ শাসিত ভারতবর্ষে চিনিকল ছিল ১৫৩টি। এরও অধিকাংশ পায় ভারত। ১৯৪৭ সালে পশ্চিম পাকিস্তানে চিনিকল ছিল ১১টি। আর পূর্ববঙ্গে ছিল মোট ৪টি। এ ৪টির সাথে আরও কমপক্ষে ৩০টি চিনিকল সংযুক্ত হয় পাকিস্তান আমলে।

একইভাবে আমরা দেখতে পাব ১৯৪৭ সালে আমাদের শিল্পোন্নয়নের জন্য অপরিহার্য কোন স্টিল মিল বা মেশিন টুল ফ্যাক্টরি ছিল না। পাকিস্তান আমলে স্থাপিত হয় চিটাগাং স্টিল মিলস ও মেশিন টুল ফ্যাক্টরি, যার ১টি রহস্যজনক

www.pathagar.com

কারণে ইতোমধ্যেই বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। আরেকটিও সম্প্রতি ধ্বংস হতে চলেছে। ১৯৪৭ সালে ভারত ৩টি এবং পশ্চিম পাকিস্তান ১টি সমুদ্রবন্দর পেয়েছিল। পূর্ববঙ্গের কোন সমুদ্র বন্দর ছিল না। পাকিস্তান আমলে আমরা চট্টগ্রাম ও মংলায় দুটি সমুদ্রবন্দর পেয়েছি। বৃটিশ আমলে আমাদের কোন পেপার মিল ছিল না। আমরা তখন ব্যবহার করতাম পশ্চিমবঙ্গের টিটাগর পেপার মিলের উৎপাদিত কাগজ। পাকিস্তান আমলে আমাদের নিজস্ব পেপার ও নিউজপ্রিন্ট মিল হয়েছে ৩টি। বৃটিশ আমলে আমাদের কোন সার কারখানা ছিল না। পাকিস্তান আমলে পূর্ববঙ্গে ৩টি সার কারখানা নির্মিত হয়।

আমরা আগেই বলেছি, পাকিস্তান আমলে আমরা যা পেয়েছি আমরা তাতে সন্তুষ্ট নই। আমরা আরও অনেক বেশী আশা করেছিলাম, যা পাইনি। তবুও সাতচল্লিশে যেখানে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে আমরা শূন্যস্থানে ছিলাম, তার তুলনায় আমরা একাত্তরে কিছুটা হলেও অগ্রগতি অর্জন করেছি, যাকে ভিত্তি করে আমাদের জন্য একটা সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ নির্মাণের এখন আশা করতে পারি, যদি আমরা সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদের আগ্রাসী থাবা থেকে আমাদের অর্থনীতি রক্ষা করতে পারি।

এবার শিক্ষার ক্ষেত্রে আসা যাক। ইংরেজ শাসনামলে কলিকাতা ছিল শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু। পূর্ববঙ্গের ঢাকা নগরীতে ১টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী তোলা হলে সে দাবীর বিরুদ্ধে কলিকাতা কেন্দ্রিক বাবু বুদ্ধিজীবীরা কেমন মুক্তকচ্ছ প্রতিবাদ জানিয়ে ছিলেন, তা আমরা দেখেছি। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করে দেয়ায় মুসলমানরা বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ ও প্রতিবাদ জানায়। ক্ষুব্ধ-ক্রুদ্ধ মুসলমানদের শান্ত করার উদ্দেশ্যে ইংরেজ সরকার মুসলমানদের অন্যতম দাবী ঢাকায় ১টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করলে এর বিরুদ্ধেও হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা প্রবল আন্দোলন শুরু করে দেন। তাদের সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন পর্যায়ে চলে যায় যে, পূর্ববঙ্গের জনগণ অধিকাংশ মুসলমান কৃষক, সুতরাং তাদের উচ্চ শিক্ষার জন্য ঢাকায় কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন নেই বলে অভিমত প্রকাশ করতেও দ্বিধা করেননি। ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল উদ্যোক্তা নওয়াব সলিমুল্লাহকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে এক বুক নিরাশা নিয়েই ইহজগৎ ত্যাগ করতে হয়।

নওয়াব সলিমুল্লাহর মৃত্যুর পর ধনবাড়ীর নওয়াব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ও এ কে ফজলুল হক এ ব্যাপারে আন্দোলন চালিয়ে যান। তাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টাতেই অবশেষে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকায় অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে একটা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল বটে, তবে কলিকাতার

www.pathagar.com

বাবু বুদ্ধিজীবীদের ষড়যন্ত্রের কারণে একে একটি পঙ্গু বিশ্ববিদ্যালয় করে রাখা হল। প্রদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর এর প্রভাব পড়তে দেয়া হল না। প্রদেশের সমস্ত হাই স্কুল ও কলেজের এফেলিয়েটিভ অথরিটি আগের মতোই থাকল হিন্দু নিয়ন্ত্রিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পূর্ববঙ্গের কলেজ ও হাই স্কুলসমূহ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলামীর শৃংখল থেকে মুক্তিলাভ করে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ফলেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার পঙ্গুদশা থেকে মুক্তি পেয়ে পূর্ববঙ্গের সমস্ত কলেজের এফিলিয়েটিভ কর্তৃত্ব লাভ করে। হাই স্কুল ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ লাভ করে নবগঠিত ইস্ট পাকিস্তান বোর্ড অব ইন্টারমিডিয়েট এন্ড সেকেন্ডারি এডুকেশন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ফলে শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার পঙ্গুদশা থেকে মুক্তি পেল না, দেশে উচ্চ শিক্ষার বহুমাত্রিক বিস্তারও শুরু হল দ্রুতগতিতে। ১৯৪৭ সালে পূর্ববঙ্গের শুধু ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে ২৪ বছরে চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও জাহাঙ্গীরনগর এই ৩টি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও ১টি ইঞ্জিনিয়ারিং ও ১টি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে এই উন্নতির ফলে প্রশাসনের উপরও তার সুফল পড়ে।

বৃটিশ শাসিত ভারতবর্ষে প্রশাসন কার্য পরিচালনার জন্য যে সুপিরিয়র সার্ভিস ছিল তার নাম ছিল ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস। ১৮৫৪ সাল থেকে এই সার্ভিসে ইংরেজদের পাশাপাশি ভারতীয়দেরও রিক্রুট করা শুরু হয়। বৃটিশ শাসনামলে কোন বাঙালী মুসলমান আইসিএস ক্যাডারভুক্ত হবার সুযোগ পাননি। ভারতের তদানীন্তন যুক্ত প্রদেশ (বর্তমানকালের উত্তর প্রদেশ) ও পাঞ্জাব থেকে কিছু মুসলমান আইসিএস ক্যাডারভুক্ত হন, বাদবাকি অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু, যাদের সাথে আরও ছিলেন কিছু শিখ। ফলে ১৯৪৭ সালে ভারতে যেখানে নিজস্ব ৫০০ জন আইসিএস ক্যাডার ছিল, পাকিস্তান সেখানে যে ১০০ জন আইসিএস ক্যাডারের অফিসার নিয়ে যাত্রা শুরু করে তার মধ্যে বেশ কিছু ইংরেজ অফিসারকেও নিতে হয়েছিল। সেই ১৯৪৭ সালে বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে একমাত্র আইসিএস ছিলেন বৃহত্তর রংপুর জেলার নূরুন্নবী চৌধুরী। তিনিও ছিলেন নমিনেটেড আইসিএস।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সেন্ট্রাল সুপিরিয়র সার্ভিস প্রবর্তিত হয়। ১৯৪৭ সালে এই সেন্ট্রাল সুপিরিয়র সার্ভিসে পূর্ববঙ্গ থেকে কেউ প্রবেশাধিকার না পেলেও ১৯৪৮ সালে ২ জন প্রবেশাধিকার পান। ১৯৪৮ সালে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ১৬ জন সিএসএস পরীক্ষায় কোয়ালিফাই করেন। এরপর পূর্ব পাকিস্তানের প্রার্থীরা ক্রমবর্ধমান হারে সিএসএস-এ প্রবেশাধিকার লাভ করতে থাকে। ১৯৬৪

www.pathagar.com

সালের হিসাবে দেখা যায়, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সেবার ২০ জন সিএসএস-এ চান্স পেয়েছেন, আর পূর্ব পাকিস্তান থেকে সফল হয়েছেন ১৯ জন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে সামরিক বাহিনীতে বাঙালী মুসলমানদের অবস্থাও ছিল প্রায় একইভাবে করুণ। বাঙালী সামরিক জাতি নয়, এ ধারণা আমাদের অস্থিমজ্জায় ঢুকিয়ে দেয়া হয় পরিকল্পিতভাবে। পক্ষান্তরে পশ্চিম পাকিস্তানের পাঠান ও পাঞ্জাবীরা বহু আগে থেকেই বংশানুক্রমে সামরিক বাহিনীতে যোগ দেয়া তাদের স্বাভাবিক কর্তব্য বলে বিবেচনা করত। ১৯৪৭ সালে যখন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয় তখন নতুন রাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীতে বাঙালীদের সংখ্যা ছিল মাত্র ১ হাজারের মত, যেখানে পশ্চিম পাকিস্তানীদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৫০ হাজার। ঊনিশ শ' সাতচল্লিশ থেকে একাত্তর এই ২৪ বছরে ১ হাজার থেকে বাঙালীদের সংখ্যা উন্নীত হয় ৪০ হাজারে। আর পশ্চিম পাকিস্তানীদের সংখ্যা ৫০ হাজার থেকে উন্নীত হয় ২ লাখ ৬০ হাজারে। ঐ সময়ে সবচেয়ে যেটা আমাদের লাভ হয় তা হল ১৯৬৫-এর পাক-ভারত যুদ্ধে লাহোরের খেমকারান সেক্টরে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট যে দুঃসাহসিক রণনৈপুণ্যের পরিচয় দেয় তাতে বাঙালীরা সামরিক জাতি নয় বলে যে ভুল ধারণা ছিল তা যেমন চিরতরে দূর হয়ে যায়, তেমনি জাতির মধ্যে একটা অদম্য আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হয়, যার প্রমাণ আমাদের লড়াকু জোয়ানরা নতুন করে দেয়ার সুযোগ পায় একাত্তরে।

একই ব্যাপার লক্ষ্য করা যায় ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংক-বীমা, বিজ্ঞান, কারিগরি, ইঞ্জিনিয়ারিং ও চিকিৎসা বিজ্ঞান, মিডিয়া ও সংবাদপত্র, শিল্পকলা ও সাহিত্য, সঙ্গীত, নাটক ও চলচ্চিত্র সব ক্ষেত্রে। খুব একটা সন্তোষজনক পর্যায়ে না হলেও সব ক্ষেত্রেই হাঁটি-হাঁটি, পা-পা করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার একটা নিজস্ব ভিত্তিভূমি গড়ে ওঠে সাতচল্লিশ পরবর্তী ২৪ বছরে।

আমরা অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রশাসন, প্রতিরক্ষা যেদিকেই তাকাই না কেন, এটা পরিষ্কার যে, ১৯৪৭ সালে পার্টিশন ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে আমাদের জাতীয় জীবনে এক সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন আসে, যার ফলে আজ বাংলাদেশ একটি স্বাধীন, সার্বভৌম এবং সমৃদ্ধ দেশ হিসাবে আত্মমর্যাদা নিয়ে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার স্বপ্ন দেখছে। আমরা সাতচল্লিশের রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের কাছে জাতি হিসাবে কতটা ঋণী, তার প্রমাণ মেলে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের সংবিধানেও। এই সংবিধানে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত যে ভূখণ্ডটি 'পূর্ব পাকিস্তান' নামে পরিচিত ছিল, অতঃপর সেটাই পরিচিত হবে বাংলাদেশ হিসাবে। আর এ কথাও সবারই জানা আছে যে, পূর্ব পাকিস্তান নামের ঐ ভূখণ্ডটিকেই আমরা একটি প্রাদেশিক অবয়বে

www.pathagar.com

লাভ করেছিলাম ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট।

এই যে জাতীয় জীবনে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন, এই যে আত্মবিশ্বাসে ভরপুর জাতির এক নয়া অভিযাত্রার শুভ সূচনা, এটা এমনি এমনিতে আসেনি। এটা কারও দয়ার দানও ছিল না। এ ছিল জাতির বহুদিনের উদ্দীপ্ত সংঘবদ্ধ সংগ্রামের ফসল। এ সংগ্রামে নিশ্চয়ই প্রধান নেতা ছিলেন একজন ঃ কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। কিন্তু এতবড় সুদূরপ্রসারী আন্দোলন শুধু একজন নেতার পক্ষে সম্ভব হত না যদি দেশের অসংখ্য ছোট বড় নেতা সে সংগ্রামে শামিল থেকে তাঁর হাত শক্তিশালী করতে এগিয়ে না আসতেন। আসলে সে সংগ্রামে শামিল ছিলেন যেমন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, তেমনি শামিল ছিলেন ওলামায়ে কেরাম, পীর মাশায়েখ, শিল্পী-সাহিত্যিক-সাংবাদিক এবং কৃষক, শ্রমিক, মহিলা ও ছাত্র নেতৃবৃন্দ।

সে সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন যেমনি বাংলার বাইরের নেতৃবৃন্দ, তেমনি অংশ নেন বাংলার প্রবীণ ও নবীন সকল পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা। তাই তো দেখা যায়, সে আন্দোলনে যেমন অংশ নিচ্ছেন যুক্ত প্রদেশের নবাবজাদা লিয়াকত আলী খান, নবাব ইসমাইল খান ও চৌধুরী খালেকুজ্জামান, বিহারের হোসেন ইমাম, বোম্বাইয়ের ইব্রাহীম ইসমাইল চুন্দ্রীগড়, মধ্য প্রদেশের সিদ্দিক আলী খান, পাঞ্জাবের সিকান্দর হায়াত, শওকত হায়াত খান, রাজা গজনফর আলী, মামদোতের নবাব ইফতিয়ার হোসেন খান, মাহমুদাবাদের রাজা ও বামপন্থী নেতা মিয়া ইফতিখারুদ্দিন, সিন্ধুর আইয়ুব খুরো, গোলাম হোসেন হেদায়েতুল্লাহ, পীর পাগারো ও ইউসুফ আবদুল্লাহ হারুন, সীমান্ত প্রদেশের সরদার আওরঙ্গজেব খান, সরদার আবদুর রব মিশতার, মানকী শরীফের পীর ও খান আবদুল কাইয়ুম খান এবং বেলুচিস্তানের কাজী ঈসা, তেমনি অংশ নিচ্ছেন বাংলা-আসামের শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, মওলানা আকরম খাঁ, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, এম এ এইচ ইস্পাহানী, হোসেন শহীদ সোহরওয়ার্দী, খাজা নাজিমুদ্দিন, সৈয়দ মোহাম্মদ সাদুল্লাহ, আবদুল মতিন চৌধুরী, মৌলভী তমিজউদ্দিন খাঁ, আবুল হাশিম, শামসুদ্দীন আহমদ, নূরুল আমিন, আবদুর রহমান সিদ্দিকী, নওয়াব খাজা হাবিবুল্লাহ, চৌধুরী মোয়াজ্জম হোসেন (লাল মিয়া), রফিউদ্দিন আহমদ সিদ্দিকী, ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া), মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, খাজা শাহাবুদ্দীন, মওলানা রাগেব আহসান, মাহবুবুল হক, ফজলুর রহমান, হামিদুল হক চৌধুরী, খাজা নসরুল্লাহ, আবদুল জব্বার খদ্দর, মোহাম্মদ আলী (বগুড়া), হাজী মোহাম্মদ ইসমাইল, ডাঃ আবদুল মোতালিব মালিক, আতাউর রহমান খান, শামসুল হক, কমরুদ্দীন আহমেদ, আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী, মাহমুদ আলী, খান আবদুস সবুর, খয়রাত হোসেন, ইয়ার মুহাম্মদ খান, এডভোকেট আবদুস সালাম

www.pathagar.com

খান, আবুল কাশেম খান, ওয়াহিদুজ্জামান প্রমুখ নেতা।

পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদের মধ্য থেকে যারা নারী সমাজের মধ্যে এ আন্দোলনের আদর্শ ছড়িয়ে দেয়ার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তাদের মধ্যে ছিলেন ফাতেমা জিন্নাহ, রানা লিয়াকত আলী খান, বেগম শাহনওয়াজ, বেগম শায়েস্তা একরামুল্লাহ, বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ, ঢাকার বেগম আনোয়ারা খাতুন, বেগম নূরজাহান মোরশেদ প্রমুখ।

বাংলাদেশের ভেতরে-বাইরের ওলামায়ে কেরাম ও পীর মাশায়েখদের মধ্যে যারা এ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন তাদের মধ্যে ছিলেন মাওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী, আল্লামা আজাদ সোবহানী, মওলানা জাফর আহমদ ওসমানী, মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী, ফুরফুরার পীর মওলানা আবদুল হাই সিদ্দিকী, শর্ষিনার পীর হযরত নেছারুদ্দিন আহমদ, পীরজাদা মওলানা আবু জাফর সালেহ, মওলানা আজিজুর রহমান নেছারাবাদী, মওলানা রুহুল আমীন, মওলানা মোয়েজ্জুদিন হামিদী প্রমুখ।

প্রবীণ নেতৃবৃন্দের পাশাপাশি এই আন্দোলনকে অপ্রতিরোধ্য করে তোলার ব্যাপারে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন তদানীন্তন মুসলিম ছাত্র সমাজ। বাংলা ও আসামে যারা তাদের নেতৃত্ব দেন তাদের মধ্যে ছিলেন আবদুল ওয়াসেক, ফজলুল কাদের চৌধুরী, আনোয়ার হোসেন, শামসুল হুদা চৌধুরী, শাহ আজিজুর রহমান, কাজী গোলাম মাহবুব, শেখ মুজিবুর রহমান, সুলতান হোসেন খান, খন্দকার মোশতাক আহমদ, তাজউদ্দিন আহমদ, আজীজ আহমদ, নঈমুদ্দিন আহমদ, তাসাদ্দক আহমদ, আবদুর রহমান চৌধুরী, দবিরুল ইসলাম, কামরুজ্জামান, রফিকুল হোসেন, আবু সালেক, আবদুস সামাদ প্রমুখ।

শুধু প্রবীণ বা নবীন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ন'ন জাতির প্রতিটি স্তরের মানুষ সেদিন পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যারা প্রকাশ্যভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ নিতেন না বা নিতে পারতেন না, সেই সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও নীরবে সমর্থন জানিয়েছিলেন পাকিস্তান আন্দোলনের প্রতি। ১৯৪৫-৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবীর যে এত বিপুল সমর্থন লাভ করেছিল, তা সম্ভবই হত না পাকিস্তান দাবী প্রতি সরকারী বেসরকারী সর্ব পর্যায়ের জনগণের ব্যাপক সমর্থন না থাকলে। মোটের উপর পাকিস্তান বনাম অখণ্ড ভারত এই দু'দাবীর ভিত্তিতে সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সুস্পষ্ট দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। এর প্রতিফলন পড়েছিল ১৪ আগস্টের প্রাক্কালে। সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীরা কে ভারত আর কে পাকিস্তান রাষ্ট্রে কাজ করতে চান, এই অপশন দিতে বলা হলে প্রায় সকল মুসলমান কর্মকর্তা-কর্মচারী

www.pathagar.com

ভারতে কাজ করার পক্ষে অপশন দেন।

সামরিক বাহিনী সাধারণত সমস্ত রকম রাজনৈতিক ডামাডোলের উর্ধ্বে থাকে। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রাম এমন এক ব্যাপার যেখানে সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তো বটেই, এমনকি সামরিক বাহিনীর সদস্যদেরও একটা সুস্পষ্ট অবস্থান গ্রহণের প্রশ এসে দাঁড়ায়। বৃটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়েও কংগ্রেস তার চিরাচরিত একগুঁয়েমীবশত দাবী করত, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রশ্নে সংঘাত দু'টি পক্ষের মধ্যে একটি বৃটিশ রাজ, অপরটি কংগ্রেস। পক্ষান্তরে মুসলিম লীগ দাবী করত, স্বাধীনতার প্রশ্নে সংঘাত তিনটি পক্ষের মধ্যে ঃ একটি বৃটিশ, অপর দু'টি কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ। মুসলিম লীগের এই দাবী যে অধিক বাস্তবসম্মত ছিল, তার প্রমাণ যেমন মেলে ১৯৪৫-৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে, তেমনি মেলে রাজনৈতিক অঙ্গনের বাইরে সারকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সামরিক বাহিনীর সদস্যদের মনোভাবের মধ্যে।

সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মত সামরিক বাহিনীর সদস্যরাও সেদিন দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল ঃ মুসলমানরা প্রায় সবাই পাকিস্তানের এবং হিন্দুরা প্রায় সকলে অখণ্ড ভারতের সমর্থক ছিলেন। ১৯৪৭-এর পূর্বেই বোম্বাইতে বৃটিশবিরোধী নৌ বিদ্রোহের সময় এদেশী নৌ-সেনারা বিদ্রোহ করে বৃটিশ ভারতীয় নৌ-জাহাজ থেকে বৃটিশ ইউনিয়ন জ্যাক পতাকা নামিয়ে সে স্থানে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের পতাকা উড়িয়ে দেন। ১৯৪৭ সালে এর স্বাভাবিক ধারাবাহিকতায় লক্ষ্য করা গেল বৃটিশ ভারতীয় সামরিক বাহিনীর প্রায় সকল মুসলমান সদস্য পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনী এবং প্রায় সকল হিন্দু সদস্য ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর পক্ষে অপশন দিলেন।

শুধু সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী বা সামরিক বাহিনীর সদস্যবৃন্দ নন, বেসরকারী পর্যায়ের ব্যবসায়ী, শিল্পপতিসহ অন্যদের বেলায়ও দেখা গেল তাদের মধ্যকার নেতৃস্থানীয় হিন্দু ও শিখরা স্বাধীন ভারতে এবং অধিকাংশ নেতৃস্থানীয় মুসলমান স্বাধীন পাকিস্তানে তাদের ভাগ্য অন্বেষণে নতুনভাবে ব্রতী হলেন। ডাক্তার, উকিল, শিক্ষক, অধ্যাপক যাদের জন্য সরকারের সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের মত অপশনের বাধ্যবাধকতা ছিল না, তাদের মধ্যেও এভাবে যার যার পছন্দের রাষ্ট্রে রয়ে গেলেন বা চলে গেলেন।

বিপুলসংখ্যক লোকের এভাবে এক দেশ থেকে অন্য দেশে চলে যাওয়ার যে প্রক্রিয়া, এতে প্রথম প্রথম পাকিস্তান এবং বিশেষ করে পূর্ববঙ্গই যে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা বলাই বাহুল্য। কারণ শিক্ষা-দীক্ষা, চাকরি-বাকরি, শিল্প-বাণিজ্য, আইন, চিকিৎসা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সর্বস্তরে মুসলমানরা, বিশেষত বাঙালী মুসলমানরা বৃটিশ

www.pathagar.com

আমলে সবচাইতে পশ্চাৎপদ ছিল। হিন্দু কর্মকর্তা-কর্মচারী, শিক্ষক, অধ্যাপক, উকিল, ডাক্তার, শিল্পপতি, ব্যবসায়ীরা একযোগে চলে যাওয়ায় প্রথমদিকে এসব ক্ষেত্রে বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি হয়। ভারত থেকে আসা লোকদের দ্বারা এ শূন্যতা কিছুটা পূরণ হল। বাকীটা ধীরে ধীরে এখানকার স্থানীয় লোকদের দ্বারা পূরণের পালা শুরু হয়। এতে করে পূর্ববঙ্গের জনগণের মধ্যে এতদিন যে প্রতিভা বিকাশের অপেক্ষায় সুপ্ত অবস্থায় ছিল, তাদের সে মেধা বিকাশের পথ উন্মুক্ত হয়।

সাতচল্লিশের পটভূমি

১৯৪৭ সালে দু'শ বছরের বৃটিশ শাসনের অবসান এবং হিন্দু-মুসলিম নেতৃবৃন্দের সম্মতিতে শান্তিপূর্ণ পন্থায় স্বাধীন পাকিস্তান ও ভারত নামের দু'টি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা যে কোন বিচারে ছিল উপমহাদেশের ইতিহাসে তো বটেই, এমনকি বিশ্ব ইতিহাসেও ছিল এক যুগান্তকারী ঘটনা। ১৯৪০ থেকে লাহোর প্রস্তাবের বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মুসলিম লীগ যে আন্দোলন শুরু করে, সেই আন্দোলনের পরিণতিতেই ১৯৪৭ সালে এই যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে। ঐ লাহোর প্রস্তাবের অপূরিত অংশের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অতপর ১৯৪৭ সাল থেকে নতুন সংগ্রাম শুরু হয়। তার চূড়ান্ত পরিণতিতেই ১৯৭১ সালে আমরা স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র লাভ করি।

১৯৭১ সালের পর থেকে পূর্বতন বৃটিশ শাসিত ভারতবর্ষে এখন তিনটি স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। লাহোর প্রস্তাবের আংশিক বাস্তবায়নের মারফত ১৯৪৭ সালে যদি পূর্বতন বৃটিশ ভারতকে স্বাধীন পাকিস্তান ও ভারত রাষ্ট্রদ্বয়ে বিভক্ত না করা হত, তাহলে অখণ্ড ভারতের কাঠামো ভেদ করে ১৯৭১ সালে আমাদের পক্ষে স্বতন্ত্র স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা কিছুতেই সম্ভব হত না। কাশ্মীরের করুণ পরিস্থিতির দিকে তাকালেই এ সত্য আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এখানেই পাকিস্তান আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য। আর পাকিস্তান সংগ্রামের এই সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যকে বিবেচনায় রেখেই সেদিন বাংলার সর্বস্তরের মানুষ পাকিস্তান দাবীর পেছনে কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে আপোষহীন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। পাকিস্তান দাবীর এই ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী সামাজিক তাৎপর্যের কারণেই বাঙালী মুসলমান এর মধ্যে তাদের সার্বিক মুক্তির সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিল।

এ ধরনের একটা জাতীয় সার্বিক মুক্তির আন্দোলন শুধু রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সফল হতে পারে না। তাই দেশের শিল্পী-সাহিত্যিক-সাংবাদিকদের পক্ষে এ আন্দোলন থেকে হাত গুটিয়ে দূরে বসে থাকার উপায় ছিল না। তারাও এগিয়ে এসেছিলেন পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ বা সমর্থনের মাধ্যমে এ

www.pathagar.com

আন্দোলনকে সামনে এগিয়ে দিতে। প্রবীণদের মধ্যে এ আন্দোলন যাদের শুভেচ্ছা ও সমর্থন লাভে ধন্য হয়েছিল তাদের মধ্যে ছিলেন মহাকবি কায়কোবাদ, সৈয়দ এমদাদ আলী, শেখ হাবিবুর রহমান সাহিত্যরত্ন, আবদুল গফুর সিদ্দিকী, আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ, 'মঙ্গল কাব্য' খ্যাত ভোলার কবি মোজাম্মেল হক প্রমুখ। কাজী নজরুল ইসলাম অসুস্থ হবার আগেই কায়েদে আজমের নেতৃত্বে পাকিস্তান আন্দোলন সফল হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন।

সেকালের আর যেসব প্রতিষ্ঠিত শিল্পী-সাহিত্যিক-সাংবাদিক পাকিস্তান আন্দোলনের সাথে একাত্ম হয়ে উঠেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ, মুজীবুর রহমান খাঁ, হাবীবুল্লাহ বাহার, সৈয়দ সাজ্জাদ হোসাইন, গোলাম মোস্তফা, শাহাদৎ হোসেন, জসীম উদ্দিন, আকবর উদ্দিন, ইব্রাহীম খাঁ, ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, ফররুখ আহমদ, শিল্পী কাজী আবুল কাসেম, শিল্পী জয়নুল আবেদীন, কাজী মোতাহার হোসেন, সৈয়দ আলী আহসান, শিল্পী কামরুল হাসান, বেনজীর আহমদ, মোহাম্মদ মোদাব্বের, ফজলুল হক সেলবর্ষী, মোহাম্মদ আহবাব চৌধুরী, মাহবুব-উল আলম, আবুল ফজল, জহুর হোসেন চৌধুরী, সৈয়দ আলী আশরাফ, আহসান হাবীব, তালিম হোসেন, বেগম সুফিয়া কামাল, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ, মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, আবুল হাসানাত, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, আবু রুশদ, আবুল হোসেন, আবদুল গণি হাজারী, সঙ্গীত শিল্পী আব্বাস উদ্দিন আহমদ, লায়লা আরজুমান্দ বানু, ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরু, আবদুল মওদুদ, রওশন ইজদানী, আবদুল হাই মাশরেকী, কাজী আফসার উদ্দিন আহমদ, শাহেদ আলী, কাজী মোহাম্মদ ইদ্রিস, মতিন উদ্দিন আহমদ, এস এম বজলুল হক, বেগম জেবু আহমদ, মতিউল ইসলাম, মুফাখখারুল ইসলাম, এ এস এম আবদুল জলিল, এ এফ এম আব্দুল জলিল, মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন, সৈয়দ শাহাদৎ হোসেন, সরদার ফজলুল করিম, বন্দে আলী মিয়া, তালেবুর রহমান, এম আকবর আলী, কাজী কাদের নওয়াজ, বজলুর রশীদ, আজীজুর রহমান, মবিন উদ্দিন আহমদ, মুনীর চৌধুরী, সানাউল হক, আশরাফ সিদ্দিকী, আবদুল হক, মোহাম্মদ নাসির আলী, আবু জাফর শামসুদ্দীন, মুহম্মদ আবদুল হাই, কাজী দীন মুহম্মদ, মুহম্মদ আবু তালিব, মুস্তাফিজুর রহমান, খালেকদাদ চৌধুরী, আবদুল ওহাব সিদ্দিকী, মহিউদ্দিন, আবদুর রশীদ খান, ওবায়দুল হক, নাজিরুল ইসলাম, মোহাম্মদ সুফিয়ান, খান মঈনুদ্দীন, ফতেহ লোহানী, সুফী জুলফিকার হায়দার, মোহাম্মদ কাসেম, সৈয়দ আসাদুদ্দৌলাহ সিরাজী, মওলানা আবদুল্লাহিল কাফী, সাদেকুর রহমান, ডঃ সাদেক, জহুরুল ইসলাম, কাজী আকরম হোসেন, সুফী মোতাহার হোসেন, আবদুল হাই, শহীদ নজীর আহমদ, মোসলেম উদ্দিন,

www.pathagar.com

সঙ্গীত শিল্পী আবদুল আহাদ, বেদার উদ্দিন আহমদ, আবু যোহা নূর আহমদ, কণ্ঠশিল্পী শেখ লুৎফর রহমান, আবদুল লতিফ চৌধুরী, শামসুর রহমান, নূরুল হোসেন খন্দকার, ইজাবউদ্দিন আহমদ, সাইদ সিদ্দিকী, এ জেড আবদুল্লাহ, গীতিকার নাজীর আহমদ, শাহেদা খানম, আজহারুল ইসলাম, চৌধুরী ওসমান, সিকান্দার আবু জাফর প্রমুখ।

কায়েদে আজম, পাকিস্তান, সাতচল্লিশের চৌদ্দই আগস্টে লব্ধ স্বাধীনতার ঐতিহাসিক তাৎপর্য সম্বন্ধে সাতচল্লিশের আগে-পরে শিল্প-সাহিত্য অঙ্গনে এরা এত বেশি অবদান রেখেছেন যে, তার শুমার করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। সেই বেশুমার সৃষ্টি সম্ভারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দানও এক সুকঠিন ব্যাপার। তাই সে কঠিন পথে আমরা যাব না।

আমরা এখানে শুধু অল্প কয়েকজন কবি-সাহিত্যিকের লেখা থেকে সামান্য ক'টি উদাহরণ টেনে দেখাতে চেষ্টা করব, সাতচল্লিশের সেই ঐতিহাসিক অর্জন ও পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃত্বের প্রতি তারা কতটা আবেগাপ্লুতভাবে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং আমাদের জাতীয় মুক্তির ইতিহাসে সাতচল্লিশের ১৪ আগস্টের অর্জনকে তারা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেছেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পটভূমি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সাহিত্যিক-শিক্ষাবিদ ইব্রাহীম খাঁ লেখেন ঃ

"পাকিস্তান সৃষ্টির আগে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত বাসিন্দাই আমেরিকায় হিন্দু নামে পরিচিত ছিল। ভারতে মুসলমান আছে এ কথা আমেরিকাবাসী জানত না বললেই চলে।... সে আমলে দেশের ভেতরে ও বাইরে ভারত উপমহাদেশের মুসলমানরা... সর্বত্র অবজ্ঞাত, উপেক্ষিত ছিল।" (মাহেনও, ডিসেম্বর ১৯৫১)

পাকিস্তান দাবীর ঐতিহাসিক পটভূমি এবং জিন্নাহ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হাবীবুল্লাহ বাহার বলেন ঃ

"দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজন হিন্দু-মুসলমান মিলন এবং বিশেষ করিয়া মাইনরিটির মনে নিশ্চিন্ত মনোভাবের সৃষ্টি করা- এ কথা তিনি (জিন্নাহ) রাজনৈতিক জীবনের প্রথমভাগেই অনুভব করিয়াছিলেন। এ জন্যই তিনি আশা করিয়াছিলেন ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠের নিকট উদার মনোবৃত্তি। এই কারণেই লক্ষ্ণৌ প্যাক্টের ভিতর দিয়া তিনি চাহিয়াছিলেন মিলন ঘটাতে।

"গান্ধী-পূর্ববর্তী নেতাদের সঙ্গে জিন্নার চিন্তার মিল ছিল। এই জন্য সেকালে তাঁর মিলন প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে নেতারা অতখানি উদার মনোবৃত্তির পরিচয় দিতে পারেন নাই। চিন্তার রাজ্যে তারা গোলকধাঁধাঁর সৃষ্টি করিয়া চেষ্টা করিয়াছেন সমস্যাকে অস্বীকার করিতে।...

www.pathagar.com

"জিন্নাহ সব সময়ই ছিলেন মুক্ত বিচারবুদ্ধির পক্ষপাতী।....

"কায়েদে আজম বলিয়াছিলেন ঃ কোন সিদ্ধান্তে আসিবার আগে হাজারবার বিবেচনা করিবে। একবার সিদ্ধান্তে আসিতে পারিলে আর কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব নয়। তখন অগ্রসর হইবে সম্মুখে। উপযুক্ত মনোবল লইয়া অগ্রসর হইতে পারিলে সাফল্য আসিবেই।" (হাবীবুল্লাহ বাহার রচনাবলী)

সাতচল্লিশের চৌদ্দ আগস্টে আমাদের অর্জন সম্পর্কে কবি মঈনুদ্দীন বলেন ঃ

"কায়েদে আজম বিরাট দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। তিনি সুষ্ঠুভাবে তা সম্পন্ন করে গেছেন। আজাদ পাকিস্তান রাষ্ট্র গড়ে দিয়ে গেছেন। এই নবজাত রাষ্ট্রকে সমৃদ্ধিশালী করার দায়িত্ব, সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব, পৃথিবীর অন্যতম প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রে পরিণত করার দায়িত্ব এখন আমাদের।" (মাহেনও, ডিসেম্বর ১৯৫২)

১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বরে পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগ সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান কায়েদে আজমের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বেতার ভাষণে বলেন ঃ

"১১ই সেপ্টেম্বর আমাদের জাতীয় ইতিহাসের একটি স্মরণীয় দিন। দশ বছর আগে আজকের দিনে আমাদের জাতির প্রতিষ্ঠাতা কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ইন্তেকাল করেন। তাই প্রতিবছর বিশেষ করে এ দিনে তাঁর গুণমুগ্ধ ও কৃতজ্ঞ দেশবাসী তাঁকে স্মরণ করে- তাঁর জীবনচরিত থেকে শিক্ষা ও অনুপ্রেরণা লাভ করার চেষ্টা করে।...

"কায়েদে আজম যে শুধু একটি নতুন রাষ্ট্রেরই জনক তা নয়, তিনি একটি জাতিরও প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা। পাক-ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসের এমন এক যুগ সন্ধিক্ষণে এবং এমন একটি সম্প্রদায়ের নেতৃত্বের মহান দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেছিলেন, যে সময়টি ছিল সমস্যাসংকুল ও সংকটপূর্ণ এবং যে সম্প্রদায়টি ছিল শতধাবিচ্ছিন্ন, দরিদ্র, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও নিষ্পেষিত।"

পাকিস্তান দাবীর পটভূমি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ১৯৫৭ সালে লিখেন ঃ

"জিন্নাহর রাজনৈতিক জীবনধারা সমকালীন মুসলিম মানসের গতিধারার প্রতীকও বটে। আজাদী লাভ সম্পর্কে তিনি সকল সময়ই সচেতন ছিলেন। তবু প্রথম জীবনে স্বতন্ত্র সংগঠন সম্পর্কে উৎসাহী ছিলেন না, যদিও পরবর্তী সময়ে যে সংগঠনকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। মুসলিম মানসেও সচেতনতা যদি বা এসেছিল তবু সংগঠনকে শক্তিশালী করার উপলব্ধি প্রথমে আসেনি, সে উপলব্ধি এসেছিল পরবর্তী সময়ে।" [দ্রষ্টব্য ঃ ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব শতবার্ষিকী উপলক্ষে

www.pathagar.com

সংকলন ঃ শতাব্দী পরিক্রমা, সম্পাদক হাসান জামান, প্রথম সংস্করণ ১৯৭৪, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, পৃষ্ঠা ২৬৪]

পাকিস্তান আন্দোলনের প্রধান নেতা কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর উপর প্রচুর সংখ্যক পুস্তক প্রকাশিত হয় তাঁর ইন্তেকালের পূর্বে ও পরে। সাহিত্যিক আবুল ফজল তাঁর উপর 'কায়েদে আজম' নামে একখানি নাটক লিখেন, যে কথা আগেই বলা হয়েছে। জিন্নাহর উপর শিশু-কিশোরদের উপযোগী গ্রন্থ রচনা করে যারা খ্যাতিলাভ করেন, তাদের মধ্যে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, সিরাজুদ্দীন হোসেন, হাসান হাফিজুর রহমান প্রমুখ ছিলেন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কায়েদে আজম ও পাকিস্তান আন্দোলন সম্বন্ধে কবিতাও লেখেন প্রবীণ-নবীন অনেক কবি। সুফিয়া কামাল কায়েদে আজমের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে লেখেন ঃ

"কায়েদে আজম! হে মহান নেতা
সাড়া দাও, দাও সাড়া
তোমারে ভোলেনি, আজও ডাকিছে
বঞ্চিত সর্বহারা"

(মাহেনও, ডিসেম্বর ১৯৫৪)

১৯৬৮ সালের ১৪ আগস্ট 'পাকিস্তানী খবর' পত্রিকায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যে ইতিহাস সৃষ্টি হয় সে সম্পর্কে সুফিয়া কামাল লেখেন ঃ

"এইখানে একটি পতাকা
চন্দ্র ও তারকা আঁকা
কোটি প্রাণের নবপ্রাণের প্রতীক-
উচ্ছ্বসিত করি দিক দিক
এখনও মুক্তির স্বাদে দুর্ভিক্ষে প্লাবনে
মানুষের দানে
স্বাধীন হইয়া বাঁচিবার
প্রেরণা অপার-
এই পাক ভূমি আজও সংগ্রামে দুর্বার
এই দিন আসে বারবার।" (স্মরণীয়)

কবি ফররুখ আহমদ কায়েদে আজমের মৃত্যুতে শোকাহত হয়ে লিখেছিলেন ঃ

"চাঁদ ডুবে গেল! নিভে গেল আফতাব!
লাখো সেতারার মাঝে চাঁদ ডুবে গেল,
জামানার ঘোর জুলমাতে হয়ে নিভে গেল

www.pathagar.com

আফতাব।

(বার্ষিকী ঃ নয়া সড়ক)

কবি মুফাখ্‌খারুল ইসলাম কায়েদে আজমের মৃত্যুতে যে কবিতা লেখেন, তার এক পর্যায়ে বলেন ঃ

"কায়েদে আজম! কায়েদে আজম!
কে বলে মরেছ তুমি?
গুরু-জিহাদের রণ-শ্রান্তিতে
হয়ত পড়েছ ঘুমি।"

(কাব্য-বীথি)

কবি সৈয়দ আলী আহসান পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা কায়েদে আজমের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে লেখেন ঃ

"আমরা জেগেছি তোমার আভায়
প্রতিদিন প্রতিরাত,
আমরা দেখেছি জীবনের আলো
দীপ্ত অকস্মাৎ
আমরা দেখেছি সৌর বলয়
মাটিতে এনেছে দিন
আমরা দেখেছি রাত্রির তারা
আসমানে রংগিন।"

(কায়েদে আজম, নয়া সড়ক বার্ষিকী)

কবি আশরাফ সিদ্দিকী কায়েদে আজমের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে 'মৃত্যু নেই' শীর্ষক কবিতায় তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এভাবে ঃ

"পার হয়ে বহু দীর্ঘ পথ
পিছে ফেলে অরণ্য পর্বত
কাফেলা এখানে এসে দাঁড়ালো আবার
কাফেলার চোখে অশ্রুধার।"

(মাহেনও, সেপ্টেম্বর ১৯৫২)

কবি মযহারুল ইসলাম পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা কায়েদে আজমের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন 'স্রষ্টার প্রতি' শীর্ষক কবিতার মাধ্যমে। এ কবিতার একপর্যায়ে তিনি বলেন ঃ

"যে এনেছে বুক জুড়ে আশ্বাস

www.pathagar.com

যে দিয়েছে সত্তা নিয়ে বাঁচবার বিশ্বাস
অগণন মানুষের হৃদয়-মঞ্জিলে
-সে আমার কায়েদে আজম।"

(মাটির ফসল)

সাতচল্লিশের চৌদ্দ আগস্ট অর্জিত 'আজাদীর রাঙা দিন' নিয়ে রচিত গীতি-কবিতায় কবি শামসুর রাহ্মান বলেন ঃ

"নিঃসীম উজ্জ্বল আকাশে
ঝলমল রৌদ্রের আকাশে
আজাদীর রাঙা দিন জ্বলছে।।
সাতরঙা চেতনার দীপ্তি
স্বপ্নের প্রশান্ত ছন্দে
নবজীবনের কথা বলছে।"

[দ্রষ্টব্য ঃ নব দিগন্তের গান, আবদুল আহাদ সম্পাদিত, সমকাল প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬১, পৃঃ ১৩]

পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা কায়েদে আজমের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাঁর জন্মদিনে কবি মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান রচনা করেন 'জন্মদিন প্রতিদিন' (কায়েদে আজমকে) শীর্ষক এক অনবদ্য কবিতা। এতে তিনি বলেন ঃ

"তোমার এ জন্মদিন প্রতিদিন জেনেছি,
কেননা
যে আমি আমার দেশ ভালবাসি, অন্যমনা
হইনি কখনো শুনে শকর রটবা।"

(মাহেনও, ডিসেম্বর ১৯৫৬)

অবশেষে আমরা কবি সিকান্দার আবু জাফরের একখানি অসাধারণ গানের উদ্ধৃতি দিয়ে সাতচল্লিশের চৌদ্দই আগস্টে আমাদের ঐতিহাসিক অর্জনের পেছনে দু'শ' বছরের অসংখ্য স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বীর মুজাহিদের যে অবদান, তার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জানাব। কারণ কবির মত আমরাও বিশ্বাস করি যে, স্বাধীনতা, দু'শ' বছরের গোলামীর জিঞ্জির ভাঙ্গা সে আজাদী হঠাৎ করে আসেনি। সে আজাদী ছিল অসংখ্য সংগ্রামীর বিরামহীন সংগ্রামের ফসল। আর সে আজাদী, সে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিটি পদক্ষেপে ছিল লাখো শহীদের ছোপ ছোপ রক্তের দাগ। কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে জাতিও যেন সেদিন গেয়ে ওঠে-

"আজিকার এই দিনে

www.pathagar.com

আজাদীর তকবীর তুলেছিল যারা।
স্মরণে আজিকে জাগে তারা।।
গোলামীর বন্ধন ভাঙল যারা
মরণের ক্রন্দন হানল যারা
জীবনের হিম্মত আনল যারা
তাহাদের কভু নাহি ক্ষয়।।
পলাশীর প্রান্তরে যাদের নিশান
সিরাজের তাজা খুনে হল মহীয়ান
উদয়নালার গড়ে যাদের জেহাদ
মীর কাসিমের ত্যাগে হল গরীয়ান
নির্ভয়ে তারা নিল মৃত্যুর দান
তাহাদের নাহি অবসান।।
মরণ পথের রাহী শহীদ সেনা
শুধিতে পারেনি যারা লহুর দেনা,
তিতুমীর হায়দার টিপু সুলতান
প্রাণ দিয়ে রেখেছেন যাহাদের নাম
চিরদিন রবে অম্লান।।
যাদের হৃদয়ে ছিল অগ্নি জমা
ক্ষমার বদলে তারা পায়নি ক্ষমা,
তাদের সাধনা নিয়ে এসেছে পুনঃ
জেহাদের পথে যারা সর্বহারা
আজিকার এ আজাদী তাহাদের দান
তাহাদের নাহি অবসান।।

[দ্রষ্টব্য ঃ আব্দুল আহাদ সম্পাদিত 'নব দিগন্তের গান', সমকাল প্রকাশনী, পৃঃ ৬৫]।

[প্রথম খণ্ড সমাপ্ত]

www.pathagar.com

সাবেক কলেজ শিক্ষক, সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক, সাংস্কৃতিক সংগঠক আবদুল গফুরের জন্ম ১৯২৯ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারী (আনুমানিক)। দিনটি ছিল ফাল্গুন ও রমজান মাসের মঙ্গলবার। জন্মস্থান বৃহত্তর ফরিদপুর (বর্তমান রাজবাড়ী) জেলার খানগঞ্জ ইউনিয়নের দাদপুর গ্রামের এক কৃষক পরিবারে। পিতা ও মাতার নাম যথাক্রমে মরহুম হাজী হাবিল উদ্দিন মুন্সী ও মরহুমা শুকুরুন্নেছা খাতুন।

শিক্ষা জীবন শুরু পিতার প্রতিষ্ঠিত গ্রামের মকতবে। এরপর ক্লাশ ফোর থেকে সিক্স পর্যন্ত পাবনা জেলার তালিমনগর জুনিয়ার মাদ্রাসায় অধ্যয়ন। ফরিদপুর ময়েজ উদ্দিন হাই মাদ্রাসা থেকে ১৯৪৫ সালে বাংলা ও আসামের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে হাই মাদ্রাসা পরীক্ষা পাশ। ১৯৪৭ সালে ঢাকা গবর্নমেন্ট ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ (বর্তমানের সরকারী নজরুল কলেজ) থেকে ঢাকা বোর্ডের ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় নবম স্থান লাভ। ছাত্র জীবনেই পাকিস্তান আন্দোলন ও ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ। ১৯৫০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ফাইনাল অর্নাস পরীক্ষার মাত্র দু'মাস আগে ভাষা আন্দোলন-সহ তমদ্দুন মজলিসের কাজে সার্বক্ষণিক কর্মী হিসাবে আত্মনিয়োগ করার কারণে ছাত্র জীবনের দীর্ঘ বিরতি। ফলে ১১ বছর পর ১৯৬২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে (সমাজকল্যাণে) এম. এ. ডিগ্রী লাভ।

[কর্ম জীবনের সূচনা ও শেষ উভয় পর্ব সাংবাদিকতায় কাটলেও মাঝে মাঝে অন্যান্য ক্ষেত্রেও সক্রিয় হয়েছেন। ১৯৪৭ সালে পাক্ষিক জিন্দেগীতে সাংবাদিক জীবনের সূচনা। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত সাপ্তাহিক সৈনিক এর সহ-সম্পাদক ও সম্পাদক এবং এরপর দৈনিক মিল্লাত (১৯৫৭) ও দৈনিক নাজাত (১৯৫৮)-এর সহকারী সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর আদি পূর্বসূরী দারুল উলুম (ইসলামিক একাডেমী)-এর সুপারিন্টেন্ডেন্ট (১৯৫৯-৬০) হিসাবে দায়িত্ব পালন। ১৯৬২ সালে এম. এ পাশের পর ১৯৬৩ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান সরকারের সমাজকল্যাণ বিভাগের অধীনে চট্টগ্রাম জেলা যুব কল্যাণ অফিসার হিসাবে এক বছর দায়িত্ব পালন। এরপর ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ (১৯৬৩-৭০) এবং ঢাকা আবুজর গিফারী কলেজে (১৯৭২-৭৯) সমাজকল্যাণের অধ্যাপক হিসাবে দায়িত্ব পালন। ১৯৭১ সালের মে থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত দৈনিক আজাদ এর বার্তা সম্পাদক, ১৯৭২-৭৫ ইংরেজি দৈনিক পিপল-এর সহকারী সম্পাদক, ১৯৭৯-৮০ দৈনিক দেশ-এর সহকারী সম্পাদক এবং ১৯৮০ থেকে ১৯৮৯ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর প্রকাশনা পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন। দৈনিক ইনকিলাব এর সূচনা (১৯৮৬) থেকে এর ফিচার সম্পাদক পদে কর্মরত রয়েছেন।

[প্রকাশিত পুস্তক-পুস্তিকার মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ইসলাম, বিপ্লবী ওমর, পাকিস্তানে ইসলামী আন্দোলন, কর্মবীর সোলায়মান, Social welfare, Social services, সমাজকল্যাণ পরিক্রমা, কোরআনী সমাজের রূপরেখা, খোদার রাজ্য (শিশুতোষ গ্রন্থ), ইসলাম কি এ যুগে অচল, ইসলামের জীবন দৃষ্টি, রমজানের সাধনা, ইসলামের রাষ্ট্রীয় ঐতিহ্য, আসমান জমিনের মালিক (শিশুতোষ গ্রন্থ), শাশ্বত নবী, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও ইংরেজী ও বাংলায় ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, সাহিত্য, ইসলাম ও সমসাময়িক বিশ্ব সম্পর্কে তাঁর আরও প্রায় এক ডজন গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে।

www.pathagar.com